মীর মশার্‌রফ হোসেন রচনাসংগ্রহ

(প্রথম খণ্ড)

সম্পাদক : ডঃ বিষ্ণু বসু

কমলা সাহিত্য ভবন
৪ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ই আগস্ট, ১৯৫৭

কমলা সাহিত্য ভবনের পক্ষে
শ্রী মদন সিংহ কর্তৃক ৪, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০০৭৩ হইতে প্রকাশিত।

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ শ্রীঅলকেন্দুশেখর পত্রী

অলংকরণ ও মুদ্রণে ঃ কোলাজ
২, চৌরঙ্গী রোড,
কলকাতা-৭০০০১৩।

বিষয় বিন্যাস

রত্নবতী

প্রথম পরিচ্ছেদ

গুজরাট নগরের রাজপুত্রের সহিত সেই রাজ্যের মন্ত্রিপুত্রের অভেদ্য প্রণয় ছিল। রাজপুত্রের নাম সুকুমার এবং মন্ত্রিপুত্রের নাম সুমন্ত। সুমন্ত বিদ্যাবুদ্ধিতে রাজতনয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহারা বাল্যকালাবধি যৌবনকাল পর্য্যন্ত একত্র ভোজন, একত্র শয়ন এবং একসঙ্গে ক্রীড়াদি করাতে প্রণয়ের বিশেষ আধিক্য জন্মিয়াছিল। কিন্তু কালের কি আশ্চর্য্য গতি। মনুষ্যের সৌভাগ্য-শশী কখনই সমভাব থাকে না। সময়ে পূর্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। রাজকুমার সুকুমার এবং মন্ত্রিকুমার সুমন্তের মিত্রতা তাহারই প্রমাণ দিয়াছিল।

একদা প্রভাকর দৈনিক কার্য্য সমাধানান্তর লোহিত-বসনাবৃত হইয়া পশ্চিমাচলে গমনোদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় রাজনন্দন ও মন্ত্রিতনয় অত্যুৎকৃষ্ট বেশভূষায় ভূষিত হইয়া প্রদোষকালে বিশুদ্ধ বায়ুসেবন করিতে বহির্গত হইলেন। ইতস্ততঃ নগরের সুচারু শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে রাজনন্দন সুকুমার মৃদুমধুর সম্বোধনে প্রাণাধিক মিত্র মন্ত্রিপুত্রকে বলিলেন, সখে! বল দেখি, ধন শ্রেষ্ঠ কি বিদ্যা শ্রেষ্ঠ? মন্ত্রিপুত্র হাস্য করিয়া বলিলেন, বন্ধো! ইহা আর জিজ্ঞাস্য কি? ধন অপেক্ষা বিদ্যা সহস্র অংশে শ্রেষ্ঠ। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজনন্দন বিরক্ত হইয়া কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, না তাহা কখনই হইতে পারে না। আমরা সচরাচর দেখিতেছি ধনবানেরা জগজ্জনমধ্যে বিশেষ গণ্য ও আদরণীয় হন। তাঁহারা কোন বিষয়ে নির্ধন লোকের ন্যায় চিন্তাজ্বরে জর্জ্জরীভূত হন না, বিপদেও চিত্তসুখ সম্ভোগ করিয়া নিশ্চিন্তে কালযাপন করেন। এমন কি তিলার্দ্ধকালের জন্যও দুঃখিত থাকেন না। নির্ধন ব্যক্তি যতই কেন বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন হউন না, তাঁহাদিগকে চিরদিন ধনীদিগের পদানত ভৃত্য থাকিতে হয়। তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, ধনহীন ব্যক্তির জন্মই বৃথা। ধনীরা বিপদাপন্ন নিরাশ্রয় ব্যক্তিগণকে ধনদ্বারা নিরাপদ করিয়া আশ্রয় প্রদান করিতে সমর্থ হন। পরিবারদিগকে স্বচ্ছন্দে ভরণপোষণ করিয়া পরমানন্দে কালাতিপাত করেন, এবং সমুদায় ধর্ম্মই তাঁহাদের আয়ত্তে থাকে। সুতরাং ধনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সুমন্ত অতি বুদ্ধিমান ও কৃতবিদ্য, সুতরাং রাজনন্দনের এই অযৌক্তিক বাক্য শ্রবণে কিয়ৎকাল মৌনভাবে থাকিয়া বলিলেন, বন্ধো ! পরম কারুণিক পরমেশ্বর যে সমুদায় বৃত্তি প্রদান করিয়া মানবকুলের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, বিদ্যা ভিন্ন তাহা পরিমার্জ্জিত হয় না। যে জ্ঞানের নিমিত্ত মনুষ্যেরা সকল প্রকার জীবজন্তুর উপর একাধিপত্য স্থাপন ও ঈশ্বরের অস্তিত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহাও বিদ্যা ব্যতীত লব্ধ হয় নাই। আপনি কিঞ্চিৎ স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন, বিদ্যাদ্বারা সকল কার্য্যই সাধিত হইতে পারে। অভাবনীয় ও আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কার্য্যসমূহ কেবল বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারাই সম্পন্ন হইতেছে। যে কার্য্য বিদ্যাহীন লোক প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও সমাধা করিতে পারে না, তাহা বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি অনায়াসে সাধন করিয়া আপামর সাধারণের হিত সাধন করেন। মিত্র ! বিদ্যা-বুদ্ধিবিহীন ধনীরা বিজ্ঞলোকের ন্যায় নিত্য চিত্তসুখ সম্ভোগ করিতে পারেন না। ধনীদিগের অন্তঃকরণ সর্বদাই অসুখী ; কেননা তাহারা কুসংস্কারের ক্রীতদাস। সামান্য বিষয়েই তাঁহারা উৎকণ্ঠিত ও ব্যাকুল হন। আপনি কি বিবেচনায় বিদ্যা অপেক্ষা ধনের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতেছেন, বুঝিতে পারি না। বোধ হয় প্রমাদে পতিত হইযাছেন।

আপন সিদ্ধান্তের বিপরীত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজকুমার সক্রোধ লোচনে বলিলেন, কি বৃথা তর্কবিতর্ক করিতেছ ? আমি চিরকালই জানি, তুমি আমার বাক্য খণ্ডন করিতে সাধ্যমতে ত্রুটি কর না, কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিবে যে পৃথিবীর কেহই আমার বাক্য খণ্ডন করিতে পারে না। তুমি নিস্তব্ধ হও, ধনই জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদার্থ। সুমন্ত কহিলেন, যুবরাজ ! অকারণ ক্রোধ করেন কেন ? এ তর্কের মীমাংসা স্বদেশে হইবার সম্ভাবনা নাই। যে দেশ উভয়েরই অপরিচিত এমন এক দেশে গমন করা যাউক, তাহা হইলে দেখা যাইবে, ধন দ্বারাই বা কি কার্য্য সিদ্ধ হয় এবং বিদ্যাদ্বারাই বা কি কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। রাজকুমার তাহাতে সম্মত হইলেন। অতঃপর ভিন্নদেশে গমন করাই স্থির হইল। সেই দিনই রাজনন্দন পশ্চিমাভিমুখে এবং মন্ত্রিনন্দন পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজনন্দন নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে বনপর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। সপ্তাহকাল নিবিড় বন পর্য্যটন করিয়া এক দিবস প্রভাকরের প্রখর কিরণে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলান্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বহু চেষ্টাতেও

জলপ্রাপ্ত হইলেন না। একে মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণ, তাহাতে আবার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বনে বনে ভ্রমণ করাতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিয়া খেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হা পরমেশ্বর! আমি আপন দোষে আপনি বিপদে পড়িয়াছি, ঘোরতর পিপাসা আমার জীবন-নাশিনী হইয়াছে, আর সহ্য হয় না। এই তৃষ্ণার্ত্ত নরাধম সন্তানের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়া কিঞ্চিৎ জীবনদানে জীবন রক্ষা করুন। রাজপুত্র এবম্প্রকার আক্ষেপ করিয়া পুনরায় জলান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়দ্দূর অতি কষ্টে গমন করিয়া হঠাৎ এক মনোহর উদ্যানমধ্যস্থিত একটি সুরম্য সরোবর দৃষ্ট হইলে রাজকুমার ত্রস্তভাবে তাহার তটবর্ত্তী হইলেন। রাজপুত্রের পিপাসা ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইতে লাগিল। এই সময়ে তিনি আর এক আশ্চর্য্য ঘটনা অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। সেই জলাশয়ের সোপানপার্শ্বে একটি কপিবর তপস্বী বেশে করে অক্ষমালা ধারণ করিয়া নয়ন মুদিয়া জগদীশ্বরের ধ্যান করিতেছিল। যুবরাজ বঙ্কিম চক্ষে তাহাকে দর্শন করিতে করিতে সরোবরে অবরোহণ পূর্ব্বক হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার পদভ্রষ্ট একবিন্দু বারি কপিবেশধারী তপস্বীর গায়ে পতিত হইবামাত্র কপিদেহ পরিবর্ত্তন হইয়া তাঁহার মনুষ্যদেহ হইল। তখন তিনি অতি ভয়াবহ গভীর শব্দে কহিতে লাগিলেন, ওরে নরাধম পাপিষ্ঠ, কে তুই? তুই কি জন্য আমার সমাধি ভঙ্গ করিলি? কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, প্রতিফল প্রদান করিতেছি। রাজনন্দন সুকুমার তাঁহার তর্জ্জনে কম্পিতকলেবর হইয়া কহিলেন, হে তাপসশ্রেষ্ঠ! আমার অজ্ঞাতসারে বারিবিন্দু আপনার গাত্রে পতিত হইয়াছে। অতএব কৃপা করিয়া আমার এই অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি বহু কষ্ট সহ্য করিয়া ভবদীয় শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিয়াছি। রাজতনয়ের এবম্ভূত সকাতর স্তুতিবাক্যে তপস্বী ক্রোধ সম্বরণ করিয়া কহিলেন, তুমি কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? এবং কি নিমিত্ত এই তরুণ বয়সে বনপর্য্যটনযন্ত্রণা সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছ? সবিশেষ সমস্ত বর্ণন কর, শুনিতে একান্ত ইচ্ছা হইতেছে। রাজনন্দন আত্মবিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। উদাসীন হাস্য করিয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। সুকুমার কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া বিবিধ প্রকার স্তব করিতে লাগিলেন। তপস্বী যোগবলে তাঁহার মনোগত ভাব অবগত হইয়া আপন করস্থিত অঙ্গুরীয়ক তাহাকে প্রদান করিলেন। কহিলেন, বৎস, এই অঙ্গুরীটি গ্রহণ কর। ইহার নিকট তুমি যখন যাহা চাহিবে, তৎক্ষণাৎ

তাহা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু তুমি এই অরণ্যানীর উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব প্রদেশ পরিভ্রমণ করিও, পশ্চিম প্রদেশে কদাচ গমন করিও না। তাহা হইলে বিপদ ঘটিবে। সুকুমার অঙ্গুরী প্রাপ্ত হইয়া তপস্বীর পদচুম্বন পূর্ব্বক পুনরায় স্তব করিলেন। তপস্বী তাঁহাকে বিদায় করিয়া পূর্ব্ববৎ বানরাকৃতি হইয়া আপন ইষ্ট দেবতাতে মনোনিবেশ করিলেন। রাজনন্দন আপন উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হইলেন।

পূর্ব্ব, দক্ষিণ, উত্তর এই তিনদিক ভ্রমন করিয়া রাজকুমার চিন্তা করিলেন, যোগী পশ্চিমে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। কি জন্য নিষেধ করিলেন? পরে এই স্থির সিদ্ধান্ত হইল পশ্চিম দিকে কোন আশ্চর্য্য পদার্থ থাকিতে পারে, অতএব তাহা অবলোকন করা কর্ত্তব্য। আমার বিপদ হইবার সম্ভাবনা কি আছে? তপস্বী-দত্ত অঙ্গুরীয়কের নিকট যাহা প্রার্থনা করিব তাহাই পাইব। এক্ষণে পশ্চিম প্রদেশেই গমন করা বিধেয়। এই ভাবিয়া তিনি একাদিক্রমে পশ্চিমাভিমুখে গমন আরম্ভ করিলেন। এইরূপে বিংশ দিবস নানা বন উপবন ও পর্ব্বতশ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে একটি অপূর্ব্ব নগরে প্রবেশ করিলেন। তত্রত্য অভিনব বস্তু, মানবমণ্ডলী ও নগরের শোভা দর্শন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, দেখিলেন, সম্মুখেই রাজবাটীর প্রবেশদ্বারে একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরফলকে স্বর্ণাক্ষরে এই লিখিত আছে, "এই রত্নপুর সাম্রাজ্যেশ্বরের দুহিতা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সপ্তাহকাল তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিবেন, তিনি তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিবেন। যিনি উক্ত সাতদিন অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন, তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারাবাসে থাকিতে হইবে।"

নৃপনন্দন উক্ত বিজ্ঞাপনী পাঠ করিয়া এবং অন্য অন্য লোকের নিকট রাজদুহিতার রূপলাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন, এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কপিরূপী তপস্বী-দত্ত যে অমূল্যরত্ন আমার নিকটে আছে, তাহার সহায়তায় রাজকুমারীর অভীষ্ট সমুদায় অবলীলাক্রমে প্রদান করিতে পারিব, অতএব রাজদুহিতার পাণিপীড়নে যে আমি সমর্থ হইব, তাহার কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ কল্পনাপথবর্ত্তী হইয়া সাহস ও উৎসাহ সহকারে পার্শ্ববর্ত্তী ডঙ্কাধ্বনি করিলেন।

তৎক্ষণাৎ কতিপয় পরম সুন্দর যুবা পুরুষ আসিয়া রাজনন্দের হস্তধারণ-

পূর্ব্বক নৃপতিসন্নিধানে সভামণ্ডপে লইয়া গেল। রাজা যথোচিত সমাদরে নিকটবর্ত্তী অপূর্ব্ব আসন গ্রহণ করিতে অনুমতি করিলেন। রাজনন্দন ভূপতিকে সবিনয় সম্ভাষণ করিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। নৃপতি যুবরাজের ভুবন-মোহন রূপলাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই যুবকটি অবশ্যই কোন রাজকুল অলঙ্কৃত করিয়াছেন, কিন্তু আমার কন্যা কি দুর্ভাগ্যবতী, এইরূপ সুকুমারের অঙ্কলক্ষ্মী না হইয়া বরং যথাসর্ব্বস্ব হরণপূর্ব্বক ইহাকে বিপদে পাতিত করিবে। যাহা হউক, এই উৎসাহোন্মুখ যুবককে সবিশেষ অবগত করাইয়া পূর্ব্বেই সতর্ক করা আমার কর্ত্তব্য হইতেছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া নরপতি ম্লানবদনে মৃদু সম্বোধনে কহিলেন, বৎস! তোমার আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া আমার অনুভব হইতেছে, তুমি কোন সম্ভ্রান্ত বংশ বা রাজকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ, দেশ পর্য্যটন ব্যতীত তোমার অন্য কোন অভিসন্ধি ছিল এরূপ বোধ হয় না। যাহা হউক, তুমি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া ডঙ্কাধ্বনি করাতে ইচ্ছা করিয়া বিপদহস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছ। কতশত রাজপুত্র অসংখ্য ধনরত্ন ও বিবিধ প্রকার আশ্চর্য্য বস্তু প্রদান করিয়াও আমার অঙ্গজার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে পারেন নাই। বিবাহ করিয়া সুখ-সম্ভোগ করা দূরে থাকুক, কারাগারে চিরকষ্ট ভোগ কবিতেছেন। আপনার সহিত ধনজন কিছুমাত্র দেখিতেছি না. কি প্রকারে রাজকন্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন, বুঝিতে পারিতেছি না। বৎস! আমি পুনঃপুনঃ নিষেধ করিতেছি, ইচ্ছা করিয়া অনলে অঙ্গ বিসর্জন করিও না। স্ত্রীরত্নলাভলালসা পরিত্যাগ কর। আমার দুহিতার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলে তখন আমার রক্ষা করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। যুবরাজ নৃপতির বাক্য শুনিয়া মনে মনে নানা প্রকার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। এখন উপায় কি করি। নৃপদুহিতার অলৌকিক রূপলাবণ্য আমার মনোহরণ করিয়াছে, সুতরাং চিত্তবারণ ধৈর্য্যাঙ্কুশেও বারণ না মানিয়া সেই পদ্মিনী গ্রহণ করিতে প্রতিজ্ঞা সরোবরে ধাবিত হইতেছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মহারাজ! আপনার অমৃতময় উপদেশ আমার শিরোধার্য্য; তথাচ এই নিবেদন করিতেছি, আমি যাতনা সহ্য করিয়া যখন এ পর্য্যন্ত আসিয়াছি, তখন অভিলষিত রত্ন লাভ করিতে পারিব না বলিয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করিব না। যাহা ভবিতব্যে লিখিত আছে, তাহাই ঘটিবে। আমি আপনার তনুজার মানস পূর্ণ করিতে সমর্থ কিনা, ইহা আপনি কিরূপে বুঝিতে পারিলেন? আমার সহিত ধনরত্ন ও রথ গজ নাই

বলিয়া অবজ্ঞা করিবেন না। যেহেতু সকল মনুষ্য একভাবের নহে। আমি যে একাকী এই অপরিচিত দূরদেশে আসিয়া শতশত রাজপুত্র যে কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হয় নাই তাহা সিদ্ধ করিতে সাহস প্রকাশ করিতেছি, ইহার অবশ্যই কোন নিগূঢ় কারণ থাকিতে পারে। তজ্জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না। আপনার দুহিতার নিকটে দূত প্রেরণ করুন, তাঁহার কি বাঞ্ছা, জানিতে পারিলেই অবিলম্বে পূর্ণ করিব। রাজা সুকুমারের এই সাহঙ্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া আহ্লাদে গদ্‌গদচিত্ত হইয়া সভাসদ্‌দিগকে বলিলেন, ইঁহার সাহস দেখিয়া বোধ হইতেছে, ইনি অনায়াসে রাজকন্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিবেন। এক্ষণে কন্যার নিকটে ইহাকে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। এই বলিয়া সভা ভঙ্গ করিতে আদেশ করিলেন।

ভূপতি রাজনন্দন সুকুমারকে আপন অন্তঃপুরে লইয়া ভোজনাদি করাইলেন এবং তাহার বিশ্রামার্থ একটি প্রকোষ্ঠ নিরূপিত করিয়া দিলেন। রাজনন্দন তথায় বিশ্রাম-সুখানুভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা শয়নমন্দিরে উপস্থিত হইয়া মহিসীকে বলিলেন, প্রিয়ে! অদ্য তরুণবয়স্ক একটি রাজপুত্র তোমার হৃদয়নন্দিনীর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন। তিনি অতিশয় রূপবান। তাহার মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিলে হৃদযাম্বুধি আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে। আর এক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার সহিত ধনজন মাত্র নাই, তথাচ তিনি কন্যার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে অভূতপূর্ব্ব সাহস প্রকাশ করিতেছেন। তুমি কন্যাকে সংবাদ প্রদান কর, আমি রাজকুমারকে এই স্থানে আনয়ন করিতেছি।

রাজকন্যা সুকুমারের আগমনবার্ত্তা পূর্ব্বেই অবগত হইয়া সহচরী সমভিব্যাহারে তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় রাজমহিষী দুহিতার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া বলিলেন, বৎসে! তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে এক রাজপুত্র উপস্থিত হইয়াছে, মহারাজ তাঁহাকে তোমার নিকটে লইয়া আসিতেছেন, এখন তুমি কি করিবে স্থির কর। মহিষীর বাক্যাবসান হইতে না হইতেই একজন কিঙ্করী আসিয়া বলিল, ঠাকুরানি! মহারাজ সেই রাজপুত্রের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। এই বাক্য শ্রবণে রানী কিঞ্চিৎ অন্তরালে দণ্ডায়মানা হইলেন। রাজা দুহিতার প্রকোষ্ঠে সুকুমারের সহিত আসন পরিগ্রহ করিলেন।

রাজনন্দিনী, যুবরাজ সুকুমারকে দর্শন করিবামাত্র সগর্ব্বে স্বীয় সহচরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি যুবরাজের নিকট বিংশতি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রার্থনা

করি। রাজনন্দন এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ রাজনির্দ্দিষ্ট স্বীয় বাসস্থানে প্রত্যাগত হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন এবং করস্থিত অঙ্গুরীয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, অঙ্গুরীয়ক! রাজকন্যার অভিলষিত মুদ্রা প্রদানে আমাকে কৃতার্থ কর। নিমেষকালমধ্যে মুদ্রা উপস্থিত হইল। তখন নৃপনন্দন বিংশতি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা গণনা করিয়া রাজনন্দিনীর সহচরীর করে অর্পণ করিলেন। রাজা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল বদনে যুবরাজের অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন, এই ব্যক্তি রাজকন্যার সম্পূর্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া নিঃসন্দেহ পাণি গ্রহণ করিবেন।

দ্বিতীয় দিবস রাজা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান সহকারে রাজপুত্রকে ভোজনাদি করাইয়া তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত অবগত হইতে লাগিলেন, কিন্তু রাজকুমারী অদ্য আবার কি প্রার্থনা করেন, এই চিন্তায় রাজকুমারের অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইতে লাগিল। অঙ্গুরীয়কের অলৌকিক গুণ স্মরণ হওয়াতে পুনর্ব্বার মনোসংযোগপূর্ব্বক ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন। রজনীযোগে রাজকন্যা তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া মধুর সম্বোধনে বলিলেন, যুবরাজ! কল্য আপনি এ দাসীর অভিলষিত অর্থ প্রদানে চরিতার্থ করিয়াছেন, অদ্য অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া বিংশতি সহস্র রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করুন। রাজপুত্র শ্রবণমাত্র পূর্ব্ববৎ উপায়াবলম্বন করিয়া বিংশতি সহস্র রৌপমুদ্রা তৎক্ষণাৎ প্রদান করিলেন। এই রূপে চতুর্থ দিবস তাঁহার বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া নৃপনন্দনের অন্তঃকরণে কৃতকার্য্যের আশা ক্রমেই বলবতী হইতে লাগিল। রাজনন্দিনী কি কৌশলে রাজপুত্রকে প্রতিজ্ঞাজালে বদ্ধ করিবেন, একান্তমনে সেই উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন; সখীকে কহিলেন, সহচরি! আর তিন দিবস প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেই আমার গর্ব্ব সম্পূর্ণরূপে খর্ব্ব হইবে, সুতরাং বিবাহ করিয়া রাজনন্দন যে, আমার অহঙ্কার চূর্ণ করিতে সর্ব্বাগ্রে সযত্ন হইবেন, তাহা বলা বাহুল্য। অতএব যাহাতে মান রক্ষা হয়, এরূপ উপায় কর। এই আগন্তুক যুবাপুরুষদের সহিত কোনরূপ অর্থ থাকা দূরে থাকুক, দ্বিতীয় পরিধেয় বস্ত্রও নাই। অতএব ইনি কোথা হইতে আমার অভিলষিত অর্থ সংগ্রহ করেন, তাহার অনুসন্ধান করা অত্যাবশ্যক। বোধহয়, ইহার নিকট কোনরূপ দুর্ল্লভ বস্তু আছে, তাহার নিকট যাহা প্রার্থনা করেন, তৎক্ষণাৎ তাহাই প্রাপ্ত হন। রাজকন্যার চতুরা সহচরী এই বাক্য শ্রবণে

সতর্ক হইয়া তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। সুকুমার নৃপতিসন্নিধানে উপবিষ্ট হইয়া ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন, এই অবকাশে রাজকন্যার সহচরী সুকুমারের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে এরূপ কৌশলে আত্মগোপন করিল যে, সমুদায় দেখিতে পায়, কিন্তু তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না।

রাজদুহিতা সুকুমারকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, রাজপুত্র। গজমুক্তা হার পরিধান করিতে আমার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে, আপনি একশত মুক্তা প্রদান করিয়া বাঞ্ছাপূর্ণ করুন। রাজনন্দন অবিলম্বে শয়নালয়ে উপস্থিত হইয়া দ্বারাবরোধ পূর্ব্বক করস্থ অঙ্গুরীয়ককে বলিলেন, প্রিয় অঙ্গুরি। অদ্য রাজকন্যার বাসনা পূর্ণ কর। এই কথা বলিবামাত্র একশত গজমুক্তা নিকটস্থ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেইগুলি বস্ত্রমণ্ডিত করিয়া স্বয়ং রাজকুমারীর সন্নিধানে প্রফুল্লান্তঃকরণে উপস্থিত হইলেন।

চতুরা সহচরী গোপনভাবে থাকিয়া সমুদায় অবলোকন পূর্ব্বক বিস্মিতান্তঃ-করণে নিঃশব্দে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া নৃপনন্দিনীর নিকট উপস্থিত হইল। যুবরাজ কন্যার প্রার্থিত গজমুক্তা প্রদান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে সহচরী রাজকন্যার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া সমুদায় বর্ণন করিল। নৃপসুতা শুনিয়া বিস্ময়োৎ-ফুল্ল লোচনে কহিলেন, সখি! আমি যাহা চাহিব, নৃপনন্দন তাহাই অনায়াসে প্রদান করিবেন, সুতরাং আর দুই দিবস পরে আমারে তাঁহার ক্রোড়গামিনী হইতে হইবে। আমি যে, এত রাজপুত্রকে কৌশল চক্রে বদ্ধ করিয়াছি, বোধহয়, তাহার প্রতিশোধ লইতেই এই মহাত্মা আগমন করিয়াছেন। অতএব এখন উপায় কি করি, স্থির কর।

সখী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, রাজনন্দিনী! চিন্তা কি? যখন অঙ্গুরীয়কের সন্ধান পাইয়াছি, তখনই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। আর চিন্তা নাই। আপনি রাজকুমারের নিকট তাঁহার করাস্থিত অঙ্গুরীটি প্রার্থনা করিবেন। তাহাতে দুই প্রকারেই আপনার ইচ্ছা ফলবতী হইবে। কেননা যদি রাজনন্দন অঙ্গুরীয়ক প্রদানে অস্বীকৃত হন তাহা হইলেও তিনি আপন প্রার্থিত বস্তু প্রদানে অক্ষম হইলেন এবং যদি প্রদান করেন, তবে আপনি পরদিন যাহা প্রার্থনা করিবেন, অঙ্গুরী না থাকিলে তিনি কখনই তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব সর্ব্বথা আপনার মঙ্গল দেখিতেছি। রাজতনয়া এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন। ষষ্ঠ দিবস উপস্থিত হইলে, যুবককে আহ্বান করিয়া বলিলেন,

রাজকুমার! অদ্য আমি একটি মাণিক্যাঙ্গুরী প্রার্থনা করিতেছি। ভবিষ্যৎ-জ্ঞানশূন্য নির্বোধ রাজকুমার অঙ্গুরীয়কের নিকট মাণিক্যাঙ্গুরী যাচঞা না করিয়া আপন অঙ্গুলিস্থিত অঙ্গুরীটি তৎক্ষণাৎ সখীর হস্তে অর্পণ করিলেন। সহচরী রাজতনয়াকে অঙ্গুরী প্রদান করিয়া বলিল, আপনার বাঞ্ছা সিদ্ধি হইল, আর চিন্তা কি? নৃপতনয়া সহাস্য বদনে অঙ্গুরী পরিধান করিলেন।

রাজপুত্র বাসস্থানে উপস্থিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, অঙ্গুরীয় প্রাপ্ত হইয়া রাজকন্যা সন্তুষ্ট হইয়াছেন; বোধহয় অন্য কোন বস্তু আর প্রার্থনা করিবেন না। এই সময় দিননাথ অস্তাচলে গমন করিলেন। দিকসকল যেন ভূপতি পুত্রের ভাবী দুঃখেই মলিনা হইল। নির্বোধ রাজপুত্র দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া রজনীর অন্তকাল মুহুর্মুহুঃ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কেননা তাহার মনে দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছিল যে, প্রভাতেই রাজকন্যার পাণিগ্রহণে সুখী হইবেন। শশিসীমন্তিনী যামিনী রাজপুত্রের ভাবী দুঃখে দুঃখিনী হইয়া গমনসময়ে বিহগকুলের কলরবই যেন ক্রন্দন এবং শিশির পতনচ্ছলেই যেন অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। কমলমুখী রাজকন্যার শুভোদ্দেশেই যেন সূর্য্যদেব উদিত হইলেন। তদ্দর্শনেই যে তিনি প্রফুল্ল হইলেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

প্রাতঃকালেই রাজা রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং সভাসদগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, অদ্য আমার কি শুভদিন! এত দিনের পরে বুঝি জগদীশ্বর আমার প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন। যাহা কখনই সংঘটিত হইবে না মনে ছিল, অদ্য তাহারই সংঘটনের লক্ষণ সকল প্রত্যক্ষ করিতেছি। কতশত রাজপুত্র আমার দুহিতার মনোরথ পূর্ণ করিতে না পারিয়া চিরকালের নিমিত্ত কারাবাসী হইয়াছেন। সুকুমার ষষ্ঠ দিবস তাঁহার কাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রদান করিয়াছেন। অদ্য সপ্তম দিবস। বোধ হয়, ঈশ্বরের কৃপায় তিনি কৃতকার্য্য হইবেন। সভাসদেরা রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, রাজকুমারের লক্ষণ দেখিয়া বোধহয়, তিনি সামান্য মনুষ্য নহেন। তিনি যে, অদ্য আপনার দুহিতার অভিলষিত দ্রব্য দানে তদীয় পাণিপীড়ন করিবেন, তাহাতে সংশয় হইতেছে না।

ওদিকে রাজপুত্রী নৃপপুত্রকে আহ্বান করিয়া সাদর সম্ভাষণে বলিলেন, রাজপুত্র! আমি আপনার সৌজন্য ও বুদ্ধিকৌশলে যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। অদ্য আমার প্রার্থিত বস্তু প্রদান করিয়া প্রতিজ্ঞা পূরণ করুন। আর একটি

মাণিক্যাঙ্গুরীয়ক প্রার্থনা করিতেছি। রাজকুমারী এই প্রার্থনা করিবামাত্র যুবরাজের মস্তকে যেন বজ্র পতিত হইল। তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। রাজপুত্রীর প্রার্থিত অঙ্গুরী কোথায় পাইবেন? তপস্বী-দত্ত অমূল্য অঙ্গুরী আর নিকটে নাই। সুতরাং রাজকন্যার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে অসমর্থ হইলেন।

রাজনন্দন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় নির্জ্জনে আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন—হা বন্ধো! তুমি কোথায়? আমি যে বিষম বিপদে পতিত হইয়াছি, তুমি ইহাব কিছুই জানিতে পাবিতেছ না। তোমার বাক্যে অবজ্ঞা করিয়া জীবন থাকিতেই শমনভবন দর্শন করিলাম! কোথায় রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার সুধাময় প্রণয়সুধাপানে পিপাসিত চিত্তচকোবকে পরিতৃপ্ত করিব, না কোথায় চিবকালেব নিমিত্ত কাবাগারবাসী হইতে চলিলাম।

হা মৃত্যু! কারাগারে প্রবেশ কবিবার পূর্বে তুমি কেন আমাকে গ্রহণ করিতেছ না? পৃথিবী! তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ করি। তাহা হইলে জীবনমৃত্যুকারিণী লজ্জা আমাকে আর যন্ত্রণা দিতে পারিবে না। হায়! আমি কি নির্ব্বোধ! লোভ আমার সর্ব্বনাশ কবিল। যদি লোভ না করিয়া বুদ্ধির অনুগত হইতাম, তাহা লইলে দুর্দ্দশা আমাব সহচরী হইত না। আমি করস্থ অমূল্য অঙ্গুরীয়ক রাজকুমারীকে কেন প্রদান করিলাম? কেন আমি অঙ্গুরীয়কের নিকট অঙ্গুরী প্রার্থনা করিলাম না? তাহা হইলে অদ্য রাজপুত্রীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সক্ষম হইতাম। এখন কি করিব? নিজ বুদ্ধিদোষে নিজ মস্তকে আপদকে স্থানদান করিলাম। হা পিতঃ! হা মাতঃ! তোমরা কোথায়? হা! কেন আমি পিতামাতাকে স্মরণ করিতেছি! নির্ব্বোধ পুত্র যে পিতামাতার হৃদয়শেল, সে যে নরাধম, সে কখনও তাহাদিগকে স্মরণ করিবার পাত্র নহে। আমি নির্ব্বোধ, আমার তুল্য নরাধম জগতে নাই!

সুকুমার এইরূপে খেদ করিতেছেন, ইত্যবসরে প্রভাকর যেন তাঁহার দুঃখেই দুঃখিত হইয়া ক্রমে ক্রমে মলিন হইতে লাগিলেন। তাঁহার সমদুঃখিনী হইয়া অন্ধকারময়ী রজনী উপস্থিত হইল। রজনীকান্ত চন্দ্রমা যেন নিজ রমণীকে পরদুঃখে কাতরা দেখিয়া প্রফুল্ল হইলেন। এই সময়ে রাজকন্যা স্বীয় সহচরীদিগকে

বলিলেন, রাজপুত্র অনেকক্ষণ গমন করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত প্রত্যাগত হইলেন না, তিনি অকৃতকার্য্য হইয়াছেন সন্দেহ নাই। রজনীপ্রভাতে তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করা আবশ্যক।

সুকুমার সমস্ত রজনী চিন্তা-শয্যায় শয়ন করিয়া অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার সুকুমার মুখচ্ছবি লাবণ্যহীন হইল। নিশাপতি তাঁহারই বদনপ্রতিমা ধারণ করিয়াই যেন মনোদুঃখে লুক্কায়িত হইলেন। রাজপুত্র রাজপুত্রীর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, পাখীরা যেন সেই কথা বলিয়াই কলরব করিয়া উঠিল। সুকুমার এতক্ষণ অন্ধকারে লজ্জাতাপিত কলেবর আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন, সূর্য্যদেব কিরণজাল বিস্তারপূর্ব্বক তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। রাজপুত্রের মুখচন্দ্রমা ক্রমেই মলিন হইতে লাগিল।

রাজতনয়া রজনীপ্রভাতে সহচরীদিগকে বলিলেন, কারাধ্যক্ষকে সংবাদ দাও, রাজপুত্র আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারেন নাই, অতএব তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যকর্ম্ম সমাধা করুন। সহচরী নৃপকুমারীর আদেশানুসারে কারাধ্যক্ষকে সংবাদ দিল। কারাধ্যক্ষও সুকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। নৃপতি সেই বাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া বলিলেন, আমার দুহিতার মনোমত পাত্র পৃথিবীতে আর নাই। রাজনন্দন ছয় দিবস তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলে ভাবিয়াছিলাম, সপ্তম দিবসেও তিনি কৃতকার্য্য হইবেন। কিন্তু সে আশা বৃথা হইল। তাদৃশ গুণাকর রাজকুমার যখন পরাস্ত হইলেন, তখন অন্য কেহ যে, জয়ী হইবেন, তাহার ভরসা ফুরাইল। বোধহয়, রাজপুত্রীকে চিরকাল অনূঢাবস্থায় থাকিতে হইবে। অতএব এটি তাহার প্রতিজ্ঞা নহে, বিধাতার বিড়ম্বনা। রাজা এইরূপ মনস্তাপ প্রকাশ করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। যুবরাজ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পাঠক মহাশয়! রাজকুমার সুকুমার রত্নপুরের কারাগারে থাকুক, আসুন, আমরা মন্ত্রিপুত্র সুমন্তের অন্বেষণ করি। তিনি কোথায়? আসুন দেখিতে পাইবেন। স্মরণ থাকিতে পারে, মন্ত্রিতনয় পূর্ব্বদিকে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি বহুস্থান পর্য্যটন করিয়া যে স্থানে তপস্বী কপিরূপ ধারণ করিয়া তপস্যা করিতেছেন,

সেই স্থানে অকস্মাৎ উপস্থিত হইলেন। কপিবর মনুষ্যের ন্যায় ধ্যানপরায়ণ হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া তাঁহার বিস্ময় জন্মিল। অনন্তর হস্তস্খলিত জলকণা কপি-তপস্বীর অঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইল। তিনি সেই বারিস্পর্শে কদাকার মনুষ্যশরীর ধারণ পূর্ব্বক তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, কে রে পাপিষ্ঠ! অকারণে আমার সমাধি ভঙ্গ করিলি? মন্ত্রিপুত্র এক আশ্চর্য্য হইতে অপর আশ্চর্য্য ঘটনা অবলোকন করিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, অনন্তর যোগিবরের পদানত হইয়া কাতরস্বরে বলিলেন, ভগবন্! আমি বিদেশী, অজ্ঞাতসারে এই কুকর্ম্ম করিয়াছি, আপনি কৃপা করিয়া ক্ষমা না করিলে উপায়ান্তর নাই। তপস্বী তাঁহার বিনয়বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন ভয়, নাই, অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা করিলাম। মন্ত্রিনন্দন আশ্বস্ত হইয়া সবিনয়ে তপস্বীকে অনেক স্তব করিলেন। তাহাতে তিনি সদয় হইয়া বলিলেন, বৎস! আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, তুমি জগদীশ্বরকে স্মরণ করিয়া, যে প্রকার শরীর ও প্রকৃতি ধারণ করিতে ইচ্ছা করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহাই হইবে। মন্ত্রিনন্দন এই বর প্রাপ্ত হইয়া, তপস্বীকে প্রণাম প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক গমনোন্মুখ হইলেন। তপস্বী তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হইয়া বলিলেন, তুমি অন্য কয়েক দিকে ভ্রমণ করিও, কিন্তু কদাচ পশ্চিম প্রদেশে গমন করিও না। তথায় অনিবার্য্য বিপদের সম্ভাবনা আছে। মন্ত্রিপুত্রকে এই সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়া তপস্বী পুনর্বার সরোবরের পার্শ্বস্থ ঘাটে অবগাহন করিয়া কপিকলেবর ধারণ করিয়া জগদীশ্বরের ধ্যানে মনঃসংযোগ করিলেন।

মন্ত্রিনন্দন সুমন্ত, সরোবরের যে প্রান্তের জল স্পর্শে কপিরূপী তপস্বী মানবরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং পুনর্ব্বার যে প্রান্তের জলে অবগাহন করিয়া কপিরূপ ধারণ করেন, তৎসমুদায় নিরীক্ষণ করিয়া চমৎকৃত ও আনন্দিত হইলেন, এবং ঐ দুই স্থানের জল ভিন্ন ভিন্ন আধারে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। গমন করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তপস্বী আমাকে পশ্চিম ভ্রমণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, বোধ হয়, তথায় কোন অদ্ভুত বস্তু থাকিতে পারে। তাহা দর্শন করা আবশ্যক। যদি নিতান্ত বিপদ ঘটে, তবে তপস্বী-দত্ত বরপ্রভাবে বুদ্ধির সহায়তায় অবশ্যই পরিত্রাণ পাইব। এই চিন্তা করিয়া আগে পশ্চিম দিকেই চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া তপস্বী-দত্ত বর পরীক্ষার্থ অন্তঃকরণে ষোড়শী রূপসী দিব্যাঙ্গনার রূপ চিন্তা করিবা মাত্র, তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরীর তদ্রূপ হইল। তদ্দৃষ্টে

তিনি একবারে বিমোহিত ও চমৎকৃত হইলেন। নারীরূপ ধারণ করিয়া ভ্রমণ করা অনুচিত বিবেচনায় ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া পুনর্ব্বার আপন স্বাভাবিক পুরুষদেহ প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে কিয়দ্দিন গমনানন্তর রত্নপুরে উপস্থিত হইলেন। নগরের শোভা দর্শন করিয়া তাঁহার আনন্দ বৃদ্ধি হইল। সুতরাং কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া রাজধানী ভ্রমণ করিতে চলিলেন। সিংহদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র দেখিতে পাইলেন, নির্ম্মল কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরফলকে স্বর্ণবর্ণে রাজকন্যার প্রতিজ্ঞা বিবরণ পূর্ব্ববৎ লিখিত আছে। তাহার সম্মুখে ঘন্টা দোদুল্যমান রহিয়াছে। প্রহরিগণ নিঃশব্দে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। মন্ত্রিনন্দন দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন, যে ব্যক্তি রাজকন্যার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে সম্মত হয়, সে এই ঘন্টা বাদন দ্বারা তাঁহাকে সংবাদ প্রদান করে। যাহা হউক, ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত না হইয়া ঘন্টাধ্বনি করা অনুচিত। কারণ ইহাতে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জ্জনপথে একটি বকুলবৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। মন্ত্রিপুত্র উপবিষ্ট হইয়া নানা প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় রাজবাটী হইতে কুম্ভকক্ষে কতিপয় পরিচারিকা তাঁহার নিকটবর্ত্তী বৃক্ষের অন্তরালে উপস্থিত হইল, এবং পরস্পর কথোপকথন করিতে করিতে বলিল, "রাজকন্যা যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা কখন যে, পূর্ণ হইবে, এরূপ বোধ হয় না। রাজনন্দন সুকুমার, তাঁহার প্রতিজ্ঞাত প্রার্থনা ছয় দিবস পূর্ণ করিয়াছিলেন। একদিন অসমর্থ হওয়াতে কল্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া আমাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।" এই কথা বলিবামাত্র মন্ত্রিপুত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হওয়াতে তাহারা কথোপকথনে বিরত হইয়া জল আনয়নার্থে প্রস্থান করিল। তৎশ্রবণে মন্ত্রিপুত্র চিন্তা করিলেন, ইহারা রাজপুত্র সুকুমারকে লক্ষ্য করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। বোধহয় ঐ সুকুমার আমার বন্ধু হইবেন। যাহা হউক, রমণীগণ ফিরিয়া আসিলে, সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিব।

পরিচারিকাগণ জলপূর্ণ কুম্ভ কক্ষে করিয়া প্রত্যাগত হইলে মন্ত্রিপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার বোধ হইতেছে, তোমরা এই রাজবাটীর পরিচারিকা হইবে। যদি আমার অনুমান মিথ্যা না হয়, তবে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিয়া আমার কয়েকটি বাক্যের উত্তর দান করিলে, উপকৃত হই। এ রাজ্যের রাজার নাম কি? এবং সিংহদ্বারে একটি বৃহৎ ঘন্টাই বা ঝুলিতেছে কেন? একটি কিঙ্করী উত্তর

করিল. মহাশয় আমাদের রাজার নাম রত্নধ্বজ, তাঁহার পুত্রসন্তান হয় নাই। একটি পরমাসুন্দরী কন্যা আছেন। সেইটিই আমাদের মহারাজের একমাত্র সন্ততি। রাজা ও রানী সেই কুমারীটিকে অতিশয় ভালবাসেন। কন্যার নাম রত্নবতী। আপনি যে বৃহৎ ঘন্টাব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, রাজকুমারীর একটি কঠিন প্রতিজ্ঞাই সেই ঘন্টা ঝুলাইবার কারণ। কিন্তু সে কথা এক্ষণে বলিবার সময় নয়। আমরা রাজকন্যার পরিচারিকা। প্রতিদিন তাঁহার স্নানার্থ জল আহরণ করিয়া থাকি। যে জল আমাদিগের কক্ষে দেখিতেছেন, তাহাদ্বারা পাষাণনির্মিত ক্ষুদ্র পুষ্করিণী অদ্য পূর্ণ করিয়া রাখিব, কল্য নৃপনন্দিনী ইহাতে স্নান করিবেন, অতএব অধিকক্ষণ বিলম্ব করিতে পারি না। আপনি যদি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করেন, তবে পুনরায় আসিয়া আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। মন্ত্রিপুত্র তাহাতেই সম্মত হইলেন; এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহারা রাজকন্যাব পরিচারিকা, ইহাদিগের নিকট রাজপুত্রীর অনেক সংবাদ পাইতে পারিব।

পরিচারিকাগণ পুনরায় জল লইতে আসিলে মন্ত্রিপুত্র ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা যে রাজকন্যার প্রতিজ্ঞার কথা বলিতেছিলে তাহার বিস্তারিত শুনিতে ইচ্ছা করি। পূর্ব্বপরিচিতা পরিচারিকা বলিল, মহাশয়! আমাদিগের রাজকুমারী প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যিনি সাতদিন তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন, তিনিই তাঁহার পতি হইবেন। তাঁহার রূপগুণের কথা শ্রবন করিয়া পৃথিবীর চতুর্দ্দিক হইতে কতশত রাজপুত্র আসিয়াছিলেন, কেহ এক কেহ দুই বা তিন দিবস পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতিজ্ঞাপূর্ণ করিয়া পরিশেষে অসমর্থ হওয়াতে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি যে একটি রাজপুত্র আসিয়াছিলেন, তিনি আপনার সমবয়স্ক এবং পরম রূপবান। সেই রাজপুত্র অসাধারন গুণে ছয় দিবস রাজকন্যার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া গতকল্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার নিমিত্ত এ রাজ্যের সকলেই কাতর হইয়াছেন। সেই রাজপুত্রের নাম সুকুমার। এইরূপ পরিচয় দিয়া কিঙ্করী সুমন্তকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, মহাশয়! দেখিতেছি, আপনিও বিদেশী পথিক, আমরা আপনার রাজকন্যার প্রতিজ্ঞা শ্রবনে আগ্রহাতিশয় দেখিয়া নিষেধ করিতেছি, কখনো জলন্ত অনলে প্রবেশ করিবেন না। বোধহয় কার্য্যান্তরে বিদেশ পরিভ্রমন ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, কার্য্য সমাপন করিয়া অবিলম্বে স্থানান্তরে প্রস্থান করুন। মন্ত্রিপুত্র কহিলেন, তোমাদিগের সদুপদেশে নিতান্ত সুখী হইলাম।

কিঙ্করীরা জলানয়নার্থ সরোবরে গমন করিল। মন্ত্রিপুত্র মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন! বন্ধু তবে এই রমণীর মোহিনীপাশে আবদ্ধ হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই। আরও অনেক রাজপুত্র সেই কূটযন্ত্রে বদ্ধ হইয়া কষ্টভোগ করিতেছেন। অতএব ইহাদিগের উদ্ধার সাধন করা আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। তন্নিমিত্ত যদি প্রাণ পর্য্যন্ত যায়, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, পরোপকারে মৃতব্যক্তির জীবন সার্থক। এইরূপ চিন্তা করিয়া বুদ্ধিবলে কোন উপায় স্থির করিলেন। এই সময়ে পরিচারিকাগণ বারি-পূর্ণ ঘটকক্ষে তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, পথিক! কি চিন্তা করিতেছ? সুমন্ত বলিলেন, অনেকক্ষণ ভ্রমণ করাতে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছি। যদি অনুগ্রহ করিয়া কিঞ্চিৎ জল দাও, তবে নিতান্ত উপকৃত হই। পরিচারিকাগণ বলিল, পাত্র বাহির করুন, জল প্রদান করিতেছি। পথিক বলিলেন, আমার নিকট পাত্র নাই, পরিচারিকাগণ বলিল, তবে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করুন, পাত্র আনিয়া জল প্রদান করিব। পথিক বলিলেন, বিলম্ব সহে না। পরিচারিকারা বলিল, তবে উপায়? পথিক বলিলেন, আমি অঞ্জলি পাতিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া কুম্ভ হইতে প্রদান কর। তাহারা স্বীকৃত হইল। মন্ত্রিপুত্র জলপান করিতে লাগিলেন। ইত্যবকাশে যে বারিস্পর্শে মনুষ্যশরীর কপি হয়, সেই বারি কৌশলক্রমে কলসীর জলে মিশ্রিত করিয়া দিলেন। পরিচারিকাগণ তাহার কিছুই জানিতে পারিল না; সুতরাং প্রফুল্লচিত্তে রাজবাটীতে গমন করিল এবং রাজপুত্রীর স্নানার্থ সেই জল রাখিয়া দিল।

পাঠকগণ! বোধ করি রাজকন্যার দুরবস্থার বিষয় কিছু আলোচনা করিতেছেন। আমরাও তাহাই বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সেই বারি দ্বারা স্নানাগারস্থ কৃত্রিম হ্রদ পরিপূর্ণ করিয়া পরিচারিকাগন স্নানার্থ নৃপনন্দিনীকে আহ্বান করিল। তিনি অবিলম্বে তথায় গমন করিলেন। সেই জলে অবতরণ করিবামাত্র তিনি কপিকায়া প্রাপ্ত হইয়া অদ্ভুত একটি বানরী হইলেন। রাজ-কুমারী আপনার অঙ্গ আপনি নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত নয়নে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সহচরীগণ এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া যেমন তাহাকে ধরিতে সেই জলে অবতরণ করিল, অমনি তাহারাও তৎক্ষণাৎ বানরী হইয়া রাজকন্যার সঙ্গিনী হইল। চতুরা নাম্নী দাসী স্বচক্ষে এই ভয়ানক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া প্রথমে চমৎকৃত হইয়াছিল, পরে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিল যে কৃত্রিম হ্রদস্থ জলের

গুণেই এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। অতএব সে জল স্পর্শ না করিয়া দ্রুত-পদে রাজমহিষীকে সংবাদ দিতে চলিল, এবং অশ্রুত্যাগ করিতে করিতে কাতর বচনে বলিল, ঠাকুরানি! সর্ব্বনাশ উপস্থিত। রাজনন্দিনী স্নানার্থ কৃত্রিম হ্রদস্থ বারিস্পর্শ করিবা মাত্র বানরী-রূপ ধারণ করিয়াছেন। রানী এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ তাহাকে ক্ষিপ্ত মনে করিয়াছিলেন। পরে যখন হ্রদের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া দুহিতার দুরবস্থা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিলেন, তখন শোকে হতজ্ঞান প্রায় হইলেন, এবং শিরে করাঘাত করিতে করিতে কন্যাকে ধরিবার নিমিত্ত যেমন হ্রদমধ্যে অবতরণ করিলেন, আপনিও একটি বৃদ্ধা বানরী হইয়া চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন! চতুর্দ্দিক বানরীময় হইয়া উঠিল!

রাজা সভামণ্ডপে বসিয়া অমাত্যবর্গ সমভিব্যাহারে বিচার করিতেছেন, এমন সময় চতুরা দাসী রোদন-বদনে রাজ সভায় উপস্থিত হইয়া করপুটে নিবেদন করিল, ধর্ম্মাবতার! ওদিকে সর্ব্বনাশ উপস্থিত। রাজমহিষী, রাজকন্যা, এবং তাঁহার সখীগণ সকলেই বানরী হইয়াছেন। পুরীমধ্যে জনমানব নাই, কেবল বানরীদলে পরিপূর্ণ। মহারাজ! শীঘ্র চলুন, স্বচক্ষে দর্শন করিয়া উদ্ধারের উপায় করিবেন। রাজা এই পরমাশ্চর্য্য অদ্ভুতোক্তি শ্রবণমাত্র নিস্তব্ধ হইলেন। ক্ষণকাল পরে দাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, চতুরে! তুমি কি বলিতেছ? তোমার এরূপ ভাব কেন হইল? বুদ্ধি স্থির কর। চতুরা পুনরায় করপুটে বলিল, মহারাজ! আমার বুদ্ধির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। মহারাজের নয়নগোচর হইলেই সত্যাসত্য প্রকাশ হইবে।

রাজা আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া মস্তকে করাঘাত করিতে করিতে কন্যান্তঃপুরমধ্যে গমন করিলেন। পুরী যেন জনশূন্য বিজনবনসদৃশ বোধ হইতে লাগিল। যে রাজপুরী সর্ব্বদা আনন্দ ধ্বনিতে পূর্ণিত হইত, এইক্ষণে সেই পুরীতে অনিবার বানরধ্বনির প্রতিধ্বনি হইতেছে! ভূপতি ক্রমে ক্রমে দাসী সমভিব্যাহারে রাজকন্যার অবগাহনস্থানে উপস্থিত হইয়া সমস্ত অবলোকনান্তর এককালে জ্ঞানশূন্য হইলেন। যেন তিনি কি অবনীমণ্ডলে, কি শূন্য মার্গে, কি জাগরিত, কি নিদ্রিত, কিছুমাত্র স্থির করিতে পারিলেন না। মহিষীবানরী মহারাজকে দর্শন করিয়া নেত্রনীরে ভাসিতে লাগিলেন। রাজা কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া কেবল পুনঃ পুনঃ সেই বিপত্তারণ জগৎকারণ জগদীশ্বরকে স্মরণ করিতে

লাগিলেন। হে ভগবন্! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, আমার কি গুরুপাপে সমস্ত পুরবাসিনী বানরী হইল। আমি কিরূপে সজ্জন-সমাজে মুখ দেখাইব? এইক্ষণে আমার মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। হে কাল! কেন তুমি তোমার করালগ্রাসে আমাকে কবলিত করিতেছ না? আমার প্রতি তোমার কি এমনই ঘৃণা জন্মিয়াছে যে, পরিবারগণের এই দুর্দ্দশা দর্শনেও জীবিত রহিয়াছি। রাজা এবম্প্রকার আক্ষেপ করিয়া সভাস্থ জনগণ-সমীপে উপস্থিত হইলেন। সভ্যগণ মহারাজের মুখশ্রী বিবর্ণ দেখিয়া চতুর্দ্দিকে অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। বিজ্ঞমন্ত্রী করযোড়ে বলিলেন, ধর্ম্মাবতার! দাসী যাহা বলিয়া গেল, বোধকরি, তাহা অসত্য নহে। নৃপতি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অশ্রুলোচনে গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, মন্ত্রিবর! জগদীশ্বর নিতান্ত বিমুখ হইয়াছেন। দাসীর বাক্য সকলই সত্য,—যাহা আমি কখন স্বপ্নেও জানি না এবং কাহারও মুখে শুনি নাই, অদ্য তাহাই প্রত্যক্ষ করিলাম। কন্যান্তঃপুরীস্থ সমস্ত রমণীই বানরী হইয়াছে। বোধকরি, এবম্ভূত আশ্চর্য্য ঘটনা ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে কেহ কখনও নয়ন-গোচর করা দূরে থাকুক, শ্রবণও করে নাই। এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, স্থির করিয়া এ অসীম বিপদসাগর হইতে আমাকে উদ্ধার করুন।

মন্ত্রী মহারাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া এককালে বিস্ময়াপন্ন হইলেন, ভূপতিও নিজাসনে ম্লানবদনে উপবিষ্ট হইয়া কি কর্ত্তব্য ভাবিতে লাগিলেন।

এদিকে সুমন্ত স্বকার্য্য সাধন করিয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে, আমি অতি প্রাচীন গণক ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করি। পরমেশ্বরের কৃপায় এবং তপস্বিবরের বরপ্রভাবে সুমন্ত তৎক্ষণাৎ অতিপ্রাচীন ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া মহারাজের জয় হইক, বলিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। কহিলেন, মহারাজ! আপনার বড় অমঙ্গল উপস্থিত দেখিতেছি। রাজা ব্রাহ্মণের মুখে অমঙ্গল বাক্য শ্রবণে গলবস্ত্র হইয়া বলিলেন, ঠাকুর! কি অমঙ্গল দেখিতেছেন অনুগ্রহ করিয়া বলুন। সুমন্ত ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, মহারাজ! আপনার অমঙ্গলের কথা আর কি বলিব, জ্যোতিষে গণিয়া দেখিলাম, অন্তঃপুরের সমস্ত কামিনী বানরী হইয়াছে। আপনার পাপের সীমা নাই। জগদীশ্বর! তুমি সত্য, তুমি সত্য! উঃ! কি ভয়ানক ব্যাপার। আহা, কেবল অধর্ম্মা-চরণেই না এরূপ বিরূপ দশা ঘটিল। সভাস্থ সমস্ত সভ্য ব্রাহ্মণের এই আশ্চর্য্য

ভাবী গণনা শ্রবণে যে কি পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, তাহা প্রিয় পাঠকগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন।

রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে কাতর বচনে ব্রাহ্মণকে কহিলেন, ঠাকুর! আমার এ পাপ কিসে মোচন হইবে? ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, মহারাজ! এ ত যৎসামান্য পাপ নহে যে, ব্রাহ্মণভোজন এবং দান-ধ্যান করিলেই বিমোচন হইবে; এ গুরুতর পাপ, সহজে মোচন হইবার নয়। রাজা পুনরায় বলিলেন, ঠাকুর! এমন গুরুপাপ কিসে সংঘটিত হইল? গণক ব্রাহ্মণ কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, মহাশয়! আপনার দোষে এ পাপ জন্মে নাই, আপনার দুহিতাই ইহার মূলকারণ। আপনিই বিবেচনা করুন, রাজকন্যার পাণিগ্রহণাশে কতশত রাজপুত্র এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্রসন্তান আগমন করিয়াছিলেন। কন্যার মোহিনী মায়াপাশে আবদ্ধ হইয়া তাঁহারা সকলেই সমস্ত ধনে জলাঞ্জলি দিয়া চিরকারাগারে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। আহা! এ কি সামান্য দুঃখের বিষয় যে, বিবাহ-আশে প্রথমে ধনসম্পত্তি বিনাশ, শেষে জীবনাশে নিরাশ। হে করুণাময় জগদীশ্বর! তোমার যথার্থ বিচার। মহারাজ! বিবেচনা করুন, এ কি সামান্য পাপ।

মহারাজ! আপনিই বিবেচনা করুন, কারাস্থ যুবকগণের অন্তরে কিরূপ ভাবের উদয় হইতেছে এবং তাহাদের পিতামাতার অন্তঃকরণেই বা কিরূপ ভাবের আবির্ভাব হইতেছে। রাজা ও অমাত্যবর্গ সুমন্তের এই সমুচিত বাক্যের উত্তর প্রদানে সমর্থ হইলেন না, সকলেই মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে সভাস্থ সভ্যগণ সুমন্তের নিকট গলবস্ত্র হইয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, প্রভো! এখন উপায় কি দেখিতেছ, আপনি ভিন্ন এখন আর কেহই এ বিপদ হইতে রক্ষাকর্ত্তা নাই। সুচতুর সুমন্ত ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, এ পাপ সহজে বিমোচন হইবার নহে, আমার সাধ্য নাই যে মহারাজকে এই ঘোরতর বিপদ হইতে উদ্ধার করি। তবে কল্য মহারাজের বহির্দ্বারস্থ সরোবরতটে এক সন্ন্যাসী আগমন করিবেন, তিনি যদ্যপি সদয় হন, তাহা হইলেই উদ্ধারের উপায় হয়।

সুমন্তের মুখে এতদ্বিবরণ শ্রবণে রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, দ্বিজবর! সন্ন্যাসীর আগমন পর্য্যন্ত আপনি এস্থানে অবস্থান করিলে উপকৃত হই। সুমন্ত বলিলেন, মহারাজ! আমি দরিদ্র যাজক ব্রাহ্মণ, একস্থানে দুদিন থাকিলে চলে না। ভগবানের কৃপায় আপনি বিপদ হইতে উদ্ধার হইবেন। পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে।

রাজা পুনরায় বলিলেন, ঠাকুর ! আমাকে হতাশ করিবেন না। সুমন্ত মহারাজকে অশেষপ্রকার প্রবোধবাক্যে বুঝাইয়া গমনে উদ্যত হইলেন। রাজা তখন কোষাধ্যক্ষকে আহ্বানপূর্ব্বক আজ্ঞা করিলেন, ইহাকে একশত স্বর্ণমুদ্রা প্রদান কর।

সুমন্ত কহিলেন, মহারাজ ! স্বর্ণমুদ্রা দূরে থাকুক, এক তাম্রমুদ্রাও গ্রহণ করিব না। যখন এ দারুণ বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিবেন, সে সময়ে অনুগ্রহ করিয়া যাহা প্রদান করেন, শিরোধার্য্য করিয়া লইব। সুমন্তের এরূপ সৌজন্য দর্শন করিয়া সভাস্থ সভ্যগণ একবাক্যে তাঁহার অগণ্য প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

মন্ত্রী করযোড়ে বলিলেন, মহারাজ ! জগদীশ্বর মানবজাতিকে ঘোরতর বিপদে নিক্ষেপ করেন, আবার তিনিই তাহার মুক্তিপথ প্রকাশ করিয়া দেন। বিবেচনা করুন, এই ব্রাহ্মণ হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া অব্যক্ত সমুদায় বিষয় প্রকাশ করিলেন। অতএব তিনি যে সন্ন্যাসীর আগমনের কথা কহিয়াছেন, তাহা অবশ্যই সত্য হইবে। মহারাজ ! ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া অন্তরের চিন্তা অন্তর করুন।

এদিকে সূর্য্য অস্ত হইল। নিশানাথ সহচরগণে বেষ্টিত হইয়া জনগণের মনোরঞ্জন করিতে করিতে পূর্ব্বদিক হইতে উদিত হইলেন। ভূপতি সমস্ত রাত্রি চঞ্চলভাবে জাগিয়া কাটাইলেন। নিদ্রা মহারাজের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার নেত্রাসনে উপবেশন করিলেন না। দুঃখের রজনী এত দীর্ঘ যে, কোনমতেই অবসান হইতে চাহে না, মহারাজ ক্ষণে ক্ষণে নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্র দর্শন করিয়া নিশার শেষ বিবেচনা করেন। কিন্তু মন কোনরূপেই সুস্থির থাকে না। একবার বোধ করেন যেন, তমোনাশিনী ঊষা পূর্ব্বদিক হইতে আগমন করিল, আবার কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার কিছুই দৃষ্ট হয় না। একবার বিবেচনা হয় যেন, বিহঙ্গমগণ স্ব স্ব কুলায়ে বসিয়া সুমধুরস্বরে জগদীশ্বরের গুণগান করিয়া উঠিল। আবার ক্ষণকালের পরে সেভাবের কিছু থাকে না। রাজা এইরূপে চঞ্চল হইতেছেন, এমন সময়ে বিহগনিচয় দিনপতির আগমনবার্ত্তা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে লাগিল। ভূপতি বিহঙ্গমুখে এতদ্বার্ত্তা শ্রবণে মহাহর্ষচিত্তে সঙ্গিগণকে বলিলেন, আর বিলম্বে কাজ নাই; রজনী শেষ হইল। ইহাদের মুক্তির চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। এদিকে নিশাপতি আগমনকাল নিকটবর্ত্তী জানিয়া চারুবর্ণ লুক্কায়িত করিতে লাগিলেন। আগমনকাল নিকটবর্ত্তী বটে, কিন্তু এ আগমন কাহার ? দিনপতির ?

রজনী প্রভাত হইল। প্রভাতে কমলবন প্রফুল্ল হইতে লাগিল। কুমুদিনী কান্ত-বিরহে মলিনী হইয়া সলিলে ডুবিল।

ওদিকে সুমন্ত সরোবরতীরে মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই শুভ অবসর উপস্থিত, এই সময় সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া প্রিয়বন্ধুর উদ্ধারের উপায় করা কর্ত্তব্য। ইহা স্থির করিয়া একমনে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে লাগিলেন। তপস্বিদত্ত বরপ্রভাবে জগদীশ্বরপ্রসাদে তৎক্ষণাৎ তাঁহার তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসীর রূপ আবির্ভূত হইল। জটা, বল্কল, শ্মশ্রু, জপমালা, কমণ্ডলু প্রভৃতি যোগিযোগ্য আভরণ সমস্ত, যেন শূন্য হইতে উপহার দিলেন। যোগিরূপী সুমন্ত নবীনবেশে সরোবর-সোপানে যোগাসনে উপবেশন করিয়া মুদিতনয়নে ধ্যান করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজসভাপণ্ডিতগণ রাজনিয়োগানুসারে অতিসত্বরে সরোবর-তীরে উপনীত হইলেন। গমনমাত্রেই ধ্যানোপবিষ্ট যোগিবরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা সবিস্ময়লোচনে সন্ন্যাসীরে নিরীক্ষণ করিয়া করযোড়ে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। মায়ারূপী সন্ন্যাসী মায়াধ্যানভঙ্গে নয়ন উন্মীলন করিয়া স্বাগত প্রশ্নদ্বারা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তোমরা? কি নিমিত্ত, কি অভিলাষে কৃতাঞ্জলিপুটে আমার নিকট দণ্ডায়মান আছ?

পণ্ডিতেরা একবাক্য হইয়া কহিলেন, প্রভো! আমাদের অন্তরের বাক্য কি আপনার অন্তরে অবিদিত আছে? এই নগরস্থ মহারাজ অসীম বিপদসাগরে নিপতিত হইয়াছেন, আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া একবার রাজবাটীতে পদার্পণ করিলেই রাজপুরী পবিত্র হয় এবং মহারাজও বিপদমুক্ত হন। সন্ন্যাসিরূপী সুমন্ত উত্তর করিলেন, আমি এরূপ ক্ষমতাবান নহি যে, তোমাদের রাজাকে ঐ ভয়ঙ্কর বিপদসাগর হইতে উদ্ধার করিতে পারি।

এদিকে ভূপতি সন্ন্যাসীর আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র স্বয়ং সরোবরতীরে গমন করিয়া সন্ন্যাসীর নিকটে করযোড়ে কাতরস্বরে বলিলেন, ভগবন্! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি যৎপরোনাস্তি বিপদগ্রস্ত হইয়া আপনার চরণে স্মরণ লইয়াছি। সন্ন্যাসী মহারাজের কাতরতা ও দীনতা দর্শনে কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে কহিলেন, রাজন্! তোমার দুহিতাই ইহার মূলকারণ। সেই পাপীয়সীর পাপেই এরূপ ঘটনা হইয়াছে। সেই দুষ্টার ছলনায় কতশত রাজপুত্র কারাগারে বন্দী হইয়াছেন। রাজা পুনরায় কাতরতা প্রকাশ করাতে সন্ন্যাসী তৎসমভিব্যাহারে রাজভবনে গমন করিলেন। রাজা নিজেই স্বর্ণময় সিংহাসন আনয়নপূর্ব্বক সন্ন্যাসীকে উপবেশন

করিতে দিলেন। সভাস্থ সভ্যগণ সন্ন্যাসীকে অর্দ্ধচন্দ্রবৎ বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণকাল পরে সন্ন্যাসী রাজাকে বলিলেন, মহারাজ! কত দেশের কত যুবরাজ তোমার কন্যার পাণিগ্রহণ-আশায় আগমন করিয়া তাহার মোহিনী মায়াপাশে বদ্ধ হইয়া কারাগারে কষ্টভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের কত অর্থ অপহরণ করিয়াছ, এ কি সামান্য পাপ! প্রথমতঃ ঐ সকল অবরুদ্ধ রাজপুত্রকে মুক্ত করিয়া তাঁহাদের অর্থের দ্বিগুণ দান কর, তাহার পর অন্য উপায় হইবে। নতুবা যাবজ্জীবন এই ঘোরতর বিপদাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইতে হইবে। রাজা সন্ন্যাসীর বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাই করিতে স্বীকৃত হইলেন। সন্ন্যাসীর সম্মুখেই রাজা কারাগারস্থ যুবরাজগণের নামধাম পরিচয় দিয়া তাঁহাদের স্ব স্ব অর্থের দ্বিগুণ প্রদান করিয়া বিদায় করিতে লাগিলেন। অবশেষে সেই রাজ-পুত্র সুকুমার উপস্থিত হইলে রাজা কহিলেন, প্রভো! ইনিই কেবল ছয় দিবস কন্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া একদিবস অক্ষম হওয়াতে কারাগারে নীত হইয়া-ছিলেন। সুমন্ত প্রিয়তম বন্ধুর দুরবস্থা দর্শনে অত্যন্ত কাতর হইলেন। নরপতিকে কহিলেন, মহারাজ! তবে এই রাজপুত্রকে বিদায় করিবেন না। ইহার দ্বারা কোন বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। সন্ন্যাসীর বাক্য অলঙ্ঘনীয়, সুতরাং মহারাজ তাঁহাকে বিদায় করিলেন না। তখন সুকুমার মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, হায়! আমি বন্ধুবাক্যবিরোধী হইয়া এত কষ্ট সহ্য করিলাম, তথাপি সে আশা ফলবতী হইল না। রে অদৃষ্ট! অন্যান্য রাজপুত্রগণ তাঁহাদের অর্থের দ্বিগুণ লইয়া স্বদেশে গমন করিলেন, আমি এমনি হতভাগ্য যে কারাগার হইতেও মুক্তি পাইলাম না।

মহারাজ সন্ন্যাসী-সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, গুরুদেব! আপনার আদেশানুসারে রাজপুত্রগণকে বিদায় করা হইয়াছে। কেবল যুবরাজ সুকুমার এই উপস্থিত আছেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, প্রথমতঃ রাজান্তঃপুরের গ্রহশান্তি হউক, তাহার পর সুকুমারের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহা করা যাইবেক। রাজা সন্ন্যাসী-সমভিব্যাহারে অন্তঃপুরে গমন করিলেন। সুমন্ত প্রথমতঃ পূতবারি-প্রভাবে মহিষীকে মানবী করিলেন। রাজা এবং অমাত্যবর্গ সন্ন্যাসীর এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা দর্শনে এককালে বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী ক্রমে ক্রমে সমস্ত বানরীকে মানবী করিলেন, কিন্তু রাজকন্যা রত্নবতী বানরীই রহিলেন। রাজা গলবস্ত্র হইয়া বলিলেন, প্রভো! সকলেই রক্ষা পাইল, কিন্তু কি দোষে কন্যাটি

বানরী হইয়া রহিল ? সন্ন্যাসী অবিলম্বে উত্তর করিলেন, রাজন্ ! তোমার কন্যার গুরুতর পাপ ; তাহাকে মুক্ত করা আমার সাধ্য নয়। রাজা তখন সজলনয়নে বলিলেন, যদি কুমারীটি বানরী রহিল, তবে আমার জীবনে কি ফল ? রাজ্যেই বা প্রয়োজন কি ? এবং এসকল পরিবারই বা থাকিয়া কি করিবে ? আমার আর তিলার্দ্ধ বাঁচিবার সাধ নাই। এই প্রকার নির্ব্বেদ প্রকাশ করিয়া রাজা পুনর্ব্বার সন্ন্যাসীর পদানত হইয়া নেত্রনীরে তাঁহার পদরজঃ ধৌত করিতে লাগিলেন। কহিলেন, গুরুদেব ! আপনি আমারে এই দুস্তর বিপদপারাবার হইতে নিস্তার না করিলে আর কে রক্ষা করিবে ? আমি আপনারে এই সমস্ত রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য দান করিতেছি, রত্নবতী রত্নটিও আপনারে দান করিব। কেবল তাহার পূর্ব্ব রূপটি দর্শন করা আমার ইচ্ছা।

সন্ন্যাসী কহিলেন, মহারাজ ! তোমার যদি সেই ইচ্ছাই হয়, তবে যথার্থই আমারে অর্দ্ধরাজ্য যৌতুক দিয়া রত্নবতী দান করিতে হইবে। রাজা যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দিলেন। সন্ন্যাসী কয়েকটি কৃত্রিম মন্ত্র পাঠ করিয়া পাত্রস্থ বারি প্রক্ষেপপূর্ব্বক বানরী রাজকুমারীকে মানবী করিলেন। রাজা ও রাজপুরীস্থ সকলে তাঁহার এই অলৌকিক ক্ষমতা দর্শন করিয়া যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে নিমগ্ন হইলেন। রাজপুরী আনন্দময় হইল। রাজা বাহুপ্রসারণপূর্ব্বক তনয়াকে ক্রোড়ে লইয়া আনন্দাশ্রুধারে তাঁহার সর্ব্বশরীর সিক্ত করিতে লাগিলেন। রত্নবতী পূর্ব্ববৃত্তান্ত কিছুই জানেন না, অথচ অন্তঃপুর লোকাকীর্ণ দেখিয়া নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে পিতৃক্রোড়ে মস্তক নত করিলেন। রাজা অঙ্গুলিদ্বারা কন্যার চিবুক উত্তোলন করিয়া কহিলেন, বৎসে ! পুনর্ব্বার তোমারে ক্রোড়ে লইব এ আশা ছিল না। পরমেশ্বরের কৃপায়, আর এই যোগীবরের প্রসাদে অদ্য হারানিধি প্রাপ্ত হইলাম, এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসীর দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিলেন। রত্নবতী এই কথা শুনিয়া সেই ভুবনমোহন কটাক্ষ সন্ন্যাসীর দিকে একবার ফিরাইলেন। ছদ্ম যোগিরূপী সুমন্ত রাজকন্যার রূপমাধুরী দর্শন করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ভাবিলেন, পরমেশ্বর এই সুবর্ণলতাটি কোন ভাগ্যবান তরুর আশ্রয় করিবার অভিপ্রায়ে সৃজন করিয়াছেন ? প্রিয়বন্ধু সুকুমারের অদৃষ্ট কি সুপ্রসন্ন, এই সৌন্দর্য্য-সরোবরের পদ্মফুলটি আজ তাঁহার হৃদয়-সরোবরে শোভা সম্পাদন করিবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া সন্ন্যাসী রাজাকে কহিলেন, মহারাজ ! আমি বিষয়-ত্যাগী যোগী, গৃহী হইতে আমার অভিলাষ নাই। তুমি অঙ্গীকার করিয়াছ, অর্দ্ধেক

রাজ্যসহ এই কন্যারত্ন আমারে দান করিবে, কিন্তু আমি তাহা লইয়া কি করিব? আমি কহিতেছি যে, সুকুমার রাজকুমার আপনার দুহিতার জন্য সুদীর্ঘকাল কারা-বাস করিলেন, তাঁহারেই দান কর। রাজা তচ্ছ্রবণে উল্লসিত হইয়া শুভদিনে শুভলগ্নে সুকুমারকে রত্নবতী দান করিলেন। নগর উৎসবময়, রাজবাটী মঙ্গলময়, এবং রাজপথ আনন্দধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

এদিকে বাসরগৃহে মহিলাগণ বরের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কেহ গবাক্ষদ্বারে বদনার্পণ করিয়া, কেহ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, কেহ বা অগ্রগামিনী হইয়া শ্রেণীবদ্ধ বাসন্তীতরুর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ওদিকে সন্ন্যাসী অমাত্যকে কহিলেন, মন্ত্রি! মহারাজকে বল, আমি অদ্য রাজপুত্রের সহিত বাসরগৃহে যামিনী যাপন করিব। মন্ত্রী এই কথা রাজাকে বলিবামাত্র রাজা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। মন্ত্রী সুকুমারের সহিত সন্ন্যাসীরে বাসরে লইয়া গেলেন। রাজকুমার সন্ন্যাসীকে নিকটে দেখিয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন। পূর্ব্বাবধি যে যে ঘটনা হইয়াছিল, সেইসকল বিপদের কথা তখন স্মৃতিপথারূঢ় হওয়াতে বন্ধুবিচ্ছেদে মন আকুল হইল। এই অবসরে সন্ন্যাসী নিজরূপ ধারণ করিয়া ঈষৎ হাস্যবদনে সুকুমারকে কহিলেন, বয়স্য! চিনিতে পার? এখন বল দেখি, ধন বড় কি বিদ্যা বড়? যুবরাজের শরীর লোমাঞ্চিত হইল। বিস্ময়ান্বিত হইয়া দেখিলেন, সেই আশৈশব-পরিচিত-বন্ধু সুমন্ত সম্মুখে উপস্থিত। তৎক্ষণাৎ তিনি হর্ষবিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া সাশ্রুনয়নে বন্ধুকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। আনন্দে তাঁহার মন এমনি বিহ্বল হইয়াছিল যে, পুনঃ পুনঃ বন্ধু বন্ধু শব্দ উচ্চারণ করিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় অনিমিষলোচনে বন্ধুর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। দৃষ্টি আর ফিরিল না। উভয়ের চিত্তে জলধিতরঙ্গের ন্যায় প্রণয়হিল্লোল বহিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে সাগর যেমন বায়ুপ্রতিঘাতে বেলাকে আঘাত করে, সেইরূপ তাহাদিগের দুঃখজলধি চিন্তাবায়ুর প্রতিঘাতে স্ফীত হইয়া হৃদয়কে আঘাত করিতে লাগিল।

কন্যাজামাতা বাসরগৃহে কিরূপ প্রেমালাপ করে, পুরবাসিনীগণ সচরাচর তাহা দেখিতে অভিলাষিণী হন, তাহাতে আবার বাসরগৃহে সন্ন্যাসী আছে, এই আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিবার জন্য তাঁহাদের কৌতূহল আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। যাঁহারা গবাক্ষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহারা গৃহমধ্যে হঠাৎ সন্ন্যাসীর রূপপরিবর্তন, জামাতার সহিত আলিঙ্গন, জামাতার ক্রন্দন এবং পরস্পরের সস্নেহ-সম্ভাষণ দর্শন করিয়া

বিস্ময়াকুল মনে দ্রুতপদে রানীকে সংবাদ দিলেন। রানী সেই ব্যাপার দর্শনের অপেক্ষা না রাখিয়াই শয়নগৃহে গিয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! এই অদ্ভুত বার্ত্তা শ্রবণ করুন। সন্ন্যাসীকে বাসরগৃহে রাখিয়াছেন বলিয়া কন্যাগণ কেহই তথায় যান নাই। জামাতা, রত্নবতী, আর সেই সন্ন্যাসী তিনজনেই বাসরে আছেন, ইতিমধ্যে সন্ন্যাসী যুবারূপ ধারণ করিয়াছেন। জামাতা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। রাজা এই আশ্চর্য্য ও অবিশ্বাস্য বাক্য শ্রবণে অতি ব্যস্ত হইয়া বাসরগৃহাভিমুখে চলিলেন। ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া দেখিলেন, সন্ন্যাসী নাই, একটি দিব্য পুরুষের সহিত জামাতার কথোপকথন হইতেছে, রত্নবতী পার্শ্বে বসিয়া আছেন। রাজা রত্নরতীকে দ্বার খুলিতে বলিলেন। রাজার স্বর শুনিয়া সুকুমার আপনিই দ্বার খুলিয়া দিলেন। রাজা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াই, "সন্ন্যাসী কোথায়? এই সুপুরুষ যুবাপুরুষ কে?" এই প্রশ্ন করিলেন। সুমন্ত নতশিরে উত্তর করিলেন, মহারাজ! আমিই সেই সন্ন্যাসী। রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন। কহিলেন, এই আশ্চর্য্য ঘটনার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিতেছে! সুমন্ত প্রথমে তাহাদিগের বাল্যসখ্য, উভয় বন্ধুতে তর্ক, মীমাংসার্থ দেশভ্রমণে বহির্গমন এবং কপিরূপী তপস্বীর সহিত সাক্ষাৎ ও বরপ্রাপ্তি অবধি পরস্পর বিচ্ছেদ ও রত্নপুরে আগমন, পরিশেষে এই বিবাহ পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। রাজা অভিনিবেশপূর্ব্বক এতদ্‌বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সুমন্তের বিদ্যা-বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। কহিলেন, বৎস সুমন্ত! তুমি বলিয়াছিলে ধনাপেক্ষা বিদ্যা শ্রেষ্ঠ, তাহা যথার্থ, তোমরাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইলে। এইরূপ নানা কথাপ্রসঙ্গে কিয়ৎক্ষণ তথায় থাকিয়া রাজা শয়নগৃহে গমন করিলেন। রজনী প্রভাত হইলে রাজা সভাসীন হইয়া আপন মন্ত্রিকন্যার সহিত সুমন্তের পরিণয়-সম্বন্ধ স্থির করিলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে বিবাহ হইল। সুকুমার ও সুমন্ত কিছুদিন শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া সস্ত্রীক স্বদেশে গমন করিলেন।

গোরাই ব্রিজ
অথবা
গৌরী-সেতু

ত্রেতাযুগে সীতানাথ সীতা উদ্ধারিতে।
বেঁধেছিল সিন্ধুসেতু বানর সহিতে॥
নল নীল হনুমান জাম্বুবান আদি।
সমতুল কপিকুল নাহি অন্যবাদী॥
প্রাণপণে সযতনে সবে করি বল।
বাঁধিল দুরন্ত সিন্ধু মরি কি কৌশল॥
ধন্য ধন্য ধন্য বীর ধন্য রঘুমণি।
সেতু বেঁধে উদ্ধারিলে আপন রমণী॥
সেতুবন্ধ রামেশ্বর মহা তীর্থস্থান।
কতই হয়েছে মরি তাহার সম্মান॥
এবে কলিকালে দেখ কলি মহারাজ।
সাজায় ভারত-মায়ে মনোমত সাজ॥
এমন নিঠুর রাজা দেখি না কোথায়।
লৌহহার পরাইছে মায়ের গলায়॥
ওদিকে হয়েছে সারা পশ্চিম প্রদেশ।
বাকি ছিল তাও হল বাঙ্গালের দেশ॥
ধিক তোরে কলিরাজা বলিব কি আর।
বৃদ্ধা মার গলে দেও লৌহময় হার॥
বাঙ্গালী হবে না এত নিঠুর হৃদয়।
তাই ভেবে রাঙ্গামুখ করেছ আশ্রয়॥
রাঙ্গামুখ কটা চ'ক বড় বুদ্ধিমান।
কৌশলে মায়ের গলে মালা করে দান॥
কলিকাতা ঢাকা আর কেন ফাক রয়।
দেও হার গলে তুলি কলিরাজ কয়॥

অমনি সাজিল বীর কত শত শত ।
জগতী হইতে সবে হইল নির্গত ।।
সে কালের মত বীর এরা কেহ নয় ।
অসি চর্ম্ম বর্ম্ম আদি কিছু নাহি লয় ।।
দড়া দড়ি খুট খস্তা এদের সম্বল ।
ধন্য ধন্য রাঙ্গামুখ ধন্য বুদ্ধিবল ।।

বাঙ্গাল কাঙ্গাল বড় কিছু দড় নয় ।
ধবল মুখের বোলে কম্পিত হৃদয় ।।
ছিলাম জঙ্গলে সবে বাঙ্গাল দেশেতে ।
কটা চ'কে তোষি কত প্রাণের ভয়েতে ।।
ঘরবাড়ী ভেঙ্গেচুরে করে ছারখার ।
তবু বলি রক্ষা কর ধর্ম্ম-অবতার ।।
দেখিতে দেখিতে গৌরীতটে উপনীত ।
হুজুর মজুর লয়ে বড়ই দুঃখিত ।।
বেগবতী স্রোতস্বতী গৌরী ভয়ঙ্করী ।
দেখে ভেবে ভয়াকুল উপায় কি করি ।।
এর পারে লৌহহার কেমনে লইব ।
কেমনে লঙ্ঘিব এরে কেমনে যাইব ।।
সকলেই এই ভেবে হইল অস্থির ।
বাঁধিব গৌরীতে সেতু শেষে করি স্থির ।।
সেতু বেঁধে পার হব পারে লব হার ।
দেখিব গৌরীর গর্ব্ব দেখিব এবার ।।
দলে দলে শ্বেতকায় জুটিল আসিয়া ।
কেমনে বাঁধিবে গৌরী ভাবিছে বসিয়া ।।
পরামর্শ হল শেষ অশেষপ্রকার ।
বাঁধিব বাঁধিব সেতু বাঁধিব এবার ।।

দলের প্রধান যিনি বসি উচ্চাসনে।
করিলেন আজ্ঞা সবে মধুর বচনে॥
গৌরীর পশ্চিম তটে কিছু ভয় নাই।
চারিদিগে ঘিরে আছি আমরা সবাই॥
সুনিয়মে সব কার্য্য সমাধা হইবে।
অল্প সংখ্যা লোক মাত্র এপারে থাকিবে॥
পূর্ব্ব পারে আমাদের থাকিবে সকল।
ধন্য ধন্য রাঙ্গামুখ ধন্য বুদ্ধিবল॥

পূর্ব্বপারে আমাদের কোন মিত্র নাই।
সতর্কে থাকিতে হবে একত্রে সবাই॥
আমরা বিদেশী এসে ঘিরিয়াছি দেশ।
কাজেই হইবে মনে তাহাদের দ্বেষ॥
ঢাকাই বাঙ্গাল দল আমাদের দলে।
আসিয়া মিলিছে তারা ফল পাবে ব'লে॥
কিন্তু তারা এদেশের কিছুই জানে না।
এদেশে তাদের কথা কেহই বোঝে না॥
ছলে হ'ক বলে হ'ক কৌশল করিয়া।
দিতে হবে দেশী লোক দলে মিশাইয়া॥
সুধু চাষা নিলে কিছু উপকার নাই।
সব দল হতে কিছু কিছু লওয়া চাই॥
চাষাদের কুলি ব'লে কর সম্ভাষণ।
তাতেই সন্তুষ্ট হবে তাহাদের মন॥
শাদা বস্ত্র জুতা পায় যাদের দেখিবে।
বাবু বলে সমাদর তাদের করিবে॥
হিন্দুস্থানী মারয়ারী খোট্টা বুনগণ।
বাছিয়ে লইবে সংখ্যা করিয়ে গণন॥
এসকলে কোন কালে হবে না প্রণয়।
আমরা করিব তাহা যাহা মনে লয়॥

হবে না হবে না ঐক্য, এ দল ও দল।
ধন্য ধন্য রাঙ্গামুখ ধন্য বুদ্ধিবল ॥

অর্থেব অসাধ্য কিছু নাই এ মহীতে।
উপস্থিত হল সব দেখিতে দেখিতে ॥
কার্য্যকর্ত্তা হইলেন লেসলী প্রধান।
ইঁহার বুদ্ধিতে সেতু হইবে নির্ম্মাণ ॥
বেনিডিকট এসিষ্টেণ্ট হইল তাঁহার।
নিকলসন্ ন্যাস্ কেরি গুণের আধার ॥
রাঙ্গা কালা শাদা মুখ সাহেব-তনয়।
ঝাঁকে ঝাঁকে পালে পালে উপস্থিত হয় ॥
বাঁধিতে গৌরীর সেতু হরষিত মন।
শাদা বস্ত্র জুতা ধাবী জোটে অগণন ॥
বাপের তাড়ান কত মাযের খেদান।
জোটা মাত্র পদ পেয়ে বাড়িল সম্মান ॥
রাম কৃষ্ণ, যদু যাদু, প্রসন্ন রাখাল।
নসী, শশী, নন্দ, চন্দ্র, গোবিন্দ, গোপাল ॥
সূর্য্য, শীল, আইজদ্দী, মহেন্দ্র, মহেশ।
গুপ্তবাবু জিতেন্দ্রিয় গুণেতে অশেষ ॥
আর কত বাবুগণ কে পারে গণিতে।
কতজন সাজে বঙ্গে কে পাবে বর্ণিতে ॥
নানা রঙ্গে বাজিরাজি সাজায় বিস্তর।
মহিষ বলদ মেষ কুকুর শূকর ॥
সংগ্রহ করিছে কত নানামত কল।
ধন্য ধন্য রাঙ্গামুখ ধন্য বুদ্ধিবল ॥

দাঁড়াইল গৌরীতীরে সারি সারি সবে।
দেখি চমকিত লোক এরা কারা হবে ॥
গৌরী পার হবে ব'লে সাজিল সকল।
বাজিল বাঁশির বাদ্য ইঞ্জিনারী কল ॥
ষ্টীমার পণ্টুন জোড়া বোট ডিঙি।

ফ্লেট ঢাকাই বোট বড়লাল ডিঙি ॥
আসিল এপারে সবে করিবারে পার।
দেখি হরষিত-চিত মবি কি বহার ॥
সকলেই পারে যাবে বলে দাঁড়াইল।
হাসি হাসি কর্ত্তা আসি কহিতে লাগিল ॥
ক্রমে পার হও সবে হয়ো না অস্থির।
হয় নাই এ পারের কোন কার্য্য স্থির ॥
কে থাকিবে কার্য্যকর্ত্তা, কুলি কতজন।
কে করিবে বার্ত্তাবহকার্য্য সংঘটন ॥
জীবামে রাখিয়া যাই কার্য্যভার দিয়া।
বার্ত্তাবহ কর্ত্তা দেই সূর্য্যকে করিয়া ॥
সূর্য্য যদি বার্ত্তাবহকর্ত্তা হয়ে রয়।
সুনিয়মে সব কার্য্য হইবে নিশ্চয় ॥
অপর এপারে থেকে না পাইবে দিশে।
থাক সূর্য্য এই পারে মনের হরিষে ॥
এত বলি সবে মিলি তরী আরোহিল।
বদর বলিয়া মাঝি তরণী খুলিল ॥
ষ্টীমারে ধপ ধপ করিতেছে কল।
বোটে দাঁড় মারে দাঁড়ী করে কত বল ॥
দরিয়া গাজি বলে কেহ ছাড়িয়া তরণী।
পড়িছে ছিঁড়িয়ে দাঁড় উঠিছে অমনি ॥
ওপারে চলিয়া যায় দেখিতে দেখিতে।
গৌরী পার হলো সবে হাসিতে হাসিতে ॥
ভীষণ তরঙ্গ গৌরী করে কল কল।
ধন্য ধন্য রাঙ্গামুখ ধন্য বুদ্ধিবল ॥
উঠিল কাসীমপুরে একত্রে সকলে।
নিরূপিত স্থানে স্থানে সব যায় চ'লে ॥
কাসীমপুরেতে কেহ, কেহ বা কয়ায়।
রহিলেন বাসা করি যথায় তথায় ॥

কোন বাবু বিবি আনি রাখিলেন ঘিরে।
কেহ মাঠে কেহ গ্রামে কেহ গৌরীতীরে ।।
শত শত বারনারী আসিয়া জুটিল।
কেহ নিজে ঘরে কেহ বাসায় রহিল ।।
সাহেবের বিবি সব গাউন পরিয়া।
সকালে বিকালে মাঠে বেড়ায় ঘুরিয়া ।।
'বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী' কটা কটা কেশ।
মুখে গন্ধ, সব মন্দ স্বধু ভাল বেশ ।।
কেবা বা কার ভালবাসা, কেবা কার নারী ।।
অঙ্গভঙ্গ রঙ্গ দেখে চিনিবারে নারি ।।
সকলেই করে কর, করিছে দলন।
সকলেই মুখে মুখ, করিছে চুম্বন ।।
দেখিয়া অবাক মোরা, বাঁচি না লজ্জায়।
কেবা কার চেনা ভার, এত বড় দায় ।।
এ দেখে এ দেশে নারী-স্বাধীনতা কাজে।
মত দিতে বিধিমতে হৃদে শেল বাজে ।।
সুরেশ্বরী ধান্যেশ্বরী বোতল সহায়।
উপস্থিত হইলেন আসিয়া কয়ায় ।।
গলবস্ত্রে কত বাবু করে জোড় কর।
কত মতে করিতেছে মায়ের আদর ।।
বারাঙ্গনাগণ সবে প্রাঙ্গণে আসিয়া।
কহিছে কাতরে কত মিনতি করিয়া ।।
থাক মা এপারে থাক সুরার ঈশ্বরী।
সেবিব তোমারে মোরা, ওমা ধান্যেশ্বরি ।।
সাহেবেরা করিবে না তোমার আদর,
ক্ষতি নাই তাতে দুখ, করো না অন্তর ।।
আমরা করিব সেবা, তোমার চরণ।
গটুহেল ক'রে দিব, রাঙ্গা মুখগণ ।।

আসিতে দিও'না কাছে, সাহেবের দল।
ধন্য ধন্য রাঙ্গামুখ ধন্য বুদ্ধিবল ॥

শিকলে আঁটিয়া কল দোলাইল কত।
রথ কল টানা কল, কল নানা মত ॥
জল তোলা, মাটি কাটা, কাদা করা কল।
কত কল পন্টুনেতে, মরি কি কৌশল ॥
সূত্রধর বুন কুলি, খাটে অগণন।
প্রাণপণে খাটে কত দেশী বাবুগণ ॥
শিকলে আঁটিয়া কত বড বড় চঙ্গ।
পুঁতেছে গৌরীর গর্ভে ক'রে নানা রঙ্গ ॥
ধপ ধপ করে ওঠে, এঞ্জিনের ধূম।
পন্টুনে গৌরীর গর্ভে লেগে গেল ধূম ॥
গৌরীজল কলে ওঠে এত বল ক'রে।
দু দিন শুকায়ে গৌরী যেন যাবে ম'রে ॥
ছলে বলে সুকৌশলে গৌরীর বুকেতে।
ক্রমে লৌহস্তম্ভ সব লাগিল পুঁতিতে ॥
পাথর ফেলিল কত গৌরীর জীবনে।
মারিবে জীবনে গৌরী আশা আছে মনে ॥
তরঙ্গের রঙ্গ আর দেখা নাহি যায়।
কেবল কান্দিছে গৌরী ক'রে হায় হায় ॥
এদিকে খালাসী দল আল্লা আল্লা ব'লে।
পুঁতিছে লোহার থাম জাঁতা কলে বলে ॥
হা ইলেছা ব'লে সবে টানিতেছে কল।
ধন্য ধন্য রাঙ্গামুখ ধন্য বুদ্ধিবল।

কারো কারো বাসায় নিশিতে বড় রং।
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ দেয় সং ॥
সাহেব মাতিছে মদে বিড়ালাক্ষী নিয়ে।
পড়িছে বিবির গায় ঢলিয়ে ঢলিয়ে ॥

মাতামাতি লাফালাফি কত গীত গায়।
তালে তালে নাচিতেছে শাখামৃগ প্রায় ॥
সেরী চেরী ব্রাণ্ডি ধরা মেজের উপরে।
সেজের আলোয় আরো বড় শোভা করে ॥
যার যাহা ইচ্ছা তাহা করিতেছে পান।
দারা রারা সুরে কেহ করিতেছে গান ॥
কোন বিবি সুরা ঢালি গেলাসেতে করি।
দিতেছে সাহেব-মুখে আ মরি আ মরি ॥
বিড়ালাক্ষী শাদামুখী ধবল বসন।
বাতির আলোতে আরো উজ্জ্বল বরন ॥
বুক উচ্চ কুচ গিরি অর্দ্ধ আবরণ।
কে বলিবে আছে তার উপরে বসন ॥
শান্তিপুরে ডুরে পরা আমাদের মেয়ে।
শতগুণে ভাল তারা বিবিদের চেয়ে ॥
ওদিকে কতক বাবু ব'সে নানা দলে।
কেহ ব'সে গীত গায় কেহ পড়ে ট'লে ॥
ধান্যেশ্বরী ভাজা চাল, ভাজা ছোলা নিয়ে।
এ উহার গালে দেয় আমোদে মাতিয়ে ॥
দিশী মদ দিশী বাবু দিশী বিবিগণ।
সাদা জলে রাঙ্গা চ'ক সাদা করি মন ॥
তবলার বোলে মন উঠিছে ফুলিয়া।
নাচিছে কামিনীকর আদরে ধরিয়া ॥
উন্মত্ত হইয়া কেহ বারনারীসনে।
কি আশে বিদেশে আসা নাহি ভাবে মনে ॥
কোন বাবু শিরে পাগ বাঁধিয়া তথায়।
চামর লইয়া হাতে রামায়ণ গায় ॥
ধিক ধিকা নাচ আর কেদারার বোল।
গাঁজাখুরি গানে আরো বাড়িতেছে গোল ॥

বেড়াইতেছে বারনারী বাজাইয়া মল।
ধন্য ধন্য রাঙ্গামুখ ধন্য বুদ্ধিবল ॥
প্রভাতে বাজিল বাঁশি কামারশালায়।
যার যার যেই কাজ সেই কাজে যায় ॥
কর্ম্মশালে কি কৌশল করিয়াছে কলে।
সব কল চলিতেছে এঞ্জিনের বলে ॥
এঞ্জিনে ঘুরিছে চাকা চক্ষের পলকে।
ধাঁদা লেগে যায় চক্ষে অগ্নির ঝলকে ॥
কত কল কত চাকা ঘোরে অনিবার।
কেবল এঞ্জিন সব কল মূলাধার ॥
চিরিতেছে বাহাদুরি কাঠ শত শত।
লোহাতে চিরিছে লোহা কত আর কত ॥
সুরকি হইছে ইটে সিন্দুরের প্রায়।
যার যাহা ইচ্ছা করে এঞ্জিন প্রভায় ॥
ওদিকে রথের কলে শিকল আঁটিয়া।
বড় বড় চোঙ্গ আনে অনাসে টানিয়া ॥
তিনশত লোকে যাহা টানিলে না চলে।
ছয়জন টানি লয় কলের কৌশলে ॥
কত বল ধরে কল কৌশল এমন।
শত মণ লোহা লয়ে যায় দুইজন।
থাম পোঁতা হলো শেষ বিশেষ যতনে।
টানিছে গার্ডার সবে হরষিত মনে ॥
এখন ভাবনা নাই থাম পুঁতিয়াছি।
বান্ধিব বান্ধির সেতু ভরসা পেয়েছি ॥
গার্ডার টানিতে কত আহত হইল।
অর্থলোভে কত চাষা প্রাণ হারাইল ॥
ঘুরিছে উপরে কল শিকল লইয়া।
হঠাৎ ছুটিল হাত, মরিল পড়িয়া ॥
মাথা ভেঙ্গে ঘাড় ভেঙ্গে পড়ে কত জন।
হস্ত পদ ভাঙ্গা কত কে করে গণন ॥

হস্ত পদ ভাঙ্গিতেছে পড়িতেছে পায়।
তবু জোর করি লয় ডাক্তারখানায় ।।
নেটিভ ডাক্তার তারা প্রসন্ন এয়ার।
এয়ার সিবিল বটে সাহেব এয়ার ।।
হস্ত পদ ভাঙ্গা পেলে কেটে ফেলে তায়।
আর্ত্তনাদে কান্দে সবে করে হায় হায় ।।
গার্ডার টানিতে সবে হইল কাতর।
দিবস-রজনী কাজ করে নিরন্তর ।।
লোরী কলে ঠেলিতেছে—ধন্য রে কৌশল।
ধন্য ধন্য রাঙ্গামুখ ধন্য বুদ্ধিবল ।।
গার্ডার লাগান শেষ হইল যখন।
আনন্দে মাতিল সব কর্মচারিগণ ।।
শ্বেত পীত লাল নীল পতাকা বিস্তর।
বান্ধিয়া গার্ডার শিরে সাজায় তৎপর ।।
অগণন জনগণ দাঁড়ায় দুকূলে।
সেতু বান্ধা হলো শেষ দেখে কুতুহলে ।।
তরী আরোহিয়া কত শ্বেতকায়গণ।
আসিছে গোরাঁর সেতু করিতে দর্শন ।।
দিনমণি অস্ত যায় পশ্চিম অচলে।
দেখিয়া চলিছে কল আর বলে বলে ।।
গার্ডার লাগান সাবা হইল যখন।
আনন্দসাগরে মন ভাসিল তখন ।।
করতালি কোলাকুলি হুবে হুরে বোল।
তিন ঘন্টা হলো তবু নাহি গেল গোল ।।
মশাল করিয়া হাতে নাচিতে লাগিল।
হরষে সরস প্রাণ আকুল হইল ।।
কেহ বোটে কেহ তীরে কেহ বা নৌকায়।
করিতেছে লাফালাফি যত শ্বেতকায় ।।

এতদিনে হলো আজ শ্রমের সফল ।
ধন্য ধন্য রাঙ্গামুখ ধন্য বুদ্ধিবল ।।

সেতু বেঁধে লৌহ-হার লয়ে গেল পারে ।
ধন্য রে বিলাতী বুদ্ধি ধন্য বে সবারে ॥
পূর্ব্বপাবে লৌহ-হার গেল কত দূর ।
রথে চড়ি দেখিবেন মেয়ো বাহাদুর ।।
এ রথ সে রথ নয় মনোরথ-গতি ।
আসিবেন বাষ্পরথে চড়ি মহামতি ।।
সমস্ত ভারতভার শিরে আছে যাঁর ।
সহিবে গৌরীর সেতু আজি তাঁর ভার ।।
লেসলীর কারিকুরি আজি জানা যাবে ।
যদি সেতু ঠিক রয় পুরস্কার পাবে ।।
আমপাতা বাঁশপাতা গাঁদাফুল দিয়া ।
রাখিল মনের মত সেতু সাজাইয়া ।।
ডুব ডুব করিতেছে লেসলী-হৃদয় ।
না জানি আমার ভাগ্যে আজি কিবা হয় ॥
শারীরিক মানসিক পরিশ্রম যত ।
বুঝি আজ ভাগ্যদোষে সব হয হত ।।
কত অর্থ ব্যয় হলো আমাব কথায় ।
যদি সেতু নাহি রয় কি হবে উপায় ॥
লোকের গঞ্জনা প্রাণে সহিবে কেমনে ।
জীবন ত্যজিব আজি গৌরীর জীবনে ॥
লর্ড মেয়া বাহাদুর গুণের আধার ।
দেখিবেন গৌরী-সেতু সবে চমৎকার ।।
সেতু উপলক্ষ করি হবে আগমন ।
কাসিমপুরেতে তাঁর হবে পদার্পণ ।।
কাশীতুল্য মান্য হবে কাসিমপুরের ।
নবতীর্থস্থান হবে কুল উদ্ধারের ।।

দর্শনে পাইবে ফল মোক্ষফল সবে।
এ তীর্থে ধর্ম্মের ভেদ কিছু নাহি রবে।।
সকল ধর্ম্মেতে হবে সম অধিকাব।
দেখা মাত্র শত কুল হইবে উদ্ধার।।
লর্ড মেয়ো বাহাদুরে দেখিবার তরে।
গৌরীর দু-তীরে লোক কোলাহল করে।।
কেহ বলে ঐ দেখো দেখা যায় ধূম।
আসিছে কলেব গাড়ী ক'রে কত ধূম।।
দেখিতে দেখিতে রথ নক্ষত্র-সমান।
ধূম ছাড়ি হুড়হড়ি করিল প্রস্থান।।
চক্ষের পলকে সেতু হয়ে গেল পার।
দেখে চমকিত লোক সন্তোষ অপার।।
থামিল রথের গতি সেতু পার হয়ে।
দেখিল ওপাব-বাসী নিকটেতে বয়ে।।
মহামান্য গণনীয় মহোদয়গণ।
লর্ড মেয়ো বাহাদুর অতি বিচক্ষণ।।
নামিলেন রথ হতে লয়ে দল বল।
ধন্য ধন্য রাঙ্গামুখ ধন্য বুদ্ধিবল।।
যমুনা পদ্মার সনে মিলেছে যথায়।
হার লয়ে সবে ব'সে ভাবিছে তথায়।।
ঢাকায় হলো না যাওয়া, হলো না এবার।
সাধ্য নাই পদ্মা-পারে লয়ে যাইবার।।
কিছু দিন এই স্থানে থাকিতে হইল।
সম্মুখে আসিয়া পদ্মা বড় বাধা দিল।।
এদিকে গৌরীর সেতু করি দরশন।
লর্ড মেয়ো করিলেন রথে আরোহণ।।
হুইল ঘুরিল জোরে বাঁশরী বাজিল।
হুস্ হুস্ করি কল চলিতে লাগিল।।

গৌরী-সেতু হলো শেষ বিশেষ জানিয়া।
হরষে সকলে যায় আবাসে চলিয়া॥
ঢাকায় চলিয়া গেল ঢাকাই বাঙ্গাল।
শিলটে শিলটী যায় বাঁধিয়া জাঙ্গাল॥
বাবুগণ বিবি লয়ে হইলেন পার।
সঙ্গে করি লইলেন যার যার তার॥
ক্রমে ক্রমে সব গেল কিছু রহিল না।
দুদিনে ভাঙ্গিল ঘর কিছু থাকিল না॥
কেবল রহিল হজ্ সেতুর রক্ষক।
রক্ষক বলিছে কিন্তু নামেতে দর্শক॥
অকস্মাৎ একদিন সেতু-দরশনে।
গিয়ে প্রাণ গেল তার গৌরীর জীবনে॥
সেতু' পরি চড়ি জল মাপিছে যখন।
অমনি গৌরীর গর্ভে হইল পতন॥
আর কি উঠিতে পারে গৌরী-গর্ভ হতে।
হজের হরিল প্রাণ দেখিতে দেখিতে॥
কান্দিছে হজের মেম করি হায় হায়।
সেম্ সেম্ ও গোরাই যাব রে কোথায়॥
হায় কটি ছেলেমেয়ে অপোগণ্ড দল।
কোথা যাবে কি খাইবে ও গোরাই বল্॥
হজ মল হেজ এলো কিছুদিন তরে।
অঙ্গনা লইয়ে রঙ্গে কত মজা করে॥
হইল না চির-সুখী তাহার কপাল।
ইয়ং হইল কর্ত্তা নন্দের গোপাল॥
ধন্য রে লেসলী তোর ধন্য বুদ্ধিবল।
বাঁধিলে গৌরীতে সেতু ধন্য রে কৌশল॥

জমীদার-দর্পণ

নাটকোক্ত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

হায়ওয়ান আলী	—	জমীদাব
সিরাজ আলী	—	জমীদারেব জ্যেষ্ঠভ্রাতা
আবু মোল্লা	—	অধীন প্রজা
জামাল প্রভৃতি	—	জমীদারের চাকর
		সাক্ষীদ্বয
আরজান ব্যাপারী	—	জুরি

নট, সূত্রধার, মোসাহেব চারিজন, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারিস্টার, ডাক্তার সাহেব, ইন্‌স্‌পেক্টর, কোর্ট-সাব-ইনস্পেক্টর, উকিল, মোক্তার, পেশকার, কনস্টেবল, চাষা, আরদালী, দর্শকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

নূরন্নেহার	—	আবু মোল্লার স্ত্রী
আমিরণ	—	আবু মোল্লার ভগ্নী
কৃষ্ণমণি		
নটী		

প্রস্তাবনা

(সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্র—(পদচারণ করিতে করিতে)

হা ধর্ম্ম ! তোমার ধর্ম্ম লুকালো ভারতে ;
জমীদার-অত্যাচারে ডুবিল কলঙ্কে !
পাতকীর কর্ম্মদোষে হলে পাপভাগী,
পাপীরা ধনের মদে না মানে তোমায়
না মানে যেমন বাঁধ স্রে তস্বতী নদী,
দ্রুতবেগে চলে যায়, ভাঙ্গিয়া দুকূল।
রাজ-প্রতিনিধিরূপী মধ্যবর্ত্তী সম,
জমিদার! রাজরূপে পালক প্রজার
সর্ব্বনর-ধনপ্রাণমান-রক্ষাকারী।
সেই হেতু রাজবিধি দিয়াছে পদবী !
রবি যথা নিজ রশ্মি বিতরি শশীরে
করেন শীতল করে ভুবন শীতল,
সে পদবী হীন পদে শোষিছে মেদিনী,
শোষে যথা চৈত্র মাসে খর প্রভাকর
নদনদী জলাশয় খরতর করে।
কি কুদিনে আজি আমি প্রবেশি এ দেশে,
স্মরিয়া বিদরে বুক নিকলে নিশ্বাসে—
ঘন শ্বাসে দহে প্রাণ জলন্ত আগুন,
তুষানলে জ্বলে তথা ঢাকা হুতাশন—
ধিক্ ধিক্ গুমে গুমে না হয় প্রকাশ—
সেইরূপ দহিতেছে আমার অন্তর।

[নটের প্রবেশ]

নট—একা একা পাগলের মত কি বলছেন ?

সূত্র—কেন ? অন্যায় কি বলেছি, সত্য বলতে ভয় কি ?

নট—আমি সত্য অসত্যের কথা বলছিনে, ভয়ের কথাও বলছিনে, বলি কথাটা কি ?

সূত্র—কথা এমন কিছু নয়। কলিকালেব প্রজারা মহা সুখে আছে। কলিরাজও প্রজার সুখচিন্তায় সর্ব্বদা ব্যস্ত; কিসে প্রজার হিত হবে, কিসে সুখে থাকবে এরি সন্ধান করছেন। কিন্তু চক্ষের আড়ালে দুর্ব্বলেব প্রতি সবলেরা যে কত অত্যাচার, কত দৌরাত্ম্য করছে তাব খোঁজখবর নেই।

নট—কেন, এ আপনার নিতান্তই ভুল। রাজার নিকট সবল-দুর্ব্বল, ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, সুখী-দুঃখী, সকলি সমান! সকলি সম স্নেহের পাত্র। সকলের প্রতিই সমান দয়া। আজকাল আবার দীন-দুঃখীদের প্রতিই বেশ টান!

সূত্র—(ক্ষণকাল নিস্তব্ধ) আচ্ছা, মফস্বলে একরকম জানওয়ার আছে জানেন ? তারা কেউ কেউ শহরেও বাস করে, শহরে কুকুর, কিন্তু মফস্বলে ঠাকুব! শহরে তাদেব কেউ চেনে না, মফস্বলে দোহাই ফেরে। শহবে কেউ কেউ জানে যে, এ জানওয়াব বড শান্ত—বড় ধীব, বড নম্র; হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, মনে দ্বিধা নাই, মাছ-মাংস ছোঁয় না। কিন্তু মফস্বলে শৃগাল, কুকুর, শূকর, গরু পর্য্যন্ত পাব পায় না। বলব কি, জানওয়ারেবা আপন আপন বনে গিয়ে একেবারে বাঘ হয়ে বসে।

নট—কি কথাই বললেন, বাঘ বুঝি আব জানওয়ার নয় ?

সূত্র—আপনি বুঝতে পারেন নাই। এ জানওযারদের চারখানা পাও নাই আর ল্যাজও নাই। এরা খাসা পোশাক পরে, দিব্বি সরু চালের ভাত খায়। সাড়ে তিনহাত পুরু গদিতে বসে, খোসামোদে কুকুররাও গদির আশে-পাশে ল্যাজ গুড়িয়ে ঘিরে বসে থাকে। কিছুরই অভাব নাই, যা মনে হচ্ছে তাই করছে। বিনা পরিশ্রমে স্বচ্ছন্দে মনেব সুখে কাল কাটাচ্ছে। জানওয়ারেরা অপমানভয়ে নিজে কোন কার্য্যই করে না। ভগবান তাদেব হাত-পা দিয়েছেন বটে, কিন্তু সে সকলই অকেজো। দিব্বি পা আছে অথচ হাঁটবার শক্তি নাই! দেখতে খাসা হাত কিন্তু খাদ্যসামগ্রী হাতে করে মুখে তুলতেও কষ্ট হয়! কি করে? আহারের সামগ্রী প্রায় চাকরেই চিবিয়ে দেয়! এরা আবার দুই দল।

নট—দল আবার কেমন ?

সূত্র—যেমন হিন্দু আর মুসলমান।

নট—ঠিক বলেছেন। ঐ দলের এক জানওয়ার যে কি কুকাণ্ড করেছিল, সে কথা এখনও মনে হলে পিলে চমকে ওঠে—এখনও চক্ষে জল এসে পড়ে। উঃ, কি ভয়ানক!

সূত্র—এখন পথে এস। আমিও তাই বলছি।

নট—যাক, ও সকল কথা বলে আর কাজ নাই, কি জানি—

সূত্র—কেন বলব না? আপনি তো বলেছিলেন, যদি কোন দিন ভগবান দিন দেন, তবে মনেব কথা বলবো। আজ আমাদের সেই শুভ দিন হয়েছে!

নট—কি করে?

সূত্র—একবার ওদিকে চেয়ে দেখুন না!

নট—(চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া) তবে আমাদের আজ পবম ভাগ্য!

সূত্র—আব বিলম্বে কাজ নাই। আমাদের চির-মনোসাধ আজ পূর্ণ করবো। যত কথা মনে আছে সকলি বলবো! এমন দিন আর হবে না। কপালে যা থাকে জানওয়ারদের এক দলেব নকশা এই রঙ্গভূমিতে উপস্থিত কবতেই হবে!

নট—তাই তো ভাবছি, কোন্ নকশা অবিকল কে তুলেছে সেইটি ভাল করে বেছে নিতে হবে।

সূত্র আপনি শুনেন নাই 'জমীদার-দর্পণ' নাটক যে নকশাটি এঁকেছে, তার কিছুই সাজানো নয়, অবিকল তুলেছে।

নট—তবে আব কথা নাই, আসুন, তারই যোগাড় কবা যাক।

[উভয়ের প্রস্থান]

[পুষ্পাঞ্চলে ধরিয়া নটীর প্রবেশ]

নটী—বেশ, ইনি তো মন্দ নন। আমায় ডেকে আবার কোথায় গেলেন? পুরুষের মন পাওয়া ভার। নারী-জাতকে ঠকাতে পারলে আর কসুর নেই। তা যাক, আমি আর খুঁজে বেড়াতে পারিনে। এই অবসরে মালা গেঁথে নেই।

[উপবেশন এবং মালা গাঁথিতে গাঁথিতে সংগীত]

(রাগিণী মল্লার—তাল আড়া)

পাষাণসমপ্রাণ পুরুষ নিদয় অতি।
মনে এক মুখে আর—ভিন্নভাব অন্যমতি॥
কত কথার কত ছলে, রমণীরে কত ছলে,
হাসি হাসি কত কত কথা বলে, মজায় অবলা-জাতি,
নিত্য নব রসে মন, বসে মন আকিঞ্চন,
দ্বিপদ ষট্ পদগুণ, কি হবে এদের গতি॥

এই মালা নিয়ে আজ আমোদ করবো।

[নটের প্রবেশ]

নট—প্রিয়ে! সকলই তো বলেছি আর ওদিকেও সকল যোগাড় করে এলুম! এখন আর বিলম্ব কি ; আর কথাই বা কি ?

নটী—না, আমার কোন কথা নাই। আপনি যা মানস করেছেন আমি কি আর তাতে কোন বাধা দেই ? দেখুন, আমি মনের সাধে এই মালাছড়াটি গেঁথেছি। এই হাতে ঐ গলে পরাব বলে ইচ্ছে হচ্ছে।

নট—(সহাস্যে) একবার তো পরিয়েছ, আবার কেন ?

নটী—(মৃদু হাসে) এও এক সুখ!

নট—প্রিয়ে! মালাতো পরালে, এখন আর একটি গান গাও।

নটী—আর কি গান গাইব ? মনেব কথাই বলি. কিন্তু আপনি না বললে আমি বলবো না।

নট—তাতে আর ক্ষতি কি ?

উভয়ের সঙ্গীত

[লক্ষ্ণৌয়ের সুর—তালে কাওয়ালী]

মরি দুর্ব্বল প্রজার 'পরে অত্যাচার।
কতজনে করে, করে জমীদার॥
তারা জানে মনে, জমীদার বিনে
নাহি অন্য কেহ দুঃখ শুনিবার।
প্রজা কত সহে, কিছু নাহি কহে:
মনে ভাবে এর নাহি উপায় আর॥

জমীদার ধরে জরিমানা করে
মনোসাধ পুরে, নাশিছে প্রজার।
শুন সভ্যজন, করিয়ে মনন
দেখাইব আজি অভিনয় তার ॥

[উভয়ের প্রস্থান]

পটাক্ষেপণ

নেপথ্যে সংগীত

[রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী]

ওরে প্রাণ মিলনসলিল কর দান
যায় যায় যায় প্রাণ, ওষ্ঠাগত হলো প্রাণ
বিনে প্রেমবারি পান।
মনপ্রাণ সব সঁপেছি হেরে ও বয়ান
তবে কেন হেন জনে হান প্রিয়ে বিষবাণ ?

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কোশলপুর

(হায়ওয়ান আলীর বৈঠকখানা

(হয়ওয়ান আলী ও প্রথম মোসাহেব আসীন)

হায়—দেখেছো ?

প্র মো—হুজুর দেখেছি।

হায়—কেমন ?

প্র মো—সে কি আর বলতে হয়, অমন আর দুটি নাই !

হায়—কিন্তু ভারী চালাক, কিছুতেই পড়ছে না !

প্র মো—(সহাস্তে) সে কি ? সামান্য স্ত্রীলোক কিছুতেই পড়ে না।

হায়—তোমরা বোধ কর সামান্য, কিন্তু আমি বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখেছি, স্বভাব-চরিত্র যতদূর জেনেছি, তাতে বোধহয় সেটি অসামান্য !

প্র মো—অন্য লোভ কিছু দেখিয়েছেন ?

হায়—টাকার লোভ দেখিয়েছি, কত গয়নার লোভ দেখিয়েছি, কিছুতেই ভোলে না !

প্র মো—ওর স্বামীও তো এমন সুশ্রী পুরুষ নয় যে, তাতেই ভুলে রয়েছে।

হায়—না, তাই বা কি করে ? আবু মোল্লা নব কার্ত্তিক ! বিধির নির্ব্বন্ধ দেখ ! চাষার হাতে গোলাপ ফুল, এ কি প্রাণে সয় ? "হায় বিধি ! পাকা আম দাঁড়কাকে খায় !"

প্র মো—(ক্রোধে) কি আর বলবো। যদি আমার হাতে পড়তো তবে দেখতে পেতেন ! শুধু টাকাতেও হয় না, কথাতেও হয় না, পায়ে ধরলেও হয় না ; হওয়ার আরও উপায় আছে ; একদিন—

হায়—আমি যে না বুঝি তা নয়। যে কাজ তা তো জানতেই পাচ্ছো, তায় আবার যদি বলপূর্ব্বক করা হয়, সে আরও অন্যায়। অর্থের লোভ দেখিয়ে কি অন্য কোন কৌশলে হলে সকল দিকই বজায় থাকে। আমি আজ মনে মনে যে কারিকুরি এঁকেছি, সেটা পরখ করে দেখে যদি না হয়, শেষে অন্য উপায়—

প্র মো—কি এঁকেছেন হুজুর !

হায়—একটা ভান করে মোল্লাকে ধরে আনা যাক। এদিকে একটু নরম-গরম আরম্ভ করে ওদিকে কৃষ্ণমণিকে পাঠিয়ে দেই। সে গিয়ে বলুক যে, তুমি আজ সন্ধ্যার পর একবার বৈঠকখানায় গে' দেখা কর, সব গোল চুকে যায় !

প্র মো—বেশ যুক্তি হয়েছে হুজুর, বেশ যুক্তি হয়েছে। এখনই চার-পাঁচজন সর্দ্দার পাঠিয়ে মোল্লাকে ধরে আনা যাক, তা হলে আজ রাত্রেই—

হায়—আজ রাত্রেই ?

প্র মো—রাত্রেই—এখনি—

হায়—যেদিন তারে দেখেছি, সেদিন হতেই সেই জ্ঞান, সেই ধ্যান—যেন উন্মত্ত ! (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) ওরে জামাল !

[সর্দ্দারবেশে, জামালের প্রবেশ]

জাম—(সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান) হুজুর—

হায়—আর সকলে কোথায় ?

জামা—(যোড়হস্তে) সকলেই দেউড়িতে হুজুর।

হায়—পাঁচ আদমী যাও, আবুকো পাকড় লাও, আবি লাও।

জামা—যো হুজুর।

[সেলাম করিয়া প্রস্থান]

হায়—দেখা যাক ! ফাঁদ তো পাতলেম ; এখন কি হয়। যদি এতেও বিফল হয়, হবে যা মনে আছে তাই ! (মৃদুস্বরে) সাবেক আমল হলে কোন্ দিন কাজ শেষ করে দিতুম। তা কি বলবো। এখনকার আইন খারাপ ! মনের দুঃখ মনেই রয়ে গেল ; তা যদি এতেও না হয়, তবে—

প্র মো—বোধহয় এইবারেই হবে। আর অন্য চেষ্টা করতে হবে না। এইবারেই হবে।

হায়—কৈ তা হয় ? ক'মাস হলো কত চেষ্টা করিছি, কত হাঁটাহাটি করিছি, কৈ কিছুই তো হয় না। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

প্র মো—অধঃপাতে গেছেন ! আপনাদের পূর্বপুরুষের মতন তেজ থাকলে এত দিন করে হয়ে যেত !

হায়—ওহে, আমাদের তেজ না আছে এমন নয়, আমরা যে কিছু না করতে পারি তাও নয়, তবে সে এক কাল ছিল, এখন ইংরেজী আইন, বিষদাঁত ভাঙ্গা !

প্র মো—সে রোজও এদেশে নাই।

হায়—এক রকম সত্য বটে, আগে আগে আমরা মফস্বলে কত কি করেছি, কার সাধ্য যে মাথা তুলে একটা কথা বলে ? এখন পায় পায় জেলা, পায় পায় মহকুমা, কোণের বউ পর্য্যন্ত আইন-আদালতের খবর রাখে, হাইকোর্টের চাপরাসীরাও ইকুয়িটি আর কমন-ল'র মারপ্যাঁচ বোঝে।

প্র মো—হুজুর যে ফন্দী এঁকেছেন, এতেই সব কাজ সিদ্ধ হবে এখন—

[নেপথ্যে আজান দান, নামাজ পড়িবার পূর্ব্বে কর্ণকুহরে অঙ্গুলী দিয়া উচৈঃস্বর]

"আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর। আশ্‌হাদো আল্‌লা এলাহা ইল্লল্লাহ্, আশ্‌হাদো আল্‌লা এলাহা ইল্লল্লাহ্, আশ্‌হাদো আন্না মোহাম্মা-দুর রাসুলল্লাহ্। আশ্‌হাদো আন্না মোহাম্মা-দুর রাসুল্‌ল্লাহ্। হাইয়া আলাস সালাহ্, হাইয়া আলাস সালাহ্। হাইয়া আল্লাল ফালাহ্। হাইয়া আলাল ফালাহ্। আল্লাহু আকবর, আল্লাহ আকবর। লাএলাহা ইল্লাল্লাহ্।"

হায়—নামাজের সময় হয়েছে, চল নামাজ পড়ে আসি। ততক্ষণে হারামজাদাকে ধরে আন্নক। (গাত্রোত্থান)

[উভয়ের প্রস্থান]

পটক্ষেপণ

নেপথ্যে গান

[রাগিণী সিন্ধু—তাল জৎ]

কুবাসনা যার মনে তার উপাসনা কি ?
মনে এক, মুখে শুধু হরি বলে ফল কি ?
মধুমাখা বোল মুখে, গরল রয়েছে বুকে,
হেন ছদ্মবেশী তার অধর্ম্মেতে ভয় কি ?
সতীর সতীত্বধন হরিবারে কর পণ,
মুখে বিভু-পদে মন, এদের, অন্তকালে হবে কি ?

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

আবুমোল্লার বাহির বাটীর ঘর

(সর্দ্দারগণ-বেষ্টিত দণ্ডায়মান আবুমোল্লা)

আবু—(কাতরস্বরে পাট জড়াইতে জড়াইতে) আপনারা বসুন, চাদরখানা নিয়ে আসি ; মনিব ডেকেছেন, না গিয়ে বাঁচতে পারি ?

জামা—নেওয়াতী রাখ, তোর নেওয়াতী রাখ, মান রাখতে পারিস তো একটু দাঁড়াই। নৈলে চল (গলাধাক্কা)

আবু—(সক্রন্দনে) দোহাই আপনাদের, চাদরখানা আনি। আমি কোমর-খোলাই দিচ্ছি। অপমান করো না।

জামা—রাখ তোর চাদর, দিবি তো দে আগে দে।

আবু—কিঞ্চিৎ কোমর-খোলাই দিচ্ছি।

জামা—দিচ্ছি কি ? ক'টাকা দিবি ? আগে টাকা আন্, তবে বসবো, তোর কথায় বসবো ? তেরা বাত্‌মে বায়ঠেগা ? চল (গলাধাক্কা)—

আবু—দিচ্ছি, এখনি দিচ্ছি।

জামা—আন্ পাঁচজনার কোমর-খোলাই পাঁচ টাকা আন্, বসছি। তা না দিস্, ঘাড়ে হাত দিয়ে কান মলতে মলতে কাছারিমুখো কর্‌বো। (ঘাড়ধারণ।)

আবু—দোহাই খাঁ সাহেবরা, আমায় বে-ইজ্জত করবেন না, আমি কোমর-খোলাই টাকা দিচ্ছি।

জামা—টাকা দিচ্ছি তো কত বারই বললি, টাকা আন না।

আবু—আমি নিতান্ত গরীব। (কোঁচার মুড়া হইতে এক টাকা ও কাছার মুড়া হইতে এক টাকা, এই টাকা লইয়া) আপনাদের পান খাবার জন্য এই ছুটি টাকা।

জামা—(মোল্লার হাতে সজোরে আঘাত করিয়া টাকা ভূমিতে নিক্ষেপ) বেটা কি টাকা দেনে-আলা! আমরা ভিক্ষে কবতে এসেছি? ছুটো টাকা নেব? চল (ঘাড়ে হাত দিয়া পাক দেওন এবং পৃষ্ঠে চার-পাঁচটা মুষ্ট্যাঘাত)।

আবু—দোহাই পেয়াদা সাহেব, আমি তাই দিচ্ছি, তাই দিচ্ছি।

[নেপথ্যে (অন্তবাল হইতে স্ত্রীলোকের হাতে তিনটি টাকা) ন্যাও আর কি করবে, যা কপালে ছিল তাই হলো।]

আবু—(হাত বাড়াইয়া ক্ষণকাল পরে) নেন, এই পাঁচটি টাকাই নেন।

জামা—(টাকা হাতে করিয়া উপবেশন ও সঙ্গীগণের প্রতি) বসো হে বসো।

আবু—(তামাক সাজিতে সাজিতে) আমি তো কোন অপরাধ করিনি; তবে জুলুম কেন? (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) সকলই আমার নসিবের দোষ, আমি কোন কথার মধ্যে যাইনে, কোন হের-ফের বুঝিনে, (টিকায় ফুঁ দেওন) কেউ চড়া কথা বললে কি দু'ঘা মাল্লেও পিঠে সই। দোষ কল্লেই সাজা হয়, তবে যখন সাচ্চা আছি—তখন—সকলি নসিবের—(ডাবা হুকায় কলিকা চড়াইয়া দান) একালে যে যত সোজা থাকে তার পাছে কাঠি দিতে কেউ রেয়াত করে না। আমি ভাল জানিনে, মন্দ জানিনে, আমার উপর পাঁচজন প্যায়দা! বাবা! কাকের উপর কামানের আওয়াজ! (গাত্রোত্থান ও যোড় করিয়া পশ্চিমদিকে ফিরিয়া) এ আল্লা, তুই জানিস্ আমি কোন মন্দ করিনি, হাকিমের বা কি করেছি যে হক না-হক মাচ্ছেন? মাটির হাকিমের কুনজরে পল্লে কি আর বাঁচা যায়? কথায় বলে, "রাজা বাদী, উত্তর নাদি!" আপনারা বসুন, আমি চাদরখানা নিয়ে আসি।

জামা—না, তা কখনই হবে না—এই ভাবেই কাছারি নে' যাব। যেমন আছে তেমনি চল, হুকুমমত কাজ করতে হয়। এ তো তোমার আমার ঘরাও কথা নয়, হুজুরের যে রাগ তাতে যে কি হবে তা খোদা জানেন আর তিনি জানেন।

আবু—এমন ঘাট আমি কি করেছি? আপনারা কিছু শুনেছেন?

জামা—আমরা আর কি শুনবো? গেলেই শুনবে, চলো।

(সকলের গাত্রোত্থান)

আবু—তবে চল, কপালে যা থাকে তাই হবে!

[সকলের প্রস্থান]

পটক্ষেপন

(নেপথ্যে গান)

[রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল আড়া ঠেকা]

সুখী বলে কোন জন?
অধীনতাপাশে বাঁধা যাদেরি চরণ ॥
ক্ষমতা হোলো না আর করি পদ অগ্রসর
দেখে আসি একবার, প্রেয়সী-বদন ॥
দু'জন দু'হাত ধরে, লয়ে যায় জোর করে
কেহ মিছে রোষ ভরে, মারে অকারণ।
দেখিলে চক্ষের পরে কেমন প্রভুত্ব করে
আনিতে দিলা না মোরে আমারি বসন ॥

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

হায়ওয়ান আলীর বৈঠকখানা।

(হায়ওয়ান আলীর মোসাহেবদের সহিত তাস-ক্রীড়া। হায়ওয়ান আলী ও প্রথম মোসাহেব একদিকে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মোসাহেব অপর দিকে।)

হায়—(তাস দেখিতে দেখিতে) রিস্তি নাই?

দ্বি মো—কি বড়?

হায়—বিবি বড়!

দ্বি মো—প্রত্যেক হাতেই যে বিবি বড ? আপনার নিকটে বিবির বড় বাড়াবাড়ি দেখতে পাচ্ছি ! বিবি যে আর ছাডে না !

হায়—বিবি ছাডে বৈ কি, সাহেবই ছাডে না ! খেল না। দেখুন দেখি সেই বিবির জন্যে কতখানা হয়ে যাচ্ছে, কৈ একবারও সাহেবের পানে ফিরেও তাকায় না ! বঙের দশ আমার।

দ্বি মো—আপনি তাকে যথার্থ ভালবেসে থাকেন, সেও ভালবাসবে ; এ তো চিরকালই আছে, মনে মনে যে যাকে ভালবাসে সেও তাকে ভালবাসে।

হায়—সে যথার্থ, কিন্তু আমার ভাই কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। যাব জন্য একেবারে আহার-নিদ্রা ত্যাগ, পূর্ব্ব যে বড় ভালবাসার ছিল, তাকেও আর দেখতে ইচ্ছে করে না। বলবো কি, জীয়ন্তে মবার যাতনা ভোগ কর্চ্ছি। অদৃষ্টের এমন দোষ যে সে আমার নামও শুনতে পারে না ! কাবার বিস্তি !

দ্বি মো—(তৃতীয় মোসাহেবের প্রতি) দেখে খেল হে, দেখে খেল ! গোচ বড় ভাল নয় !

প্র মো—কাবার ইস্তক।

দ্বি মো—তবে ঠ'কৃলেম।

তৃ মো—কাজেই, ওঁদের পডতা পডেছে, পড়তা প'লে এই হয়। (গান) 'পডতা ছিল ভাল যখন, ফি হাতে হন্দর তখন, মেরে তাস করিতাম হত লো।' এই টেক্কা, হাতের পাঁচ আমার।

হায়—হাতের পাঁচ নিলে কি হবে, ওদিগে যে চা'র কুড়ি সাত দেখাতে হবে। আব এই বারেই পঞ্জা (প্রথম মোসাহেবের প্রতি) ওহে একখানা কাগজ ধব (তাস একত্রে করিয়া সম্মুখে ধারণ) কাটুন দেখি।

দ্বি মো—(হস্ত বাডাইয়া) এই নিন গোলাম কেটেছি, আর পাল্লেম না, গোলামেই সব হবে।

হায়—কি হবে ? এত ভয় কেন ?

দ্বি মো—আবার ভয় কেন ? সব হবে—গোলামেই সব হবে।

হায়—ওহে ! আমরা সাধে জিতছি, আমাদের যাত্রা ভাল ; ওদিগের খবর শুনেছ তো ?

দ্বি মো—কতক কতক ! কৈ এতক্ষণও যে আনছে না ? বোধহয় পালিয়েছে।

হায়—পালাবে কোথায় ? একটু বসো না, এখনি দেখতে পাবে।

তৃ মো—দেখবে, এই দেখ (তাস নিক্ষেপ) হুক্কর হয়েছে।

হায়—এমন সময় এমন কাজ কল্লে? হাতে না তুলতেই হুক্কর—

প্র মো—(দূরে সর্দ্দারগণকে দেখিয়া)—ঐ আবুকে আনছে।

হায়—চুপ কর, ওদিকে তাকিও না—এইবারে খেলাটা হয়ে যাক।

(সর্দ্দারগণ-বেষ্টিত আবুর প্রবেশ)

আবু—(সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান।

জামা—হুজুর! আবু হাজির।

হায়—কাঁহা হ্যায়? পঞ্চাশ! (হেট মুখে সক্রোধে) আরে আবু! তুই জানিস আমি তোর সব কর্ত্তে পারি? তোর ভিটেয় ঘুঘু চরাতে পারি?

আবু—(ভয়কাতর স্বরে) হুজুর। আপনি সব কর্ত্তে পারেন; আপনি রাজা; জানজাহানের মালিক; মাল্লেও মারতে পারেন; রাখলেও রাখতে পারেন!

হায়—তোর এতদূর আস্পর্দ্ধা? আমার সঙ্গে অ-কৌশল? তুই ভেবেছিস কি? আমি তোকে সোজা কর্ব্বই কর্ব্ব! কাবার পঞ্চাশ—জামাল! হারামজাদাসে পঁচাশ-রোপেয়া, জ'ববানা আদা কর!

জামা—যো হুকুম!

আবু—(যোড়করে) হুজুর! আমি কি ঘাট করেছি?

হায়—চোপরাও হারামজাদা! আবতাক্ হামরা সাম্‌নে মুখোলকে বাৎ কাহতাহায়! আভি লে যাও! লে যাও! (ক্রোধে উচ্চৈস্বরে) ঘন্টে কা দারমিয়ান রোপেয়া আদা কর।

জামা—(মোল্লার হাত ধরিয়া টান) চল!

মোল্লা—খোদাবন্দ! আমায় মাপ করুন।

হায়—মাপ ক্যা, অ্যা মাপ হ্যায় নাই! জামাল! ওকে চোদ্দ পোয়া করে মাথায় ইট চাপিয়ে দে', তা না হলে ও ন্যাকা কখনও টাকা দেবে না!

জামা—(চোদ্দ পোয়া করন)

আবু—খাঁ সাহেব, আমার মাথায় ইটই দিন আর আমাকে কবরেই দেন, আমায় দিয়ে এত টাকা হবে না। বাড়ি-ঘর ছেড়ে দিলুম, বেচে নিন!

হায়—হারামজাদা! আমি তোর ঘর বেচবো! তুই যেখান থেকে পারিস টাকা

এনে দে। (সর্দ্দারগণের প্রতি) আরে তোরা এখনও ওর মাথায় ইট দিলিনি !

[একজন সর্দ্দারের প্রস্থান]

আবু—হুজুর ! আমি বড় গরীব, কুপুষ্যি গলায়, বিষয়-আশয় হুজুরের অজানা কি ? এত টাকা কোত্থেকে জোটাই ? দোহাই খোদাবন্দ ! মাপ করুন !

প্র মো—কেন ? তোমার কুপুষ্যি এমন কে ?

দ্বি মো—আরে জান না, ছোটলোকের ঘরে যার একটু সুন্দরী বিবি তার এক পুষ্যিতেই একশ' ! নিত্যি নতুন ফরমাস—নিত্যি নতুন আবদার !

প্র মো—ওর বিবি বুঝি খুব খুপসুরৎ ?

দ্বি মো—উরির মধ্যে।

হায়—তবে অবশ্যি টাকা দিতে পার্ব্বে। তার গয়নাই থাক, নগদই থাক, আর যার কাছে থেকেই হোক, টাকার তার অভাব কি (ইট লইয়া সর্দ্দারের প্রবেশ) দে ওর মাথায় চাপিয়ে দে।

(সর্দ্দার কর্ত্তৃক আবুর মাথায় ইট দেওন)

আবু—দোহাই সাহেব ! আর সয় না, আমায় ছেড়ে দিন, আমি বাড়ি গে, ঘটি-বাটি যা থাকে বেচে এনে দিচ্ছি ! হুজুর ! কপালে যা ছিল, তাই হোলো ! আমার কোন পুরুষেও এমন অপমান হইনি ! এর চেয়ে মরণই ভাল !

হায়—চোপরাও, চোপরাও। (মোসাহেবগণ প্রতি) কি বল আর খেলবে ? না আর কাজ নেই ! (চতুর্থ মোসাহেবের প্রতি) আপনি একটা কথা শুনে যান।

চ মো—(নিকটে গিয়া) বলুন ?

হায়—(কানে কানে প্রকাশ) এখনই যান, আর বিলম্ব করবেন না ! গিয়েই পাঠিয়ে দেবেন !

চ মো—যাচ্ছি !

হায়—যদি সুখবর আনতে পারেন তবে গাল ভরে চিনি দেব !

আবু—(চতুর্থ মোসাহেবের প্রতি—চুপে চুপে) কর্ত্তা ! আমার জন্যে একটু—আমি আপনারে (পাঁচ অঙ্গুলি প্রদর্শন) দেব !

চ মো—(হায়ওয়ান আলার নিকট যাইয়া চুপি চুপি) আবু কি ততক্ষণ ঐ অবস্থায় থাকবে ? ও অবস্থায় রাখা আমার বিবেচনা হয় না !

হায়—(মৃদুস্বরে) আচ্ছা, আপনি ওর জন্যে উপরোধ করুন, আপনার আসা পর্য্যন্ত বসিয়ে রাখা হুকুম দিচ্ছি !

চ মো—(প্রকাশ্যে) দেখুন হুজুর! আবু আপনারই প্রজা, ওর ক্ষমতা কি যে আপনার অবাধ্য হয়? এখানে ওকে এ প্রকার কষ্ট দিলে তো টাকা পয়সা আদায় হবে না! জামিন নিয়ে ছেড়ে দিন, টাকার যোগাড় করে নিয়ে আসুক।

হায়—তা হবে না, আমি ওকে ছেড়ে দিতে পারি না। তবে আপনি বলেছেন, এ অবস্থায় না রেখে সন্ধ্যা পৰ্য্যন্ত দেউড়িতে কয়েদ থাকুক! সন্ধ্যার পর টাকা না দেয়, যা মনে আছে তাই করবো; তখন আর কারও উপরোধ শুনবো না।

চ মো—আপনি সব করতে পারেন। আমার কথায় যে এই কল্লেন এতেই কৃতার্থ হলেম!

(প্রস্থান)

হায়—জামাল! আবুকে সন্ধ্যা পৰ্য্যন্ত বসিয়ে রাখ। সন্ধ্যার পর টাকা না দেয়, যা করতে হয় করবো। এখন দেউড়িতে নে যা।

(জামাল, আবু মোল্লা ও সর্দ্দারগণের প্রস্থান)

দ্বি মো—আমি এ ঠার ঠোর কিছুই বুঝতে পারছি না।

"সীতা নাড়ে অঙ্গুলী, বানরে নাড়ে মাথা

বুঝিতে না পারি নরবানরের কথা।"

হায়—বুঝবে কি, আজও যে গাল টিপলে দুধ পড়ে!

দ্বি মো—দুধ পড়ে তাতে ক্ষতি নেই, হুজুর কিন্তু বুঝে চলবেন, শেষে চক্ষের জল না পড়ে! তখন আর ঠারেঠোরে বলা চলবে না। "ঠারে ঠোরে উনিশ বিশ দাদার কড়ি"—প্যাচ ঘটাতে সকলে পারে কিন্তু ম্যাও ধরবার বেলায় কেউ নেই!

হায়—(মুখের উপর হাত নাড়া দিয়া) অধিকারী মশায় চুপ করুন, আপনার আর ছড়া কাটতে হবে না।

দ্বি মো—চুপ কল্লেম বটে, কিন্তু আমার ভাল বোধ হচ্চে না। যাই করুন, আগে পাছে বিবেচনা করে করবেন।

হায়—সেজন্য আপনাকে বড় ভাবতে হবে না। আমি আপনার চেয়ে ভাল বুঝি—চল, আড্ডায় যাওয়া যাক!

দ্বি মো—গুলিতে যে হাড় কালি হয়ে চললো!

হায়—চুপ কর হে চুপ কর; বেশী ব'কো না, মাথা ঘুরবে!

(সকলের প্রস্থান)

পটাক্ষেপণ

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

আবু মোল্লার অন্দর-বাড়ি

(নূরন্নাহার ও আমিরণ আসীনা)

আমি—(কাঁথা সেলাই করিতে করিতে) আর কাঁদলে কি হবে। জমীদারের হাত কখনও এড়াতে পারবে না, টাকা দিতেই হবে।

নূর—পঞ্চাশ টাকা কোথায় পাব ? আজ যে করে প্যাদার কোমর-খোলাই পাঁচ টাকা দিয়েছি তা আর কি বলবো। আর একটি পয়সারও ফিকির নাই, জিনিসপত্র ঘর কয়েকখানা বেচলে কিছু টাকা হতে পারে। তা এ অবস্থায় কে-ই বা কিনতে সাহস করে ? টাকা না দিলেও তো রক্ষা নাই। আমি কি করবো ? এত টাকা কোথায় পাব ? তিনি কাছারিতে আটক রইলেন, আমি মেয়েমানুষ কোথা থেকে এত টাকা দেবো ? গরীব বলেও কি তার দয়া হলো না ? পঞ্চাশ টাকা একসাথে তো আমরা চক্ষেও দেখিনি। আজ আর কোথা হতে দেব।

আমি—না দিয়ে কি আর বাঁচবে ? জরিমানা না দিয়ে যে অন্য কোনো হাকিমের মাটিতে পালাবে, মনের কোণেও সে কথা ঠাঁই দিয়ো না !

নূর—পালাব ! সে তো পরের কথা, রাত্রে যে তাঁকে কত কষ্ট দেবে, কত মারই মারবে, কত রাতই যে খাড়া করবে, আমার সেই কথাই মনে পড়ছে ! তাঁর হাতে একটি পয়সাও নেই (রোদন)। টাকার জন্য তাকে মেরে মেরে একেবারে খুন করে ফেলবে।

আমি—মাটির হাকিমে মেরে ফেললে তুমি কি করবে ? তাঁর নামে তো আর সাহেবদের কাছে নালিশ করতে পারবে না ? নালিশ কল্লে এই হবে, একদিন তোমার ভিটেয় পুকুর করে দেবে। জমীদারের সঙ্গে কার কথা, সে কি না করতে পারে !

নূর—পারেন বলে কি একেবারে মেরে ফেলবেন ? এই কি জমীদারের বিচের ? জমীদার বাপের সমান, কোথায় প্রজার ধন-প্রাণ-মান রক্ষা করবেন, ওমা তা গেলো মাটি চাপা ! উল্টে দিনে ডাকাতি !

আমি—চুপ কর চুপ কর, ঐ কৃষ্ণমণি আসছে। যদি কিছু ওর কানে গে থাকে, তবে এখনই বলে দেবে। মা গো, ওতো সামান্যি মেয়ে নয়!

নূর—তাই তো, ও আবার আসছে কেন? ওকে দেখলেই যে আমার প্রাণ উড়ে যায়!

(ঝোলা কক্ষে, ঘটি হস্তে কৃষ্ণমণির প্রবেশ)

কৃষ্ণ—"জয় রাধে কৃষ্ণ বল মন!"—মা ভিক্ষে দেও গো! ওমা, তোমায় আজ এমন দেখছি কেন গো? কেঁদে কেঁদে দুটো চোখ যে একেবারে রাঙা করেছ, ওমা, এ কি গো?

আমি—ও মরে গেছে, ও কি আর আছে! মোল্লাকে যে কাচারি ধরে নে গেছে, তুমি শোননি?

কৃষ্ণ—তুই চক্ষের মাথা খাই মা! আমি কিছুই শুনিনি! ধরে নিয়ে গেছে, সে কি? কেন, আবু তো দোষ করবার লোক নয়।

আমি—শুধু ধরে নিয়ে গেছে! ধরে নিয়ে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হেঁকেছে; আরও কত অপমান কচ্ছে, টাকার জন্য মাথায় ইট দিয়ে খাড়া করে নাকি রেখেছে! এদের তো ঘর কুড়ুলে পাঁচটা পয়সা বেরোবে না; এত টাকা কোথায় পাবে? এই কি হাকিমের বিচার?

কৃষ্ণ—(কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) আহা-হা, এত করেছে? হা কৃষ্ণ! কি করবে বাছা! জমীদার দণ্ড করলে আর বাঁচবার উপায় নেই! টাকা দিতেই হবে—জমীদার টাকা নেবার জন্যে ধল্লে আর এড়ান নেই। তবে একে ভয়ও করতে হয়—তার কথা শুনতে হয়, জমীদার আস্ত বাঘ।

নূর—দুর্জ্জনকে সকলেই ভয় করে! এই কি তাঁর বিবেচনা? আমাদের দিন চলাই দায়, কোন কোন দিন উপোস করেও কাটাতে হয়, এতে যে বিনি দোষে এত টাকা জরিমানা কল্লেন, কোত্থেকে দেব? ঘরদোর ঘটিবাটি বেচলেও তো পঞ্চাশ টাকার অর্দ্ধেক হয় না। দেখ দেখি বাছা, এ তাঁর কেমন বিচার? হাকিমে এমন করে বিচারে মাল্লে আর কার কাছে দাঁড়াব? এরপর যদি হাকিমের পর হাকিম থাকতো, তবে এর বিচের হতো!

কৃষ্ণ—ও মা! হাকিম থাকলে করতে কি? জমীদারের হাত কদিন এড়াবে? হাকিম তো আর সকল সময় কাছে বসে থাকবেন না! জমীদার যখন মনে

করবে তখন ধরে নিয়ে জরিবানার টাকা আদায় করবে।—মা! বেলা গেলো আর থাকতে পারিনে, একমুঠো ভিক্ষে দাও, যাই, আর কি করবে মা! (দীর্ঘশ্বাস)

নূর—(ভিক্ষা আনিতে গমন)

কৃষ্ণ—(পশ্চাৎ যাইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান)

নূর—(ভিক্ষা লইয়া ভিখারিনীর ঘটিতে দান)

কৃষ্ণ—(ভিক্ষা লইতে লইতে) চুপে চুপে শুন মা! জমীদারের হাত এড়াতে পারবে না, আমি শুনেছি তোমার জন্য একেবারে পাগল। দেখ না, একমাস হলো তোমার পাছেই নেগে আছে, তুমি মনে করলেই সব মিটে যায়।

নূর—(সক্রন্দনে) আমি আবার কি মনে করবো!

কৃষ্ণ—আর এমন কিছু নয়, আজ রাত্রে যদি তাঁর বৈঠকখানায় যেতে পার, তা হলে যত রাগ দেখছো একেবারে জল হয়ে যাবে। তুমি উল্টে আবার তার ডবল ঘরে আনতে পারবে!

নূর—আমি বৈঠকখানায় যাবো মাসি? (চক্ষে অঞ্চল দিয়া) এতকাল পরে তুমি আমায় এই কথা বল্লে? তাঁর কি এমন কর্ম্ম করা উচিত? অধীনে আছি বলেই কি এমন অধর্ম্মের কাজ করবে? এই কি তার ধর্ম্ম?—এ বড় দারুণ কথা, আমা হতে এমন কর্ম্ম হবে না! তিনি যা করুন, তা করুন, প্রাণ থাকতে আমা হতে এমন কুকাজ হবে না—আমি বৈঠকখানায় কখনও যেতে পারবো না। যদি বড় পেড়াপীড়ি হয় তবে এই রাত্রেই গলায় দড়ি দিয়ে মরবো।

কৃষ্ণ—(জিভ কাটিয়া) সেও তো ভদ্রসন্তান, তায় আবার জমীদার, এ কথা কে শুনবে? কেউ জানতে পারবে না। জানলেও কার দুটো মাথা এ কথা মুখে আনে মা! তুমি রাজার রাজরানীর মত সুখে থাকবে! দেখ, জমীদার, সে কি-না করতে পারে? তোমায় ধরে নিয়ে যেতেও তার ক্ষ্যামতা আছে; জোরবান কল্লেও তো করতে পারে। সে যখন পণ করেছে তখন ছাড়বে না! তবে কেন অপমানে কুল মজাবে? মান থাকতে আগেই তার কাছে গিয়ে কাতর হয়ে পড়, আদর পাবে। তিনি যা বলেন, তাইতে রাজী হওগে মা! তুমিই যে একা এ কাজ করছো তা তো নয়, জমীদারের নজরে পড়ে কত কোণের বৌ পর্য্যন্ত এ কাজ করেছে! চৌধুরীদের কথা

শোননি? ওমা! তারা আস্ত ডাকাত! পাড়া-পড়সী, জগত-কুটুম, পর্জার-ঘর কাউকেও ছাড়েনি! যার উপর নজর করেছে তারির মাথা খেয়েছে! কৈ কে তার কি করেছে? যে তার অবাধ্য হয়েছে তার ভিটে-মাটিতে একেবারে উলকুড উঠিয়ে দিয়েছে! মা, আমি তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, মানে মানে থাকাই ভাল, শেষে মানও যাবে আর জানতেও পাচ্ছো—বুঝেছ—

নূর—বুঝেছি সব, কিন্তু সে কাজ আমি পারবো না, জান থাকতে তো নয়,! আগে আমায় খুন করুন, তারপর যা ইচ্ছে তাই করবেন। (ঘৃণা ও বিরক্তির দৃষ্টিতে শশব্যস্ত গমনোদ্যতা)।

কৃষ্ণ—দাঁড়াও না শু—

নূর—আমি শুনবো না (আমিরণের নিকট গমন)।

কৃষ্ণ—শুনলে না শুনলে না! আচ্ছা, যাই আগে, খাঁ সাহেবের কাছে এই সতীপনার যা শুনাতে হয় তা হবে অকন। শেষে জানতে পাবে আমি কেমন 'কৃষ্ণমনি।'

(সক্রোধে প্রস্থান)

আমি—কৃষ্ণমণি হাত মুখ নেড়ে কি বলছিল বউ?

নূর—তোমার আর শুনে কাজ নেই। সে কথা আর মুখে আর আনবো না। ছি, ছি, বড় মানুষের এই আচরণ!

আমি—কি কথা, বল না শুনি?

নূর—তবে শোন। (কানে কানে প্রকাশ)

আমি—(গালে হাত দিয়া) এমন! তা হবেই তো; ওরা ছাগলের জাত।—পজ্জন্ত পার পায় না! তুমি আমি তো ছার কথা। বলতেও লজ্জা করে বন; শুনতেও লজ্জা! ওদের মেয়েমানুষ দেখলেই চোখ টাটায়. জমীদার হলেই প্রায় একখুরে মাথা মুড়নো! কেউ চিরকাল বাইরে বাইরে কাটাচ্ছেন, ঘরের খবর চাকরেরাই জানে। যেখানে যান সেইখানেই মরেন, একদিনের জন্যও ছেড়ে থাকতে পারেন না! বাঈ! বাঈ! বাঈ! বাঈ বই দুনিয়াতে তাঁদের যেন আর কেউ নাই! এঁরাই আবার বড়লোক। সাহেবদের কাছে বসতে পান, কত খাতির হয়, তাতেই আবার ন্যাজ ফুলে ফুলে ওঠে! সৎকাজের বেলায় এক পয়সা মা-বাপ! কিন্তু ওদিকে কল্পতরু! চুল পেকেছে,

দাঁত পড়েছে, মুখের চামড়া ঢিল হয়েছে, কিন্তু সক এমনি দাঁতপড়া বাঘের মতন এখনও জিভ লক্‌লক্ করে ! সেই বাজারে মেয়েগুনো এসে কত লাঞ্ছনা দিয়ে যায়, তবু লজ্জা নাই ! কিছুদিন খাবার পরবার লোভে থেকে বেশ দশ টাকা হাত করে মুখে চুনকালি দিয়ে চলে যায়, আবার বেদিনী যুগিনী, চাড়ালনী, কলুনী, চারজাতের চারজনকে নিয়ে কেউ কেউ বুড়ো বয়সে রঙ্গ কোরছেন, কেউ ঘরের বাইরে রঙ্গিণী নে উন্মত্ত ; কেউ ঘরের দিব্বি স্ত্রী ফেলে পাড়াতেই কাল কাটালেন ! তা বোন, এদেশের জমীদারদের অনেকের দশাই তো এই ! তা বলে আর কি করবে বল ? যে গতিকে পারে তোমার মাথা খাবেই খাবে ! তা এখন চল, ওদিকে—

নূর— ওদিকে আর তুমি কি বলবে ভাই (দীর্ঘনিশ্বাস) আমি আজ বুঝেছি। আজ মাসাবধি লোকের দ্বারায় কত রকমের কথার ঠারে কত লোভ দেখাচ্ছে ! খাঁ সাহেবও বিকেলে সন্ধ্যার পর পর মিছিমিছি শিকারের ছুতো করে বাড়ির আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ! আমি আজ সকলি বুঝেছি ! আমি যা যা বলেছি বোধ হয় কৃষ্ণমণি তা'র দ্বিগুণ বাড়িয়ে বলবে, আমার কি হবে ? আমি কোথায় পালাব ? এখন যদি আমাকে ধরে নিয়ে যায় তবে আমার কি দশা হবে ? কার কাছে গে এ বিপদ থেকে রক্ষা পাব ? এমন কি কেউ নেই ?

পটক্ষেপণ

(নেপথ্যে গান)

(রাগিণী রাগশ্রী—তাল আড়াঠেকা)

আর কে আছে আমার

এ দুঃখ-পাথারে কে বা হবে কর্ণধার ?

যে তরিবে এ দুস্তারে, নিজে সে ভাসে পাথারে,

না হেরি সে প্রাণেশ্বরে, ঝুরি অনিবার।

আমারি, আমারি লাগি প্রাণকান্ত দুঃখভাগী

বিপক্ষ হোলো বিরাগী, না দেখি নিস্তার।

শুনেছি ভারতেশ্বরী, দুষ্টজন-দণ্ডকারী

তবে মাগো কেন হেরি, হেন অবিচার ?

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

গুলির আড্ডা

(হায়ওয়ান আলী, মোসাহেব চারজন এবং একজন গুলিখোর আসীন)

হায়— ওহে বসো বসো, কেবলই টানছো, দু-একটা গল্প চলুক !

তৃ মো—হুজুর ! গৌরী নদীর পুল বেঁধেছে—

প্র মো—বেঁধেছে বটে, তার ওপরে কলের গাড়িও চলেছে বটে, কিন্তু—

তৃ মো—(সক্রোধে) কিন্তু আবার কি ?

প্র মো—(মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) সে পুল টেকবে না ; দুমাস পরেই হোক, আর ছমাস পরেই হোক, ভেঙ্গে পড়বেই পড়বে। যত বেটারা গাড়ির মধ্যে থেকে উঁকি মেরে হাত নাড়া দিয়ে চলে যায়, তারা গৌরীর জল খাবেই খাবে ! গৌরী তাদের খাবেনই খাবেন।

হায়—না হে না, ভাঙ্গবে না। শুনিছি ভাবি ভাবি লোহার থাম পুতেছে।

প্র মো—হুজুর থাম পুতলে কি হবে ? ওদিকে যে গোড়া নড়বড়ে—

হায়—নড়বড়ে, কি রকম ?

প্র মো—শুনেছি পদ্মার কাছে গৌরী গিয়ে নালিশ করেছিল যে পুলের ভার আর সইতে পারিনে, তাতে পদ্মা বলেছেন যে লেসলী সাহেব পুল বেঁদে বেলাতমুখো হন, আমি একদিন ভেঙ্গেচুরে একেবারে কুমারখালি গিয়ে ধর্বো !

হায়—এ তো শুনলেম ! জোৎদার বেটারা খ্রীষ্টান হবে বলে পাদরী সাহেবের কাছে পড়েছিল, তার কি হয়েছে।

প্র মো—হুজুর, খ্রীষ্টান হওয়া মিছিমিছি। খ্রীষ্টান হওয়া ওদের কাজ নয়, তবে যে গিয়েছিল, সে কোন কাজ পাবার লোভে ! ওদের দলের যিনি কর্তা তাঁর কোন মতেই বিশ্বাস নাই। আসলে যদি ধরেন, তবে তারা সেই এক রকমের লোক ! ভালমানুষ হোলে স্বভাব চরিত্র ওরকম হোত না। দেখতে সেই লাঙল-ঘাড়ে চাষাদের মতো দেখায় ! মুসলমানের আবার আচার-ব্যাভার ? ধর্ম্ম কিছুই নাই বলতে কি, তারা কোরান কেতাব কিছুই মানে না। কোনো বিদ্যার ধার ধারে না, কেবল বড়াই করে বাড়ির ভেতরে মেয়েদের সামনে অপরের নিন্দা কর্ত্তে মজবুদ।

হায়—আমি জানি ওদের দলের যিনি কর্ত্তা তিনি সকল বিষয়েই কর্ত্তা।

প্র মো—হুজুর! কুঠির কর্ত্তা একবার কর্ত্তার বড়কর্ত্তামী বার করেছিলেন। মাথায় ইট চাপানো পর্যন্ত বাকি ছিল না। ওরা—

"যখন দেখে আঁটাআঁটি
তখন কেঁদেকেটে ভিজায় মাটি।"

তারপর অমনি চোখ উল্টে বলে ফেলে, তো-তো-তো তোমি কেডা হে?

হায়—সে কথা থাক, আন্দ বিশ্বাসের মকদ্দমার কি হলো?

প্র মো—সে কথা আর কি বলবো? কলিকালে সকলেই গেলো। রমজানের চাঁদে রোজা রেখে মস্ত মস্ত কাঁচা-পাকা দাড়িওয়ালা সাহেবেরা তসবি টিপতে টিপতে হলফ করে হাকিমের সামনে মিছে কথা কইলেন, শুনে অবাক হয়েছি, যে এ বাবাজিদের অসাধ্য কিছু নেই।

হায়—তা তো কইলেন, তারপর?

প্র মো—(ঈষৎ হাস্য করিয়া) এখন যেমন আইন, তেমনি আদালত, টাকার জোরে কিনা হয়? ডিসমিস হয়েছে!

হায়—বেশ হয়েছে! ভদ্রলোকের জাত বাঁচলো। শুনেছিলাম এ মোকদ্দমায় বড় যোগাড় হোয়েছিল।

প্র মো—যোগাড় কল্লে কি হবে। অমন বিচক্ষণ হাকিমকে কি কেউ ঠকাতে পারে? হুজুর, আর-এক কথা শুনেছেন? হিঁদুদের নিকে হোচ্ছে!

হায়—শুনেছি। আমাদের সঙ্গে কি হিঁদুর মেয়ের নিকে হতে পারে না? না বাবা? তার কাজ নেই, পাবনায় সেদিন রাড় কনে আর তার বরকে বাসরঘরেই পাড়ার হিন্দুরা জুটে পুড়িয়ে ফেলছিল, ভাগ্যিস হারিশ ডাক্তার ছিল তাই রক্ষে হোলো। তবে—তবে তো বাবা! একেবারে আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে।

প্র মো—সে কথা যাক, এদিগ্যের কি হোলো?

হায়—আজ যে যোগাড় করেছি তা তো শুনিইছ!

প্র মো—হুজুর আমি শুনেছি সে নাকি গর্ভবতী আছে।

হায়—না হে না, সে কোন কাজের কথা নয়, ও কথা শুনলেম না, আমি কালও দেখেছি, ওসব ভো কথা! আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে মিছিমিছি একটা

রটনা কচ্ছে, আমি তাতেই প্রায় ভুলে গেলাম আর কি। এ কি ছেলের হাতের পিঠে।

প্র মো—(হেঁট মুখে) আপনি দেখেছেন, তাতে কোন কথাই নেই, কিন্তু আমি যেন শুনেছিলাম, যে সত্য সত্যই গর্ভবতী।

হায়—হোক, তায় ক্ষতি কি ?

(চতুর্থ মোসাহেবের প্রবেশ)

হায—চালাক দাস ? খবর কি ! গালভরে চিনি দেব না দুটো ছিটে টানবে !

চ মো—(কুজ হইয়া আঙ্গুলী নাড়িয়া) ছিটেফোঁটার কাজ নয়, (নিশ্বাস ত্যাগ) সব দফা রফা—

হায়—সে কি ? একেবারেই যে শেষ কল্লে ? ব্যাপারখানা কি ?

চ মো—কোনমতেই না। সে হাত মুখ নেড়ে কত কি বললে। আরো বললে, এদের উপর হাকিম থাকত তাহলে এর শোধ নিতেম। কি আশ্চর্য্য ! মেয়েমানুষের এমন কথা। কৃষ্ণমণি আরও অনেক বললে, সে কথা এখন বলবো না, আর এক সময় শুনতে পাবেন।

হায়—কি ? তার স্বামীকে এনে কানমলা নাকমলা দিচ্ছি, খাড়া করে রেখেছি, আর তার এত বড় আস্পর্দ্ধা ! মেয়েমানুষের এত হেম্মত ! হাকিম দেখায় আমাকে ! তবে এর প্রতিফল এখনই দিচ্ছি। আর বলতে হবে না, আমি সব বুঝতে পেরেছি। আপনি সর্দ্দারদের ডাকুন।

(চতুর্থ মোসাহেবের প্রস্থান)

প্র মো—আপনার উপরে হাকিম দেখাতে চায়, এতদূর বুকের পাটা ! আমি—

হায়—এখনই তারে হাকিম দেখাচ্ছি। বড় সতী হোয়েছে। সতীপনা এখনই মালুম পাওয়া যাবে।

(জামাল, কামাল ও চতুর্থ মোসাহেবের প্রবেশ)

জামা—(সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান)

হায়—দেউড়িতে যত সর্দ্দার আছে সব যাও। মোল্লাকো জরুকো পাকাড় লাও। মোল্লাকে ছেড়ে দাও। আমি মোল্লা চাইনে, নুরন্নেহার চাই।

জামা—হুজুর! আমরা চাকর। যে হুকুম করবেন তামিল করবই! কিন্তু শেষে যেন মারা না যাই!

হায়—তোমাদের কি? এর জন্যে যদি আমার সর্ব্বস্ব যায়, তাও স্বীকার,! নূর-ন্নেহার কেমন সাচ্চা দেখবো! আর বিলম্ব করো না, এখনই যাও, আর সহ্য হয় না! কি? মেয়েমানুষের এত বড় কথা!

জামা—হুজুরের হুকুম, চল্লেম!

(সেলাম পূর্ব্বক জামাল-কামালের প্রস্থান)

হায়—(কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) আর ভাবলে কি হবে, যা অদৃষ্টে থাকে তাই হবে! (তৃতীয় মোসাহেবের প্রতি—) ওহে টান না?

তৃ মো—(গুলি টানিতে আরম্ভ করিল)

গু খো—(আগুন দিতে অগ্রসর)

হায়—শুধু শুধু টান। কেউ গান ধর না—

তৃ মো—আচ্ছা এই ছিটেটা ওড়াই।

গু খো—কর্ত্তা, আমি সারাদিন কিছুই খাইনি!

হায়—কিছুই খাসনি! এই যে এত ছিটে খেলি!

গু খো—কর্ত্তা, না জলটুকুও মুখে দিইনি!

তৃ মো—আচ্ছা এই দুটো পয়সা নে, বাজারে জলপান কিনে খেগে যা! (দুটো পয়সা দান)

(সেলাম পূর্ব্বক গুলিখোরের প্রস্থান)

হায়—একটা গান ধর না।

তৃ মো—আচ্ছা। (মোচে তা দিয়া, একটু চাট খাইয়া) তবে একটা মধ্যমান গাই।

(রাগিণী জঙ্গলা—তাল আড়খেমটা)

যে বলে হয় হাড় কালী সকের ছিটে টানলে পরে
দু'গালে চার চড় লাগাই তার, দেখা পেলে
রাস্তার ধারে।
যে পেয়েছে গুলির মজা, উড়ছে তার নামের ধ্বজা
মনে মনে হয় সে রাজা, যখন আড্ডায় এসে

আড্ডা করে।

দু-চার ছিটে উড়িয়ে দিলে চতুর্বর্গ ফলটি ফলে
নবাবজাদা কাছে এলে, কে আর তারে কেয়ার করে?
নয়ন দুটি বুঁজে, ঢুলি যখন মাথা গুজে
স্বর্গ মর্ত দেখি খুঁজে, তেমন মজা নাই সংসারে!

(প্র মো ব্যতীত সকলের উচ্চস্বরে গান)

প্র মো—এই বুঝি তোমাদের মধ্যমান?

তৃ মো—নয় তবে এটা কি? ভায়া ভারি কলোয়াত।

প্র মো—ওরে তোর মাথা। এটা আড়াখেমটা আর রাগিণী শঙ্করা।

তৃ মো—কে জানে তোর খেমটা, আর কে জানে তোর শঙ্করা।

হায়—(উষ্ণ ভাবে) একটু চুপ কর হে চুপ কর। (উচ্চস্বরে—) ওহে তোমরা কি পাগল হোয়েছ? একটু চুপ কর না। (মোসাহেব পূর্ব্বমত উচ্চরবে তাফ্‌লাক্‌সিন ধিনিতাক)

হায়—(হস্ত দ্বারা বিছানায় আঘাত) চুপ কর না। তোমাদের কাণ্ডজ্ঞান নাই। ওদিকে যে ভয়ানক গোল হচ্ছে। (মোসাহেবগণ নিস্তব্ধ) শুনেছ? বড় গোল হচ্ছে। চল একটু এগিয়ে গিয়ে দেখা যাক।

সকলে—চলুন, আপনি যাবেন, আমরাও যাচ্ছি! (উচ্চৈস্বরে "আল্লা আল্লা" করিয়া) (নেপথ্যে—উচ্চস্বরে—ছোট বিবি মলেম, (সকলের প্রস্থান) আমায় নিয়ে চল্লো, এইবার গেলাম।। দ্বিতীয়বার নেপথ্যে। এগোরে নিয়ে গেলরে, তোরা এগোরে, দোহাই মহারানীর তোরা এগোরে।

পটাক্ষেপণ

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কোশলপুর

হায়ওয়ান আলীর বৈঠকখানা

(মোসাহেবগণ, সর্দ্দারগণ এবং হাওয়ান আলী নূরন্নাহারের হস্ত ধরিয়া দণ্ডায়মান। নূরন্নাহার হেঁট বদনে কম্পিতা)

হায়—কেমন? এখন তো হাতে পড়েছো! এখন আর কে রক্ষা করবে? বাড়িতে বসে বসে যে বলেছিলে, ওর উপরে কি আর হাকিম নেই? কই

কাহাকেও যে দেখতে পাইনে! তোমার সে বাবারা কোথায়? এখন দেখ না! এসে রক্ষা করে না। সতী সতী ক'রে বড় ঢুলে পড়তে! এখন সতীত্ব কোথায় থাকবে? আমার হাতে তো পড়তেই হলো, তবে আর এতো ভিরকুটি কল্লে কেন? আমার ক্ষমতা আছে কি না তাও তো দেখলে? আরও এখনই দেখতে পাবে জান! এতদিন আমার জানকে এত হয়রান করেছো জান! এস তার প্রতিফল দিই।

নূর—(সকরুণে) আপনি সব কর্ত্তে পারেন। আমি আপনার প্রজা, আমি আপনার মেয়ে, আপনি আমার বাপ! জাত মান রক্ষা করতেও আপনি, প্রাণ রক্ষা করতেও আপনি। আমি আপনার মেয়ে, আপনি আমার বাপ! (রোদন) আপনিই আমার জাত কুল রক্ষা কোরবেন!

হায়—এই তো কচ্ছি! (নূরন্নাহারকে টানিয়া লইতে উদ্যত)

নূর—(মাটিতে গড়াইয়া পড়িয়া সরোদনে) আমায় ছেড়ে দিন! গলায় কাপড় দে বলছি আমায় ছেড়ে দিন। আমি আপনার মেয়ে! আপনি আমার বাবা! আমার কাপড় অসামাল হলো, কাপড় পরি, ছেড়ে দিন।

হায়—(রুমাল দ্বারা মুখ বন্ধন করিতে করিতে) কাপড় নেওয়াচ্ছি!

নূর—(গোঙাইতে গোঙাইতে) পায় ধ-রি—আমা—

হায়—(মোসাহেবগণ প্রতি) আপনারা দুইজন হারামজাদীর হাত ধরুন, আমি চুল ধরে টেনে নিচ্ছি!

(তৃতীয় ও চতুর্থ মোসাহেব বেগে হস্তধারণ এবং খাঁ সাহেব কর্ত্তৃক নূরন্নাহারকে ধরে অগ্রসর।)

(প্রস্থান)

দ্বি মো—(ক্ষণচিন্তার পর) হুজুরের যে রাগ দেখতে পাচ্ছি এতে যে কি করে বসেন, তার নিশ্চয়তা কি। কিন্তু এর ভোগ শেষে ভুগতেই হবে!

জামা—দেখুন আমরা চাকর, হুকুম কল্লে আর অতুল কত্তে পারিনে। এ কাজটা বড়ই অন্যায় হোচ্ছে। মোল্লার স্ত্রী গর্ভবতী, তারপর এই জাবরান। এ কাজটা বড় অন্যায় হচ্ছে! কি করি! এর অধীনে থেকে একেবারে সর্ব্বনাশ হবে! এর তো দিগ-বিদিগজ্ঞান কিছুই নাই, ন্যায় হোক, অন্যায় হোক একটা করে বসেন, যে ভাব দেখতে পাচ্ছি, এতে আমাদের জাতকুল

থাকাই ভার। আজ আবু মোল্লার যে দশা হলো, কোনদিন বা আমাদের ওরূপ ঘটে।

(হায়ওয়ান আলীর পুনপ্রবেশ)

হায়—ওহে, তোমরা এখানে কি কচ্ছো? ওদিকে যে—যাও না এমন দিন—!

প্র মো—আচ্ছা যাই।

(প্রস্থান)

হায়—(সর্দ্দারগণ প্রতি) তোমরা আমায় খুশী করছো, আমি মনের মতো খুশী কর্ব্বো।

জামা—হুজুর আমরা হুকুম পেলে কাউকে ভয় করিনে, তবে দেখবেন শেষে যেন একেবারে দম ডুবে না মরি! সময় বড় খারাপ, সাবেক আমল হলে এতো ভাবতেম না।

হায়—তার জন্যে ভয় কি? মকদ্দমা আছে মামলা আছে কবুল! জামাল ওকে কি রকম ধল্লে?

জামা—আমরা ঐ সেই কোটার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলুম! কোনমতে আর ফাঁক পাইনে। অনেকক্ষণ পরে কানে আওয়াজ এলো যে, একটু দাঁড়াও আমি বার থেকে আসি। আবার শুনলুম যাও, চাঁদনির রাত ভয় কি? তারপরই দেখি নূরন্নাহার বাইরে এয়েছে! তখন একবার লাফিয়ে ধরে শূন্যে শূন্যে আনতে লাগলুম! ও কেবল মুখে বল্লে, 'ছোট বিবি মলেম!'...তারপরই আপনি গিয়েছেন। মোল্লাকে যে রকমে তাড়িয়েছি তা তো দেখেছেন! হুজুর, আমরা যেন নষ্ট না হই!

হায়—তোমাদের ভয় কি? টাকার অসাধ্য কি আছে বল দেখি?

জামা—হুজুর! সে যথার্থ, কিন্তু আমরা গরীব, সেইটি যেন মনে থাকে।

হায়—মনের মত বখশিশ করবো।

(প্র মোসাহেবের প্রবেশ)

প্র মো—হুজুর সর্ব্বনাশ হয়েছে।

হায়—কি হলো?

প্র মো—আর কি দেখছেন, নূরন্নাহার কেমন কচ্ছে, বুঝি বাঁচে না।

হায়—বটে (ত্রস্তে উঠিয়া)

প্র মো—তার ভাব দেখে ভাল বোধ হচ্ছে না।

(উভয়ের প্রস্থান)

(এবং জামাল কামাল ব্যতিরেকে অবশিষ্ট সর্দ্দারগণের অপর দিক দিয়া বেগে পলায়ন)

জামা—অদৃষ্টে কি জানি কি হয় ? গতিক বড ভাল বোধ হচ্ছে না। (হায়ওয়ান আলী মোসাহেবগণের সাহায্যে হাত পা ধরিয়া নূরন্নাহারকে লইয়া প্রবেশ)

হায়—(মাটিতে রাখিয়া) যথার্থই কি মরে, না ওর সব মিছে ? ও কিছুই নয়, ও এক কাপ করে রয়েছে !

দ্বি মো—না, না, দেখুন গর্ভবতী যথার্থই ছিল ! ঐ দেখুন তলপেট তোলপাড় কচ্ছে !

হায়—(নিকটে যাইয়া বিস্ময়ে) যথার্থই গর্ভের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে ; তলপেট অতো নড়ে কেন ?

নূর—(মৃদুস্বরে) হা খোদা ! আমার কপালে এই ছিলো ! নারীকুলে জন্ম নিয়ে সতীত্ব রক্ষা করতে পাল্লেম না। হায়, এই জন্যই কি আমার জন্ম হয়েছিলো ! জন্মেই কেন মরে গেলাম না ! তা হলে এত লাঞ্ছনা সইতে হতো না ! কি করি উপায় নাই, এ দুঃখ কাকে জানাব ! এমন সময় প্রাণধন স্বামীর সঙ্গে দেখা হলো না ! মা-বাপের মুখও দেখতে পেলাম না ! প্রতিবেশীরাও আমাকে দেখতে পেলে না ! (দীর্ঘশ্বাস) হা খোদা ! তোর মনে এই ছিল ! জমীদার হয়ে এমন কাজ কল্লে ! ধর্ম্মের দিকে চাইলে না ! এত কষ্ট কি আর প্রাণে সয় ! হায় হায়, এদের দমনকর্ত্তা কি আর কেউ নেই। এদের উপরে কি আর হাকিম নেই ! হায় হায়, জাত গেল, দেশ জুড়ে কলঙ্ক হলো, প্রাণও গেলো, শুধু আমার প্রাণই যে গেল তা নয়। পেটে যে একটা ছিল তারও গেলো। খাঁ সাহেব ! আপনার মনে এই ছিল ? এই কল্লেন ! খোদা আপনার বিচার করবেন ! শুনেছি যে মহারানী সকলের উপরে বড়, সাহেবদের উপরেও বড়। আমরা যেমন তোমার প্রজা, তেমনি তুমিও তার প্রজা। তিনি কি এর বিচার করবেন না ? প্রজার প্রজা বলে কি আর দয়া হবে না ? মা ! তুমি বেলাতে থাক, তোমার প্রজার প্রতি এত দৌরাত্ম্য হচ্ছে তুমি কি জানতে পাচ্ছো না ? কেবল বড় বড় লোকই কি তোমার প্রজা ? আমরা গরীব

বলে কি তুমি আমাদের মা হবে না? মা—আ—মার—আ—মা—সয় না, মা—মা—মা আমি মেয়ে দয়া—কর—তো—পা—য়—(মৃত্যু)

হায়—ওহে, যথার্থ মলো! (নিকটে যাইয়া নাসিকায় হস্ত দিয়া) নিশ্বাস নাই। মরেছে, না ঐ যে তলপেট নড়ছে? কই আর যে নড়ে না। বুঝি পেটের-টাও মলো! (বুকে হাত দিয়া) এখন উপায়?

(প্রথম মোসাহেবের প্রস্থান)

দ্বি মো—আর উপায়। তখনই তো বলেছিলাম যা করবেন আগেপাছে বিবেচনা করে করবেন। এখন তো খুনের দায়ে ঠেকতে হলো!

হায়—চুপ চুপ। খুন খুন কবো না। যা হবার তা হলো, এখন কি কব্রা যায়। অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে, বসে বসে ভাবলে আর কি হবে। রাত থাকতে থাকতেই এর একটা উপায় করা চাই।

দ্বি মো—আমার বুদ্ধিসুদ্ধি কিছুই নাই। আমি একেবারে জ্ঞানশূন্য হয়েছি। যা আপনি ভাল বোঝেন করেন।

হায়—জামাল! তোমার বিবেচনায় কি হয়?

জামা—আপনি যে হুকুম করেন তাই করব। এতে আর আমাদের বিবেচনা কি?

(প্রথম মোসাহেব এবং নিদ্রোত্থিত বেশে সিরাজ আলীর প্রবেশ)

সিরা—আরে পাজি রে! এমন কাজ কল্লি? একেবারে হাবু খাঁর নাম ডুবালি? তোর কি কাণ্ডজ্ঞান নাই? চিরকালই কি তোর এইভাবে গেলো! লক্ষ্মী-ছাড়া আর কি মরবার জায়গা ছিল না? এমন কাজ কি করতে হয়? যত গোঁয়ার একঠাঁই জুটে এই কাজ করছে। এখন মুখে কথা নাই। তোর জন্য সর্ব্বনাশ হবে। পূর্ব্বপুরুষের নাম গেল, তুই কি একেবারে পাগল হয়েছিস? এখন আর কি বলবো? তোরে এ বুদ্ধি কে দিল! (দ্বিতীয় মোসাহেবের প্রতি) এখন মুখে কথা নাই। পাজিরা এখন কেউ নেই। সর্ব্বনাশ কল্লি। লুটে পুটে মজালি! রাগ আর বরদাস্ত হয় না—(দ্বিতীয় মোসাহেবকে মুষ্ট্যাঘাত) তোরাই আমার সর্ব্বনাশ কল্লি। তোদের কুপরামর্শতেই হয়েছে।

দ্বি মো—দোহাই আল্লার! কোরানের কিরে! আপনার গা ছুঁয়ে বলতে

পারি, আমি দফায় দফায় মানা করেছি, এমন কাজ করবেন না। তা কি উনি শুনেন, উনি না একজন!

সিরা—জামাল! তোরাই সর্ব্বনাশ কল্লি! তুই কি এই বদমাইশদের দলে মিশে গেছিস?

জামা—কর্তা, আমি কি আর করবো? হুকুম কল্লে তো আর অতুল করতে পারিনে।

সিরা—আর সকল বেটারা কোথায়?

জামা—সকলেই পালিয়েছে।

সিরা—(উপবেশন এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হেঁটমুখে চিন্তা) হায়! এখন কি হবে? উপায়? বাঁচবার উপায় কি? এখন আর কি সেদিন আছে? এই হাতে কত কাণ্ড করেছি, কতজনের ও কর্ম্ম করেছি, সাবেক কাল হলে আর এত ভাবতে হতো না! পাজিরা শোনেও নাই? আমার বাপজী কুকুর দিয়ে মানুষ খাইয়েছেন! আর আমরাও কত কিং করেছি, এখন যে কেন চুপ করে থাকি তা তো তোরা বুঝবি না।

জামা—তা বলে আর কি হবে? এখন বাঁচবার পথ দেখা যাক।

সিরা—এক কাজ করা যাক, রাত শেষ হয়ে এলো। আর কোন উপায়ই এখন হয় না। তবে সকলে হাতাহাতি করে ধরে নিয়ে আবু মোল্লার বাড়ির উত্তর দিকে খেজুরবাগানে ফেলে আসা যাক। শেষে নসিবে যা থাকে তাই হবে। ভোর হলো—নেও, নেও উঠ, উঠ, আর দেরি করো না।

দ্বি মো—হুজুর যা বল্লেন সেই ভাল! চল আর বিলম্ব করে কাজ নেই। রাত ফরসা হয়ে এলো! (নেপথ্যে দুবার কুকুটধ্বনি) ঐ হয়েছে, আবার রাত নেই, ধর ধর—।

সিরা—জামাল ধর, সকলেই যাচ্ছে!

জামা—(কোমরে চাদর জড়াইতে জড়াইতে) তবে আর দেরি করা নয়, ভোর হয়েছে! ঐ সেই পাগল বৈরাগী বেটা গান গাচ্ছে। (কামালের প্রতি) কামাল ধর ভাই,—একটা মেয়েমানুষকে নে যেতে আবার আর কেউ কেন? আমরা থাকতে বাবুরা হাত দেবেন!

(জামাল কামাল কর্তৃক শবদেহ লইয়া গমন। পশ্চাতে পশ্চাতে অধোমুখে সকলের প্রস্থান)

পটাক্ষেপণ

(নেপথ্যে গান)

(রাগিণী ললিত—তাল জলদ তেতাল)

চেতরে চেতরে চিত। এই তো দিন ঘনায়ে এলো।
সারা নিশি ঘুমাইলে আর কত ঘুমাবে বল।
মায়াবিনী এই নিশি, আসলো ঘুমপাড়ানি মাসি
ভোগ দিয়ে সর্ব্বনাশী, সাব কথাটি ভুলিয়ে দিলো।
শিষ্ট যারা নিশিযোগে, রয় কি তারা নিদ্রাযোগে ?
মনে রেখে সেই পদযুগে, যোগে মজে জেগেছিল !
দুষ্টলোকে বেতের বেলা, ঠিক যেন হয় কলির চেলা
কেউ চুরি কেউ কামের খেলা, খুন করে কেউ লুকাইল।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

আবুমোল্লার খেজুরবাগান

(কনস্টবলদ্বয় নূরুন্নাহারের শবের পার্শ্বে দণ্ডায়মান)

প্র কন—বাবু যে এতক্ষণও আসছেন না !

দ্বি কন—উঠতে পাল্লে তো আসবেন !

প্র কন—সে তো আর নতুন নয়।

দ্বি কন—তাতে কি আর নতুন পুরান আছে ; বেশী মাত্রা হলেই দিন কাবার। আবার যে লক্ষ্মী কাঁধে ভর করেছেন তিনি তো—জানই আর কি !

(কাস্তে বগলে তামাক টানিতে টানিতে দুই চাষার প্রবেশ)

প্র চা—এ গাঁয়ে আর বাস্তব্বি হয় না। গেল না, ওরে ধরে নিয়ে এই কাণ্ডটা করেছে।—জমীদার বহুত আছে, অনেক জমীদারের নাম তো শুনেছি। এরা যেমন বাবা !

দ্বি চা—মামুজি, কি নকমে মাল্লে ?

প্র চা—আমি কি দেখতে গেছি ?

দ্বি চা—বুঝিছি বুঝিছি, ও ব্যাটা বড় শয়তান। বন্দুক হাতে করে ঠিক সাঁজের বেলা আমাদের বাড়ির পাছ কানাচে ঘুরে বেড়ায়, ঘুরেই বেড়ায় ! পাছ-

দুয়োর দিয়ে বাড়ির মদ্দিও আসে, বেটার চালচলন বড় খারাপ। মামুজি, তুমি শোননি, ঐ সেই দহিনপাড়ার জোলা বড় হাকমত করে বলেছ্যাল। উনি তো তার মেয়েকে দেখে বাড়ির সামনেই ঘোরেন, সে বল্লো হুজুর! দিনে মুনিব বলে মানবো, রাত্তিরে অজাগায় দেখলে আর হাকিম বলে ন্যাত ক'র্ব্বো না।

(ইনস্পেক্টরের সহিত আবুমোল্লার প্রবেশ)

ও মামুজি, ঐ সাহেব (পলাইতে উদ্যত)

ইন—খাড়া রাও, কাঁহা যাতা হায়?

প্র চা—(হুঁকা ফেলিয়া করজোড়ে) কর্ত্তা! আমরা কিছু জানিনে।

ইন—(শবের নিকটে যাইয়া) এ মেয়েলোকটি কে? কি হয়েছে? এ রকম এখানে পড়ে কেন?

প্র চা—মরে গেছে, শুনিছি খুন হয়েছে।

আবু—ধর্ম্মাবতার! আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমার মাথায় বাড়ি হয়েছে। হুজুর! আমার জাত-কুল-মান সকলি গেল। (সক্রন্দনে) হায়! আমার কি হবে?

ইন—(কনস্টবলদের প্রতি) তোমরা কি অবস্থায় দেখেছো।

প্র কন—এইভাবেই দেখেছি।

ইন—লাশ উল্টাও।

প্র কন—(ঐ রূপ করিয়া) এই তো দাগ জখম দেখছি।

ইন—কোথায় কোথায় দাগ জখম আছে দেখ।

প্র কন—হুজুর, এই পিঠে পাছায় গালে দাগ দেখা যাচ্ছে। আর অধোদেশ ফুলো, আর থান থান রক্ত।

আবু—হায় হায়। আমার অদৃষ্টে এই ছিল? (কপালে আঘাত করিয়া) হায়! খোদায় এই করে এই দেখালে!

ইন—দুজন কুলি বোলাও।

প্র কন—ঐ দুই ব্যাটাকেই ডাকি।

ইন—আচ্ছা লে আও! ডাক্তার সাহেবকে লাশ পাঠাতে হবে।

প্র কন—(দুই চাষাকে ধৃত করণ) তোদের লাশ নে:জেলায় যেতে হবে।

প্র চা—কর্ত্তা আমরা মোসলমান, মরা মানুষ ছুঁতে পারবো না।

দ্বি চা—আমাদের জাত যাবে, আমি পারবো না।

প্র কন—কি পারবিনে, পারতেই হবে (ঘাড়ে ধরিয়া) শালা পারবিনে, উঠাও লাশ উঠাও।

দ্বি চা—না বাবা। মেরেই ফেল আর কেটেই ফেল আমরা পারবো না, আমাদের জাত যাবে। এ কাম আমাদের নয়।

প্র কন—(মুষ্টাঘাত করিয়া) নে বাঞ্চত, লাশ নে।

দ্বি চা—এই নিচ্ছি।

[চাষাদ্বয়ের লাশ লইয়া প্রস্থান]

ইন—জমিদারের পক্ষের লোক কোথায় ?

প্র কন—হুজুর, তারা ভয়ে আপনার কাছে আসছে না। গ্রামে আছে—চলুন।

ইন—আচ্ছা চল—

[সকলের প্রস্থান]

পটাক্ষেপণ

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বিলাসপুর।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছারি।

(ম্যাজিস্ট্রেট, কোর্ট ইনস্পেক্টর, কয়েকজন আসামী, আবুমোল্লা এবং উকীল মোক্তার দর্শকগণ, আরদালী প্রভৃতি উপস্থিত।)

ম্যাজি—হামি আর সাক্ষী চাই নে।

কোর্ট ইন—(নিকটে যাইয়া) আসামীদের পক্ষে আর কয়েকজন সাক্ষী উপস্থিত আছে !

ম্যাজি—নেই, সাবুদ হুয়া (ফরিয়াদির মোক্তারের প্রতি) টোমরা কুচ সাওয়াল হায় ?

মোক্তা—ধর্ম্মাবতার (গাত্রোত্থান)

উ কি—(আসামীর পক্ষে) ধর্ম্মাবতার—

ম্যাজি—ও হ'টে পারে না, টুমি আসামীর পক্ষে আছে, টোমার বক্তৃতা শেষে হটে পারে! (বাদীর মোক্তারের প্রতি) টোমার আর কি আছে?

মোক্তার—(স্কন্ধের চাদর বারে বারে নাড়িয়া এবং মোচে তা দিয়া) ধর্ম্মাবতার! এই মোকদ্দমার বাদি আবুমোল্লা প্রজা। আসামী হায়ওয়ান আলী জমীদার। প্রজা মোল্লার স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনা, বলাৎকার করিতে থাকা ও তদ্দহেতু মৃত্যু হওয়ার প্রমাণ হইয়াছে। আর সেই জমীদার, সেই জমিদার আসামী আর কয়েকজন আসামীকে সঙ্গে করিয়া প্রাণভয়ে কোথায় পালিয়েছে তার সন্ধানমাত্র নাই। ইহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে আসামীগণ সম্পূর্ণরূপে দোষী ও অপরাধী। ধর্ম্মাবতার! খোদাবন্দ! হায়ওয়ান আলী (থুথু ফেলিয়া থুবড়ি) হায়ওয়ান আলী খাঁ জমীদার মপস্বলে প্রজার হর্ত্তাকর্ত্তা জমীদার। তাদের আদালত ফৌজ-দারী জমীদারই নিষ্পত্তি করিয়া থাকে—প্রজার পরস্পর বিবাদ নিষ্পত্তি হ'ক্ বা না হ'ক্ আপনি নজরের টাকা হলেই হল। প্রজারা শাসনভয়ে মুখে কথা নাই, জমীদার যা বলেন কোন মতেই তার অবাধ্যি হইতে পারে না। জমীদারের অজানিতে কোন মতেই প্রজা বিচারের প্রার্থনায় আদালত আশ্রয় করিলে তখন জমীদার একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া তার ভিটেমাটি একেবারে জালিয়ে ছারখার করে দেন। আর ইহাও অপ্রকাশ নয় যে—

ম্যাজি—চুপ, চুপ আসল কথা বল—

মোক্তার—খোদাবন্দ ধর্ম্মাবতার! এই মকদ্দমায় জমীদার স্বয়ং আসামী, সুতরাং প্রমাণ হওয়াই দায়, তবে যে হুজুর এতদূর হয়েছে সে কেবল সত্যি ঘটনা বলেই হয়েছে। নতুবা গরীবের সাধ্যি কি যে মকদ্দমা করে। হায়ওয়ান আলী যে চরিত্রের লোক তার প্রমাণ এই দেখুন—(রায় দর্শন) ইতিপূর্ব্বে সাহেব জাদা হাকিমের আমলে এক হিন্দু স্ত্রীকে জাবরাণে ধরে এনে সতীত্ব হরণ করেন। ঐ প্রকার কত কুলবালার সতীত্ব নাশ করেছেন, ধ্বংস করেছেন, নষ্ট করেছেন, মাথা খেয়েছেন, জাতপাত করেছেন, সে আমি বলতে চাই নে। ধর্ম্মাবতার! ওদের নিষ্ঠুরতার বিষয় কত প্রমাণ আছে। প্রধান প্রধান হাকিমের রায়েতে প্রকাশ আছে। (উপবেশন।)

উকীল—ধর্ম্মাবতার ! মোক্তার মহাশয় যে এতক্ষণ ব’কে গেলেন ও মকদ্দমা সম্বন্ধে কি বলেছেন, কিছুই বলেন নাই। জমীদার এমন করে—জমীদার প্রজার প্রতি দৌরাত্ম্য করে—জমীদার প্রজার সর্ব্বস্ব হরণ করে—সে কথা এ মকদ্দমায় কিছুমাত্র সংশ্রব নাই ; হায়ওয়ান আলী কি করিয়া দোষী হইতে পারে,—তিনি অতি ধনবান, বিশেষতঃ বিচক্ষন ধর্ম্মপরায়ণ, বয়স এ পর্য্যন্ত ৪০ বৎসর হয় নাই। তার দ্বাবা এমন কাজ হওয়া কথনই সম্ভব হয় না। কেবল মনোবাদ সাধন জন্য এই মিথ্যা নালীশ উপস্থিত হয়েছে, কোন সাক্ষীতেই এমন স্পষ্ট প্রমাণ দেয় নাই, যে আমাব মক্কেল নূবন্নেহাব আওরতকে জবরাণ বলাৎকাব কবেছেন. আব সেই বলাৎকাব কবেছেন, আব সেই বলাৎকারে তাহাব প্রাণ বিয়োগ হয়েছে, ফবিয়াদী আবু মোল্লা বড ফেরেববাজ।

আবু—(গলবস্ত্রে অগ্রসর হইয়া) ধর্ম্মাবতাব ! আমি নিতান্ত গরীব, আমার সাধ্য কি যে, জমীদারের নামে মিছে মকদ্দমা করি ? হুজুব সে—

ম্যাজি—চুপ চুপ—(কোর্ট সব ইনস্পেক্টরের প্রতি) দারগার রিপোর্ট পড।

কোর্ট ইন—(রিপোর্ট-পাঠ আরম্ভ) ফবিয়াদীর স্ত্রীর নূরন্নেহার আওরতের মৃতদেহ দৃষ্টে ও সাক্ষী হামছায়াগণের বাচনিক জোবানবন্দীতে ও তমিজদ্দীন আসামীর স্বীকৃত জওয়াবের মধ্যে ও তাহার সন্ধানে বাদীর বাসস্থান গ্রামের তালুকদার ১ নং আসামী হায়ওয়ান আলী ও তস্য ভ্রাতা সিরাজ আলী সহিত ঐ গ্রামের আংশিক তালুকদার কাতল মারিয়া নিবাসী লাল বিহারী সাহার জমাজমী লইয়া বিবাদ ও মনবাদ হওয়ায় ছায়েল মজকুর ঐ খাঁদিগের আশ্রিত লোক থাকিয়া এদানিক তাহাদের অসম্মতিতে সাহাদের অনুগত ও বাধ্য হওয়ায় হায়ওয়ান আলী অতি লম্পট ও দুষ্ট স্বভাবের মনুষ্য বিশেষ উক্ত মনোবাদে বাদীকে নির্যাতন ও স্বীয় কুপ্রবৃত্তির সাধন জন্য আপন চাকর ও অনুগত ২ হইতে ১৮ নং প্রতিবাদীগণের সহিত জোটবন্ধ হইয়া অমুক তারিখে অধিক রাত্রে ফরিয়াদীর প্রতি বাদী ২ নং আসামী বাটীর নিকটে থাকিয়া ছায়েলের স্ত্রী প্রস্রাব করার জন্য ঘর হইতে বাহির হইলে তাহাকে বলপূর্ব্বক ধৃত করিলে ঐ স্ত্রী সোর করাতে বাদী প্রভৃতি বাহির হইয়া সোর করায় তাহাদিগকে ভয়

প্রদর্শন দ্বারা হটাইয়া স্ত্রী মজকুরার মুখাদি বন্ধ করিয়া হতাসাঙ্গে শূন্যভাবে আপন বাহির বাটির পূর্ব্ব দ্বারি বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে লইয়া ও মুখ বন্ধ করিয়া বলাৎকার করা ও নানা মত অত্যাচার করিয়া কষ্ট দিয়া হত্যা— করা স্পষ্ট প্রমাণ ও প্রকাশ পাইলেক যে ২ নং হইতে ১০ নং আসামী- গণ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ৩৫২। ৩৫৪। ৩০২। ৩৭৬ ধারার অপরাধ ক্রমে ধৃত হইয়া ইত্যগ্রে ফৌজদারী আদালতে চালান হইযাছে ১ নং প্রধান আসামী ও ১১ হইতে ১৮ নং আসামীগণ বাড়ি ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করায় অনেক তলাসে এ যাবত তাহাদিগকে প্রাপ্ত না হইয়া স্থানে স্থানে সন্ধানী লোক প্রেরণ করত ধৃত করার পক্ষে যথোচিত চেষ্টা থাকিয়া (এ) ফারাম সহ আবশ্যকায় সাক্ষীগণকে হুজুরে পাঠানো হইল। আর সিরাজ আলী মজকুর অপরাধী দ্বারায় বাদীর স্ত্রীর মৃতদেহ বাগানে ফেলিয়া রাখা অর্থাৎ দণ্ডবিধি আইনের ২০২ ধারার অপরাধে করা প্রকাশ ও যে জন্য জামানত থাকাতে তাহার গ্রেপ্তারি ওয়ারেন্ট প্রচার হওয়ার জন্য কোর্ট ইনস্পেক্টর মহাশয় দ্বারা প্রার্থনা করিয়া বিদিতার্থ নিবেদিলেক হুজুর মালিক নিবেদন ইতি। সন তারিখ মাস।

ম্যাজি—ডাক্তার সাহেবের সার্টিফিকেট কোথায় ?

কোর্ট ইন—নথিতেই আছে।

ম্যাজি—(নথি উল্টাইয়া দেখেন, কিছু কাল পরে রায় লিখিতে আরম্ভ এবং কোর্ট ইনস্পেক্টর দ্বারা পাঠ)

কোর্ট ইন—হুকুম হইল যে গড়হাজিরা আসামীগণের নামে ওয়ারিন করিয়া গ্রেপ্তার হয়, আর হাজিরা চালানী আসামীগণকে দায়রা সোপর্দ্দ করা গেল। সন তারিখ মাস।

পটাক্ষেপণ

তৃতীয় অঙ্ক

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বিলাসপুর জিলার সেসন আদালত

[দায়রা বিচার]

(জজ, উকিল, ব্যারিস্টার,—আসামী, সাক্ষী, পেস্কার, আরদালী, জুরীগণ ও দর্শকগণ)

পেস্কা— (জজের নিকট গিয়া) হুজুর, জুরির সংখ্যা পূর্ণ হয় নাই একজন গর-হাজির।

জজ—ডেকে আনতে পার।

পেস্কা— (দর্শকগণ মধ্যে একজনকে সংকেতে ডাকিল) আপনি এদিকে আসুন।

দর্শ— (নিকটে যাইয়া) বলুন।

পেস্কা—আপনি জুরি হতে পারেন ?

জজ—আপনি কে আছে ?

দর্শ—খোদাবন্দ—আমি—আমি (যোড হাত) না না খোদাবন্দ, কিছু কসুর নাই, আমি জলপান খাচ্ছি (বস্ত্র হইতে চিড়ে-মুড়কী পতন)

জজ—এই, টোমার জুরি হ'তে হবে।

দর্শ—দোহাই ধর্ম্মাবতার ! আমার কোন কসুর নাই, আমি কিছু ঘাট করি নাই ; আমি কোষ্টা কিন্তে যাচ্ছি। পথে শুনলেম যে আবুমোল্লার বৌয়ের খুনি বিচার হচ্ছে। হুজুর ! তাই আমি দেখতে এয়েছি, ধর্ম্মাবতার ! ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে আমি আর কিছু জানিনে হুজুর ! দোহাই ধর্ম্ম—

জজ—নেই, নেই হাম টুমকো জুরী করে গা, টোমারা ক্যা নাম ? (গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক শিশ দিয়া তুড়ি এবং ভঙ্গি করিয়া নৃত্য)

দর্শ—(সক্রন্দনে) হুজুর ! দেশের মালিক যা মনে করেন তাই করতে পারেন, কিন্তু আমি কিছুই জানি না।

জজ—(ব্যঙ্গ ভঙ্গীতে) তোমার নাম ক্যা হায় ?

দর্শ— (সরোদনে করযোড়ে) আবজান বেপারী হুজুর। খোদাবন্দ—

জজ—টোম ঐ চেয়ারমে বয়ঠো।

আব—(বেগে পলায়নোদ্যত)

জজ—পাকড়ো—পাকড়ো। (আরদালী কর্তৃক ধৃত হইয়া চেয়ারে বসন)

আব—(চেয়ারের একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া) হুজুর ! আমি কিছুই জানি না, সকলকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি কিছু জানি না।

জজ—চুপরাও !

আব—এইবারই গেলুম ! (নিস্তব্ধ)

(বিচার আরম্ভ)

পেস্কার—[জজসাহেবের নিকট করযোড়ে] হুজুর, ছাপাই সাক্ষী আরও দুজন আছে।

জজ—লে আও

পেস্কা—(আরদালীর প্রতি) জিতু মোল্লা সাক্ষীকে ডাক।

(আদালত রীতিমত আরদালীর দ্বারা তিনবার ফোকরানো)

[ঢিলে পাজামা, সাদা চাপকান পরা, মাথায় পাগড়ি, তসবি গলায়, হাতে যষ্টি, বৃদ্ধ জিতু মোল্লা প্রবেশ এবং হলফপাঠ]

জিতু—আমার নাম জিতু মোল্লা, বাপের ফেন্ড মোল্লা, বয়স ৬০।৭০ বৎসর, মোল্লাকি ব্যবসা।

জজ—মোল্লাকি কি?

জিতু—কোরান প'ড়ে আমরা মুরিদকে শোনাই, দুটো আখেরের কথা কই যাতে দীন-দুনিয়ার ভালই হবে! বিয়ে-সাদীর কলমা পড়াই। মানিকপীরের সিন্নি ফয়তা দেই, আর মুরগী জবাই করি, হুজুর এই সকল কাজ আমার—

জজ—(গাত্রোত্থান করিয়া) টুমি এ মকদ্দমার কি জানে?

জিতু—আমি আবুমোল্লার কুটুম। যেদিন এই মামলার বাত হয়েছে, আমি সেদিন আবুমোল্লার খলিফা ঘরে বসে সারারাতি আল্লা আল্লা ক'রে জেহীর করেছি, আমি রাত্রে ঘুম পাড়ি না।

জজ—টুমি ঘুম পাড়ো না, তবে কি কর?

জিতু—সারারাত জেগে আল্লার কাছে রোনা পিটনা করি।

ব্যারি—নেই, ও বাত নই, টুম কুচ্ গোলমাল শোনা হ্যায়?

পেস্কা—হাকিম জিজ্ঞেস করছেন সে রাত্রে তুমি কোন গোলমাল শুনেছিল?

জিতু—সে রাত্রে কোন গোলমাল হয় নাই, এসকল কেবল মিছে করে আবুমোল্লা এদের বাদিয়েছে।

ব্যারি—টুমি মক্কামে গেয়া?

জিতু—জোনাব! গেছলাম। আমি চারবার আজ করেছি।

ব্যারি—মোল্লার জরু কি করে মরেছে, টুমি তার কিছু জানে?

জিতু—জানবে না ক্যা? আবুই মারতে মারতে একেবারে খুন করেছে।

ব্যারি—আবু কেঁও মারা?

জিতু—ও নাহি কার সঙ্গে কথা কৈল।

ব্যারি—হায়ওয়ান আলী কেমন লোক আছে—

জিতু—(তসবিতে কপাল চুলকাইয়া মাথা নাড়িয়া) আহা, অমন লোক দুনিয়া জাহানে আর নাই। বড় দিনদার, বড় দাতা, মক্কায় যাইবার সময় আমারে পঞ্চাশটি টাকা দেয়।

ব্যারি—হায়ওয়ান আলী নূরন্নেহারকে মারিয়াছে?

জিতু—(দুই গালে হাত দিয়া) তোবা তোবা তোবা! সে কি এমন কাজ করতে পারে। তা কখনো হবার নয়!

ব্যারি—আচ্ছা তুমি যাও।

[কলম ছুঁইয়া জিতুর প্রস্থান]

[নামাবলি গায়ে, কৌপিন এবং বহির্বাস পরিধান, সর্ব্বাঙ্গে তিলক ছাপা, হস্তে গলে তুলসীর মালা, কণ্ঠে কুঁড়াজালী, কক্ষে ঝুলি, হরিনাম জপ করিতে করিতে দ্বিতীয় সাক্ষী হরিদাসের প্রবেশ এবং পূর্ব্বমত হলফ পাঠ]

হরি—আমার নাম হরিদাস, পিতার নাম ঠাকুরদাস; বয়স ৪০।৫০ বৎসর। আমি বৈরাগী, ভিক্ষা করি।

ব্যারি—আবুমোল্লার স্ত্রীকে কে খুন ক'রেছে টুমি কিছু জানে?

হরি—(মালা টিপিতে টিপিতে) রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ। আমি কিছু জানি না।

ব্যারি—কিছু শুনিয়াছে?

হরি—শুনেছি হুজুর।

ব্যারি—ক্যা শুনা হ্যায়?

হরি—হরিবোল! হরিবোল! শুনেছি আবুমোল্লাই মেরে ফেলেছে। উঃ কি পাপিষ্ঠ!! হরিবোল হরিবোল!

ব্যারি—আবুমোল্লা কেমন লোক?

হরি—সে বড় ফরাববাজ, একদিন আমি—

জজ—তুমি কি? ফেরব করিয়াছে (উচ্চহাস্য করিয়া পূর্ব্ববৎ তুড়ি ও শিশ দিয়া নৃত্য এবং ইংরেজী গান করিয়া দর্শকদের প্রতি দৃষ্টি করতঃ হাস্যপূর্ব্বক উপবেশন)

তুমি—একদিন তুমি কি?

হরি—হুজুর! একদিন আমি, ভিক্ষে করতে ওদের বাড়িতে গেছিলুম। ফাঁকি

দিয়ে আমার ঝোলা দেখি ব'লে কেড়ে নিয়ে চালগুলো ঢেলে নিলে ; শেষে ঝোলাটা পায়ে প'ড়ে চেয়ে নিলুম। ও বেটা বড় ফেরেববাজি! ওর জ্বালায় গাঁয়ের লোক জ্বলে মল। রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ।

ব্যারি—মোল্লার স্ত্রীর চরিত্র কেমন ছিল ?

ব্যারি—(দুই কানে হাত দিয়া) রাধে গোবিন্দ। আমার মুখ দিয়া সে কথা বেরুবে না—(দীর্ঘনিশ্বাস) মেরে ফেলেছে কি জন্য—দীনবন্ধু!

ব্যারি—এই আসামীরা কেমন লোক ?

হরি—বড় ভাল মানুষ। আর সেই জমীদার বড়লোক, বড় ধার্মিক। গরীব লোকদের প্রতি তার ভারি দয়া। আমার বৈষ্ণবী যখন খাঁ সাহেবের বাড়িতে যান তিনি কাপড়, টাকা, পয়সা, চাল দয়া করে দিয়ে থাকেন।

বা উ—তোমার বৈষ্ণবীর নাম কি ?

হরি—কৃষ্ণমণী।

বা উ— হুজুর সেই কৃষ্ণমণী।

জজ—হাঁ, হাঁ, আমি জানে।

(ডাক্তার ক্যানিংহাম সাহেবের প্রবেশ)

জজ—How are you ?

ডাক্তার—Thanks ! Quite well.

জজ—Please take your seat. How is Mrs. CUNINGHAM ? I have not seen her for a long time. (মৃদুস্বরে) More than six months.

ডাক্তার—Thanks ! She is in delicate state and this is the seventh month.

জজ—Oh ; (ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে অধোবদনে লিখনীতে দন্তাঘাত) Do you like to go soon ?

ডাক্তার—Yes, she is alone.

জজ—(আসামীর ব্যারিস্টারের প্রতি) DR. CUNINGHAM is in hurry and I think it is better to take his deposition first.

ব্যারি— Yes, I have no objection.

বা উ—(দণ্ডায়মানপূর্ব্বক) হুজুর হরিদাস সাক্ষীর প্রতি আমার সওয়াল আছে ?

জজ—Wait, wait (ঈষৎক্রোধে) Baboo, can't you wait (মৃদুস্বরে) natives ! Let me take DR. CUNINGHAM's deposition first.

(বাদীর উকিল নিঃশব্দে চেয়ারে উপবেশন)

(ডাক্তার সাহেবের হস্তে জজের বাইবেল দান)

ডাক্তার—(বাইবেল চুম্বনপূর্ব্বক) My name is F.B. CUNINGHAM; aged 72 years. I am the G. Surgeon of Bensaff district. I made the port-mortem examination of the body of Nooren-nehar, a healthy good looking woman, aged about twenty years, sent by the officer-in-charge of Dharmoshala police station. No marks of external violence except on the genetal profuse discharge of blood from the said part ; the lungs highly conjected on digesting away the skin of throat extravasation of blood observed, all other organs found healthy. (ত্রস্তভাবে) In my opinion she must have died of sanguinous apoplexy of the brain.

জজ—(মৃদুস্বরে) Must be brain disease. (বাদীর উকীলের প্রতি) টোমার কুছ সওয়াল আছে ?

বা উ—ডাক্তার সাহেব জবানবন্দী দিলেন ইহাতে স্পষ্ট প্রকাশ হচ্ছে যে স্ত্রীলোকটি অধোদেশ হইতে রক্ত নির্গত এবং গলার চর্ম্মের নীচে রক্ত জমা হইয়াছিল ঐ কারণে কি ব্রেন ডিজিজে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা ?

জজ—হাঁ, কেন হবে না ? ডাক্তার সাহেব কহিতেছেন ; হোবে, হোবে।

বা উ—হুজুর ! ডাক্তার সাহেবকে ঐ সওয়ালটা জিজ্ঞাসা করা উচিত।

জজ—(বিরক্তি সহকারে মৃদুস্বরে) ছুট ! (ডাক্তার সাহেবের প্রতি) Is it possible that profuse discharge of the blood from the Vegina and extravasation of blood beneath the skin of the throat, produced sanguineous apoplexy of the brain ?

ডাক্তার—(উচ্চহাস্যপূর্ব্বক) হা হা হা ! If fever can produce enlargement of spleen then why not the soft blood will produce sanguineous apoplexy of the brain ?

জজ—আর কিছু সওয়াল আছে ?

বা উ—হুজুর, আমরা মেডিক্যাল সায়েন্স ভাল বুঝি না। আর কোন সওয়াল নাই। (উপবেশন)

জজ—(ব্যারিস্টারের প্রতি) Have you anything to ask Dr. CUNINGHAM ?

ব্যারি—(সাশ্চর্য্যে) To whom ? To DR. CUNINGHAM ?

জজ—Yes.

ব্যারি—Certainly not ; he is perfectly right.

জজ—(ডাক্তারের প্রতি, Then you can go ; give my compliments to Mrs. CUNINGHAM.

ডাক্তার—Thanks.

[প্রস্থান]

ব্যারি—(হরিদাসের প্রতি) টুমি কোন কোন তীর্থ দেখছ ?

হরি—গয়া, কাশী, পেঁড়ো আর কত তার নামও জানিনে।

জজ—(ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক) টুমি লেখাপড়া জানে ?

হরি—নাম সই করতে পারি।

জজ—আচ্ছা, দস্তখত কর।

[নাম সই করিয়া হরির প্রস্থান]

জজ—(বাদীব উকীলের প্রতি) বাবু আপনি এইক্ষণে বক্তৃতা করুন।

[পাঁচ মিনিটকাল উকিলের বাঙ্গলা বক্তৃতা]

[পনেরো মিনিটকাল ব্যারিস্টারের ইংরেজী বক্তৃতা]

আবু—দোহাই ধর্ম্মাবতার—আমার প্রতি বড অন্যায় হয়েছে—বড় দৌরাত্ম্য হয়েছে।

ব্যারি—টুম চোপরাও।

আবু—আমার বাড়িঘর সব গিয়েছে, জাতও গেছে হুজুর ; আমার কিছুই নাই ; (ক্রন্দন) আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে।

জজ—চুপরাও।

আবু—দোহাই ধর্ম্মাবতার। আমার প্রতি বড় অন্যায় হয়েছে—আমি নিতান্ত গরীব।

জজ—চুপরাও। (কিঞ্চিৎ পরে জুরীগণের প্রতি) Is the case guilty or not ?

জুরি—(যথাস্থানে এক ঐক্য হইয়া) Not guilty.

ব্যারি—(হো হো শব্দে হাস্যপূর্ব্বক পুস্তকাদি টেবিল হইতে হস্তেকরণ এবং জজের একটু খোসামোদ)

জজ—(রায় লিখিতে আরম্ভ, ক্ষণকাল পরে দণ্ডায়মান হইয়া) ডিস্‌মিস্—আসামীগণ খালাস। (হাতে তুড়ী দিয়া নৃত্য)

ব্যারি—(হাস্য করিয়া) সেক্‌হেণ্ড।

পটাক্ষেপণ

(নটীর প্রবেশ)

নটি—(স্বগত) হায়, হায় এ কি হলো? হা ভগবান তুমি কোথায়? হায় হায় এ জগতে অর্থ ই সকল দোষের মূল।

হায়রে পাতকি অর্থ! তোর লাগি ভবে—
স্বধু তোর লাগি ঘটে যত অত্যাহিত!
অবলা অমূল্য বত্ন সতীত্ব রতন,
হরিল দুর্ম্মতি পাপ পাষণ্ড বর্ব্বর
জমীদার! ধর্ম্মাসনে হলো না বিচার!
কারে কই মনো দুঃখ কারে বা জানাই
এ বারতা? শোকসিন্ধু উথলিছে মনে—
কারে বা জানাই? কেন কেন এ জিজ্ঞাসা?
দুজন জিজ্ঞাসা-পাত্র সম্মুখে আমার—
জানাইব তাঁরে যিনি সর্ব্ব নেত্রবান্,
সর্ব্বদর্শী মহেশ্বর, জগত-কারণ,
সর্ব্বময় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বশাস্তা বিভু,

ত্রৈলোক্য ঈশ্বর যিনি, পরম ঈশ্বর—
অনুগত ধর্ম্ম যার সদা আজ্ঞাবহ,
তাঁরে বিজ্ঞাপিব শোক মনে যত আছে—
এইভাবে জিজ্ঞাসিব কহ কহ দেব,
হবে না কি দারিদ্রের এ দুঃখ মোচন ?
রবে না কি অবলার সতীত্ব রতন ?
আরো বিজ্ঞাপিব শোক কান্দি তাঁর কাছে,
ঈশ্বর-প্রসাদে যিনি ভারত-ঈশ্বরী,
যাচিব কেবল ভিক্ষা ডাকি বার বার,
কর মা কর মা দিনে কর মা নিস্তার।

সঙ্গীত।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

কাতরে ডাকিমা তোরে শুনমা ভারতেশ্বরী।
অবহিত অবিচার আর বাঁচিনে মরি মরি॥
থাক মা সাগর পারে কভু না হেরি তোমারে,
রক্ষ মা প্রজা কিঙ্করে, বিনয়ে মিনতি করি।
অবলা সরলা সতী, তাহে ছিল গর্ভবতী,
সে সতীর এ দুর্গতি, উহু মরি মরি!
সবল দুর্ব্বল পরে, হেন অত্যাচার করে ?
রক্ষ মা দীন প্রজারে, মা তোমার চরণ ধরি॥
দয়া মমতা পালিনী, প্রজার দুঃখ বিমোচিনী
দীন দুঃখ-নাশিনী, মা তুমি শুভঙ্করী ;—
জননী বলিয়ে ডাকি, শুন সিন্ধু পারে থাকি,
করুণা কটাক্ষ রাখি, তার মা ভারতেশ্বরী।

(নটের প্রবেশ)

নট—প্রিয়ে! আর দুঃখ করলে কি হবে ? আমাদের কথা কে শুনে ? আর কেইবা আমাদের দুঃখে দুঃখিত হয় ? হায়! চ'খের উপর এমন অন্যায় হলো ? হায়! হায়! দিন-দুপুরে ডাকাতি হলো! দীনহীন প্রজার ধন, মান,

প্রাণ পর্য্যন্ত গেল, তার প্রতিশোধ কিছুই হলো না। (ক্ষণকাল চিন্তা) যাক আমাদের আর সে কথায় কাজ নাই। আমাদের কথায় কেবা কান দেয় ?

নটি—বলেন কি ? আমাদের এই কান্না কি কেউ শুনবে না। গরিবের প্রতি কি কেউ নজর করবেন না ?

[দীনবেশে ক্রন্দন করিতে করিতে আবুমোল্লাব প্রবেশ]

নট—আবার কি হয়েছে ? উঃ কি ভয়ানক।

আবু—আমার সর্ব্বনাশ তো হয়েইছে—হায়ওয়ান আলী মোকদ্দমা জিতে আমার বাড়ি ঘর ভেঙ্গে চুরে খানে ওয়ারাণ ক'রে ফেলেছে। আমার আর দাঁড়াবার লক্ষ নাই। (ক্রন্দন) হায় হায়। আমার ধন মান সকলি গেলো, বিষয় সম্পত্তি যা কিছু ছিল সকলি লুটে নিয়েছে। আমায় গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—আমার অন্ন বস্ত্র কিছুই নাই। (ক্রন্দন)

নট—কি নির্দয় !! কি নিষ্ঠুব !!!

নট নটী—(উভয়েব দুঃখিত স্বরে সঙ্গীত)

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

কবে পোহাইবে ভবে এই দুঃখ বিভাবরী।
উপায় না হয় ভেবে নিয়ত ভাবনা করি॥
কবে দেব দিবাকর, বিকাশিয়ে সুখকর,
নাশিবেন তম ঘোর, ঘোর অন্ধকার ছবি ?
ওহে বিপদ বারণ, কর বিপদে তারণ,
তম কর নিবারণ নিবেদন কবি :—
তুমি দেব সর্ব্বময়, কাতরে করুণাময়,
নাশ কর দীন ভয়, শ্রীপদ কমল ধরি॥

॥ যবনিকা পতন ॥

এর উপায় কি ?

(প্রহসন)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম রঙ্গভূমি

(নয়নতারার ঘর, নয়নতারা আসীনা)

নয়ন—(পান সাজিতে সাজিতে) একখানা ঢাকাই শাড়ি দেখিয়ে পাঁচজনার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা নিয়েছি। যার বিয়ে হয়েছিল কিনা—শুনি নাই। বাবা কেমন চিনি না, কখনও দেখি নাই ; সেই বাবার ঘোড়া চড়া সাধ হয়েছিল বলে, তাতে বেশ দশ টাকা লাভ করেছি। সোনা-রুপার অলংকার যা আছে, সকলি আমি করেছি। এত করেও 'হাবা' কথাটা মায়ের মুখ থেকে সরাতে পাল্লেম না। ফাঁকি দিয়ে আজ কিছু টাকা হাত করে, মাকে দেখিয়ে বলবো যে, মা ! দেখ দেখি তারা নাকি কিছু বোঝে না। এখনি এর একটা ফন্দি এঁটে রাখি। (পান সাজা রাখিয়া একটু চিন্তা) দূর কর, আর কি করব, জামাইয়ের ঢাকাই শাড়িই আমার লক্ষ্মী, এই শাড়ি দেখিয়েই বাজি মাত করবো। খাটানও কল, খাটাতে জানলে আর পট যায় না। আজ বড়দিন, বাবু যে কম করে বড়দিন করবেন, সে তো কথাই নয়। বড়লোক বড় রকমেই বড়দিন করে থাকেন, এখনও যখন দেখছিনে, তখন বোধ হচ্ছে যে, একেবারে তয়ের হয়ে আসছেন। তা আমি আগেই একখানা মলা কাপড় পরে এখানা সামনে ফেলে রাখি। (কাপড় পরিতে গমন)

(অন্য দ্বার দিয়া জগার প্রবেশ)

জগা—ও মা !—বাবু আসছে। কৈ, কোথা গেলে গা। (স্বগত) যাক মরুগগে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাক, ফাঁকতালে গোটাকত পান চুরি করি (কয়েকটা পান লইয়া কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে) কৈ গো, ও মাঠাকরুন ! বাবু এসেছেন। ওগো বাবাঠাকুর এসেছেন।

(অন্য কাপড় পরিয়া ঢাকাই শাড়ি হস্তে নয়নতারার প্রবেশ।)

নয়ন—বাবু কৈ ?

জগা—এই এলেন. বেশি দূরে নয়। আমি দেখেই খবর দিতে এসেছি।

নয়ন—(শাড়ি ভাঁজ করিতে করিতে) আসছে আসুক, তুই বিছানাটা ভাল করে ঝেড়ে তামাক সেজে নিয়ে আয়। আর খবরদার ! কাল রাত্রের কথা মুখে আনিসনে. তোর পেটে তো ছাই কিছুই হজম হয় না। তুই একপ্রকার পাগল। (কাপড় সম্মুখে রাখিয়া দুঃখিতভাবে উপবেশন) যা বেটা যা, তামাক সেজে আন, ঐ কথা শোনা যাচ্ছে।

(কিঞ্চিৎ পরে রাধাকান্ত এবং মদনবাবুর প্রবেশ)

জগা—ও বাবা—আজ যে মেজেস্টার সাহেব সেজে এসেছে।

(হুঁকা লইয়া প্রস্থান)

রাধা—বড়বৌ, প্রাতঃপ্রণাম। মুখে কথা নাই যে ? মাথা ধরেছে ? না পেটে ব্যথা উঠেছে ? এ কি ? কথাটা কি ? লক্ষণ ভাল নয়, যাত্রার ফল বুঝি ফলে যায়। ও মদনবাবু! বড়দিনে, আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছি। বেশ বড়দিন কল্লেম। যে গোল দেখতে পাচ্ছি এত শিগগির মেটবার নয়। আমার কপাল ! আর তোমার মাথা। দিন বুঝেই কল বিগড়েছে ! দেখি ! বউ, কথা কও। ও বউ, কথা কও।—

মদন—আর বউ কথা কও—মনে ব্যথা না পেলে কি শাশুড়ী আমার বউ হয়ে ঘাড় গুঁজে বসে আছেন ?

রাধা—(নিকটে যাইয়া) কিসের ব্যথা ? কোথা ব্যথা ? (নয়নতারার ঘোমটা টানিয়া ফেলিয়া) ও বউ ! কথা কও, এক বছর যদি বাঁচি তবে তো আবার বড়দিন পাব ? (নয়নতারা চক্ষু বুজিয়া অভিমান) কথা রাখ, চেয়ে দেখ, কেমন সাহেব সেজেছি। তোমার জামাই বড়দিন করে একেবারে গলে পড়ছেন, আমি গলি নাই ; কিন্তু টলেছি। মন্মোহন দাদা ঢলিয়েছেন, আর তোমার সন্ন্যাসী দাস পথে পড়ে ধুল খাচ্ছেন। (চিবুক ধরিয়া) তোমার এ কি ভাব ?

নয়ন—(হাতে ঝ্যাটকা মারিয়া) গায়ে হাত দিও না। ভালয় ভালয় বলছি, আমাকে বিরক্ত করো না।

মদন—আর কেন, বোঝা গেছে।

রাধা—তুমি ছেলেমানুষ, এ-সকল ভাব সহজে বুঝবার সাধ্য নাই। আগে একটু সাধ্যসাধনা করে দেখি। (জানু পাতিয়া যোড়করে গলবস্ত্রে যাত্রার স্বরে)

মানময়ী—মানে ক্ষমা দে।২—
আজ মান করিবার দিন নহে ॥

কৈ না, এতে যে কিছুই হলো না। থাক, নেচে গেয়ে বকশিশ নেব, আরও কথা কওয়াব, মদনদাদা আমার সঙ্গী হও তো (নৃত্য করিতে করিতে গীত ও সময় সময় সাহেবী নৃত্য)

—খেমটা।

স্থর - কাহারৌয়া জাল বিনে রে।
বড় বাহার দিয়েছ বৌ বড়দিনে বে।
বড়দিনে ওলো বৌ বড়দিনে বে,
বড়দিনে ওলো বৌ বড়দিনে রে।
আমি তো তোমারে বৌ কিছু বলি নাই।
মাথা তুলে কও কথা মনে ব্যথা পাই ॥
কিসে এত মন-দুঃখ হলো কি অসুখ।
হাসিমুখে চেয়ে দেখ দেখি চাঁদমুখ ॥
অজানিতে যা করেছি তা শুনিব পাছে।
আগে না হয় সাজা কর, গোলাম হাজির আছে ॥
(রুমাল গলায় জড়িয়ে যোড়করে দণ্ডায়মান)
(কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে জগার প্রবেশ)

নয়ন—(রোষে রাধাকান্তবাবুর দিকে হস্তস্থিত ঝাঁটি নিক্ষেপ) এখানে মরতে এয়েছ কেন? (পাছ ফিরিয়া মাথায় ঘোমটা দান)

জগা—বাবা, এখনি যে গায় লাগতো।

(ত্রস্তে প্রস্থান)

মদন—কেমন বকশিশ !

রাধা—থেমে যাও বাবা, আর একবার, এই পাড়ি দিয়েছি। বড় ঢেউ কাটিয়েছি। এখন কেবল হাঁপানিটুকু আছে।

মদন—সাবাস মোর বাবা! এই দুনিয়ায় তুফানে টিকে গেলে—কত জাহাজ-বজরা পড়ে গেছে। ভাগ্য আপনি সামলে আছেন।

রাধা—তাই তো বাবা, এইবার সামলাতে পাল্লে হয়। (নিকটে যাইয়া) বলি, ও বড়বৌ! এত কেন? (স্বরের সহিত) পেট যে ফেঁপে ওঠে, আর লুচি খাব না।

নয়ন—(ঈষৎ ক্রোধে) আমি আজ কথা বলব না।

রাধা— (স্বরের সহিত) এই তো বাবা—বলেছ?

নয়ন—বলেছি বলেছি, আর বলব না।

রাধা—(স্বরের সহিত) এই দুবার হল।

নয়ন—বেশ তো, দুবার কেন তিনবার হলো।

রাধা—তবে বেশ তো, চলুক—বড়দিনে আবার চলুক।

নয়ন—(দুঃখিতভাবে) তোমার বড়দিন, তোমারই আছে, আমার কি?

রাধা—তোমার কি? (চিবুক ধরিয়া) বলি ও ক্ষেপি! তোমার কি? জগৎ তোমার, আমি তোমার, প্রাণ তোমার, রাধা তোমার, কান্ত তোমার।

নয়ন—(আড়নয়নে চাহিয়া) থাক, আর বলতে হবে না। জগৎ আমার, তুমি আমার, তোমার প্রাণ আমার, এত ছেনালি করে আর জ্বালিও না।

রাধা—কেন? তোমার জন্যে আমি প্রাণ তো দিয়েই রেখেছি। তার উপরেও যদি কিছু থাকত, তাও না হয় দিতাম। তুমি যা ভাব তা নয়। দেখিয়ে দেও দেই কিনা?—করি কিনা?

নয়ন—(মাথার কাপড় ফেলিয়া ঈষদ্ধাস্যে) আচ্ছা, এখনি পরীক্ষা হোক, স্বত্ব মুখে বল্লে চলবে না।

রাধা—আচ্ছা তুমি বল, যদি না পারি শেষে অন্য কথা। না বলতেই মুখের দোষ দিলে। এ মুখ বেদ-মুখ, যা বলব সে বেদবাক্য।

নয়ন—এই কথা। তবে শোন (রাধাকান্তের কানে কানে প্রকাশ।)

রাধা—(বিকৃত মুখে) এতেই এত? ছি ছি। এত তুচ্ছ কথা !!—ছি ছি, মাটি করেছ, প্রাণ মাটি করেছ, ছি ছি !!!

নয়ন—না না সত্যে বলছি, বড় সক করে, এই কাপড়খানা নিয়েছি। বিশখানা কাপড় থেকে এইখানা বেছে বার করেছি। মার কাছে টাকা চাইতেই তো একেবারে খেউ খেউ করে ঝাঁটা হাতে করে উঠলেন। দোকানি বেটা দুবার এসে, শেষ বারে ভারি কড়া কড়া কথা বলে গেছে। করি কি

ভাই, কাপড়ের মায়াও ছাড়তে পারিনে, টাকাও হাতে নাই। হাতে না থাকলে কে কাকে দেয় ?

রাধা—বড় লজ্জার কথা, তোমার হাতে টাকা নেই বলে আমার দেউলে নাম বের করো না। টাকার জন্যে তোমাকে কড়া কথা বলে গেছে ? নয়নের তারাকে কড়া কথা বলে গেছে ?—রাধাকান্তবাবুর নয়নতারাকে কাপুড়ে বেটা কড়া কথা বলে গেছে ? এ দুঃখ রাখি কোথা ? ধিক আমার টাকায়, ধিক আমার মায়ায় !! শত ধিক আমাব চৌদ্দপুরুষে ! সে বেটার বাড়ি কোথা ? কোথাকার সে বেটা ? তুমি যে তার দোকান শুদ্ধ কিনতে পার, তা বোধ হয় সে বেটা জানে না ? নয়ন ! তোমার কমি কিসে ? কাপড়ের দাম কত ?

নয়ন—বেশি নয়, দশ টাকা।

রাধা—ছি ছি ! মরে যাই। গলায় কলসী বেঁধে উলুবনে ডুবে মরি। দশ টাকার কাপড়ের জন্যে মুখ ভারি ! মদন দাদা ! এ কি আর গায়ে সয় ? এত বড় তার বাপের যোগ্যতা। টাকার জন্যে কড়া কথা বলবে ? (পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া দশ টাকা কাপড়ের দাম, আর পাঁচ টাকা বেটাকে বকশিশ দিও। ক্যা বাৎ হায়। এখন বড়দিন করি। [উচ্চৈঃস্বরে] ও বেটা বাঁদরমুখো ?—বাবা জগন্নাথ !

জগা—(নেপথ্যে) আজ্ঞা !

রাধা—ব্রাণ্ডি লাও।

জগা—(নেপথ্যে) জল ?

রাধা—জল খাবে তোর বাবা। শালা ব্রাণ্ডি লাও। (ব্রাণ্ডি লইয়া জগার প্রবেশ)

মদন—আবার ব্রাণ্ডি। অন্য আর কিছু হোক। কেমন শ্বাশুড়ি ?

নয়ন—শ্বাশুড়ির ব্রাণ্ডি না হলো (মাথা নাড়িয়া) হবে না—হবে না। [টাকা উঠাইয়া] বড়দিন,—বড় রকমে হওয়া চাই।

রাধা—মদনবাবু ! আর কত বলব, সময় থাকতে শিখে নেও। যতন করে মনে রেখ। এ-সব কথা বড় কাজে লাগে। বাবা ! রাণ্ডির বাড়ি ব্রাণ্ডি না খেলে কোন কালে মজা হয় না। ওর শাস্ত্রেই আছে, রাণ্ডির বাড়ি ব্রাণ্ডি, এয়ারের বাড়ি বিয়ার, শালার বাড়ি শ্যাম্পিন, শিকারে সেরি, আর বোটে-

পোর্ট, এই হোল মদ খাওয়ার ব্যবস্থা। কাঁচ আর মর, মাতাল-উন্নতি সভার সভ্য, এখানে উপস্থিত থাকতে কখনই নিয়ম ভঙ্গ করতে পারবে না।

মদন—তবে পালা আরম্ভ করি।

রাধা—ও কথা মুখে এন না, ও রস পচে গেছে। মদ খাওয়ার একটি নূতন নাম বেরিয়েছে। 'লেখাপড়া করা।'

মদন—বা-বা খাসা নাম বেরিয়েছে। তবে দিন 'লিখাপড়া করি।'

রাধা—(মদ্য দান) লেখাপড়া কর— কিন্তু ধেবড়ো না।

মদন—তবে আগে আপনি।

রাধা—তা পারি নে।

মদন—তবে শাশুড়ী ?

রাধা—বৌ, নেও লেখাপড়া কর।

নয়ন—না-না আমি লেখাপড়া করতে পাবব না।

রাধা—ওরে বাপরে ! তা কি হয়ে থাকে, না পার, ঢেরা সই কর।

নয়ন—(গ্লাস লইয়া এক সিপ পান এবং নয়নতারা-কর্তৃক সকলেরই মদ্যপান।)

[সন্ন্যাসী দাসের প্রবেশ]

সন্ন্যা—[টলিতে টলিতে] এই তো এসেছি। চেনা পথে কি আর বাবা—সন্ন্যাসী দাস ?

মদন—ওকে এখানে কে আনলে। বাবু ! ও বেটা বদমাইশকে কসে দুই-চার ঘা চাবুক মেরে তাড়িয়ে দিন। শালা চোর পরের খেয়ে নিজে মাতলামি করবে, আর সকলকে ফাঁকি দেবে। আচ্ছা করে চাবকে দিন।

নয়ন—না না, অমন করতে নেই, এর পরে কি আর তাড়াতে আছে, না মারতে আছে ?

রাধা—সন্ন্যাসী দাস, এ কি ? খবর কি ? এখানে কেন ?

সন্ন্যা—এই তো বাবা, সীমা আর বেশি দিন নাই। উঠেছি ভবের ধুলাখেলা মিটে গেছে।

মদন—আপনি যত শীঘ্র যান, ততই দেশের মঙ্গল। গায়ে কাঁদা লেগেছে কেন ? পিরানটা ছিড়লে কি করে ? খুব মজার লোক দেখছি।

সন্ন্যা—ওরে ছোঁড়া ! মাছ ধরতে গেলেই গায়ে কাদা লাগে। হেস না, সীমা দেখ। [টলিয়া পড়িতে উদ্যত।] এই তো।

মদন—দেখ, গায়ে অমনি পড় না।

সন্ন্যা—আমি অমনি বদ্ধ মাতাল কিনা ? আমার হুঁশ জ্ঞান নেই কিনা ? ছোঁড়াদের পাকামু দেখে আর বরদাস্ত হয় না। রাস্তায় পড়ে ধুলাখেলা করেছি। এস একবার, এস বড়দিন।—যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিন এস না—যীশু-জন্মের কোলাকোলি করি। সকল কোলাকোলির মজা নেওয়া চাই। বিজয় দশমীর কোলাকোলি, ঈদের নমাজের পর কোলাকোলি, আজ যীশু-জন্মের কোলাকোলি। মদন ! চট না, ফেটে চৌচির হয়ো না, এস, খ্রীষ্টানের মজাও দেখ। আজিকার কোলাকোলিতে কি সুখ পাও, তাও দেখ। [মদনবাবুকে জড়িয়ে ধরেন]

মদন—তুই বেটা নিতান্তই চাষা। [জোরে ছাড়াইয়া পদাঘাত]

সন্ন্যা—[চিত হইয়া পড়িয়া] এ বাজি ভাল নয়, ফের বাজি [উঠিতেই মুখ থুঁসিয়া পতন]

নয়ন—সন্ন্যাসী দাস, এ কি ? মাতলামি করবে রাস্তায় যাও।

সন্ন্যা—বাস্ বাবা—

বাবা মল মদ খেয়ে খুড় এল ঘরে।
'রোজে' নিয়ে রোজ রোজ কত মজা করে ॥
কত মদ খেতে পারে সন্ন্যাসী গোসাঁই।
মাসীমার কথা শুনে লাজে মরে যাই ॥

নয়ন—সন্ন্যাসী দাস ! এক গ্লাস খাবে ?

সন্ন্যা—দেবেই ত। মাসী এতদিন পরে কি মনে পড়েছে ?

বেটা বল কেটা তোর মাসী।
মাসী মাসী বলে বেটা গলায় দিলি ফাঁসি ॥

[নয়নতারার হস্ত হইতে মদ্য লইয়া পান] এ কি পাকা মাল যে ? কোথা পেলে বাবা ? মাসীমা ! কোথা পেলে ? খুব খাঁটি আসল। ভেল-ভেজাল জলের কারবার নাই। নম্বার 'এক্কা'।

মদন—আমরা কি চাষা যে কাঁচা মাল খাই।

সন্ন্যা—আমিও চাষার নন্দন নয়, জানিস ? জাতি কৈবর্ত বামুনের ঝাঁক মারি। আমি কি কম লোকের সন্তান। আমার বাবার বাবা, যে-চাঁই মাছ ধরত, ঠাকুরমার মুখে শুনেছি, তা কেউ চক্ষেও দেখেনি। বাবা, রাজারহাট চেন ? সেই রাজারহাটের দক্ষিণে রানীরহাট, ঠিক বিবিরহাটের পাশেই কপীরহাট, সেই আমার পিতামহের জন্ম-মাটি, নামটাই কি যেমন তেমন —নাম হনুমান দাস। সন্ন্যাসী দাস আসল নাম নয়।

মদন—এতকাল শুনলেম সন্ন্যাসী দাস, বেটা আজ বলছে হনুমান দাস।

সন্ন্যা—কথাই শোন, রাগ কর কেন ? যে সন্ন্যাসী সেই হনুমান। ভিন্ন কি রে বেটা ? শোন, আমার জন্মকাহিনী শোন। আমি সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদি ছেলে—তারকেশ্বরের মোহন্ত তখন হয় নাই, তা হলে মোহন্তের আশীর্ব্বাদেই হতেম। আমি হতেই মাব বেঁজ নাম, বাবার আঁটকুড়ো নাম, কাব' কার' আইবড নাম ঘুচে গেছে। তাইতে কেউ কেউ আহ্লাদ করে আমায় আঁটকুড়োর নন্দন বলেও ডেকে থাকে। এই আঁটকুড়োর নন্দন আগুনে পুড়বে না, জলে ডুববে না। বল, এখন ডুবে দেখাই। মা গঙ্গে। পতিতপাবনী মা। একবার ডুব দেই। [ভূমে পতন]

রাধা—যে যা না পারে সৈতে যে না পাবে, সে তা কেন খায় ?

মদন—ও কি নিজে খেয়েছে ? আকর্ষণে টেনে নিয়েছে এই সকল তিন ঢুকে ছটাকে মাতালেই তো মদের সর্ব্বনাশ করে ভদ্রলোকের ঘর থেকে তাড়ালে। এ দশা দেখলে কি আর মদের নাম শুনতে ইচ্ছা করে। ছি, ছি !

নয়ন—যাক, তা আব তুমি কি বলবে। সকলেরই ঐ দশা। ধরে রাখবার লোক থাকলেই ভদ্রলোক, না থাকলেই মাতাল। তা যা হক। আমি একে রোজের বাড়িতে রেখে আসি।

রাধা—তুমি এই অন্ধকারে কোথা যাবে ? জগাকে ডেকে দিই আর না হয় আমি যাই। তুমি বাড়িতে থাক !

নয়ন—না তা হয় না, পুরুষ মাতালকে পুরুষে ঠাণ্ডা রাখতে পারে না। তুমি রাস্তায় গেলে একাকার হবে। আমি কি পাগল যে, সন্ন্যাসী দাসের সঙ্গে

রাত্রে তোমাকে যেতে দিই। [সন্ন্যাসী দাসকে উঠাইতে অনেক চেষ্টা] এ কি ? ও যে আর উঠে না।

মদন—ওর কেবল চালাকি। তামাসা দেখবেন। [সন্ন্যাসীর পায়ে চাদর বাঁধিয়া] এইভাবে টেনে নিন।

রাধা—[টানিতে আরম্ভ]

সন্ন্যা—কুইক, বি কুইক, জলদি চালাও।

[রাধাকান্তের সন্ন্যাসী দাসকে লইয়া প্রস্থান]

মদন—মাতাল কি আব কথায় জব্দ হয়। এখন বেটা গিয়ে পথে আচ্ছা গোল বাধাবে।

নয়ন—আমরা তো ঘবে আছি। তাতে আর ভয় কি ? জামাই সেদিন বড় চালাকি করে গেছে।

মদন—তুমিই আজ কম কি কল্লে, কাপড় দিয়েছি পূজার সময়। দোকানী কড়া কথা বল্লে আজ। সাজিয়ে ছিলে তো মন্দ নয়। তোমায় চেনা ভার।

নয়ন—তুমি কি ? বাছা তুমি ত কম নও, যার খাও তারই গুণ গাও, দেখ তো তোমাব অসাধ্য কি আছে ?

মদন—শাশুড়ি ! বাবু তো কিছু টের পান নেই।

নয়ন—পেলেই কি ! আমি তো ঘরেব মাগ নই যে ভয় করে ডরিয়ে চলব। এত কি ? আসে লক্ষ্মী, যার বালাই। আমি ওর জন্যে একেবারে পাগল কিনা ? সরে এস। (মদনবাবুর জানুতে মস্তক রাখিয়া শয়ন) জগা, ও জগা ! ঘুমিয়েছিস ?

জগা—(নেপথ্যে) না।—

নয়ন—বাবু এলে কেসে উঠিস। (মদনের প্রতি) জামাই। অনেকদিন গান শুনিনে।

মদন—তা বলি কিন্তু—

নয়ন—যদি তাড়াতে পারি। নানা আজ মাপ করবে. ওর মাগকে দেখাবে বলেছে, আজ ওদের বাড়ি যেতে হবে।

মদন—বাবুর স্ত্রী বড় ভাল মানুষ।

নয়ন—ভাল মন্দে কাজ নেই, দেখতে পেলেই হল। তুমি গান কর।

মদন—(নয়নতারার মুখের দিকে মাথা নওয়াইয়া মুখের নিকটে হস্ত নাড়িয়া গান)

কাওয়ালি।

(শাশুড়ি গো) মন-দুঃখ মনে রহিল।
আশা না পুরিতে বুঝি প্রেমবাসা ভাঙ্গিল॥
পিরিতি কাননে, ভ্রমিব গোপনে।
পাবে না সন্ধান কেউ, জানিবে না স্বপনে।
মরি মরি এ কি দায়, মন যেন ডেকে কয়,
আর কি ভাবিছ। প্রেমে বিবহ ঘটিল॥

নয়ন—(মদনবাবুর বুকে সাহসসূচক চপেটাঘাত করিয়া) ভয় নাই। ধৈর্য্য ধর।

(জগার প্রবেশ)

জগা—বাবু আসছে।

নয়ন—(তাড়াতাড়ি উঠিয়া) এখন সরে বস।

(রাধাকান্তবাবুর প্রবেশ ও জগার প্রস্থান)

রাধা—বড় শীত (কাঁপিতে কাঁপিতে) আজ বড শীত। বেটা রাস্তায় বড জ্বালাতন করে মেরেছে। শেষ না পেরে কাঁধে করে নিতে হয়েছিল। একা হলে পারতুম না, হঠাৎ গাঙ্গুলী ডাক্তাব সঙ্গে দেখা হল, সে আর আমি একত্রে কাঁধে করে নিয়ে একেবারে আড্ডায় ফেলে দিয়েছি, শালা কাঁধের উপরে দুবার বমি করে আমার গায়েব কোট নষ্ট করে ফেলেছে। (কোট খুলিতে খুলিতে) বৌ! এক গ্লাস ঢাল।

নয়ন—এত কাঁপনি উঠেছে কেন? (রাধাকান্তের হস্তে মদ্য দান)

রাধা—(মদ্যপান করিয়া) বাঁচা গেল, সাতখানা লেপ গায়ে দাও, যেখানে ফাঁক পাবে সেইখানেই শীত সেঁদবে। আগুন জ্বেলে দাও, গায়ের উপরকার চামই গরম হবে। মা সুরেশ্বরী পেটে পড়লে অন্তরে বাহিরে, ভিতরে উপরে যেন একেবারে বেলাতী কম্বলে মোড়ান হয়। বৌ! আর এক গ্লাস।

নয়ন—এত ভাল নয়, পায়ে দড়ি পড়বে। (মদ্যপান)

রাধা—গলায় দড়ি পড়লে ছাড়ব না বাবা (মদ্য লইয়া পান) বউ! তবে আজ রাত্রেই দেখাশুনা হয়ে যাক। কেন আর অদেখা থাকে।

নয়ন—আমি তোমার বাড়ি গিয়ে কি ঝেঁটা খাব। তোমার গিন্নী, আমার নামে কুকুর পোষেন। দেখলে কি আব আস্ত রাখবেন। ঝেঁটার বাড়িতে তোমার, আমার হাড় চুর করে দেবেন।

রাধা—চুর করতে আর হয় না, যদি হয়, তবে চুব হবে, না বৌ। সে বড় খাসা লোক, গেলেই দেখবে।

নয়ন—চল, এক যাত্রায় দুই ফল হবে। বাড়ি দেখাও হবে, ঘরেব গিন্নীও। কিন্তু ভাই-জামাইকে সঙ্গে নিতে হবে।

রাধা—চল দাদা! আমার বাড়ি, তোমাব বাড়ি, আমার ঘর তোমার ঘর।

নয়ন—ও কথাটা আর বাকি বাখলেন কেন? তোমার বউ, আমার ভালবাসা, তোমার ভালবাসা।

রাধা—বাধা হান্ কি। চল দাদা।

মদন—যে আজ্ঞা, আমি হাজিব।

নয়ন—তবে যাত্রা করে নিই। [নয়নতারা-কর্ত্তৃক সকলেব মদ্যপান]

রাধা—তবলাটা নিই, গিন্নিকে এবারকি দেখাব। বড় বৌ। নাচবে তো।

নয়ন—অত বসিকতা ক'র না। মাগকে আব নাচ দেখিয়ে কাজ নেই, শেষে বেঁধে রাখা দায় হবে। আমার জ্বালাতেই দিনরাত মাথা দিয়ে আগুন উঠছে। আবাব তার চোক কান ফুটিয়ে, আব কাজ নেই। এই আছ ভাল। সে ভদ্রলোকের মেয়ে, তাই তো টের পাও না, আমাব মত হলে তোমাব প্রাণ থাকত না।

রাধা—যাক, মদের বোতল আর গ্লাসটা নিতে হবে। (মদের গ্লাস লইয়া) সকলেই আবার যাত্রা করি। (বাধাকান্ত-কর্ত্তৃক সকলেই মদ্যপান)

(নয়নতারা-কর্ত্তৃক গান)

সুর—আড়খেমটা।

আজ আমি মালঞ্চেতে যাই—
[আজ] প্রেম যাচিবারে যাই। দেখি হারি কি হারাই,
যা থাকে কপালে হবে, তাতে ক্ষতি নাই ॥
আমার নয়নতারা, আমার নয়নতারা,
বেলেছো যে এত দিন, [আমি] দেখিব তাহাই !!

ভালবাসা জানা যাবে, কপটতা না রহিবে,
প্রণয়ও পরীক্ষা হবে, (আজ) দেখিবে জামাই ॥

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় রঙ্গভূমি।

রাধাকান্তবাবুর বাড়ি, মুক্তকেশীর শয়নঘর।

(মুক্তকেশী এবং রাইমণি আসীনা)

রাই—তুমি হয়ে এত সয়ে থাক। আমি হলে এত দিন যা মনে হত, তাই করতেম কা'র মুখের দিকে চাইতেম না। কয়েদির মত দুবেলা দুটা খাব, আর মনের আগুনে গুমরে মরব, একটি কথাও বলতে পারব না। বল তো এত কার প্রাণে সয়? আজকাল ঘরের বৌ হলেই যে চিরকাল মনের আগুনে জলেপুড়ে মরতে হবে, এত আর বিধাতা কপালে লিখে দেন নাই?

মুক্ত—বিধাতা যে লিখে দেন নাই, তাই বা কি করে বুঝতে পারি, শতকের মধ্যে যখন একটাও খুঁজে পাইনে, তখন আর অদৃষ্টের দোষ না দিয়ে কার দোষ দেব!

রাই—শুধু অদৃষ্টের দোষ দিলে হবে না, তোমার দোষ আছে! তুমি কি করে সয়ে থাক, আমি তা ভেবে উঠতে পারি না। এত কি করে চোখে দেখে সওয়া যায়।

মুক্ত—[মলিন মুখে] সৈ! আমার মনের কড়া তো তোমার কাছে কিছুই চাপা নাই। যখন যেভাবে রয়েছি তুমি সকলেই জান। আজকাল যে দুঃখে দিন-রাত যাচ্ছে, তা না জানতে পাচ্ছ এমন নয়। এ কি হল? এখন আর প্রাণে সয় না। আগে মাসান্তরে দুই-একদিন দেখা পেতাম, কোন কোন দিনে হাসি তামাসা করে দুই-একটা কথা বলতেন। আমি ভাবতেম যে আমার—আমারই আছে, সময় সময় মুখখানা দেখলেই আমার হল, সাধও মিটলো। যেমন চেয়েছি, তেমনি বিধি দিয়েছেন। সুখই কি আর দুঃখই কি? এখন এমন হয়েছে, দেখাশুনার নাম নেই। আমি যে একজন তাঁর বাড়িতে আছি, আমায় যে কখনও বিয়ে করেছিলেন, (ক্রন্দন) এ তাঁর মনে আছে কিনা সন্দেহ। চিরকাল আইবড় থাকতেম সেও ভাল ছিল, বিধবা হয়ে ঘরে রই-তেম, তাতেও দুঃখ হত না, থেকে—নেই, আমার আমার নয়, আমি যার,

সে পরের। আমি দিনরাত কাঁদি। সে মনেও করে না, এ দুঃখ আর কারে বলি।

রাই—তুমি আগে হাত খাট করে ঢিল দিয়ে ঠকেছ, মনে মনে জানতে আমিই সকল, আমি ভালবাসা। সময় সময় হেসে দুটো কথা বলতেন তাতেই আহ্লাদে গলে পড়তে। সৈ! পুরুষের মন পাওয়া ভার, তাদের চাতুরী আমাদের বুঝবার সাধ্য নাই। এ তো কথাই আছে, "নূতনে পোড়ে বন, পুরাতনে জ্বালাতন"। এর পর তুমি যেমন হাবা, একালে আব একটি জোড়া পাওয়া ভার। এখন কলি কাল, সোজা কথায় চলে না, হাবা মেয়ে হলে ভাতার জব্দ থাকে না; নরম গরম দুই চাই। কখনও ভয় দেখাতে হয়, ভরসাও দিতে হয়। আমি তো অনেক দিন থেকেই দেখে আসছি যদি কোন দিন রাগ করে মুখখানি ভার কবে বসে থাক, বাবু এসে দুট কথা বলতেই জল হয়ে গেলে, হাসি দেখে অমনি হেসে ফেলে সকল কথাই ভুলে বসলে, এতে ছাই আর কি হবে ?

মুক্ত—সৈ, মনের কথা বলি! মনে আঁচ কবি যে, আজ একখানা ক'বব, আবার ভাবি, যে আজ না হয় কাল করব, এই ভাবতে হঠাৎ একদিন তাঁর মুখখানি নজরে পড়লো সকলেই ভুলে যাই। হাসিমুখে দুট কথা শুনলে, আর আগের ভাব কিছুই মনে থাকে না।

রাই—তা বুঝেছি। অমন করেই তো তোমার মাথা তুমি খেয়েছ: বানরকে নাই দিলে মাথায়, তা জান।

মুক্ত—ছি, সৈ। স্বামী তাকে—

রাই—তা যাই বল, মনমোহিনীর কথা শোন নাই, আজকাল স্বামী বলে পূজা কল্লে চলে না, সে কালও নাই, তেমন স্বামীও নাই। এখনকার মদখোর আর বেশ্যাখোর স্বামী যে বানব হতেও বাড়া। তুমি যদি দুবেলা দু-ঘা কসে জুতো মারতে তাহলে এত করে মাথায় চড়ত না। মেয়ে বলি মনমোহিনী! যেমন বিষ তেমনি রোজা। একদিন কার বাড়িতে গিয়েছিল, এই কথা শুনে রসিকবাবুকে তো আচ্ছা করে বিষঝাড়া ঝেড়ে, সেই মাগীকে মা বলিয়ে ছেড়ে দিলে। চন্দ্রদাদা নেত্যর ঘরে বসে ইয়ার নিয়ে মজা করছিলেন, কুমুদিনী সেই রাত্রে বাড়ি হতে গোপনে বেরিয়ে নেত্যর ঘরের

কানাচি দাঁড়িয়ে বড় বড় করে বলতে লাগল ; চন্দ্রবাবু ! আমার স্বামী, আমি স্ত্রী, আপনি গোপনে এখানে লুকচুরি খেলচেন, আমি চল্লেম। চন্দ্রবাবু শুনে একেবারে কুমুদিনীর পা ধরে কতরকমে সেধে বাড়ি নিয়ে গেলেন। আর কখনো কা'র নাম করেন না।

মুক্ত—(কাতর স্বরে) যা হবার তা হয়েছে। সৈ ! এখন এর উপায় কি ? কত লোকের কাছে কত কথা শুনি। পাড়ার ছেলে মেয়ে আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে আর কত বলে। কেউ বলে তুইজন মদ খেয়ে পাগলের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। লজ্জা তো নাই, মান অপমান বলেও ভয় নাই। আবার শুনি যে, একদিন তুজনে মারামারি করে যা না বলতে পারে, তাও বলাবলি করেছে।

রাই—কি বলেছে, মা বাবা বলাবলি করেছে, এই তো ? ও কথা ত মাতালের আসল বোল। ও কথায় কিছুই গোল নাই। ভালবাসার ডাকই ঐ।

মুক্ত—মিছে নয়, আবার শুনি যে কিছুই না। যেমন তেমনি রয়েছে। ছি ! ছি ! কি ঘৃণা।

(নেপথ্যে)

জিতা রাও বাবা বৈতরণী পার হই, দেখে যেও, বাবা ! আঁধারেতে পা সাবধান, দেখে যেও। "দেখে যেও সোনার যাদু, (আমি) যাচ্ছি তোমার আঁচল ধরে। আঁধারেতে পা সরে না মাথার কিরে যারে ফিরে।।" ফিরে যাও—এ ব্রজরাই ফিরে যাও।

মুক্ত—এ যে বাবুর গলার আওয়াজ। এ কি ! বাড়ির মধ্যে আসছেন তবু যে গান থামচে না।

রাই—বুঝি বেশি করে খেয়েছেন, আজ বড়দিন, তু তিন বোতল খেয়ে ঢুলতে ঢুলতে গলাবাজি করে আসছেন, কথায় বেঠিক হচ্ছে, যা মুখে আসছে তাই বলছেন ! এই সময় আমি একটু আড়ালে যাই। সৈ ! মাতাল হলে মন বড় সাদা হয়। এই রেতে যে গান করতে করতে তোমার কাছে আসছেন, অবিশ্যি মনে পড়েছে, অবিশ্যি কিছু মনে হয়েছে। আমার মাথা খাও, আজ ছেড না, একটু ধল্লেই মনের কথা শুনতে পাবে। ঐ আসছেন, আড়ালে গিয়ে বসি।

(প্রস্থান)

[বোতল বগলে, গ্লাস হস্তে মাতাল অবস্থায় নয়নতারা এবং মদনবাবুর সহিত রাধাকান্তের প্রবেশ]

রাধা—[নয়নতারার প্রতি] প্রিয়ে ! এই বিবিসাহেবের ঘর, ঐ আমার ঘরের লক্ষ্মী। মদনদাদা ! ঐ আমার অঙ্কলক্ষ্মী, ঐ আমার মাথার মণি, ঐ আমার জাত-কুলমানরক্ষাকারিণী, ঐ আমার মুখপানে চাহিনী, (যাত্রার সুরে) ঐ বসে আছেন ! তোরা দেখ দেখ, দেখ একবার, চেয়ে দেখ। (হস্ত দ্বারা দর্শন) ঐ গগনের চাঁদ আমার ঘরে, একবার চেয়ে দেখ।

মুক্ত—পোড়া অদৃষ্টে আর কি আছে ? পরমেশ্বর ! এই দেখালে ? (পলাইতে উদ্যত)

রাধা—[বোতল গ্লাস রাখিয়া মুক্তকেশীকে ধারণ] ভয় পেয়েছ ? গা কাঁপছে যে ? ভয় নাই, ভয় নাই। চক্ষে জল পড়েছে ? ছি ছি ! আমায় লজ্জা দিলে ? ছি লক্ষ্মী ! আমার এয়ারে মজলিসে মাটি কল্লে। আমি এমন রসিক, এমন চতুর বাবা, আমার ঘরের গিন্নী ভয়খেক ? মানুষ দেখে, কেঁপে কেঁদে ফেললে ? ছি ছি ! চেয়ে দেখ, দেখ তোমার জোড়া মিলিয়ে এনেছি। কেষ্টঠাকুর মেয়েমানুষেরে হাতী সাজিয়ে, ঘোড়া সাজিয়ে, মজা করে চড়ে বেড়াতেন, আমি হাতি ঘোড়া করব না, তোমাদের যুড়ি হেঁকে বেলাতী চক্করে ঘুরব, এইটি বড় সাধ আছে। (মুক্তকেশীর হস্ত ধরিয়া উভয়ে উপবেশন) আমার কোলে বস, না না আমার মাথায় বস, মান করেছ ? সাজা কর, যা ইচ্ছে সাজা কর, মান ভাঙ্গুক। একটু মদ খাও দেখি, [গ্লাস লইয়া মুখের নিকট ধারণ] সব রাগ মাটি হবে। তুমি জান না ? এতে রাগ মাটি হয়। দ্বেষ, হিংসা মন থেকে দু'শ হাত সরে যায়, একবার খাও দেখি ?

নয়ন—কিরে ডেকরা পোড়ারমুখ ! এই দেখাতে আমায় এখানে নিয়ে এসেছিস ? আমি যাই, জামাই চল, আমার মাথা খাও, চল, [মদনবাবুর গায়ে ধাক্কা দিয়ে] চল, এখানে আর থাকব না।

রাধা—তুই বাবা ঘরে যা। আমি এই ঘরে থাকি।

নয়ন—(ক্রন্দন করিতে করিতে) তোর মনে এই ছিল, আমায় বাড়িতে এনে এত অপমান করলি, আমি এ প্রাণ রাখব না, আমি যাই, (যাইতে উদ্যত

এবং মদনবাবু কর্ত্তৃক ধারণ) জামাই, আমায় ধ'র না। আমি আজ গলায় দড়ি দেব। ও বেহায়া পাজি মাগ নিয়ে মজা করুক। তুমি ছাড়, গলায় দড়ি দেব।

রাধা—(ত্রস্তে মুক্তকেশীকে ছাড়িয়া নয়নতারাকে ধারণ) তুমি যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাব।

নয়ন—(রাধাকান্তকে পদাঘাত কবিয়া) তুই তোর মাগকে নিয়ে থাক। আমি তোব মুখ দেখবো না—আমি কখনও তোর মুখ দেখবো না।

রাধা—(যোড়করে) মাপ কর, আমি আব কখনও এ ঘরে আসব না, মুক্তকেশীব মুখ আব দেখব না। আমায মাপ কব।

মুক্ত—জাত গেল। লোকে এ কথা শুনে মুখে চুনকালি দেবে। তুমি যেখানে ছিলে, সেইখানে থাকাই ভাল ছিল। এভাবে কেন আমার বাড়িতে সর্ব্বনাশ করতে এয়েছ ? আর ঐ ভদ্রসন্তানকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে কি এই দেখালে ! আব গোল ক'ব না, যেখান হতে এয়েছ, সেইখানে চলে যাও।

নয়ন—দেখ পাজি ! কোন মুখে এখানে রয়েছিস। দূর দূর করে শেয়াল-কুকুরেব মতো তোকে তাডাচ্ছে, তবু তোব লজ্জা হচ্ছে না ?

রাধা—কার সাধ্য আমাকে তাডাতে পাবে। যে বলবে আমি তার মাথা ভাঙব। (তাডাতাড়ি গ্লাস লইয়া) এই বোতলেব বাড়িতে মাথা ভাঙব। [সজোরে মুক্তকেশীর দিকে গ্লাস নিক্ষেপ, গ্লাস মৃত্তিকায় পতন ও ভগ্ন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে] আমি মদ খাব কিসে ? আমার গ্লাস ভেঙে গেল, অ্যা আমাব গ্লাস দে। দে—দে—

নয়ন—ভাল চাও, তবে বাড়ি চল, না হয় জুতিয়ে মাথা ভাঙব।

মদন—(নয়নতারাব প্রতি) তুই বেটি ভারী পাজি। ভদ্রলোকের বাড়ি এসে—এ কি ? যা, তোব বাবাকে নিয়ে যা ইচ্ছে কর, আমি বাড়ি যাই।

নয়ন—ও দিকে যোগাড় হ'ল নাকি ? আমিই পাজি ! বেশ বললে।

রাধা—মদনবাবু ! একটু দাঁড়াও, তোমায় মারে কে ? আমি আজ ঘর থেকে যাব না। মুক্তকেশীকে তাড়িয়ে নয়নতারাকে এই পালঙ্কে শুইয়ে—তুমি আমি খাড়া পাহারা দেব।

নয়ন—তোর আর ভালবাসা দেখাতে হবে না, তুই চল।

রাধা—আচ্ছা, আমায় একটু ছেড়ে দেও, আমি এ ঘর থেকে মুক্তকেশী হারামজাদিকে তাড়িয়ে দিই।

নয়ন—যা বলতে হয়, এখান থেকেই বল, কাছে যেতে দেব না। মারতে গিয়ে কাছে দাঁড়ালেও আমার গা জ্বালা করে।

রাধা—তা আমি বেশ বুঝি, আমায় ছেড়ে দাও, দেখ তোমার মনের দুঃখ এমনি মেটাচ্ছি। ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও। (জোরে যাইতে উদ্যত ও নয়নতারা পশ্চাৎ হইতে পিরান এবং পিরান ছিঁড়িলে পরিধেয় ধারণ)

নয়ন—আবার যেতে চাও ? চল আর থাকতে পারব না। (গমনোদ্যত)

মুক্ত—(নিকটে যাইয়া) দেখ, তোমার দুখানি পায় ধরি, একটু দাঁড়িয়ে হতভাগিনীর দুটি কথা শুনে যাও।

রাধা—তোর কি কথা শুনবো রে প্রাণ ! তুই গাইতে জানিস নে, নাচতে জানিস নে, এমন বদরসিকের কথা রাধাকান্ত শুনতে পারে না।

মুক্ত—তা হক, আমি স্ত্রী, আমার একটি কথা শুনে যাও (চরণ ধরিতে উদ্যত) অভাগিনীর দুঃখের কথা শুনে যাও।

রাধা—(সজোরে পদাঘাত করিয়া) এই শুনি।

[মদনবাবুর প্রস্থান

নয়ন—জামাই ! দাঁড়াও, আমরাও আসছি, আর দুই-এক ঘা দেখে গেলে না ?

মুক্ত—এমন করে এদের সামনে অপমান করলে ?

রাধা—আমায় আর শেখাতে হবে না। নয়নতারা ছেড়ে দেয় না বলে বেঁচে গেলি। যদি বাঁচি তবে কাল এসে—

[উভয়ের প্রস্থান

মুক্ত—রে কপাল ! (ক্রন্দন)

(রাইমণির প্রবেশ)

রাই—[বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা মুক্তকেশীর মুখ মুছাইয়া] তোমার দোষে তুমি কাঁদবে, এর উপায় কি ? সে পোড়াকপালি দু'শভাতারী এত কথা বলে গেল, তুমি তো একটি কথাও বললে না।

মুক্ত—আমার কি বলবার সাধ্য আছে ? ভাবলেম কি হল কি, হল কি ? ও সাত-

জনের মন যোগায়, কতরকমের কথা ওর পেটে আছে, নিত্য নূতন কথা ওর মুখে, এক কথা কয়ে কি দু'শ কথা শুনবো। (ক্রন্দন করিতে করিতে) সই! এক ঘরের মেয়ে বলে, মা-বাপের কাছে বড আদরে ছিলাম। ছোটবেলায় কত আবদার করেছি, কত জিনিসপত্র ভেঙ্গেচুরে ছাই করেছি, কেউ আমায় দূর কথাটি বলে নাই। বলতে পারে নাই। সুখে থাকব আশাতেই বড়লোকের ঘরে বিয়ে হয়েছিল, অদেষ্টের গুণে তার ফল তো চক্ষেই দেখলে? বিধাতা যার বিমুখ তার হাতে সোনার টাকা তুলে দিলেও অদেষ্টগুণে তামা হয়, ভাল কথা বললেও মন্দ হয়ে পড়ে। যা কপালে ছিল হয়ে গেল, এখন যাতে ভাল হয়, যাতে পোড়ারমুখোর মুখ আর না দেখতে হয়, তারই সোজা পথ দেখিয়ে দাও। আজ রেতে এই হল, আবার কাল তাকে এই মুখ দেখাব? আর কি আশায় থাকব? দোরে দোরে যদি ভিক্ষে করে খাই, সেও আমার ভাল, এখন এর উপায় কি? যদি না পার, যদি উপায় না বলতে পার, তবে যাতে লোকালয়ে আর মুখ দেখাতে না হয়, তারই উপায় করে দাও। আর যদি মুখ দেখাতেই হয়, তবে যাতে ওর মুখে চুনকালি পড়ে, দশজনে দেখে হাসে, না হয় তারই উপায় করে দাও। স্বামী বলে যে তার মুখপানে চেয়ে থাকবো, তার কুলে খোঁটা হবে বলে যে কুল মজাতে পিছে হাটবো, তা মনেও কর না। জাত, কুল, মান, ধর্মের দিকে আর তাকাব না। কার জন্যে? যে আমার হল না, আমি তার হব কেন?

রাই—এখন পথে এস, যদি মন বেঁধে সাহসে ভর করে দাঁড়াতে পার, তবে আর ভাবনা কি?

মুক্ত—কেন দাঁড়াব না? এতদিন তো দেখলেম, মেয়ে-পরানে যা সয় না, তা সয়েও মন যুগিয়ে চল্লেম, দেখি কি হয়? আমার দায়, তার গায়েই বাধল না। তবে আর কেন? পেটের সন্তানসন্ততি নাই যে, তারা লজ্জা পাবে। তবে মা-বাপের যেমন কাজ তেমনি ফলভোগ করবেন, আমার কি?

রাই—এত উতালা হচ্ছো কেন? মন যখন ভেঙ্গে গেছে, তখন এর উপায় করে দিচ্ছি। আজ রাত্রে আর কি হবে? আজ আমি বাড়ি যাই, কাল সকালে এসে যা হয় বলে দেব। আজকার রাতটে কোন গতিকে সয়ে থাকতে হচ্ছে।

মুক্ত—সই ! তুমিও আজ ফেলে যাবে ? আমার মাথা খাও, আজ এইখানে থাক। দুই সযে একত্র শুয়ে 'এর উপায় কি ?' আজই শুনব। কাল আসবে বলে গেছে, আজই স্থির করা চাই।

রাই—আচ্ছা, তবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান]

পটাক্ষেপণ

তৃতীয় রঙ্গভূমি

নয়নতারার শয়নঘর

(রাধাকান্ত এবং মদনবাবু আসীন)

মদন—ও কথা আর শুনি না। একেবারে অধঃপাতে গেছেন। কাল রাত্রি যা করেছেন, তা বোধহয় কেউ করতে পারে না।

রাধা—(বাঁয়ায় টোকা দিতে দিতে ঈষদ্ধাস্যে) মুক্তকেশী কিছু ঘুষঘাস দিয়েছে ? না গোপনে যেতে বলেছে ? বাবা ! শাশুড়ীর কথা যে একেবারে ভুলে গেলে ?

মদন—আপনি যদি এভাবে কথার উত্তর করেন, তবে চুপ কল্লেম।

রাধা—তোমার মতো নিমকহারাম তো দুটি দেখা যায় না। যার খাও, যার নামে তরে যাও, যার ঘরে বসে দু'দণ্ড আমোদ কর, যে তোমায় এত ভালবাসে, এখনও যার ঘরে বসে রয়েছ, তারই নিন্দা তোমার মুখে ! তোমার চক্ষে মুক্তকেশীকে ভাল লেগে থাকে, স্বচ্ছন্দে ঘরে নিয়ে এসো। না হয় ঘরে যাও। কেউ রোখবার নাই, খোলা মহল দেদার লোট !

মদন—আর কি বলবেন ? সকল দিকেই দেখতে হয়। চিরকালটা মদ খেয়ে রাঁড়ের বাড়ি পড়ে থাকবেন, ঘরের কথা মুখে আনবেন না। ছি ছি ! কেউ কি মদ খায় না, না বেশ্যা রাখে না ?

রাধা—রাখে বই কি, বল ?

মদন—আমরা আর কি বলতে পারি। সাধ্বী সতী স্ত্রীকে অনায়াসে ছেড়ে দিলেন, নয়নতারা বারোজনের মন যোগায়, তার মাথাটা ছাড়তে পাল্লেন না ?

রাধা—আমি তো আর হাবা ছেলে নই যে ঐ কথায় পড়ে যাব। আমি ছেড়ে দেই আর তুমি গিয়ে দখল কর।

মদন—আপনি বলতে পারেন। বলুন তো, বেশ্যা কার বাবা-কেলে বিশ্বাসের ধন। হাজার ভালবাসেন, দিনরাত পায়ের ধূলা মাথায় করে ঝাড়েন, সোনার টাকা দিয়ে প্রতিদিন পূজা করেন, তবু ফাঁক পেলে উপরিলাভ হাত করবেই করবে।

রাধা—সকলে নয়।

মদন—খুঁজলে পাওয়া ভার। আপনি জানেন আপনার নয়নতারা আপনাকেই জানে?

রাধা—[কিঞ্চিৎ রাগতভাবে বায়াঁ রাখিয়া] জানি বই কি? আমি দিব্বি করে বলতে পারি কারও ঘরের মাগও নয়নতারার মত সতী নয়। আগে যাই করুক, এখন সে বেশ্যা নাই।

মদন—যাক, আপনার সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে আসি নাই। যা ইচ্ছা করুন, দয়া করে দুই গ্লাস খেতে দিবেন বস্।

রাধা—এখন সোজা পথে এসো, বাজে কথার দরকার কি? [সম্মুখস্থ বোতল হইতে গ্লাসে মদ ঢালিতে উদ্যত] না এতে কিছুই নাই, ভগবান ভাব, দেখ বড়বউ কি করে আসেন।

মদন—শাশুড়ী যে নিজেই।—

রাধা—দশটা বাজলে দোকানী বেটারা কি আর পুরুষের হাতে মদ দেয়? জগা দুবার ফিরে এসেছে বলে তিনি নিজেই রেগে গেছেন। আমি সঙ্গে যেতে চাইলাম, তা বললে যে আর তোমার গিয়ে কাজ নেই।

মদন—এই তো ঠাকুর চাতুরী বুঝিতে পার নাই।

শতজন মন তারা কথায় যোগায়।
একমন পরিতোষ করিছ কোথায়?
একজন আলে তারা কখনই থাকে না।
একের অভাব হলে কিছুই ভাবে না।
এ-কেবল তোমার নয় ও নয়নতারা।
কতজনে বলে মোর নয়নের তারা॥
কার তারা কে বলিবে, তারা কার নয়।
কেবল অর্থের সনে তারার প্রণয়॥

নেপথ্যে—[মলের শব্দ করিয়া] এমন লোকের হাতেও পড়েছি, এত করে মন যোগাই তবু মন পাইনে।

রাধা—[মদনবাবুর প্রতি] এখন তো আর সম্মুখে নাই—শোন, অগোচরে কি বলে। মন থেকে খাঁটি করে না বেরোলে কি আর অসাক্ষাতে বলছে ?

(বোতল হস্তে নয়নতারার প্রবেশ)

নয়ন—এই নেও (বোতল রাখিয়া) পথে আসতে বড় ভয় পেয়েছি। মেঘে এমন অন্ধকার হয়েছে যে কোলের মানুষ চক্ষে দেখা যায় না। দুই-এক ফোঁটা জল পড়ে আরও জ্বালাতন করেছে। যে জগা সঙ্গে গিয়েছিল সে বেটা আমা হতে ভয়খেক। মেঘের ডাক ও বিদ্যুতের চকমকি দেখে জড়িয়ে ধরে।

রাধা—বড়বউ, আমার জন্য বড়ই কষ্ট পেয়েছ। আমি এ কথা আজীবন ভুলব না, বস, তোমার মাথার জল মুছিয়ে দি।

নয়ন—(মুখ বাঁকা করিয়া) থাক, আপনার আর আদর করে কাজ নেই। আমিই মুছি। (অঞ্চল দিয়া মাথা মোছন)

রাধা—[নয়নতারার প্রতি] দেখ, তোমার জামাই আজ তোমার যে নিন্দে করেছে, তা শুনে মরা মানুষেরও রাগ হয়! মুক্তকেশীকে কাল তোমার কথায় মেরেছি, তাইতে আমি তো আর মানুষের মধ্যেই নেই। আর তোমার নামে একেবারে দুশ ঝেঁটা।

নয়ন—ওদের কথা মুখে আনতে নেই, অমন নিমকহারামদের কথা শুনতে আছে ? ওরা যে পাতে খায় সেই পাতই ফুটো করে। বাবা! ওদের খুরে নমস্কার (যোড়করে নমস্কার)

মদন—শাশুড়ী! তুমিও যে পাগল হলে। আমি নিন্দে করব ? আমি বার-বিলাসিনীদের দুই-একটি কথা বলেছি। তুমি তো আর তা নও ? শাশুড়ী, আমার মাথা খাও, বাবুর কথায় কান দিও না। (আপন হাতে ঢেলে) এঁটো করে একটু দেও, খেয়ে বাড়ি যাই।

রাধা—যাবে কোথায় ? ভয় পেয়েছ ? বড়বউর এককথাতেই দশ হাত সরে গেলে ? [মদ ঢালিয়া] খাও—লক্ষ্মী আমার। ঢোকে ঢোকে গেলো।

নয়ন—আপনি কেন দিচ্ছেন! আমি এঁটো করে হাতে দিচ্ছি। ও যা বলেছে তাই করি, জামাই আমার মানিক-অঙ্গুরী। যখন যার তখনই তার। মন

হ'ল স্বর্গেই তুললেন আবার মন হ'ল দশ হাত মাটিতেই বসিয়ে দিলেন। পাগল মন। [মদ এঁটো করিয়া মদনবাবুর হস্তে দান] বিস্তি কাবার করো তো জামাই। আমাব এঁটো যে খাবে, তার জন্যে স্বর্গের সিঁড়ি দিনরাত খোলা থাকবে। (বেহালার এক দুই তিন সুরেব সহিত, জামাই আমার মাথা খাও, খাও মাথা খাও, খাও, দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া নৃত্যসমন্বয়ের ভঙ্গিব সহিত)

মদন—এক অঙ্গ বাকি থাকলো তাতেই যা হোক। শাশুড়ী, আমাব হাতে ঢালো, নেই।

নয়ন—ছুঁয়ে দিয়েছি।

মদন—ছুঁলে কি হয়? যাক, আবও দিন. আছে, [মদ্যপান] একটা গান মনে হয়েছে, বলবো?

নয়ন—নিয়ম ভাঙ্গ কেন? জান তিনেতেই সব। তিন বার হোক।

রাধা—তবে চালাই—(মদ ঢালিয়া পান)

নয়ন—আপন হাত জগন্নাথ: আমি শালা কি চোব? (মদ ঢালিয়া পান)

মদন—[ত্রস্তে বোতল গ্লাস লইয়া] এবারে আমি [মদ ঢালিয়া পান]

রাধা—[ত্রস্তে বোতল গ্লাস লইয়া] নিয়মরক্ষা তো হয়েছে। ফের বড়বউ [মদ ঢালিয়া নয়নতারার হস্তে দান]

নয়ন—বন্দিগী ' [মুসলমানি ধবনে মাথা নওয়াইয়া সেলাম করিয়া মদ্যপান]

মদন—[ত্রস্তে গ্লাস লইয়া] ফের বাজি বড়বাবু! [মদ্য ঢালিয়া রাধাকান্তবাবুর হস্তে দান]

রাধা—জিতা রাও বাবা! গুড হেল্‌থ বড়বউ। [মদ্যপান]

নয়ন—আমি বুঝি ফাঁক যাব? [ত্রস্তে বোতল গ্লাস লইয়া] ফের লাগ জামাই (মদ ঢালিয়া মদনবাবুর হস্তে দান)

মদন—অল রাইট. ঘণ্টা মাব (মদ্যপান) গাড়ি উড়েছে।

নয়ন—মদও উড়েছে [বোতলে ফুঁ দিয়ে দূরে নিক্ষেপ]

রাধা—এখন আব কি?

নয়ন—যা ইচ্ছে।

মদন—আপনাদেবই হোক।

নয়ন—তাতে কম পাবে না, জামাই, বাজাও তো (গানারম্ভ)

পিলু-জং

নয়নেরই অনুরোধে যারে প্রাণ সঁপিলাম (আমি)
সে আমার হলো না কেন ? ঐ খেদে মরিলাম
অন্য আশা ছেড়ে দিয়ে তারি প্রেমে মজিলাম।
তবু সে চাহে না আমায় একি দায়ে ঠেকিলাম।
প্রেমজ্বরা লোকেরই মুখে এতদিন যা শুনিলাম।
সাধেরই পিরিতে মজে স্বচক্ষে তা দেখিলাম॥

মদন—(তালের সহিত) বাবা বেশ। বেশ ভেলকি। বাঃ শাশুড়ী ' মনের কথাই খুলে বলেছ।

রাধা—[গুন গুন করিয়া গান করিতে চেষ্টা]

মদন—হুঁ হুঁ করলে চলে না। তানা নানা কর, যা কর আর হবে না। এর উত্তর নাই বাবা।

রাধা—মনে হয়, আবার হয় না।

মদন—তা বোঝা গেছে। বলুন আমি উত্তর করি।

নয়ন—আজ উত্তরে কাজ নেই। একটা কথা শোন (কানে কানে প্রকাশ)

মদন—হাজির আছি।

নয়ন—ভুলো না। আমার মাথা খাও, এসো।

রাধা—বড়বউ, আমার কানে একটা কথা বল। (নিকটে যাইয়া) আমার কানে একটা মন্ত্র দেও।

নয়ন—যে মন্ত্র দিয়েছি তাই তো আগে সেধে ওঠ। যত কথা আজই জানা যাবে।

মদন—(গাত্রোত্থান করিয়া) গুডনাইট টু অল্। আর থাকতে পারি না। এত রাত হয়েছে আজ আর কথা নেই। গিন্নি ঝাঁটা হাতে করেই আছেন। ক ঘা যে খেতে হবে তা গিন্নীর হাত, আর আমার কপাল। (নৃত্য করিতে করিতে গান)

খেমটা

কি বলে দাঁড়াব তাহারই কাছে (ওলো সই)
ঘড়িতে ঢং ঢং বাজিয়া গেছে
দশে দশ ঝাঁটার বাড়ি

বাইরে যাই গড়াগড়ি,
না জানি ভাগ্যে
আজি কি যেন আছে (ওলো সই)।

[প্রস্থান

নয়ন—(ক্ষণকাল পর) আর কথা কি ? রাত তো আর কম হয় নাই ?

রাধা—কথা আর কি ? (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) যাই।

নয়ন—না পার খুলে বল। তুমি যে তার মায়া ছাড়তে পারবে না, তা আমার বেশ জানা আছে।

রাধা—একেবারে প্রাণে মারতে।—

নয়ন—(ক্রোধে) তবে আমি মরি। তোমার মুক্তকেশী বেঁচে থাক। তোমার ভালবাসা বেঁচে থাক। আমি তার পরানের কাল হয়েছি, তাইতে তোমারও চক্ষের শূল হয়েছি। আর কাজ নেই, আমি গলায় ছুরি দিয়ে মরব। (ত্রস্তে হাতবাক্স হইতে ছুরি লইয়া গলাস্পর্শ) এই ছুরি। তুমি—

রাধা—(ব্যস্তে নয়নতারার হাত ধরিয়া) ছি ছি. এ কি ? তুমি কি আমার সর্ব্বনাশ করবে ?

নয়ন—হাত ছাড়, আমি যা বলেছি তাই করবো।

রাধা—ছুরি ছাড়।

নয়ন—আবার তোর কথায় ভুলবো ? কাল এককথা আজ এক কথা ? পাজি ! আমি তোর মুখ আর দেখবো না। [দুই পা সজোরে আছড়াইয়া ঈষৎ ক্রন্দন-স্বরে] আমি এ প্রাণ আর রাখবো না [ছুরির উলটা পিঠে গলা কাটিতে উদ্যত] এখন মরি, সব মিটে যাক।

রাধা—তুমি কি পাগল হয়েছ ? (কাঁপিতে কাঁপিতে) ছুরি ছাড়। আমি সত্যি সত্যি বলছি এই ছুরি দিয়ে মুক্তকেশীর গলা কাটব (ছুরি কাড়িয়া লইয়া) তোমার অসাধ্য তো কিছুই নাই। সর্ব্বনাশ ! কি সর্ব্বনেশে রাগ !

নয়ন—[কান্দিতে কান্দিতে] ছুরি নিলে কি হবে ? আমি আজই গলায় দড়ি দিয়ে মরব। এখন বুঝি অন্তরে ঘা লেগেছে ? (কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ) যাও, তোমার মুক্তকেশীকেও মেরে কাজ নেই, আমার বাড়িতে এসেও আর দরকার নেই। আমি—

রাধা—আমি ধর্ম্মতঃ বলছি, এই তোমার, গা ছুয়ে বলছি, মুক্তকেশীকে আজ খুন করব। নিশ্চয়ই খুন করব। যদি তুমি দেখতে চাও রক্তসুদ্ধ ছুরি এনে তোমায় দেখাব। তোমার পায়ে ধরি, কেন্দো না। (পদধারন)

নয়ন—(পদাঘাত করিয়া কিঞ্চিৎ জোরে কান্দিতে কান্দিতে) তোর কথা আবার শুনব ? আমি এ প্রাণ রাখব না।

রাধা—আমি চললেম, মুক্তকেশীকে খুন করতে এখনই চললেম। যা বলেছি তাই করবো। মুক্তকেশীকে খুন করব (গাত্রোত্থান) মারব, খুন করবো। মুক্ত-কেশীকে খুন করবো তাতে আমার কি ?—(পদচারণ করিতে করিতে) সে বেঁচে থাকলে আমার প্রাণকে হারাবো, নয়নতারাকে হারাবো। কপালে যাই থাক চললেম। (ছুরি লইয়া বেগে প্রস্থান)

নয়ন—[শয্যা হইতে উঠিয়া দুই-তিন পদ অগ্রসর, একটু উচ্চৈঃস্বরে] দেখ ! মিছে-মিছি ঘরে ফিরে এলে, আর আমায় জীয়ন্ত পাবে না। (ঘরের জিনিসপত্র শৃঙ্খলা করিয়া রাখিতে রাখিতে স্বগত) মুক্তকেশী গেলেই এদিকের পথ খুলাশা হয়। আর যাবে কোথা ? নয়নতারা ঝাঁটা মারবে আর দুহাতে লুটবে। ওর যা যা আছে সকলই হাত কবব। মুক্তকেশীর ভাল ভাল অলঙ্কার আছে শুনেছি, সেগুলো তো কালকেই হাত করব। এখন একটু আড় কবে বসে যা ইচ্ছা তাই করতে পারব। এখনও কি আমি হাবা আছি ? মা'র চেয়ে ঝি যে দু'হাত বেড়ে গেল, তবু মার কান্দনি গেল না। যারে পান তারেই বলেন, আমার নয়নতারা বড় হাবা (উচ্চৈঃস্বরে) মা ! ও মা ! ঘুমেয়েছিস্ নাকি ? আমি একা একা বসে থাকতে পারিনে, আমার ভয় করে।

নেপথ্যে—এদিকে আয় না ? দেখ না কে যেন ডাকছে !

নয়ন—আমি যেতে পারিনে। যে ডাকে সে কি পথ চেনে না ?

দ্বিতীয়বার নেপথ্যে—তোর আর নবাবি দেখে বাঁচিনে। সে পথ চিনুক আর না চিনুক, আমি ডাকছি তুই উঠতে পাললিনে ?

নয়ন —কোন্ বেটা নবাবপুত্র এসেছে যে এগিয়ে না আনলে আর আসতে পারেন না। আমি যেন ঘরের মাগ হয়ে পড়েছি। [জোরে পদনিক্ষেপ করিতে করিতে গমন] নেপথ্যে—পথ ভুলেছেন নাকি ? মাপ করবেন। [নগেন্দ্র-বাবুর পরিধেয় ধরিয়া নয়নতারার পুনঃপ্রবেশ]

নয়ন —রঙ্গরসভরা এই তারারঙ্গভূমি।
মন খুলে বোসে দুশ মজা কর তুমি ॥

(নগেন্দ্রবাবুকে সাদরে বসাইয়া উপবেশন)

নগে—বলিহারি যাই, কবিতা বলতেও শিখেছ ?

নয়ন—চিরকালই কি সমান থাকে ?

নগে—ভাল আছ তো তুমি ?

নয়ন—এতদিন পরে 'তুমি' ডাক শুনলেম সেও ভাল। সই, বন্ধু, ভালবাসা, বসকে, জননী, দিদি, শাশুড়ী, বড়বউ, আবার কেউ আদর করে নূতন যৌবন দেখেও বুড়ি বলে ভালবাসার ডাক ডাকে, তুমি সেই নূতন ডাক 'তুমি' কথা বের করে যে কত মজা করেছ তা আর বলতে পারি না। যে শুনে সেই বলে লোকটা তো ভারি রসিক ' কতজনে দেখতে চায়।

নগে—দেখালেই পার।

নয়ন—পাই কোথা। যখন মন চায় তখন পাই কোথা ? আপনি হলেন বিচারকর্তা হাকিম, আপনার বার পাওয়াও সোজা কথা নয়। এতদিন পরে যে মনে পড়েছে, সেও ভাল।

নগে—এতদিন পরে কি ? গেছে · নিবারেও তো এসেছি, 'তুমি' যে রাধাকান্ত-বাবু পেয়েছ, তাতে কি আর কা'র দখল পাবার কথা আছে ?

নয়ন—ও পোড়ামুখোর কথা বলবেন না, মুখে আনবেন না। ওর নাম শুনলে আমার গায়ে আগুন জ্বলে। দিন দুই এসেছিল, তাতেই কি একেবারে তার বাঁধা হয়ে পড়েছি, না তার পিরীতে মজেছি! ঝাঁটাখেক, না নথিখোর আমার বাড়ি বই আর চক্ষে দেখে না। 'তুমি' কি বলব, আজ ক'দিন হ'ল খড়মপেটা করে একেবারে দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছি, আর আসবে না। আমিও বাড়ি ঢুকতে দেব না।

নগে—দেখা যাবে, ক'দিন ?—

নয়ন—আর নয়। যাক, ও কথায় আর কাজ নেই। আজকাল দেখতে পাইনে কেন ? আমরা নাচতে জানিনে, গাইতে জানিনে, দেখতেও ভাল নয়, তাই বলে কি আর দেখা দিতে নেই। কালো বলে ঘৃণা করে কি আর দু'দণ্ড কাছে বসতে নাই ?

নগে—দেখ ভাই, পরের চাকুরি করি, চারদিক নজর রেখে চলতে হয়। তোমার বাড়িতে আসতে কি আমার ওজর আছে ? এত কাজ ! দিনরাত খাটি তবু অবসর পাইনে।

নয়ন—কবে বা ডেকেই পাঠালেন ? তোমরা হুগলি কলেজের পড়ো, তোমাদের চালাকি আর বদমাইশির কি অন্ত আছে ?

নগে—হুগলি কলেজের দোষ দিও না। বড় কষ্টের চাকুরি ! ঘোড়ায় চড়তে জানি না তিন ক্রোশ পথ এক দোমে হেঁটেছি। সাঁতরিয়ে গঙ্গা পার হয়েছি, উল্টে উল্টে বাজি করেছি, দশ-বার হাত উপরে বাদুরঝোলা ঝুলেছি। চাপদেড়ে খোয়েটের কত বকুনি খেয়েছি। ওর দাড়িনাড়া দেখলেই আমার গা কাঁপত। এখন বলতে হাসি পায়, দুঃখও হয়। টামসন ডাক্তারে কত কি ধরে, পরীক্ষা করে ভাল শরীর বলে সার্টিফিকেট দিয়েছে। এত কাণ্ডকারখানার পর হুজুর ক্যাম্বেল বাহাদুর দয়া করে সব-ডিপুটি খেতাব দিয়ে চাকুরি দিয়েচেন।

নয়ন—বেশ হয়েছে। 'তুমি' যে এখন খেতে পায় না তার উপায় কি ? ছেলের দর বেড়েছে, এতে আর বাঁচবার ভরসা নাই। এক পেট হলে ভিক্ষা করেই চালাতে পারতেম।

নগে—ভয় কি ? রাধাকান্তবাবুর এত টাকা খাবে কে ?

নয়ন—আপনি বললে নাচার। যাকে দেখতে পারিনে, যাকে ভালবাসিনে, যার নামে দু'শ খেঙ্গরা, তারই কথা !

নগে—না, আর বলব না—আজ আমার বাসায় চল।

নয়ন—এত ভাগ্যি হবে !

নেপথ্যে—শাশুড়ী ! ও শাশুড়ী ! ঘুমিয়েছ ?

নগে—কে ডাকে ?

নয়ন—কি জানি।

নগে—বেশ, শাশুড়ী বলে ডাকছে, চেন না ?

নয়ন—আসলেই নেই, তার আবার শাশুড়ী।

দ্বিতীয়বার নেপথ্যে—শাশুড়ী ! জেগে আছ কি ?

নয়ন—শুধু শাশুড়ী বললে চলবে না, নাম বল।

তৃতীয়বার নেপথ্যে—নাম বলতে লজ্জা করে।

নয়ন—তবে জামাই ! সোজা পথ দেখ। শশুরঘরে।

নগে—তোমার জানা লোক হয়, আর আমাকেও যদি না চেনে, তবে ডেকে আন।

নয়ন—দুই গুণ একত্রে পাওয়া বড় দায়। দেখি—(দোরের নিকট যাইয়া হাস্য

করিতে করিতে) বেশ ! বেশ ! জামাই যে ! আরে কবে এলে ? এস এস, বাবা এস। মেয়ে ভাল আছে তো ?

(মদনবাবুর সহিত নয়নতারার প্রবেশ এবং নগেন্দ্রবাবুর কাপড দিয়া নিজ মুখ আবরণ)

মদন—(নয়নতারার প্রতি ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা)

নয়ন—(কানে কানে প্রকাশ)

মদন—আর ঢাকবেন না, চিনেচি। চাঁদের আলো কি কাপড়ে ঢাকা পড়ে ? আজ ধরা পড়েছেন। এ তো সিভিল সার্ভিস ক্লাস নয় যে নোবলিটিব সার্টি-ফিয়কট না দিলে ঢোকবার জো নাই। এ কলিকাতার জাত্নঘর। তাতেও রবিবার আর সকাল-বিকাল আছে। হুজুর, এ হাবড়ার স্টেশন বললেও হয়, ময়ূরপঙ্খী বললেও হয়। পয়সা দিলে আব কথা নেই।

নগে—(কাপড ফেলিয়া হাসিতে হাসিতে) আমি আজ আপনাকেই দেখতে এসেছি। আপনাব ধর্ম্মজ্ঞান, জিতেন্দ্রিয় মরকান্নার ধ্যান, তারই পরীক্ষা করতে এসেছি।

মদন—হুজুর ! তবে ঠকেছি।

নয়ন—জগা—ও জগা ! তামাক সেজে আন। আর সেখানে গিযেছিলে ?

নেপথ্যে—না—

মদন—শাশুডী ! আজ যে ভারি আংবামুখো দেখতে পাচ্ছি—মার ধর হেন ত্যান সাত সতেব, এ আবাব কি ?

নয়ন—চুপ কর, ব'ক না।

(তামাক লইয়া জগার প্রবেশ)

জগা—এদেব চক্ষে তো আজ ঘুম নেই। রাত ফরসা হয়ে এল, তবু ঘুমায় না। খাটতে খাটতে প্রাণটা গেল ! [কলিকায় ফুঁ দিয়ে নয়নতারার হস্তে হুঁকা দান]

মদন—কি জগন্নাথ ! মুখে যে খৈ ফুটচে। পেটে ভাত গিয়েছে তো ?

জগা—নেও, তোমার আর সে কথা শুধিয়ে কাজ নেই। (নগেন্দ্রবাবুর প্রতি) বাবুমশাই, একখানা কাপড় দিতে হবে। শীতে আর বাঁচিনে। কাঁপিতে কাঁপিতে মরে গেলুম বাবুমশাই।

মদন—তোর বড়বাবু দেবে ?

জগা—আর দিয়ে কাজ নেই। আপনারা দিলে দশ জায়গায় দেখাব।

নগে—দশ জায়গায় দেখিয়ে আর কাজ নাই। আচ্ছা, পাবে।

জগা—(গড হইয়া প্রণাম করিয়া প্রস্থান)

নগে—(নয়নতারার প্রতি) এখন আর কি—যাই।

নয়ন—যে আজ্ঞা—

নগে—(গাত্রোত্থান করিয়া মদনবাবুর প্রতি) মহাশয়, কিছু মনে করবেন না, চললেম।

মদন—আপনি মহৎ ব্যক্তি। আমাদের হাকিম,—নমস্কার।

নগে—[যাইতে যাইতে] নমস্কার নমস্কার।

[প্রস্থান]

নয়ন—জামাই ব'সো, আমি আসচি।

মদন—কোথায় ?

নয়ন—এই আসছি, তুমি একটু ব'সো, আমি আসচি—মাথা খাও, যেও না।

[প্রস্থান]

মদন—একবার ঝ্যাটা খেয়ে এসেছি, আবার কোথা যাব ? (স্বগত) বাবু লোভে পড়ে এত টাকা দিয়েও নয়নতারার মন পান নেই। শক্তের কাছে কিছুই নয়। জগা, ও জগা। তামাক আন।

নেপথ্যে—যাও মশাই। জগাকে আর ভুগিও না।

মদন—শুনে যা না। কথা না শুনিস তোর মায়ের কাছে বলে দেব।

(জগার প্রবেশ)

জগা—মা কি আর আজ আসবে যে ব'লে দেবে ?

মদন—সে যে এখনি আসবে ব'লে গেল ?

জগা—তুমিও যেমন পাগল। আসবে বলে গেছে সেই কথায় ভুলে রয়েছ। আমাকে বলে গেছে, বড়বাবু এলে বলিস যে তোমারই খোঁজে বেরিয়েছে।

মদন—ডিপুটিবাবুর বাসায় গেছে ?

জগা—আমি ডিপুটিবাবু চিনিনে; ঐ যে দাড়িমুখ হাকিম—তারই হাত ধরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে—তার সঙ্গে গেছে কিনা জানি না।

মদন—(গালে হাত দিয়া নিস্তব্ধ)

জগা—ভাব কি ? সে আজ আর আসবে না।

মদন—কি পাজি ! এদের একটি কথায় বিশ্বাস নাই। আমি কত দেশ পুড়িয়ে এলেম। আমাকেও দেখি জব্দ কললে, আর কখনও না, এই নাকে কানে —আর কখন না—আর না— (রাগ-ভাবে প্রস্থান)

জগা—বয়ে গেলো, নয়নতারা তো আর বাঁচবে না ? তার—(প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া প্রস্থান)

চতুর্থ রঙ্গভূমি

রাধাকান্তবাবুর বাড়ি, মুক্তকেশীর শয়নঘর।

(মুক্তকেশী ও অপরিচিত একজন পুরুষ আসীন)

পুরু—তাতে আর কি হবে ?

মুক্ত—আর কি হবে ? যা কপালে ছিল তাই হলো। এর বাড়া আর কি হবে ?

পুরু—বাবু এই পালঙ্কে শুতেন ?

মুক্ত—মনে হয় না ?

পুরু—(হাসিতে হাসিতে শয়নের চেষ্টা) তবে সকলই নূতন। হলো ভাল। এস, তুমিও শোও। (শয়ন)

মুক্ত—(পালঙ্কের পার্শ্বে বসিয়া অধোবদনে চিন্তা)

পুরু—যা করতে হবে তাতে আবার ভাবনা কি ? দেখছ না, রাত অনেক হয়েছে। শোও।

মুক্ত—(শয়ন করিতে করিতে) কপালে যা ছিল তাতো হলো দেখি ! (পুরুষের বাম-পার্শ্বে শয়ন এবং কিছুকাল পরে ছুরি-হস্তে রাধাকান্তের প্রবেশ)

রাধা—(দোরে দাঁড়াইয়া চুপে চুপে স্বগত) ঘুমিয়েছে, না জেগে আছে ? [মস্তক উত্তোলন করিয়া দৃষ্টি] কৈ কোন সাড়া-শব্দ তো পাই না। জাগাব ? নয়ন-তারার মন যোগাতে ঘরের স্ত্রীকে—না—পারব না। (একটু অগ্রসর) নয়নতারার কথায় মারতে ইচ্ছে হয়েছিল, এখন এমন হলো কেন ? কি করি [চিন্তা] দূর দূর, ফিরে যাই ! [প্রস্থান এবং ক্ষণকাল পরে পুনঃপ্রবেশ] নয়নতারাকে তো আর পাব না। কিছু না করে শুধু শুধু ফিরে গেলে প্রাণের তারাকে তো আর পাব না ? কে জানবে ? কেই বা বিশ্বাস করবে ?

মারবো—একেবারেই কাজ নিকেশ করবো। মারবই—এক দিক তো ফরসা করে দেই। একবার মুখখানা দেখে নেই। জন্মের মতো মুখখানা দেখে নেই। চিরদুঃখিনীর মুখখানা দেখে নেই। দেখব? মুখ দেখে যদি মায়া হয়? না, তা হবে না, মন বেঁধে একবার বই—দুবার তাকাব না। [নিঃশব্দে অগ্রসর] এ কি? পুরুষ! মুক্তকেশীর বিছানায় পুরুষ। এ কি উপপতি! মুক্তকেশীর উপপতি! আর ত সহ্য হয় না। আমার স্ত্রী ভ্রষ্টা—আমার স্ত্রী উপপতি নিয়ে শুয়ে, আমার বিছানায় শুয়ে! কি করি। এ জ্বালা, এ আগুন কিসে নিবারণ করি। যা অদৃষ্টে থাকে, দুটোকেই কাটব। এ প্রাণ থাকে আর যায়, দুজনকেই মারবো। [রোষভাবে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি] কি আমি—এ কি আর চক্ষে দেখা যায়। [হস্তস্থিত ছুরিকার দিকে দৃষ্টি করিয়া] এ ছুরিতে হবে না। দুটো মাথা একেবারে কাটবে না। পাঁঠাকাটা দাখানা নিয়ে আসি। (ছুরি ফেলিয়া প্রস্থান, ক্ষণকাল পরে দুই হাতে দা উত্তোলন করিয়া ক্রোধান্ধে প্রবেশ এবং উচ্চস্বরে) মুক্তকেশী! এই বুঝি তোর সতীপনা? ও রে! (দা'র আঘাত করিতে উদ্যত এবং মুক্তকেশী ও পুরুষ ত্রস্তে শয্যা হইতে দুই পার্শ্বে দুইজন দণ্ডায়মান)

উভয়ে—কর কি? (রাধাকান্তের হস্তধারণ)

পুরু—(রাধাকান্তের হস্ত হইতে দা কাড়িয়া লইয়া রোষে) কি, এত কেন? ভাল চাও সরে যাও, প্রাণ বাঁচাতে চাও—দুদিন কাল যদি নয়নতারার মন যোগাতে চাও তবে সরে যাও—

রাধা—তুই কে রে বেটা! জানিসনে এ কার ঘর? তোর এত বড় মাথা! আমার ঘরে—

মুক্ত—কেন? তোমার কি?

রাধা—(কাঁপিতে কাঁপিতে) হারামজাদি! আবার মুখ বাড়িয়ে কথা বলছিস। লোকের কাছে, আমার কাছে মিছেমিছি সতীপনা দেখিয়ে গোপনে গোপনে এই কাজ? ও রে হারামজাদি! তোর এই কাজ?

মুক্ত—তাতে তোমার কি?

রাধা—আবার কথা? কি বলব চেঁচিয়ে ঠকেছি, রাগে পাগল হয়ে সব নষ্ট করেছি, তা নইলে এতক্ষণ দুজনেই যমের বাড়ি দেখতে পেতি। তোর অসাধ্য কি আছে বল তো? এই তো খালি ঘর পেয়ে উপপতি নিয়ে মজা করিস। আর দেশসুদ্ধ লোকের কাছে আমার নিন্দে করে বেড়াস। আজ কি হয়? ক'দিন

লুকাবি! আমি তোকে খুন করবো। তোর ভালবাসার বাবাকেও খুন করবো। যাবি কোথা? (পুরুষ-প্রতি আক্রোশে) শালা! তুমি খালি ঘর পেয়ে আমার সর্ব্বনাশ করেছ। তোর মাথা কাটব। বাঞ্চৎ গরুখেক নেড়ে! আমার সর্ব্বনাশ করলি। (ক্রোধে দাড়ি ধরিতে অগ্রসর)

পুরু—সাবধান! দা দেখেছ? তোমার মাথা কাটবো। বেহায়া! বের। আমার ঘর থেকে শীঘ্র বের। আর জায়গা পাও নাই, এখানে মাতলামি করতে এসেছ? বের বেটা—'খালি ঘর, খালি ঘর' করে বেটা তোলপাড় লাগিয়েছে। খালি ঘর কর কেন? একা ফেলে যাও কেন? বেটা নচ্ছার, বের। যা, তোর নয়নতারার ঘরে যা। এ ঘরে কেন? আমি ইচ্ছে ক'রে আসি নাই, টাকা দিয়ে নিয়ে এয়েছে। টাকা পেয়ে পরের ঘরে আসতে দোষ কি?

রাধা—(মুক্তকেশীকে মারিতে উদ্যত; পুরুষকর্তৃক বাধা) টাকা দিয়ে উপপতি এনে আমার ঘরে—

মুক্ত—কেন? এত কেন? তুমি টাকা দিয়ে বেশ্যা এনে আমার ঘরে—আমি পারিনে? একবারে দেখেই সচ্ছে না। খুন করতে চাচ্ছ। দুজনের মাথাই কাটতে চাচ্ছ। আমি যে চিরকাল দেখেছি, আমার মনে কিছুই হয় না? কিছুই বেদনা লাগে না? বেশ করেছি, এতে তোমার কি? রাগই বা কেন? কাটাকাটি মারামারিই বা কেন?

রাধা—তোর যে ভারি সাহস! ধরা পরলি, তবু তোর কথার বাঁধুনি গেল না। তবু তোর জোরের কথা গেল না। বল তো, তোকে এত সাহস কে দিয়েছে?

মুক্ত—কাকেও দিতে হয় নাই। কেউ শেখায় নাই। ভুগে ভুগে আপনিই শিখেছি। তুমিই তো এর গোড়া। তবে আবার এত কেন? যেমন দেখিয়েছ তেমনই দেখ। দেখলে কি গা-জ্বালা করে?

রাধা—তুই কি একেবারে লজ্জার মাথা খেয়ে বসেচিস, এতদিন তো তোর মুখে একটি কথাও শুনতে পাই নাই। হাতে হাতে ধরা পরলি, তবু তোর লজ্জা হয় না। তোর কি মরণ নাই?

মুক্ত—তোমার মরণ নেই? কথা বাড়ালেই বাড়ে। শুনালেই শুনতে হয়, দেখালেই দেখতে হয়। আর গোল কর না, সোজা পথ আছে, চলে যাও। বেশ্যার জন্যে সব মজালে। আবার কাল রাত্রে যা করেছো, তার উপরে কথা?

ধিক তোমার জীবনে ! ধিক তোমার মুখে। তুমি আগে করেছ, আমি না হয় পাছে করেছি, আর পাছেই বা কি ? সইতে না পেরে তোমার জ্বালা—তোমার দৌরাত্মি সইতে না পেরে মুখ ফুটে কান্দলেম, হাত-পা-ধরলেম, কিছুই হলো না, কি করি ! শেষে আর কোন উপায় না পেয়ে এই উপায় করেছি। এখন তুমি তোমার মতো থাক, আমি আমার মতো থাকি। [পুরুষের গায়ে ধাক্কা দিয়া] চল।

রাধা—তুই কি হাতে হাতে প্রতিশোধ নিবি ? আমি যা করেছি তুইও তাই করবি ?

মুক্ত—কেন করব না ? তুমি আমি ভিন্ন কি ? আমার শরীর বুঝি রক্তমাংসের নয় ?

রাধা—এই কি তার প্রতিশোধ ?

মুক্ত—এক রকম অনেক দিন সয়ে, অন্তরে ঘা খেয়ে এই করেছি। প্রতিশোধ নেই নাই। প্রতিফলও দেখাই নাই, এখনও অনেক বাকি।

রাধা—এর উপরে কি আরও আছে ?

মুক্ত—আছে বৈ কি ? হয়েছে কি ? একদিনেই এত ! অনেক আছে, ক্রমে দেখ—

রাধা—আরও দেখাবি ?

মুক্ত—দেখাবো।

রাধা—আমি আজ বেঁচে যদি কিছু না পারি, কাল তোকে দেখবো।

মুক্ত—তুমিও দেখবে। আরও কতজনে দেখবে, কত কানেও শুনবে। ভালই তো !

রাধা—(মাটিতে বসিয়া অধোবদনে মাথায় হাত দিয়া চিন্তা)

মুক্ত—(পুরুষের কানে কানে প্রকাশ)

পুরু—ব্যস্ত কেন ? দেখ না। কেবল ঔষধ ধরেছে—

রাধা—(মাথা হেঁট করিয়া কাতরস্বরে) হা! আমি কি করতে এসে, কি দেখলেম। যা কখনও ভাবি নাই তাই হলো। যা কখনও মনে করি নাই, তাই দেখতে হলো ! নয়নতারা গোপনে জানতে পেরে কি কৌশলে আমায় দেখতে পাঠিয়েছিল ? আমি করেছি তাইতে করেছে। মন্দ কথা নয়। পাপে প্রায়শ্চিত্ত আছে। সুখান্তে দুঃখ আছে। তবে আর কেন ? বুঝেছি। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ) আমার দোষ ? যথার্থ আমারই দোষ।

আমার দোষে এই হলো? কি বলে মুক্তকেশীকে দোষী করব, সে পথে তো আমিই কাঁটা দিয়েছি। আমি নযনতাবার প্রণয়-ফাঁদে পড়ে সাধারণের একমাত্র লক্ষ্য হয়েছি। হায হায়! আমার সর্ব্বনাশ আমিই কবেছি, আপন পাযে আপনি কুড়ল মেবেছি। (মুক্তকেশীব পুরুষেব সহিত ইঙ্গিতে কথা-বার্ত্তা) কাকে কি বলবো—আপন মাথা আপনিই খেয়েছি; আপন স্ত্রীকে যতনে রাখলে কখনই এমন হতো না। এত তাচ্ছল্য, এত অন্যায়, এত ঘৃণা না করলে কখনই এত হতো না। বাধাকান্তেব চক্ষু এতো দেখতো না। আমাবই দোষ, আমাবি—আমিই মূল। আব দুঃখ কি? বেশ হযেছে। মুক্তকেশী বেশ কবেছে। (কান্দিতে কান্দিতে) আমি বেশ্যাব মাযায় না ভুললে মুক্তকেশী কখনই আমায ভুলতো না। আমি একদিন ভুলেও যদি তাব সুখেব পথে দাড়াতেম, তবে কি আব সে এ-পথে দাঁড়ায়? আমি যদি তাব মনেব দুঃখ বুঝতে পেতেম তবে কি সে এ-পথে দাঁড়ায়? আমি যদি তোকে ভালবাসতেম, হায! ভাল মুখে যদি দুটো কথাও বলতেম, তবে কি—[ক্রন্দন]

মুক্ত—(পুরুষেব প্রতি) আব কেন?

পুরু—একটু বাকি আছে।

রাধা—[কান্দিতে কান্দিতে] আর সহ্য হয না। ভগবান! এই দেখালে?

মুক্ত—কেমন? লেগেছে?

রাধা—(কান্দিতে কান্দিতে) আব বলো না, তোমার পায ধবি আর আমায় কিছু বলো না। আমি বেশ বুঝেছি, বক্তমাংসেব শরীব, সকলেব পক্ষেই সমান। আর ঘা দিতে হবে না।

মুক্ত—চিরকাল কেঁদেছি। এখন তোমার পালা।

রাধা—[ক্রন্দন করিতে করিতে] আমি মিনতি করে বলছি আব ঘা দিও না, আর দগ্ধে মের না। আব বলো না। আমাব এখন যেমন হযেছে, তোমারও তেমনি হয়েছিল। তা আমি বেশ বুঝেছি। তাইতে কি এমন করে জাত-কুল মজাতে হয়? বল তো কি কবে মানুষের মধ্যে মুখ দেখাব। এ কথা কি আর ছাপা থাকবে? শুনতে কি আর বাকী থাকবে? হয় কাল, নয় দু-দিন পরে একেবারে ঢাকে-ঢোলে কাঠি বেজে উঠবে। কতজনে মুখের

উপরে কত প্রকারে বাড়িয়ে বলবে, তা তো এ প্রাণে সইবে না। পরের মুখে এ কথা শুনলে আমার মুখখানা কেমন হবে বল তো? মেয়ে-প্রাণে সকলি সয়। হাজার হলে কেহ কিছু বলে না। তোর সকলি বিপরীত।

মুক্ত—না হবে কেন? আমি চিরকালটা তোমার পায়ে ধরে কত মিনতি করে বলেছি। এত কর না। বেশ্যার কথায় ঘরের স্ত্রীকে পা দিয়ে ঠেলে ফেলো না। দেখ, অনেকেই করে, অনেকেই সয়ে থাকে, এমনতর কেউ নয়, এত কেউ নয়, স্বামী বই স্ত্রীর আর কে আছে? সুখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে আর কে আছে? এত কর না, পায়ে ধরে বলছি। এখনও সাবধান হও, তোমারই মন্দ হবে। অন্তরে ঘা লাগে?

রাধা—বেশ লাগে। আমি কেন, অনেকেরই লাগে। আগে ভুগিয়েছি, এখন ভুগছি। আমার আর কোন কথা নাই। তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। দা-খানা আমার হাতে দেও, আমি এ প্রাণ আর রাখব না। এ মুখ আর মানুষকে দেখাব না। কোন মুখে আর কোন কথাও আর শুনতে হবে না। মুক্তকেশী, তোমার পায় ধরি, দা-খানা আমায় দেও, [কান্দিতে কান্দিতে] আমি যা বলি তাই কর। আমার অন্তরের জ্বালা মিটিয়ে দেও। আর আমার সহ্য হয় না। আমি নয়নতারার কথায় তোমায় কাটতে এসেছিলাম। তোমার মুখখানি দেখব বলে এগিয়ে দেখেই আমার দিকবিদিক কিছুই জ্ঞান থাকল না, আমি কোথায় গিয়েছি, কি করেছি, কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে। আমার এ কি হলো? তুমি দা-খানা দেও, দেখ, তোমার সম্মুখেই আমি আত্মহত্যা করছি। তোমার প্রত্যয় না হয় তোমার উপপতিকে বলে একচোটে আমার মাথা দুইখণ্ড করে সকল জ্বালা মিটিয়ে দেও। প্রতিশোধ হোক। আজই প্রতিশোধ হোক। দেখ, আমার মরণেই তোমাদের মঙ্গল ও সুখের কারণ।

মুক্ত—(কান্দিতে কান্দিতে) আর সহ্য হয় না, আর থাকতে পারিনে। আমার অপরাধ হয়েছে। মাপ কর. মেয়েমানুষ মেয়েবুদ্ধি বলে মাপ কর। আজ তোমার মনে যে ভাব হয়েছে, আমি চিরকাল এইভাবে দুঃখের আগুনে জ্বলে পুড়ে খাক হয়েছি। সময়ে কত কথা মনে হয়েছে, কত কাজে মন গিয়েছে। গলায় দড়ি দিয়ে মরবো—তাও কতদিন মনে করেছি। বিষ খেয়ে মরবো, তারও যোগাড় করেছি। সময় সময় তোমার মুখখানি দেখব সেই

আশাতে আবার সকলই ভুলে গেছি। কপালগুণে এই পোড়াকপালের গুণে কখনও ফিরেও চাইলে না। কি করি, ভেবে আর কোন উপায় না পেয়ে এই উপায় করেছি। [ক্রন্দন করিতে করিতে চরণধারণ] অপরাধ হয়েছে, আমি তোমার দাসী, আমায় ক্ষমা কর।

রাধা—[দুঃখিতস্বরে] তোমার অপরাধ কি? যা করবার তা তো করেই বসেছো। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। পুরুষের প্রাণে এ কখনই সহ্য হয় না, রক্তমাংসের শরীর, আর স্বামীর চক্ষু এ দেখে কখনই স্থির থাকতে পারে না। আমায় মেরে ফেলো। আমার মুখ তোমরা দেখ না। আমিও আর দেখতে চাইনে।

মুক্ত—আমি উপপতি করেছি, তা বলে তুমি আমাকে অসতী মনে কর না। আমি এমন কুকাজ করে যে তোমার সর্ব্বনাশ করেছি তা তুমি মনের এক কোণেও ঠাঁই দিও না। আমার মনের ভাব তোমার মন দিয়ে জানাতেই আমি এই করেছি।

রাধা—পা ছাড়। আমি বিনয় করে বলছি, পা ছাড়। আমি আজ রাত্রেই যা হয় একখানা করব। এ কি সামান্য কথা! [ক্রন্দন] আমি রাধাকান্ত, আমার স্ত্রী ভ্রষ্টা—

পুরু—এখন বুঝেছেন। হাতে-পাতে ধরেছেন, স্থির করেছেন মুক্তকেশী ভ্রষ্টা।— স্ত্রী ভ্রষ্টা হয়েছে, অন্তরে ঘা লেগেছে, জীবনে ঘৃণা ধরেছে। তাইতে প্রাণ-ত্যাগ করতেও প্রস্তুত হয়েছেন। এতদিনে এ বুদ্ধি—এ ঘৃণা কোথা ছিল? যা হউক, আপনি আপনার স্ত্রীর সতীত্ব বিষয়ে প্রমাণ পেলে বোধহয় প্রাণ ধড়েই রাখবেন? আমি উপপতি নই, মুক্তকেশী আমার ভগ্নী; আপনি সাধ্বী-সতীর প্রতি কোনরূপ দোষারোপ করবেন না।

রাধা—এর আবার প্রমাণ? যাক আমার স্ত্রীতেও কাজ নাই, এ বাড়ি ঘরদোরেও কাজ নাই, আমার যা মনে—(মুক্তকেশীকে ছাড়িয়া বেগে যাইতে উদ্যত)

মুক্ত—ও সই—

পুরু—তাই তো, এখন যে আর কিছুতেই হয় না। এত বললেম যে মুক্তকেশী আমার ভগ্নী, আমার যা—তবু তাঁর প্রত্যয় হলো না। ভাল কথা। দেখ, মুক্তকেশী সতী কি অসতী।—হুজুর, আর ভাববেন না—আমি

পুরুষ নই, আপনারই চির-ভালবাসার রাইমণি (কৃত্রিম পরিধান পরিত্যাগ ইত্যাদি)। সইয়ের দুঃখ সইতে না পেরেই এই উপায় করেছি।

রাধা—(সচকিতে) সই—সই—এ কি ! মুক্তকেশী, এ কি ?

মুক্ত—(নিস্তব্ধ)

রাই—(ঈষৎ ঘোমটা দিয়া) আর কি ? মনে মনে যে সইয়ের মনের ভাব বুঝেছেন সেই ভাল !

রাধা—না জেনেই এতদূর হয়েছে। আব নয, সই, আর নয়। আমার ঘাড়ের ভূত আজ নেমে গেছে।

রাই—ও সই। এখন আর কথা কি ? ওভাবে বসে রইলে কেন ? শিখেছো তো, ও সই ! শিখেছ তো, 'এর উপায কি ?' আজকার মতো পালা শেষ করে চল ঘুমই গে।

[সকলের প্রস্থান]

যবনিকা পতন

উদাসীন পথিকের মনের কথা

প্রথম স্তব

প্রথম তরঙ্গ

নীলকুঠি

কুষ্টিয়ার বর্ত্তমান রেলওয়ে স্টেশনের উত্তরসীমা গৌরীনদী, পূর্ব্বসীমা কালী-গঙ্গা। কালীগঙ্গা গৌরীর দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে ছুটিয়া ক্রমে দক্ষিণদিক বহিয়া কুমারনদে মিশিয়াছে। কালীগঙ্গার বাম তীরে শালঘর মধুয়ায় নীলকুঠি। রেল-ওয়ে স্টেশন হইতে সাত মাইল ব্যবধান। বর্ষাকাল—নীল কাজ আরম্ভ, দিবারাত্র লোকজনের কোলাহল।

বেলা প্রায় ৮টা। কুলিরা বোঝা বোঝা 'নীল শিটি' মাথায় করিয়া হাউজের বাহিরে ফেলিতেছে, নীলপচা দুর্গন্ধময় জল, নাক-মুখ বহিয়া বুকে-পিঠে পড়িতেছে। অল্প পরিসর পরিধেয়খানি ভিজিয়া পায়ের পর্য্যন্ত নীলরঙে রাঙিয়া যাইতেছে। ছোট হাউজের কুলীরা ব'ঠে হস্তে চক্রাকারে দাঁড়াইয়া তালে তালে নীলপচা জল মাই (মন্থন) করিতেছে। জাঁতঘরে জ্বালানি মাল জাঁত হইতেছে। আপিস দালানে আমলাগণ আপন আপন কার্য্যে বসিয়া কাগজ কলমে মনের সহিত কথা-বার্ত্তা কহিতেছে। মেঃ টি. আই. কেনী শয়নকক্ষেই আছেন। দ্বিতল হইতে নামেন নাই। প্রতিদিন ৭টার সময় নিচে নামিয়া ডিহি দেখিতে গমন করেন, আজ ৮টা বাজিয়া যায়, নিচে আসিতেছেন না। কেফাতুল্যা দরওয়ান সিঁড়ির সম্মুখে পায়চারি করিয়া খাড়া পাহারা দিতেছে। রাম ইয়াদ পাঁড়ে জমাদার ঢাল-তরবার বাঁধা, দাড়ি দুই ফাঁক করা—কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, আমীন, তাগাদগীর, কোড়াবরদারসহ বারান্দার সম্মুখে মনিবের আগমন অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। নীলমণি মাহুত লালবনাতের কুর্ত্তি পরিয়া, মাথায় লালপাগড়ি বান্ধিয়া অঙ্কুশ হস্তে প্যারীজান হস্তীর ঘাড়ের উপর বসিয়া সিঁড়ির দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। প্যারীজান শুঁড় দোলাইয়া কর্ণ নাড়িয়া পুচ্ছ হেলাইয়া বিরক্তিকর কীট-পতঙ্গসকল শরীর হইতে তাড়াইতেছে। জয়চাঁদ সহিস শ্বেতবর্ণ অয়লারের বাগডোর ধরিয়া খাড়া রহিয়াছে। সময় সময় চামরদ্বারা ঘোটকবরের গাত্র

হইতে মক্ষিকা তাড়াইতেছে। তত্রাচ খবগতি 'অয়লার' পুচ্ছগুচ্ছ অনবরত নাড়িয়া হ্রেষারবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। বেহারাগণ পালকি মাটিতে রাখিয়া 'বেলা হইল', 'আজ রোদ্রে মারা পড়িব', 'সাহেবের বুদ্ধি নাই' বলে কার যেন পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে সময় যাইতেছে। সকলেই দেখিল কেফাতুল্যা পায়চাবি রাখিয়া সেলাম বাজাইবার জন্য নম্রভাবে দাঁড়াইল। দব-ওয়ানজীব ভাবে সকলেই বুঝিল যে সাহেব নিচে নামিতেছে, সকলেরই পূর্ব্বভাব পবিবর্তন। নূতন ভাব নম্র ও সতর্ক। বেহারাগণের মুখ বন্ধ, বেশীর ভাগ পালকি ঘাড়ে, কাম বাজাইতে খাড়া—প্রস্তুত। টি. আই. কেনী পাইপ টানিতে টানিতে বেতহস্তে নীচে নামিলেন। শশব্যস্তে সকলেই ঘাড় নোয়াইয়া দস্তরমত সেলাম বাজাইল। সামান্য চাকরের সেলামের প্রত্যুত্তর, প্রায়ই নাই, ইংরেজ আবও কড়া মেজাজ, সেদিক লক্ষ্য না থাকিবারই কথা। জগচাঁদ সহিসের দিকে বেত উঠাইয়া বলিলেন, গোরা লাও। জগচাঁদ ঘোড়া লইয়া নিকটে আসিল। কেনী অশ্বে আরোহণ করিলেন। আবার 'বন্দুক' শব্দ উচ্চারণ করিতেই পীরবকস শিকারী তাড়াতাড়ি বন্দুক তোজাদান লইয়া সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। আমীন, তাগাদগীর, কোড়াবরদার চাকরি বাঁচাইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিল।

নীলমণি মাহুত চাই ধাং করিয়া প্যারীজানকে পিলখানায় লইয়া গেল। বেহারাগণ আজিকার মত রক্ষা পাইল। কিন্তু সর্দ্দার বেহারা মধু বলিতে লাগিল, "দেখ তো ভাই, বেটার বুদ্ধি! কথাটা আগে বললেই হইত। আজ ঘোড়ায় চড়িয়া ডিহি দেখিতে যাইব, হাতী-পালকির দরকার নাই।" মনিবের বুদ্ধি-বিবেচনায় সাতপ্রকার ত্রুটি দেখাইয়া আপিস ঘরের বারান্দায় পালকি রাখিয়া মধু সদলে বাসায় চলিয়া গেল।

টি. আই. কেনীর মনের কথা আগে কেহ জানিতে পারিত না। কোনদিকে নীল দেখিতে যাইবেন, সে কথা কাহারও জানিবার সাধ্য ছিল না। কুঠির চতুর্দ্দিকেই নীলজমি। যে দিকে তাঁহার ইচ্ছা হইত, সেই দিকেই তিনি যাইতেন। আমীন, খালাসীরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিত। একদিন যেদিকে যাইতেন, পরদিন আর সেদিকে যাইতেন না—একথা সকলেই জানিত। আজ তিনদিন ক্রমাগত উত্তরদিকেই যাইতেছেন। কুঠির উত্তরদিকেই দমদমা গ্রাম। টি. আই. কেনী দমদমা গ্রামের মধ্যে যাইয়া পথ ভুলিয়া অন্য পথে যান। তাঁহার বহুকালের

চেনা পথ কেন যে ভুল হয়, তিনিই জানেন। ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটি গৃহস্থের কুঁড়ে-ঘরের দিকে লক্ষ্য করেন। গ্রাম্যপথ। গ্রাম্যলোক সাহেব দেখিলেই ভয় পায়। সাহেব বাহির হইয়াছে শুনিলে যে যেখানে থাকে সে সেখানেই. গাছের আড়ালে কি পথের ধারে লুকায়—ঝাড়-জঙ্গলে মাথা দেয়, একেবারে সরিয়া যাইতে না পারিলে কাঁপিতে কাঁপিতে সেলাম বাজাইয়া জোরপায়ে সরিয়া পড়ে। গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা সাহেবের নাম শুনিলেই ঘরের দোর আঁটিয়া কেহ মাচার নীচে, কেহ ঘরের আড়ালে থাকিয়া বিলাতী রূপ দেখিয়া চক্ষু জুড়ায়। কেনী একদিনে এক পথে কখনই যাওয়া-আসা করিতেন না। আজ তিনদিন হতে তাঁহার সে নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে। প্রতি-দিনই দমদমা গ্রামের মধ্য দিয়া যাওয়া-আসা করেন। একজন দুঃখী প্রজার বাড়ির নিকট বিনাপরাধে ঘোড়ার উপর চাবুক সৈ করেন।—কিন্তু অশ্বের বাগডোরে গতিরোধ সংকেত। অবলাবের মহা বিপদ। পিছাড়া. সিকপা যন্ত্রকমের বজ্জাতি সে জানিত তাহা বাধ্য হইয়া করিতে বাধ্য হইত। খুরের খট খট, চাবুকের পটাপট বিলাতী কণ্ঠের হুটপাট শব্দ শুনিয়া অনেকেই সাহেবের ঘোড়ার কাণ্ডকারখানা ছুপনি পাতিয়া দেখিত। কেনীর সাদা চক্ষুও চারিদিকে অনবরত ঘুরিয়া কি যেন দেখিত।—চক্ষু যাহাকে দেখিতে চাহে, তাহাকে দেখিতে পায় না। প্রথমদিন যেখানে ঘোড়া দাড়াইয়াছিল, আজও সেইস্থানে দাঁড়াইল। সিকপা, পিছাড়া ঝাড়া, কিছুই বাকী রহিল না। পীরবকস প্রভৃতি যাহারা কিছু পিছনে পড়িয়াছিল তাহারা আসিয়া জুটিল। ঘোড়া আর সোজাভাবে চলে না। অনেক গৃহস্থের পরিবার ঘরের বেড়া ছিদ্র করিয়া ঘোড়া দেখিতে লাগিল। কেনী বাহাদুরও আড়নয়নে চক্ষের কাজ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি যে মুখ দেখিবার জন্য নিরপরাধ দেড়হাজার টাকা দামের ঘোড়াটা নষ্ট করিতে উদ্যত, আজ সে মুখ তাঁহার পাপচক্ষে পড়িল না। সাহেব অশ্ব হইতে নামিয়া স্নেহবশে অশ্বগাত্রে হাত বুলাইয়া অনেক দেলাসা দিলেন। কিন্তু সে সময় তাহার চক্ষুর কার্য্য ভুলে নাই। সেই চক্ষু. সেই দর্শন, সেই আশা। ঘোড়া সহিসের হস্তে অর্পিত হইল। পীর-বকসের নিকট হইতে বন্দুক লইয়া কেনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্দুক ভরা আছে?"

পীরবকস যোড়হাতে বলিল, "হুজুর! আমি ভরিয়া আনিয়াছি।"

কেনী বন্দুক লইয়া একটি গ্রাম্য ময়নাপাখির প্রতি লক্ষ্য করিলেন। সকলেই বলিল, "হুজুর! ও পোষাপাখি। হুজুরের চাকর জকি গাড়োওয়ানের ময়নাপাখি, পোষ মানিয়াছে, বুলিও ধরিয়াছে।"

কেনী বলিলেন, "জকি গাড়োয়ান কে ?"

একে বলিতে দশজনে বলিয়া উঠিল, "হুজুরেরই চাকর—গরুর গাড়ীর কাজ করে। হুজুরের বহুদিনের চাকর, এ বাড়ি-ঘরদোর সকলি হুজুরের, হুজুরই সকলের মালিক।"

সাহেব অন্যদিকে ফিরিয়া একটি ফাঁকা আওয়াজ করিলেন। ময়না জকির ঘরের মধ্যে পলাইল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কেনী পীরবকসের হস্তে বন্দুক দিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন। অশ্ব শান্তভাবে চলিতে লাগিল। নীলজমি দেখা আজিকার মত এই পর্যান্ত শেষ হইল। কিন্তু অকারণে দুই-তিনজন কুলীকে চাবুক সই করিয়া কুঠির দিকে ফিরিলেন। আপিস ঘরের সম্মুখে আসিয়া হরনাথ শ্রী মিশ্রী (নায়েব), শম্ভুচরণ সান্যাল (দেওয়ান) প্রভৃতিকে কটু কথায় কয়েকটি কথা কহিয়া গরমভাবে বলিলেন, "যাহা যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার কি করিয়াছ ? সাঁওতার মীরসাহেবের নিকট পত্র লিখা হইয়াছে ?"

হরনাথ বলিলেন—

"ধর্ম্মাবতার ! কোন বিষয়ে ত্রুটি নাই। পত্র লিখা হইয়াছে, কেবল হুজুরের সহি বাকি।"

কেনী অশ্ব হইতে না নামিতেই তিন-চারিজন আমলা ব্যস্তসহকারে ঘোড়া ধরিলেন। "কৈ ! সে পত্র কৈ ?"

সান্যাল মহাশয় পত্র হাতে করিয়াই দাঁড়াইয়াছিলেন। আপিস ঘরের সম্মুখেই পত্র সহি হইল, তখনি সাঁওতায় লোক রওনা হইল।

কেনী বলিলেন—

"জকি গাড়োয়ানের বাড়িতে একটি পোষাপাখি আছে, আমি সেই পাখিটা চাই।"

এইকথা বলিয়াই বাসঘরের দিকে যাইতে লাগিলেন। কিছুদূর যাইয়া পুনরায় ফিরিয়া বলিলেন, "জকি যে দাম চাহে, সেই দামই দিব। সকের জিনিস জবরাণে লইব না। তোমরাও জবরদস্তি করিয়া আনিও না।"

এই কয়েকটি কথা যেন হৃদয় হইতে কহিয়া চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় তরঙ্গ

মীরসাহেব কে ?

শালঘর মধুয়ার কুঠির উত্তরে সাঁওতা গ্রাম। স্রোতস্বতী গৌরীনদীর পশ্চিমকূলে।—কুঠি হইতে দুই ক্রোশ ব্যবধান। সাঁওতার বিখ্যাত জমিদার মীরসাহেব। টি. আই. কেনীর চিন্তা উচ্চ, আশাও উচ্চ। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কুঠিয়ালগণ সাঁওতার জমিদারের সহিত ক্রমাগত বিবাদ-বিসম্বাদ করিয়া চিরকাল পরাস্ত হইয়াছেন। কেনী সেইসকল ইতিবৃত্ত শুনিয়া পূর্ব্ব হইতেই মীরসাহেবের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। পরস্পর বিসম্বাদ করিবেন না—কোন প্রকারে কেহ কাহারও মন্দ চেষ্টায় যাইবেন না—আপদ-বিপদে সকলেই সকলের সাহায্য করিবেন, যোগ দিবেন। কোনদিন কোন কার্য্যে কেহ কাহাকে শত্রুভাবে দেখিবেন না। সর্বদা পিরিত, প্রণয়ে, আপন বিষয়-বিভবের কার্য্য চালাইবেন—উভয়েরই এই স্থিরপ্রতিজ্ঞা।

এই কেনীর সহিত বন্ধুতা স্থায়ী হওয়ায় ও অঞ্চলের সমুদায় নীলকরের সহিত মীরসাহেবের বনিবনাও হইয়াছিল। টি. আই. কেনী আজ যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, মীরসাহেবের সহিত পরামর্শ আঁটিয়া অগ্রসর হইবেন, এই তাঁহার ইচ্ছা। তাহাতেই পত্রলেখা।

মীরসাহেব কে ? এখানেই পরিচয় দিয়া রাখি। কারণ অনেক সময় ইহার সহিত পাঠকগণের দেখা হইবে।

মীরসাহেব মোসলমান সমাজের সমুজ্জ্বল রত্ন। তাঁহার বংশমর্য্যাদা ভারত-বিখ্যাত। যদিও তিনি ভারত রাজ্যের প্রান্তসীমা বঙ্গে বাস করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ, পবিত্রধাম বোগদাদ শরিফের মহা মাননীয় এবং গননীয়, সৈয়দ-বংশসম্ভূত, প্রভু সৈয়দ সাদুল্যার বংশধর। সেই তাপসশ্রেষ্ঠ প্রভু সৈয়দ সাদুল্যা বোগদাদ শরিফ হইতে ভারতে ক্রমে বঙ্গরাজ্যে, পরিশেষে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত স্রোতস্বতী চন্দনানদীর তীরে সেকাড়া গ্রামে অবস্থিতি করেন। সহচর, অনুচর, পরিষদ, মধ্যশ্রেণীর নানা শ্রেণীর ব্যবসায়ী, এমন কি রজক, নরসুন্দর পর্যন্ত তাঁহার সমভিব্যাহারে বোগদাদ হইতে ভারতে আসিয়াছিল। তাঁহার আগমনের কারণ ও অবস্থিতি বিষয়ে পর পর ঘটনাবলীর ইতিবৃত্তসহ মীর-সাহেবের সাঁওতা-বাস পর্য্যন্ত বিবরণ 'আমার জীবনী' নামক গ্রন্থে লিখিত হইবে।

এক্ষণে মীরসাহেবের উপস্থিতি কার্য্যবিবরণই লেখকের লেখনীর আবশ্যকীয় উপকরণ।

মীরসাহেব গৌরবর্ণ, স্থূলকায়, চক্ষু বিস্ফারিত, ললাট বিশাল, মষ্টভাষী, সরলপ্রকৃতি এবং ঘোর আমোদী। পরিবার-মধ্যে মাতৃহীন এক পুত্র, পিতৃহীনা এক ভ্রাতুষ্পুত্রী, দুই ভগ্নী এবং দাসদাসী ইত্যাদি। পুত্রের নাম আসগর আলী, বয়স আট বৎসর। মীরসাহেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা (শুকরননেসার পিতা) জীবিতকালে তিনিই সংসারের কর্ত্তা ছিলেন, এক্ষণে মীরসাহেবকে সেই সংসারের ভালমন্দ যাবতীয় ভার বহন করিতে হইয়াছে। জ্যেষ্ঠভ্রাতার মৃত্যুর পর শুকরন-নেসার বিবাহ দেওয়াই মীরসাহেবের কর্তব্য কার্য্য মধ্যে অগ্রে প্রধান কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। তিনি যে বিবাহ সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই নারাজ। বিবাহের পূর্ব্বে মীরসাহেবের অতি-নিকট সম্বন্ধীয় ভ্রাতা মীর আলী আসরফ খান বাহাদুর বলিয়াছিলেন যে, ভাই, গরীব হজরত (প্রভু)-দিগের সহিত কোন নূতন সম্বন্ধ করিও না। তাহাদের হৃদয় নাই, সমাজের ভয় নাই, লোকনিন্দার দিকে দৃষ্টি নাই, তাহারা মহাপাপকেও অতি তুচ্ছ মনে করে। আমি বার বার নিষেধ করিতেছি, সা গোলামের সহিত শুকরনের বিবাহ দিও না—কখনই দিও না—পরিণামে মনস্তাপ পাইবে, সর্ব্বস্ব হারাইবে—পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইবে। সাবধান! কখনই তাহাদের কথায় ভুলিও না। তুমি জান না যে, তাহারা আপন সহোদরে সহোদরে কিনা করিতেছে! সমাজ হাসাইতেছে। ফরিদপুর অঞ্চল ডুবাইতেছে। এ সকল কথা স্মরণ রাখিও। কখনই সেই মূর্খ, নিরক্ষর সা গোলামের সহিত পিতৃহীনা কন্যার বিবাহ দিও না।

বিধির নির্ব্বন্ধ খণ্ডাইতে কাহার সাধ্য! শতসহস্র প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও শুকরন-নেসার বিবাহ সা গোলামের সহিত হইয়াছিল। বিবাহের পর জামায়ের হস্তে জমিদারি কার্য্যভার দিয়া মীরসাহেব আমাদের সঙ্গ কিছু বেশী করিয়াছিলেন। সময় সময় জামাতাকে বলিতেন, দেখ বাপু! আমার কেহই নাই, কেবলমাত্র একটি পুত্র, তাহারও জীবনে সংশয়, সর্ব্বদাই পীড়িত। তোমরাই আমার বল, তোমরাই আমার সকল। আপন কার্য্য-কর্ম্ম দেখিয়া শুনিয়া করিবে। সংসারের ঝঞ্ঝাট আর আমার ভাল বোধ হয় না, স্ত্রীপুত্র-বিয়োগে আমার মন সর্ব্বদাই

অস্থির থাকে। অনেক কার্য্যেও ভ্রম জন্মে। এক্ষণ বিষয়াদি রক্ষা করা না করা, সকলই তোমার ইচ্ছা। দু সন্ধ্যা ভুমুট খেতে পেলেই আমি সুখী হইব।

সা গোলাম দেখিতে গৌরবর্ণ, মুখ চোখা, মাথায় কোঁকড়া চুল, চক্ষু দুটি নিতান্ত ক্ষুদ্র, ভ্রূ কুঞ্চিত। শীঘ্র শীঘ্র কথা, অস্পষ্ট কথা, বিশেষ মনোযোগ করিয়া না শুনিলে সে কথা অনেকেই বুঝিতে পারিত না। সময়ে সময়ে তিনি অনেক শিষ্টাচার করিয়া বিশেষ ঐক্যের সহিত সংসারের কাজকর্ম্ম চালাইতে লাগিলেন। দিন দিন জমিদারির উন্নতি, সংসারের উন্নতি, অবস্থার উন্নতি, বাড়িঘরের উন্নতি, চারিদিকে উন্নতি। উন্নতির স্রোতলহরী, প্রবাহতরঙ্গ ক্রমে ক্রমে বহিতে লাগিল—ক্রমে ছুটিতে লাগিল।

মীরসাহেব অধিক বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইতেন। নিদ্রা হইতে উঠিয়া বসিয়া আছেন, শালঘর মধুয়ার কুঠির রামদয়াল সিং সেলাম বাজাইয়া একখানি পত্র দিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। মীরসাহেব বাংলা ভাষা স্বচ্ছন্দে পড়িতে পারিতেন, লিখিতে জানিতেন না। মনে মনে পত্র পড়িয়া রামদয়ালকে বলিলেন, সাহেবকে আমার সেলাম বল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পত্রের উত্তর যাইবে। রামদয়াল পুনরায় সেলাম বাজাইয়া নাগরা জুতাজোড়া যাহা দালানের সিঁড়ির নীচে রাখিয়া আসিয়াছিল, পায় দিয়া লাঠি ঘাড়ে করিয়া চলিয়া গেল।

মীরসাহেব বলিতে লাগিলেন, সুন্দরপুরের সহিত কাজিয়া করা বড় সহজ কথা নহে। সাহেব আজ পর্য্যন্ত প্যারীসুন্দরীকে চিনিতে পারেন নাই। তা—যা হ'ক, দেবীপ্রসাদ কাছারিতে আসিয়াছেন কিনা? মাংগন খানসামা দৌড়িয়া কাছারিঘর হইতে প্রধান কার্য্যকারক দেবীপ্রসাদকে ডাকিয়া আনিল। কেনীর পত্র চোবে ঠাকুরের হস্তে দিয়া মীরসাহেব বলিলেন, ইহার যাহা বিহিত হয় কর। আর সেইসঙ্গে ইহার উত্তর লিখিয়া দেও।

দেবীপ্রসাদ পত্র পাঠ করিয়া একটু চিন্তার পর বলিলেল, সাহেব যখন চাহিয়াছেন, দেওয়াই উচিত, কিন্তু এত লাঠিয়াল একদিনে তো জুটিবে না। মীরসাহেব বলিলেন, না জুটিলে উপায় কি! যত পার। যখন সাহায্য চাহিয়াছেন, তখন দিতেই হইবে। দেবীপ্রসাদ বলিলেন, নিজের হাত-পা যাহারা, তাহাদের এ কাজে দিতে পারি না, সুন্দরপুরের ঘর কম নহে। পরিণামে যে কি হইবে, তাহা ঈশ্বরই জানেন। সাহেব এত দিন দুর্ব্বলকেই নির্য্যাতন করিয়াছেন, সবলের গায়

তো হাত দেন নাই—এই প্রথম। যাক সে কথায় আমাদের কাজ নাই। এতদিন পরে মহিষ আর বাঘিনীতে বাধিল। ভালই হইল। হয় কেনীর সর্ব্বস্বান্ত, নয় প্যারীসুন্দরীর সর্ব্বনাশ। এই বলিয়া মীরসাহেব উঠিয়া গেলেন। দেবীপ্রসাদও পত্রহস্তে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কাছারিঘরে আসিয়া বাব দিলেন। চিঠিপত্র, লোক যেখানে যেখানে পাঠান আবশ্যক, পাঠাইয়া স্নান আহার করিতে বাড়ি চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় তরঙ্গ

প্যারীসুন্দরী

সুন্দরপুরের জমিদার প্যারীসুন্দরী। প্রধান কার্য্যকারক রামলোচন। সে সময়ের চলতি বাঙ্গলা ভাষায় রামলোচন খুব পাকা। জমিদারি ফন্দি-ফেরেবেও দেশবিখ্যাত। সকলেই জানে যে রামলোচন একজন বিখ্যাত মামলাবাজ।

কেনীর অত্যাচারে ছোট ছোট তালুকদার, জোতদার, নানাশ্রেণীর ব্যবসাদার, মহাজন প্রভৃতি নাজেহাল হইয়া পৈতৃক গ্রাম, বাড়ি-ঘর ছাড়িয়া নানা স্থানে নানা লোকের আশ্রয় লইতেছে—জাতি, ধন, মান, প্রাণ কৌশলে বাঁচাইতেছে। কেনী এ পর্য্যন্ত সুন্দরপুরের কোন প্রজার গায়ে হাত দেন নাই, কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই, ইহাতেই রামলোচন নির্ভাবনায় জমিদারি চালাইতেছেন। প্যারী-সুন্দরীও ঈশ্বরে ধন্যবাদ দিয়া নির্ভাবনায় আছেন।

একদিন প্রায় একশত প্রজা কাঁদিতে কাঁদিতে সুন্দরপুর উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের একমাত্র বল-ভরসা, আশ্রয়দাত্রী ও রক্ষাকর্ত্রী যাহাকে জানিত তাঁহার নিকট বলিতে লাগিল, "মা! রক্ষা কর। এতদিন বাঁচাইয়াছ, এখন বাঁচাও। দুরন্ত বাঘের মুখ হইতে তোমার গরীব প্রজার প্রাণ বাঁচাও। আগামীকল্য আমাদের বুনানী ধান ভাঙ্গিয়া সাহেব নীলবুনানী করিবে—বহুতর লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়াছে। মা! আমাদিগকে রক্ষা কর। দুরন্ত জালেমের হস্ত হইতে তোমার গরীব প্রজাদিগকে রক্ষা কর। এতদিন ছিলাম ভাল, এখন মারা পড়িলাম। আর বাঁচিবার পথ নাই। সংবৎসর আশা করিয়া চাষ করিয়াছি, পেটে না খাইয়া ঘরের ধান মাঠে ফেলিয়াছি, স্ত্রী-পুত্র লইয়া খাইয়া প্রাণ বাঁচাইব, আপনার রাজস্ব আদায় করিব আশাতেই সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া ঐ ধানখেতের দিকে চাহিয়া একটু স্থির রহিয়াছি। মা! আমাদের সেই বোনা ধান ভাঙ্গিয়া সাহেব যদি নীল-

বুনানী করে, তবে আমরা একেবারে মারা পড়িব—ছেলেমেয়েসমেত মারা পড়িব। মা! তুমি মুখ তুলিয়া না চাহিলে আমাদের মুখের প্রতি একবার নজর করে এমন লোক জগতে আর কেহই নাই। মা! তুমিই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা। মা! তোমার এই অধম সন্তানদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা কর। দুরন্ত জালেমের হাত হইতে বাঁচাও।”

প্যারীসুন্দরী প্রজাদিগের কাতর উক্তি শ্রবণ করিয়া ব্যথিত হইলেন। তিনি রামলোচনকে ডাকিয়া বলিলেন, “আমার প্রজার প্রতি অত্যাচার যাহা শুনিতে বাকি ছিল, আমি বাঁচিয়া থাকিতে ভাগ্যক্রমে তাহাই শুনিতে হইল। আমি থাকিতে আমার প্রজার প্রতি নীলকর ইংরেজ দৌরাত্ম্য করিবে? আমি বাঁচিয়া থাকিতে আমার প্রজার বুনানী ধান ভাঙ্গিয়া কেনী নীল বুনিবে, ইহা আমার প্রাণে কখনই সহ্য হইবে না। প্রজাদিগের দুরবস্থা আমি এই নারী-চক্ষে কখনই দেখিতে পারিব না। যে উপায়ে হউক, প্রজা রক্ষা করিতেই হইবে। লোক-জন, টাকা, সদ্দার, লাঠিয়াল যাহাতে হয়, তাহার দ্বারা প্রজার ধন, মান, প্রাণ জালেমের হস্ত হইতে বাঁচাইতে হইবে। ধান ভাঙ্গিয়া যাহাতে নীলবুনানী করিতে না পারে তাহার বিশেষ উপায় করিতে হইবে। আপন প্রজাকেই যদি দুরন্ত নর-ব্যাঘ্র হইতে রক্ষা করিতে না পারিলাম—ম্লেচ্ছ পাপাত্মার কঠিন হস্ত হইতে রক্ষা করিতে না পারিলাম—তবে এ বিষয়-বিভব, টাকা এবং জমিদারিতে প্রয়োজন কি? এখনি এ-সকল প্রজার সাহায্যার্থ লোক পাঠাও। যদি যথার্থই সাহেবের পক্ষীয় লোকেরা এইসকল প্রজার ধান ভাঙ্গিয়া নীলবুনানী করিতে আইসে, দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা নাই—যেপ্রকারে হয় তাহাদিগকে তাড়াইয়া—শাস্তি দিয়া তাড়াইয়া প্রজা রক্ষা করিবে। ধান ভাঙ্গিয়া নীলবুনানী করিলে কি আর প্রজা বাঁচিবে? কি লজ্জার কথা! কি ঘৃণার কথা! কোথায় বেলাত, আর কোথায় এদেশ। একটিমাত্র ইংরেজ (কেনী) আসিয়া এদেশ উচ্ছিন্ন করিল। একেবারে ছারখার করিয়া ফেলিল! কৃষি-প্রজার জমিজমা কাড়িয়া লইয়া নীলবুনানী করিল। কত তালুকদারের তালুক, কত জোতদারের জোত জবরাণে লিখিয়া লইল। কাহারও যথাসর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইয়া একেবারে পথের কাঙ্গাল করিয়া ছাড়িয়া দিল। হায় হায়! কি দুঃখ! যাহারা চিরকাল দুধে-ভাতে, সুখ-স্বচ্ছন্দে, আপন আপন পরিবার লইয়া সংসার-ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছে, কত অতিথ-সেবায়, দেবতা-পূজায়, দীনদুঃখীর সাহায্য করিয়া কত লোকের উপকার

করিয়াছে, কত অনাহারীর আহার দিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছে, এক্ষণে তাহারাই একটি পয়সার জন্যে লালায়িত! তাহাদের পেটে অন্ন নাই, গায়ে বস্ত্র নাই, থাকিবার স্থান নাই। হায়! হায়! তাহাদের মা, ভগ্নী, স্ত্রী, মাসী, পিসীর উদরের দিকে চাহিলে কাহার না চক্ষু জলে ডুবিয়া যায়? সে জীর্ণশীর্ণ শরীরে শত গ্রন্থিযুক্ত পরিধেয়ের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে কাহার না অন্তরে ব্যথা লাগে? সে দুঃখ কি আর মানুষে চক্ষে দেখিতে পারে? ঐ কেনীর দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে না পারিয়া কত ভদ্রসন্তান, কত নিরীহ লোক পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া কোথায় কোথায় কোন দেশে চলিয়া গিয়া জাতি, কুল, মান রক্ষা করিতেছে। যাহারা পৈতৃক ভিটার মায়া-মমতা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহারা যথাসর্বস্ব দিয়াও রক্ষা পায় নাই। নীল কাটা, হউজ মাই, নৌকার গুণ টানান এইসকল কার্য্যে তাহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া যাইতেছে। ইহার পর আবার সময় সময় হাত-পা বান্ধিয়া গাছে লটকাইয়া চাবুকে পিঠের ছাল তুলিতেছে! উহু! কি ভয়ানক নরব্যাঘ্র! কি করিব, আমি দেশের রাজা নহি, সকলে আমার অধীন প্রজা নহে, এদেশের সকল জমিদারি প্যারীসুন্দরীর নহে। কি করিব, এদেশের আর কাহারও কিছু রাখিবে না। ও বেলাতী কুকুর এদেশের সকলকেই দংশন করিবে! সে বিষে সকলেই জর্জ্জরীভূত হইবে। প্রথমেই ঐ ম্লেচ্ছের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া না দিলে শেষে আমার জমিদারি পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া ভস্মীভূত করিবে। আমাকে যে কিরূপ বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে, তাহা ঈশ্বরই জানেন। শেষে কি সুন্দরপুরের ঘরের মান ডুবিবে! হায়! হায়! শেষে কি কেনীর হস্তে সুন্দরপুরের ঘর মাটি হইবে?

রামলোচন বলিলেন—"কেনীর সাধ্য কি যে আমাদের প্রজার উপর অত্যাচার করে। যে উপায়ে হয় আমি তাঁহাকে দুরস্ত করিব। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদারের বিষয়-সম্পত্তি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া তাঁহার মেজাজ গরমী চড়িয়াছে। আপনার আশীর্ব্বাদ থাকিলে যে উপায়ে হয় তাঁহাকে এমন শিক্ষা দিয়া দিব যে আর কখনও সুন্দরপুরের নাম স্বপ্নেও মুখে না আনেন—মনে না করেন। আর বাঙ্গালী হইলেই যে শেয়াল-কুকুর হয় তাহাও না ভাবেন।" এই বলিয়া রামলোচন বিদায় হইয়া আপন কর্ত্তব্য কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত রামলোচন লাঠিয়াল যোগাড় করিয়া প্রজাগণের

সাহায্যে নিযুক্ত করিলেন। এবং একজন সাহসী কর্ম্মচারীকে তাহাদের অধিনায়ক করিয়া প্রজাগণকে সঙ্গে দিয়া তখনই সুন্দরপুর হইতে ঘটনাস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন রাত্রি প্রভাত না হইতে হইতে ভারলেব (গ্রাম) কাছারি পঁহুছিবে এবং তথা হইতে যত লোক পাও সঙ্গে লইয়া সেই ধানেব জমিতে যাইয়া থাকিবে। প্রাণ থাকিতে সাহেবের লাঠিয়ালকে আমার এলাকায় পা দিতে দিবে না। যেখানে যাহাকে পাও মারিবে। ধরিয়া আনিতে পারিলে ত কথাই নাই।

একে একে সকলেই বামলোচনেব আশীর্ব্বাদ লইযা সুন্দরপুব হইতে বিদায় হইল।

চতুর্থ তরঙ্গ

বাঙ্গালী যুদ্ধ

বাঙ্গালী যুদ্ধে ডাক ভাঙ্গা একপ্রকাব উৎসাহসূচক বাজনা এবং দূতেব কার্য্য করে। ডাকের উত্তব-প্রত্যুত্তরেই ক্ষমতা, বল, লোকসংখ্যা সকলই বোঝা যায়। অনেক সময় এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, কেবল ডাক ভাঙ্গার উত্তব-প্রত্যুত্তরেই নিস্তেজ পক্ষ হটিয়া যায়। আর অগ্রসর হয না। বাত্রি প্রভাত হওয়ার পূর্ব্বেই প্যারীসুন্দরীব সর্দ্দারগণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে 'মার মাব' শব্দে আসিয়া পড়িল। আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে একেবাবে ভগ্নহৃদয়ে হতাশ হইয়া—নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। কারন সাহেবেব লাঠিযালগণ বিরোধীয় ভূমিতে পূর্ব্বেই আসিয়াছিল। কেবল প্রভাতের প্রতীক্ষায় ছিল মাত্র। উভয় পক্ষের মশালের আলো দেখিয়া উভয় পক্ষ ডাক ভাঙ্গিযা উত্তর-প্রত্যুত্তরেই বুঝ-সমুজ হইয়া গেল। উভয় পক্ষ জানিল যে কোন পক্ষই কম নহে। প্যাবীসুন্দবীব লাঠিয়ালেরা স্থির করিল যে, রাত্রে লাঠালাঠি, মারামারি করা বুদ্ধির কার্য্য নহে। কে কোথা হইতে কাহাকে মারিবে, কে মরিবে, কে বাঁচিবে, কে রক্ষা করিবে, কে দেখিবে, একটু অপেক্ষা করিয়া পূর্ব্বদিক ফরসার সহিত আমরাও ওদিকে ফবসা করিয়া দিব।

মায়াময়ী নিশা পরস্পর বিবাদ-বাধাইয়া দিবার জন্যই বোধহয় শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান করিলেন। দুই দলে স্পষ্ট দেখাশুনা হইল। ছেড়ছাড় মিষ্টি গালি-গালাজ চলিল। প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেবা সজোরে ডাক ভাঙ্গিয়া ক্রমশঃই অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহারা মনে করিয়াছিল যে, যে জমির ধান ভাঙ্গিয়া সাহেব নীল-

বুনানি করিবেন, সে জমি পিছে ফেলিয়া নির্দ্দিষ্ট সীমায় দাঁড়াইয়া বুনানি ধান রক্ষা করিবে। সাহেবের লাঠিয়ালদিগকে আর সে জমির দিকে আসিতেই দিবে না। সে আশা বিফল হইল। কারণ সাহেবের লাঠিয়ালেরা পূর্ব্বেই ধানখেত পাছে করিয়া আপন আপন আয়ত্ব ও সুবিধা মত আনি (ব্যুহ) বান্ধিয়া দাঁড়াইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে প্রভাতবায়ু বহিয়া পূর্ব্বদিক পরিষ্কার করিয়া দিল। মশালের আলো মলিন হইযা মুখে ছাই মাখিয়া নিবিয়া গেল। পুনরায় উভয় দলেব কথা চলিল। ক্রমে গালাগালি, শেষে লাঠালাঠির উপক্রম। ওদিকে কেনীর পক্ষ হইতে শতাধিক লোক লাঙ্গল-গরু জুড়িয়া ধান ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। প্যারীসুন্দরীর কার্য্যকারক, যিনি হুকুম দেহেন্দা হইয়া আসিয়াছিলেন, ঘোড়া টপকাইয়া এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে দৈবাৎ সাহেবের সর্দ্দারদিগের পিছনে বহুতর গরু ও লাঙ্গল দেখিযা বলিতে লাগিলেন, "ভাইসকল! আর দাঁড়াইয়া কি কর ওদিকে দফাবফা। ঐ দেখ, ধান ভাঙ্গিয়া নীল বুনিতেছে। আমবা যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা হইল না। সর্ব্বনাশ হইল! সুন্দরপুর গিয়া কি জবাব দিব?"

প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেরা বিকট চীৎকাব করিয়া কেনীর লাঠিয়ালের প্রতি আক্রমণ করিল। বিপক্ষদলও বিশেষ শিক্ষিত—কিছুতেই হেলিল না। আনি ভাঙ্গিল না—একপাও নড়িল না। লাঠি-উডসড়কি অবিরত চলিতে লাগিল। কেনীর লাঠিয়ালেবা কেবল আত্মবক্ষা করিতেছে, একপদও অগ্রসর হইতেছে না। কার্য্যসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত (ধান ভাঙ্গিয়া নীল-বুনানি) আক্রমণের নামও মুখে আনিবেন না, ইহাই তাহাদের স্থির-সংকল্প।

এদিকে সূর্য্যদেবের আগমন সহিত টি. আই. কেনী বৃহদাকার শ্বেতবর্ণ অশ্বে আরোহণ করিয়া ত্বরিদ্‌বেগে আপন লাঠিয়ালদিগের পৃষ্ঠপোষক হইলেন। দেখিতে দেখিতে ধান ভাঙ্গিয়া নীল-বুনানি শেষ হইয়া গেল।

সাহেব গভীরস্বরে বলিলেন, "আর দেখ কি, লাগাও!"

স্বয়ং মনিবের হুকুম। পাঁচশত লাঠিয়াল একত্রে সেই বিকট চীৎকারে, মাঝে মাঝে ঋ-ঋ শব্দ করিয়া মনিবের সাহস ও উৎসাহবাক্যে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। কেনী লাঠিয়ালদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেরা সাহেবকে স্পষ্টভাবে দেখিতেছে। অশ্ব উচ্চ, কেনীর শরীর উচ্চ,

সকলের মাথার উপর মাথা—সে মাথার উপরে আরো উচ্চ টুপি। সকলেই দেখিতেছে যে, আজ কেনী স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে রহিয়াছেন। প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়াল-গণমধ্যে সড়কিওয়ালা সর্দ্দাব অনেক ছিল। একজন সড়কিওয়ালা সর্দ্দার টি. আই. কেনীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া উড়সড়কি এমন কৌশলে নিক্ষেপ করিল যে, সাহেবের টুপি সড়কির আঘাতে মাটিতে পড়িয়া গেল। মাথায় আঘাত লাগিল না। সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দুই-তিনজন প্রধান প্রধান লাঠিয়ালেব পৃষ্ঠে চাবুক সই করিয়া করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ড্যাম শুয়াব, কেবল ডাক ভাঙ্গিতে জান, পায়তারা করিতে জান, লাঠি ভাঁজিতে জান, মারিতে জান না? লাগাও, তাড়াও, মার শুযার লোক্‌কো—"

লাঠিয়ালেরা হুকুমের জোরে চাবুকের জ্বালায় বিপক্ষ দল প্রতি সজোরে লাঠি-সড়কি মারিতে আরম্ভ করিল, এবং ক্রমশই অগ্রসব—প্যারীসুন্দরীর লাঠি-য়ালেরা আঘাতিত হইতেছে, কিন্তু পৃষ্ঠ দেখাইতেছে না, দৌড়িয়া পলাইতেছে না। ক্রমে পিছে হঠিয়া আত্মরক্ষা করিতে কবিতে যাইতেছে। দুই-তিনটি লোক পিছে হঠিয়া যাইতে যাইতে দৈবাৎ উচ্চনিচু স্থানে যেই পড়িয়াছে, অমনি সাহেবের লাঠিয়াল সড়কিদ্বারা আঘাত করিয়া বিন্ধিয়া ফেলিল, আর উঠিতে দিল না। মানুষের রক্তের ধারা ছুটিল। কেহ উঠিয়া বসিতেই পড়িয়া গেল। কেহ মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। বক্তমাখা সড়কির দিকে দৃষ্টি কবিয়া প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালগণ ঢাল, সড়কি, লাঠি ফেলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে আবম্ভ করিল। যে যেদিক সুবিধা বুঝিল, সে সেইদিকেই যথাসাধ্য দৌড়িল। হুকুম দেহেন্দা মহাশয় কোন সময় চম্পট দিয়াছিলেন, তাহা কেহই দেখিতে পায় নাই।

টি. আই. কেনীর উৎসাহে তাঁহার লাঠিয়ালগণ অর্দ্ধক্রোশ পর্য্যন্ত বিপক্ষ-গণকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। শেষে তাহারা একেবারে দল ভাঙ্গা হইয়া ঝাড়ে-জঙ্গলে এবং সম্মুখে গ্রামের মধ্যে গিয়া প্রাণ বাঁচাইল। টি. আই. কেনী সদর্পে বলিতে লাগিলেন—"আর আগে বাড়িও না। এক্ষণে প্যারীসুন্দরীর প্রজাগণের বাড়ি-ঘর যাহা সম্মুখে পাও ভাঙ্গিয়া ফেল। জিনিসপত্র লুটিয়া লও।"

আদেশমাত্র লুঠ আরম্ভ হইল। থালা, ঘটি, বাটি এবং কৃষক-স্ত্রীদের গায়ের রূপার অলঙ্কার সর্দ্দারগণ টানিয়া ছিঁড়িয়া খসাইতে আরম্ভ করিল। পাষণ্ডেরা স্ত্রীলোকদিগের পরনের কাপড় পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়া কেহ মাজায়, কেহ মাথায়

বান্ধিয়া বাহাদুরি দেখাইতে লাগিল। গরুসকল তাড়াইয়া কুঠির দিকে লইয়া চলিল। ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্র যাহাই সুবিধা পাইল লইল, অবশিষ্ট ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া শেষে ভাঙ্গাঘরে, ভালঘরে আগুন লাগাইয়া টি. আই. কেনী লাঠিয়ালগণসহ কুঠির দিকে ফিরিলেন।

প্যারীসুন্দরীর প্রজার সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বনাশ!—বিনাশ—একেবারে রসাতল। মাথা ভাঙ্গিয়া কান্না।—স্ত্রীলোকেরা ঝাড়ে-জঙ্গলে প্রাণের ভয়ে, জাতের ভয়ে লুকাইয়া বাড়িপোড়া আগুন—জলপোরা চক্ষে দেখিয়া মৃত্যুযাতনা ভোগ করিতে লাগিল। সাহেব সদলে কুঠিতে আসিয়াই লাঠিয়ালগণকে বকশিশ দিয়া খুসি করিলেন। লুটের মাল কাঁসা, পিতল, বস্ত্রাদি লাঠিয়ালগণের বাড়িতে গেল। সোনারূপা সাহেবের আলমারিতে উঠিল। গরুসকলের গায়ে তখনি T. I. K. মার্কা বসাইয়া কুঠির গরুর সামিল হইল। সময়ে এ সংবাদ সকলেই শুনিলেন। হায়! হায়! ভিন্ন আর উপায় কি!

টি. আই. কেনী পত্রদ্বারা মীরসাহেবকে এ শুভ সংবাদ জানাইলেন। মীর-সাহেব প্যারীসুন্দরীর প্রজাগণের দুরবস্থার কথা শুনিয়া মহা দুঃখিত হইলেন। কি করিবেন দায়ে পড়িয়া কেনীর সহিত বন্ধুত্ব। নিজের সম্পত্তি, মান, সম্ভ্রম রক্ষা করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। জানিত পক্ষে কেনীর অপকার করিবেন না, এইটিই তাঁহার স্থির সঙ্কল্প। বোধহয় কেনীর পত্রের উত্তর, সন্তোষ এবং হরিষের কথা পুরিয়া দিয়াছিলেন।

প্যারীসুন্দরীর প্রজাদিগের দুরবস্থার কথা শুনিতে কাহারও বাকি থাকিল না। অন্যান্য জমিদার, তালুকদার, মধ্যশ্রেণীর জোতদার, প্রজা, সকলেই ভয়ে ভীত, ব্যস্ত—অস্থির। কখন কাহার ভাগ্যে কি হয়, এই ভাবনাতেই সকলে

কেনী ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী জোতদার, তালুকদারদিগকে পত্রদ্বারা, কাহাকে লাঠিয়ালদ্বারা আনিয়া তাঁহাদের পৈতৃক ভূ-সম্পত্তি আপন সুবিধা মত কবালা, পত্তনী এবং মিরাস স্বত্বে দলিল লিখাইয়া লইতে লাগিলেন। চির-দখলী পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি লিখিয়া দিতে যিনি একটু ওজর-আপত্তি করিলেন, তিনিই সিরাজদ্দৌলার অন্ধকূপসম গুদামজাত হইলেন। কষ্টের একশেষ। বাধ্য হইয়া

সে কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া কেনীর মনোমত দলিল লিখিয়া দিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। অমানুষিক কয়েদ হইতে খালাস পাইলেন।

সে সময় কুষ্টিয়া অঞ্চলে কেনীই রাজা, কেনীই প্রায় হর্ত্তাকর্ত্তার মালিক। যা করে—কেনী। শালঘর মধুয়ার কুঠির দিন দিন উন্নতি। নীলের উন্নতি, রেশমের উন্নতি, চতুর্দ্দিকে কেনীর নাম। কেনীর নামে পুরুষের পীলে কাঁপে, গর্ভিনীর গর্ভপাত হয়! ছোট ছোট ছেলেরা কেনীর নামে ভয় পায়। কেনীর দৌরাত্ম্য আগুনে দেশের লোক জ্বলিয়া পুড়িয়া থাক হইতে লাগিল। কুঠির নাম শুনিলেই হৃদয় কাঁপে। কুঠির সীমা-মধ্যে পা ধরিতে অনেকেরই প্রাণ কাঁপিয়া—অঙ্গ শিহরিয়া উঠে—মুখ শুকাইয়া যায়। কুঠির সম্মুখে কালীগঙ্গা। কালীগঙ্গার পশ্চিমপার দিয়া লোকজনের গতিবিধি ভিন্ন, কুঠির পাব—পূর্ব্ব পার দিযা কেহই যাইতে সাহসী হয় না। নিকটবর্ত্তী জমিদার, তালুকদাব, সকলেই কুঠিব চটকা (বৃক্ষ বিশেষ) তলায পড়িয়া আপন আপন পীব-পয়গম্বর বা ইষ্টদেবতার নাম করিয়া থাকেন। কার ভালে কি হয় কে জানে! বিনা তলবে আপিস ঘবে কাহারও যাইবার অনুমতি নাই। কার সাধ্য সে আজ্ঞা লঙ্ঘন কবে? বা বিপর্য্যয় ঘটায়? ঘরাও বিবাদ, প্রজায় প্রজায় মারামাবি, স্বত্বাস্বত্বের বিচাব, খত পত্র তমঃস্তক ইত্যাদি যাবতীয় নালিশ সে সময় কেনী গ্রহণ করিতেন।—পরে শুনিয়াছি যে, কেনীব অনারারি মাজিষ্টারের ক্ষমতা ছিল।

কুষ্টিয়ায় মহকুমা হয় নাই। জেলাও পদ্মার পার। জমিদার কেনী—বিচারকর্ত্তা কেনী—মহারাজও কেনী। রাখেন তিনি, মারেন তিনি। যারা আগে থেকেই কেনীর পায়ে মুজা চড়াইয়াছিলেন, তাঁহারা একটু আছেন ভাল। বিশ্বাস ছিল যে, বিচার না করিয়া আব গুদামে পুরিবে না।

এ গুদাম—বড় ভয়ানক বন্দিখানা। সরকারী গুদামে পেট পুরিয়া না হউক, কয়েদী দুবেলা দুমুঠো ভাতের মুখ দেখিতে পায়। এ গুদামে তা নয়, এ বন্দিখানার সে কথা নয়, ইহার ভিন্ন ভাব—অন্য কারবার—বড় ভয়ানক স্থান! সেখানে শুইবার বিছানা নাই, বালিশ-কাঁথা-কম্বলের নাম নাই। ভাতের মুখ দেখিবার ভাগ্যই নাই। আহারের ব্যবস্থা ধান।—ধান বাছ, চাল বাহির কর, জলে মিশিয়ে গিলে ফেল।

পঞ্চম তরঙ্গ

আবার

রামলোচন একখানি পত্র প্যারীসুন্দরীর নিকট দিয়া বলিলেন, পত্র পড়ে দেখুন।

প্যারীসুন্দরী পত্র পাঠ করিয়া ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিলেন। ভাবে বোধ হইল, যেন কোন বিশেষ গুপ্ত কথা পত্রে লিখা। ক্ষণকাল পরে বলিলেন, এবারেও যদি গতবারের মত হয়, তবে আর—কাজ নাই,—অপমান অপেক্ষা মৃত্যুই ভাল।—

রামলোচন বলিলেন, "চেষ্টার ত্রুটি নাই। জয়পরাজয় ভগবানের হাত—দেখি। এবারেও দেখি!"

প্যারীসুন্দরী বলিলেন, "দেখিতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু খুব সাবধান—খুব সতর্কে, এবারে খুব সতর্কভাবে কার্য্য করিবে। ঐ ম্লেচ্ছ ইংরেজ বেটা (কেনী) কোন দেশ হইতে এদেশে আসিয়া, দেশের লোকের সাহায্যে আমাদিগকে এত কষ্ট দিতেছে। প্রজার দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। হায়! হায়! একটি শ্বেতরাক্ষসে আমার জমিদারি পর্য্যন্ত গ্রাস করিতে বসিয়াছে।—ম্লেচ্ছ বেটা দর্প করিয়া বলিয়াছে যে, প্যারীসুন্দরীকে যে আমার নিকট ধরিয়া আনিবে হাজার টাকা পুরস্কার পাইবে। আমি ভাল করিয়া বিলাতী সাবানে তাহার গায়ের ময়লা দূর করিয়া যাতে বাঙ্গালীর গন্ধ শরীর হইতে একেবারে সরে যায় তার উপায় করিব। গাউন পরাইয়া দিব্বি মেম সাজাইয়া কুঠিতে রাখিব। কি ঘৃণা! কর্ণ! তুমি বধির হও, বধির হও।"

রামলোচন বলিলেন, "হুজুর! যত শুনা যায় তত নয়। আবার পর মুখে পরের কথা কিছু বেশি পরিমাণেই কানে আসে। ও সকল কথায় কান দিবেন না। শত্রুর মুখ—আর পাগলের জিহ্বা, এ দুই-ই সমান। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।—বাজে কথা বলার জন্য বাজে মুখ আছে। শুনিবার জন্যও বিস্তর কান রহিয়াছে। আমরা কাজের কথা শুনিব। এবং যাহা মনে আছে করিব। ও সকল হাওয়াই কথায় কখনই কান দিব না।"

প্যারীসুন্দরী বলিলেন, "বাজে কথায় কান না দেওয়াই ভাল, কিন্তু কেনীর মেমকে যে হাতে আনিয়া দিবে, এই হাজার টাকার তোড়া তাঁহার জন্যে ধরা রহিল,—ইহার পর—মনের মত তাহাকে সন্তুষ্ট করিব। আজীবন তাহার চাকুরি বজায় থাকিবে। মৃত্যুর পরেও তার বংশাবলী সুন্দরপুরের ঘর হইতে বিশেষ বৃত্তি পাইবে।"

রামলোচন বলিলেন, "এ উতলার কার্য্য নহে। সকল দিক রক্ষা করিয়া, মান, সম্ভ্রম, এবং প্রাণ বাঁচাইয়া এইসকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। রোষবশে সাংঘাতিক কোন কার্য্য করিতে অগ্রসর হওয়া মানুষের কার্য্য নহে। আগে আত্মরক্ষা, শেষে যাহা ইচ্ছা। ইহার অন্যথায় নিত্য নূতন বিপদ ঘটিবারই বেশী সম্ভাবনা। এই তো সেদিন তাড়াতাড়ি করিয়া অপ্রস্তত হইতে হইল। পূর্ব্ব হইতে আয়োজন করিয়া আগাগোড়া আঁটিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে কিছুতেই ঠকিতাম না। সাহেবের লোকেরা কি সুন্দর কৌশলে কার্য্যসিদ্ধি করিয়া চলিয়া গেল। বিবেচনার ক্রুটিতেই সরকারী চাকর ১০।১২ জন অনর্থক জখমী হইল। যদিও তাহারা প্রাণে মরিবে না কিন্তু আশঙ্কা অনেক।"

প্যারীসুন্দরী বলিলেন, "আমি যে কিছু না বুঝি তাহা নহে। কিন্তু এত অপমান, এত লাঞ্ছনা, প্রজার প্রতি দৌরাত্ম্য ইহা আমার প্রাণে কখনই সহিবে না। যাহা হইবার হইয়াছে। গত কথায় আর ফল কি? এবারে কত লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়াছ? এবার তোমাকে স্বয়ং যাইতে হইবে। কুঠি পর্য্যন্ত নিজে না যাও, আমার কাছারি বাড়িতে থাকিবে। ইংরেজ দেখিলেই তোমরা যে কেন এত ভয় কর, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। সেও মানুষ, তোমরাও মানুষ। তোমাদেরও দুই হাত দুই পা, তাহাদেরও তাহাই। কোন হাড় কি শিরা তোমাদের শরীর অপেক্ষা তাহাদের বেশি নাই, অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরও কোন প্রভেদ নাই, আছে কেবল রঙের প্রভেদ। আর একটু প্রভেদ আছে। তোমরা নীলকর কুঠিয়ালদের ন্যায় পরিশ্রমী নও, বুদ্ধিমানও নও। কেনীর ন্যায় মিথ্যাবাদীও নও, নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, প্রবঞ্চকও নও। অত স্বার্থপরও নও। আমি শুনিয়াছিলাম যে টি. আই. কেনী বিলাতের ভদ্রবংশীয়। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, সেসকল কথারই কথা। এখন দেখিতেছি

কেনী চামার অপেক্ষাও অধম, মেথর অপেক্ষাও নীচ। ঐ কুঠিরই একজন সাহেবকে সাঁওতার বড় মীরসাহেব কি করিয়াছিলেন মনে আছে? আজ যে মীর-সাহেব কেনীর আজ্ঞাবহ, সেই মীরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা যে কীর্ত্তি করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, চিরকাল এদেশে সাধারণের মনে সে-কথা আঁকা থাকিবে। তাঁহার ক্ষমতাকে সহস্র ধন্যবাদ। যে নীলকরকে দেখিলে তোমরা দশহাত সরিয়া পড়, দুইহাত সেলাম বাজাইতে বাজাইতে পিছে হটিয়া হাঁপ ছাড়, দেবতার ন্যায় পূজা কর, যম হইতেও ভয় কর। সত্য কথা বলিব তাহাতে আর দোষ কি? নিন্দাবই-বা কথা কি? সাহেব দেখিলে সকলেরই যেন গা কাঁপিয়া ওঠে। সে গিড়ি-মিড়ি কথা কানে গেলে মহামহিম মহাশয়েরও প্রাণ উড়িয়া যায়। সেই নীল-করকে ধরিয়া তিনি যেরূপ শাস্তি করিয়াছিলেন, তাহা এদেশের সকলেই জানে। বড় মীর ঐ শালঘর মধুয়ায় কুঠির একজন কুঠিয়াল সাহেবকে ধরিয়া, দিনে দুপুরে তাহার একটি কান কাটিয়া লইয়াছিলেন। প্রজার প্রতি অত্যাচার করাতেই না তাহার রাগ—সাহেবেরও শাস্তি। আমি কি বলিব। আর কি করিব। সমুদায় কার্য্য পরের হস্তে। শুধু মুখের কথায় কি হয়? যা হউক, আমি আবার বলিতেছি কেনীর মেমকে তোমার নিকট চাই।"

রামলোচন বলিলেন, "হুজুর! আমার নিজের কার্য্য নহে! যাহা করিব সকলই পরের হস্তে, আমি যোগাড়ের ত্রুটি করি নাই, কখনও করিব না। টাকা খরচ করিতেও আপনার হুকুমের অপেক্ষায় থাকি নাই, থাকিবও না—দেখি, এবারে ঈশ্বর কি করেন।" এই বলিয়া রামলোচন প্যারীসুন্দরীর নিকট হইতে বিদায় হইলেন।

ষষ্ঠ তরঙ্গ

মিসেস কেনী

যে সময়ের কথা, সে সময় কুষ্টিয়ার মহকুমা বসে নাই। কেনীর জমিদারির কতক অংশ পাবনার সামিল, কতক মাগুরা যশোহরের অধীন। বিশেষ কোন আবশ্যকীয় কার্য্যোপলক্ষে কেনীকে স্বয়ং যশোহরে যাইতে হইয়াছিল। যখন সংবাদ পাইয়াছেন, তখনই বেহারার ডাক বসাইয়া চলিয়া গিয়াছেন! রাত্রে সংবাদ রাত্রেই যাওয়া—অনেকেই তাঁহার যশোহর গমনের খবর পায় নাই।

প্যারীসুন্দরীর গুপ্তচর সন্ধান করিয়া সুন্দরপুরে যে সংবাদ দিয়াছে, তাহা ঠিক হয় নাই। কারণ কুঠির লোকেই কেনীর সংবাদ ঠিক জানে না। অনেকেই জানে, সাহেব কুঠিতেই আছেন। কেনী কুঠি হইতে বাহির হইলেন, মেমসাহেব পিয়ানোয় হাত দিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পিয়ানোর সুরে সুর মিলাইয়া গান করিলেন। ক্লান্তিবোধেই হউক, কি নিশির স্তব্ধতায় বিশেষ কোন কথা মনে উঠিয়াই হউক, হৃদয় বিচলিত হইয়া মিহিস্বর বন্ধ হইল। পিয়োনোর বাজনাও থামিয়া গেল। হৃদয়ে যে চিন্তার লহরীই খেলিতে থাকুক, তাহা মুখে ফুটিল না। মনের কোন কথা মুখে আনিলেন না, কিন্তু ভাবে বোধ হইল যেন তিনি কি ভাবিতেছেন। তাঁহার পূর্ব্ব অবস্থার কথা—ইংলণ্ডের কথা? তাঁহার ভাগ্যের কথা? ভাবিতেছিলেন কেনীকে বিবাহ করিয়া ভালই করিয়াছেন। ইংলণ্ডে থাকিলে এত সুখ ভাগ্যে কখনই ঘটিত না। নৃত্য, গীত, আহার, বিহার, আমোদ, রাজপ্রাসাদে রাজভোগ, ইহা কখনই তাঁহার সুন্দর ললাটে জুটিত না। হয় জুতা সেলায়ের সুতার যোগাড, না-হয় কাপড ইস্তিরির সরঞ্জাম দুরস্ত, নয় দোকান ঘরে বিকিকিনি, কি অন্য কোনরূপ ব্যবসা অবলম্বন করিয়া শরীর খাটাইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত। ভারতে আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। সুখের সীমা পর্য্যন্ত (বোধহয় তাহার মতে) উপভোগ করিতেছেন। ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিয়া যেন তিনি চেয়ার হইতে উঠিলেন। শয়নকুঠরিতে গিয়া রাত্রিবাস মোলায়েম (রেশমী) কাপড পরিয়া পালঙ্কে শয়ন করিলেন। পাখা চলিতে লাগিল। বোধহয় ভাগ্যফল আলোচনা করিতে করিতে ঘুমে মাতিয়া পড়িলেন।

পাখিদের প্রভাতী গানেই প্রতিদিন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইত। নিশি-শেষে আজ নূতন প্রকারের শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। হো! হো! মার! মার! লাঠির ঠাকাঠক, লোকের গররা—এই নূতন প্রকার শব্দে তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। শয্যা হইতে চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, প্রভাত হইয়াছে। প্রভাতবায়ু জানালার খডখড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার রেশমী বসন-সহিত ক্রীড়া করিতেছে। দোলিত পাখার ঝালর মৃদু মৃদু নডিতেছে। মিসেস কেনী এইসকল ভাব, আধ-নিমীলিত আঁখিতে, আধ আধ ভাবে দেখিয়া প্রাভাতিক সমীরের স্বাভাবিক মোহমন্ত্রে আবার নিদ্রায় অভিভূতা হইলেন। কিন্তু নিদ্রার আবেশ বেশিক্ষণ রহিল না। ভীষণ রবে, লাঠিয়ালগণের হুহুংকার এবং মার মার শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। প্রাণ দুর দুর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। একি কাণ্ড? কি

ব্যাপার ? মহা গোলযোগ। পালঙ্ক হইতে ত্রস্তে উঠিয়া তাড়াতাড়ি গবাক্ষ-দ্বারে মুখ দিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার শয়নঘরের চতুষ্পার্শ্বে এবং কুঠির চারিদিকে বহুতর লাঠিয়াল। কুঠির হাতায়, এবং প্রবেশদ্বারে, ঢাল-সড়কি-বল্লমধারী সারি সারি লাঠিয়ালগণ যমদূতের ন্যায় দণ্ডায়মান, সকলেই অপরিচিত। কুঠির কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। দেখিবার মধ্যে দেখিলেন প্রবেশদ্বার হইতে কুঠির লোকদিগকে মারিয়া তাড়াইতেছে। তাহারা আঙ্গিনায় আসিতে যতই চেষ্টা করিতেছে, ততই লাঠির আঘাতে আঘাতিত হইতেছে। বহু চেষ্টাতেও আঙ্গিনায় প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। মহা বিপদ! একি! এরা কারা? কি জন্য আসিয়াছে—কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া সিঁড়ির দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। গবাক্ষে মুখ দিয়া বলিতে লাগিলেন, "সাহেব কুঠিতে নাই।"

লাঠিয়ালদিগের মধ্য হইতে একজন বলিল, "আমরা সাহেবকে চাই না। তোমাকে চাই। প্যারীসুন্দরীর হুকুম, তোমাকে সুন্দরপুর যাইতে হইবে। কথায় না যাও—লইয়া যাইব।"

মিসেস কেনী বলিলেন, "বাপুসকল! তোমরা আমাকে লইয়া কি করিবে? আমি তোমাদের কিছুই করি নাই, আমাকে বাঁচাও!"

সাদামুখের কথা শুনিতে কাহার ভাগ্য! আজ মিসেস কেনী বিপদে পড়িয়া লাঠিয়ালদিগের সহিত কথা কহিতেছেন, কিন্তু কার ভাগ্য সে মুখের কথা শুনিতে পায়? যাহাহউক, মিসেস কেনী তিন-চারটি কথা কহিয়াই কার্য্য-উদ্ধার করিলেন। স্ত্রীলোকের জয় না আছে কোথায়? তাহাতে আবার বিলাতী মুখ! যার তুলনা ভারতে নাই। লাঠিয়ালগণের এত উৎসাহ এত জোরের কথা—মিসেস কেনীর ঐ একটি কথায় কোথায় যে সরিয়া গেল তাহার সন্ধান হইল না। —যে মুখ তুলিয়া তাকাইল সে তাকাইয়া রহিল। যে কানে শুনিল সে কান পাতিয়াই রহিল। মিসেস কেনী সাহসে নির্ভর করিয়া একতোড়া টাকা উপর হইতে নীচে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন। অর্থের কাঙ্গাল বাঙ্গালী। টাকার মুখ দেখিয়াই গলিয়া পড়িল। যে কার্য্যে আসিয়াছিল, তাহা মন হইতে একেবারে সরিয়া গেল। সড়কি, ঢাল, লাঠি, তরবার মাটিতে ফেলিয়া তাড়াতাড়ি টাকা

কুড়াইতে লাগিল। যে যত পারিল লইল, কেহ কোমরে গুঁজিল, কেহ কাপড়ে বান্ধিল। টাকার লোভে শেষে আপসে আপসে সংগ্রাম বাধিল। মিসেস কেনীর নিক্ষিপ্ত টাকা সমুদয় কুড়াইয়া লইয়া শেষে বলবানেরা দুর্ব্বল এবং ক্ষীণকায় ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে আরম্ভ করিল। কেহ সাহায্য করিল, কেহ-বা সে সাহায্যে বাধা দিতে অগ্রসর হইল।

মিসেস কেনী এই সুযোগ দেখিয়া আর একতোড়া ঐ কুকুরকাণ্ড-মধ্যে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন। সে সময়ে আপসে আপসে প্রকাশ্যভাবে মারামারি বাধিয়া গেল। কোথায় সড়কি, কোথায় লাঠি, কোথায় কি পড়িয়া রহিল সে-দিকে কাহারও লক্ষ্য থাকিল না। টাকা লইয়া কাড়াকাড়িতেই মাতিয়া গেল। আপসে আপসে মারামারি, টানাটানি, হেঁচড়াহেঁচড়ি আরম্ভ করিয়া কেনীর লাঠিয়ালগণের অনেক সুবিধা করিয়া দিল। বিপক্ষ দলের লাঠি-সড়কি হাতে লইয়া অর্থলোভী নিমকহারামদিগকে ধরিবার আশয়ে কুঠির লাঠিয়ালেরা 'মার মার' শব্দে আসিয়া পড়িল। টাকার এমনি লোভ—টাকা এমনি জিনিস যে তখনও সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। রূপার চাকিতে চক্ষে ধাঁধা লাগিয়াছে। আত্মহারা, জ্ঞান-হারা হইয়া সকলেই ভ্রমে—মহাভ্রমে পড়িয়াছে। কুঠির লাঠিয়ালগণের লাঠি পিঠে পড়িতেছে, মাজা দমিয়া যাইতেছে, কেহ মাটিতে গড়িয়া পড়িতেছে, চক্ষু তুলিয়া ফিরিয়া দেখিয়াই চম্পট। দৌড়িয়া পথে অপথে পলায়ন। যাহারা প্যারীসুন্দরীর নির্দ্দিষ্ট বেতনভোগী তাহারাই কেবল রামলোচনের নিকটে ভারলের কাছারিতে ফিরিয়া গেল। বিদেশী সর্দ্দারেরা আপন আপন সুবিধামত আপন আপন পথ খুঁজিয়া লইল। হুকম দেহেন্দা দলপতি মহোদয়ের সহিত কাহারও সাক্ষাৎ হইল না।

মিসেস কেনী নীচে নামিয়া বাক্স, আলমারি যাহা পূর্ব্ব হইতে জরাজীর্ণ ছিল, নিজের চাকরদ্বারা ভাঙ্গিতে লাগিলেন। ফুলের টব, পাপোস, চেয়ার ইত্যাদি ছিন্নভিন্ন করিয়া কতক ঘরের বাহিরে, কতক সিঁড়ির নীচে, কতক ভগ্ন, কতক স্থানভ্রষ্ট করিলেন। এবং তখনই জেলায় ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পত্র লিখিয়া রামরূপ সিংহকে অশ্বারোহণে জেলায় পাঠাইয়া দিলেন। শম্ভু সান্যালকে ডাকিয়া কুঠিতে চড়াও, মালামাল লুট, বাক্স, আলমারি ভাঙ্গিয়া নগদ টাকা অপহরন —দিনে ডাকাইতি, এইসকল বিষয় বিস্তারিতরূপে লিখিয়া মীরসাহেবের নিকটেও পত্র পাঠাইলেন।

হরনাথ মিশ্র প্রধান কার্য্যকাবক বাসাবাড়িতে থাকিয়াই কুঠির সমুদয় অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। এখন আর গোলযোগ নাই দেখিয়া মেমসাহেবের নিকট আসিয়া বলিলেন, "হুজুর! আর একটি কার্য্য করিতে হইবে, গোপনে বলিব।"

মিসেস কেনী বলিলেন, "তুমি যাহা ভাল জান কর, আমার নিকট আর জিজ্ঞাসা করিও না।"

হরনাথ তখনি আপিস ঘরে যাইয়া কি মন্ত্রণা করিলেন তিনিই জানেন। এক ঘন্টার পব একপ্রকার হৃদয়বিদারক শব্দ শুনা গেল। বাবা গো—মলেম গো—আমি কিছুই জানি না—হা খোদা—

সপ্তম তরঙ্গ

ঘরজামাই

এক গাছের বাকল অন্য গাছে লাগে না। কলমের চারাও একেবারে খাঁটি উতরে না। আর একটি কথা, শত বৎসরও যদি কোন গাছের উপর ভিন্ন গাছ জীবিত থাকিয়া ডালপালা ছাড়ে, তত্রাচ তাহার নাম পরগাছা। জামাই পর-গাছা, জামাই কলমের চারা এবং ব্যবহারে বাকল। হাজার ঘস মাজ, মিশিবার নহে। মিশিবে না। স্থুল কথা জামাই জেতেই বিশ্বাস নাই, তারপর আবার ভাইঝি-জামাই। খুড়-ভাইপোয়ে প্রায়ই কাটাকাটি, মারামারি, খুনাখুনি। পরিশেষে—শ্রাদ্ধ আদালত পর্য্যন্ত গড়ায়। পবিণামে উভয়ে প্রায় এক ক্ষুরে মাথা মুড়িয়া পরের অন্নে উদরপূরণ, কেহ অন্য কোন নীচ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা ভিন্ন আর কোনই ভাল ফল দেখা যায় না। এক রক্ত, এক গোত্র, এক বংশ, তাতেই এই দশা—পরগোত্র, পরপুত্র জামাই, তাহার সঙ্গে এক কায়া, এক প্রাণ, দুইয়ে এক হওয়া বড়ই কঠিন কথা। যাহাদের শরীর এক রক্তে গঠিত, তাহাদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ থাকা স্বত্বেও রক্তের গুণ না থাকিয়া যায় না। পাষাণ হইলেও সময়ে নরম হয়, কালে স্নেহ, ভক্তি, প্রণয় এবং প্রেমভাব—সে কলুষিত পাপময় অন্তরেও দেখা যায়, জামাই পরের সন্তান, পররক্তে গঠিত, সুতরাং মনের ভাব ভিন্ন, স্বভাব ভিন্ন, হৃদয় ভিন্ন। সে বসে থাকিবার নয়। থাকিবে কেন, সে শ্বশুরকে পিতৃতুল্য মানিবে কেন? সে খুড়-শশুরকে শশুরের স্থানে বরণ করিবে কেন? তার কার্য্য-উদ্ধারই ভক্তি, তার স্বার্থসাধনই শ্রদ্ধা,

অভিষ্টসাধন করাই প্রেম। তোর সকলই কৃত্রিম। মীরসাহেব আপন বিপদ আপনি ডাকিয়া আনিয়াছেন। আপন মন্দ আপনি ঘটাইয়াছেন। আপন পায়ে আপনিই কুঠারাঘাত করিয়াছেন। রে সংসার! রে লোভ! তোর অসাধ্য কিছুই নাই। রে অর্থ! রে জমিদারি! তোরা না ঘটাতে পারিস এ জগতে এমন কোন কু-কার্য্যই নাই। মায়া, মমতা, স্নেহ, দয়া, ধর্ম্ম, সকলই স্বার্থের নিকট পরাস্ত। তোদের নিকট জিয়ন্তে বলি। মীরসাহেবের দেবীপ্রসাদ প্রধান কার্য্যকারক। সা গোলামের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। কালের ধর্ম্ম! সময় সময় তাঁহাদের উভয়ে অনেক কথা, অনেক আলাপ হইয়া থাকে। কোন কোন দিন আবশ্যক মতে নিকটস্থ আমবাগানে, কি বকুলতলায় বসিয়া গোপনে কথাবার্ত্তা হয়। প্রথম সূত্রপাত, পরে অনেক কথা, দিন দিন বহু কথা, বহু যোগাড়, গোপনে গোপনে বহু মন্ত্রণা, বহু কার্য্য সাধন হইতেছে ও হইযাছে। এখনও অনেক বাকি, সীমা পর্য্যন্ত যাইতে বহু বিলম্ব। তাই কথা ফোটে নাই, কেহ জানিতে পারে নাই। মীরসাহেবেরও কানে ওঠে নাই।

রাত্র দুই প্রহর। দেবীপ্রসাদের বৈঠকখানাতেই আজ বৈঠক। দেবী-প্রসাদ ছোট একখানি জলচৌকির উপর। সা গোলাম বড়গোছের একটি মোড়ায় বসিয়া উভয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। ঘরের এক কোণে মিটমিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে। সে সময় কেরোসিন তেলের চলতি হয় নাই। দিশি তৈল, দিশি প্রদীপ, দীপগাছাও মাটির।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন : মীর এব্রাহিম হোসেনের 'অছিয়তনামায়' যাহা যাহা লিখা আছে তাহা তো অন্যথা করিতে পারিবেন না। আমার বেশ মনে আছে, দুই ভ্রাতারই জমিদারিতে সমান অংশ। সাঁওতার বসতবাটিতেও তুল্যাংশ। কনিষ্ঠপুত্রকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। কারণ অতিশৈশবকালেই মীরসাহেব মাতৃহারা হন বলিয়া পদমদীর বাড়ি তাঁহাকে বেশির ভাগ দিয়া গিয়াছেন। সে বাড়ি এ বাড়ির ন্যায় পাকা নহে। সামান্য একখানি ঘর, আর চতুর্দ্দিকে প্রাচীর। বেশীর ভাগ পুষ্করিণী ও একটি আমবাগান মাত্র। মীর এব্রাহিম হোসেন আপনার শ্বশুরকে রাজী করিয়া, কন্যাদ্বয়কে বলিয়া পদমদীর বাড়ি-বিষয় মীর সাহেবকে অতিরিক্তরূপে দিয়া গিয়াছেন। একথা সকলেই জানে, অছিয়তনামাতেও স্পষ্টভাবে লিখা রহিয়াছে।

সা গোলাম বলিলেন : একথা অসম্ভব—অসম্ভব ! বাড়ি যেমনই হউক পৃথক হওয়ার কারণ কি ? নির্দ্দিষ্ট করিয়া যখন লিখা, তখন কি আর কথা আছে ! না, উহাতে কোন গোল উপস্থিত হইতে পারে ? ঘব থাক, পুষ্করিণী থাক, প্রাচীর থাক, বাগান থাক, হাজাব থাক সে বাডিব সকলি তাঁহাব। আর এই সাঁওতার বাড়িতে যাই থাক, সকলি আমাব শ্বশুবেব। দালানকোঠা আছে বলিয়াই কি ভাগ দিতে হইবে ?

দেবীপ্রসাদ বলিলেন : দেওয়াই তো কথা—বিষয়সম্পত্তি-জমিদারি সকলি এখানে, পদমদী পৈতৃক স্থান বটে, কিন্তু ধরিতে গেলে সকলই এখানে। সে কেবল নামমাত্র বাড়ি। আমি বেশ জানি, যাহার ভাগে যে গ্রাম পডিয়াছে, বৃদ্ধ মীবসাহেব যাহাকে যাহা দিয়াছেন, তাহা তিনি অছিয়তনামায় নির্দ্দিষ্টরূপে লিখিয়া দিয়াছেন। কেবল এই বাড়ি, আর এ বাডির মোতালকের অস্থাবর সম্পত্তি এজমালিতে বাখিয়া গিয়াছেন। অছিয়তনামা এবং অন্যান্য দলিল মীর-সাহেবের নিকট আছে, তাহা দেখিলেই আপনাব মনের ধান্দা ছুটিয়া যাইবে।

সা গোলাম বলিলেন : অন্যান্য দলিল-দস্তাবেজ যে বাক্সে আছে সে বাক্সে অছিয়তনামা নাই। আমি তন্ন তন্ন কবিয়া দেখিয়াছি। আপনি যে স্থানে থাকার কথা বলিযাছিলেন, সেখানেও নাই—আমি সন্ধান করিয়াছি। যেখানে আছে, তাহা জানিতেও পারিয়াছি। আমাদের সংসারে তাঁহার পক্ষে এখন একটি প্রাণিও নাই। মনে মনে সকলেই ফাঁক। দু-হাত ফাঁক। ফাঁক পেলে কেহই ছাড়িবে না। দু-একটি দাসী মাত্র তাঁহার স্বপক্ষে আছে। কিন্তু তাহাদেব কোন ক্ষমতা নাই। আমাদেরই সকল, আমরাই কর্ত্তা, আমরাই মালিক। আমি ইচ্ছা করিলে এই রাত্রেই একেবারে নিষ্কণ্টক হইতে পাবি। নির্ব্বিবাদে স্বীয় সম্পত্তি লইয়া সুখে থাকিতে পারি, কিন্তু—

দেবীপ্রসাদ বলিলেন : সে কি কথা ! ওসকল কথা কখনই মনে স্থান দিবেন না। মুখেও আনিবেন না। লোকের কুপরামর্শে কখনই ভুলিবেন না। কোনরূপ অমানুষিক কার্য্যে অগ্রসর হইবেন না। যাহা সহজে হইবে তাহার জন্য এত ব্যস্ত কি ? নখের আঁচড়ে ছিঁড়িয়া যাইবে, তাহার জন্য কামান পাতিবার দরকার কি ?

সা গোলাম হাসিতে হাসিতে বলিলেন : ও কিছু নয়, ও কথাটা আমি তামাশা করে বলছি। বিবেচনা করুন, অছিয়তনামা যদি কোন কৌশলে হস্তগত করিতে পারি—তাহাতে যাহা লিখা আছে, তাহার কি আর অন্যথা হইতে পারে না ?

দেবীপ্রসাদ বলিলেন : তাই বা কি করিয়া হইবে? এখন অন্যথা করিতে পারে এমন সাধ্য কার?

সা গোলাম বলিলেন : কেন সে তো কোম্পানীর ঘরে জানিতে হয় নাই, কোন হাকিমের নিকটও আজ পর্য্যন্ত উপস্থিত করিয়া কোনরূপ সহি করান হয় নাই। ঘরাও দলিল, ঘরাও লিখাপড়া। তাতে আছে কি? আপনারই তো পিতার হাতের লেখা। আপনার হাতের লেখা হইলে ক্ষতি কি? যেসকল সাক্ষী আছে, তাহাদের দ্বারা সাক্ষী-শ্রেণীতে নাম লেখাইতে কতক্ষণের কাজ?

দেবীপ্রসাদ বলিলেন : মীর এব্রাহিম হোসেনের দস্তখতের কি হইবে?

সা গোলাম বলিলেন : সে ভাবনা ভাবিতে হইবে না। সে ভার আমার প্রতি।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন : ভার আপনার প্রতিই থাক, গড়িয়া উঠিতে পারিলে হয়। ইহার জন্য সময় চাই—গোপন চাই, ছদ্মবেশী হওয়া চাই কপটতা শিক্ষা করা চাই—বিশেষ পরিশ্রম এবং উদ্যোগী হওয়া চাই।

সা গোলাম বলিলেন : সে আপনাকে বলিতে হইবে না, বহুকাল হইতে শিক্ষা আছে। আমি না পারি জগতে এমন কোন কার্য্য নাই। সংসার চালাইতে আমি ভাল জানি—সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য করিতে আমার বেশী সময় আবশ্যক করে না। ধর্ম্মভয়আমার অতি কম।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন : ভালই তো, ভয় যত কম থাকে ততই ভাল। কিন্তু ধর্ম্মভয় একটু থাকিলে যেন ভাল হয়। যাহাই বলুন আর যাহাই করুন, কিন্তু অছিয়তনামা আগে হস্তগত করিতে না পারিলে আর কোন আশা নাই। আপনি বলেন সন্ধান করিয়াছেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না। অছিয়তনামার বিষয় মীরসাহেব ভিন্ন অন্যকেহই জানে না। জানিবার সম্ভাবনাও নাই।

সা গোলাম বলিলেন : সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সন্ধান করিতে আমি কম করি নাই। শীঘ্রই সফল হইব—কোন চিন্তা করিবেন না।

দেবীপ্রসাদের বাটির পূর্ব্বদিকে বড় রাস্তা। গ্রামের, ভিন্ন গ্রামের ও অন্য স্থানের লোকজন ঐ পথে চলাচল করে "চৌকিদার চৌকিদার" বলিয়া একটি লোক ডাক ছাড়িয়া উঠিল।

সে সময় চৌকিদারের চাকুরি বড়ই অযত্ন ছিল। নামমাত্র চৌকিদার। চৌকিদারকে পেটের অন্ন জোটাইতে সারাদিন পরের দ্বারে মজুরী করিতে হইত। নিতান্ত হীনাবস্থার লোক না হইলে চৌকিদারি কার্য্য কেহ স্বীকার করিত না। বৎসরান্তে কেহ এককাঠা ধান, কেহ একজোড়া নারিকেল, দুই-একমুঠো পাট, দু-একসের কলাই চৌকিদারের বেতনস্বরূপ দিত। বড় বড় ঘরে বার্ষিক বরাদ্দ চারি আনা, বড় বেশি হইলেও আট আনার ঊর্দ্ধ ছিল না। ছেলেমেয়ের বিবাহে লোকে কিছু পয়সা, দু-একখানা কাপড় চৌকিদারকে দিত মাত্র। মাসিক বরাদ্দে প্রায় কেহই বেতন দিত না। চৌকিদারও বেতন বলিয়া কোন দাবি করিত না। চৌকি পাহারাও সেইপ্রকার—যেমন দান তেমন দক্ষিণা—যেমন বেতন তেমন কাজ। কিন্তু থানার দারোগা, জমাদার, বরকন্দাজের হাত হইতে বাঁচাও ছিল না। প্রতিকথায় মার, প্রতিকথায় গালাগালি, এইসকল ব্যবহারে নীচশ্রেণীর লোক ভিন্ন ভাল লোকে এখনও চৌকিদারি করে না। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া চৌকিদার বিভোরে ঘুমাইয়াছে। "চৌকিদার, চৌকিদার।" অনেকক্ষণ ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতেও চৌকিদার হাজির হইল না।

এত রাত্রে চৌকিদারের ডাক কেন? কে ডাকে? দেবীপ্রসাদ দুই-একপায়ে দেউড়ি পর্য্যন্ত আসিলেন। রাস্তার নিকট আসিয়া জানিতে পারিলেন যে, আগন্তুক পাবনার বরকন্দাজ। মাজিষ্ট্রেটসাহেব শালঘর মধুয়ার কুঠিতে যাইবেন। পথে পথে মশাল, মশালচির যোগাড় করিয়া, শালঘর মধুয়া যাওয়াই বরকন্দাজের এখন কর্ত্তব্য কার্য্য।

দেবীপ্রসাদ মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নাম শুনিয়াই তাড়াতাড়ি আসিলেন। সা গোলামকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া বরকন্দাজ ও তাহার সঙ্গী, লোকজনসহ মনিববাড়িতে আসিলেন। সদর দেউড়িতে তাহাদিগকে বসিবার স্থান দিয়া মাজিষ্ট্রেটসাহেবের শালঘর মধুয়ার কুঠিতে গমনসংবাদ মীরসাহেবের নিকট বলিতে অগ্রসর হইলেন। বৈঠকখানার বারান্দায় উঠিলেন, কিন্তু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন না। কারণ সেসময় মজলিস জমিয়া গিয়াছে। মীরসাহেব স্বয়ং সেতার বাজাইতেছেন, গোপাল ঢোলক বাজাইতেছে। দেশীয় নর্ত্তকীদ্বয় নৃত্য করিতেছে। মহফেলের প্রায় সকলেই মনের আনন্দে আনন্দসাগরে হাবুডুবু খাইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেবীপ্রসাদের পা উঠিল না। ডাকিলেই বা শুনে কে।

বাজেলোক পাঠাইয়া খবর দিতেও সাহস হইল না। আমোদে বাধা দেয় কার সাধ্য ?

দেবীপ্রসাদ বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। সা গোলাম দেবীপ্রসাদের সঙ্গে সঙ্গে বাটিতে আসিয়া, বৈঠকখানাঘরের দিকে যাইলেন না। মীরসাহেবের বিশ্বাসী খানসামা বিনোদের সহিত গোপনে গোপনে কি কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। এদিকে আমোদের ঢেউ খেলিতেছে। হাসির গররা, গানের তান, বাজনার বোলে হুলুস্থুল ব্যাপার বাধিয়া গিয়াছে। হঠাৎ সেতারের তার ছিঁড়িল, সঙ্গে সঙ্গেই যেন নর্ত্তকীর পায়ের নূপুর খসিয়া পড়িল। লয় বিহনে, বে-লয়ে, তাল কাটিয়া বাজনা বন্ধ হইল। বসীরুদ্দিন মোসাহেবও গায়ক—তিনিও বাঁচিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গলাবাজি করিয়াছেন, বাহিরে আসিবার নিতান্তই দরকার হইয়াছে। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া আবশ্যকীয় কার্য্য সমাধা করিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই হঠাৎ দেবীপ্রসাদকে দেখিয়া থতমত খাইয়া দাঁড়াইলেন। দেবীপ্রসাদ বসীরুদ্দিনের হস্ত ধরিয়া একটু দূরে লইয়া গিয়া চুপি চুপি মাজিষ্ট্রেটসাহেবের শালঘর মধুয়ার কুঠিতে গমনবিষয় বলিয়া দিলেন। বসীরুদ্দিন উঠিতে পড়িতে মীরসাহেবের নিকট যাইয়া চুপি চুপি সকল কথা শুনাইলেন। মীরসাহেব আমোদে ভঙ্গ দিয়া তখনি বাহিরে আসিলেন। মশাল, তৈল, মশালচি সংগ্রহ করিয়া দিতে দেবীপ্রসাদকে আদেশ করিলেন। এবং তখনি জানমামুদ, কদম, ফটিক, চাকরান, জমিভোগী বেহারাদিগের বাটিতে লোক ছুটিল। কারণ মাজিষ্ট্রেট-সাহেবের কুঠিতে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই মীরসাহেব কুঠিতে যাইয়া মিসেস কেনীর সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত মনে করিলেন।

বসীরুদ্দিন দেবীপ্রসাদকে দুইচক্ষে দেখিতে পারিতেন না। কারণ আমোদে-আহ্লাদে, মনোমত কার্য্যে বাধা দিতে দেবীপ্রসাদের হস্তই অগ্রে প্রসারিত হইত। বসিরুদ্দিন মীরসাহেবের প্রধান মোসাহেব। নাচিতেন, গান করিতেন, পাশা খেলিতেন। সং সাজিয়া রঙ মাখাইয়া—ঢং দেখাইতেও—লজ্জা বোধ করিতেন না। এবং ইচ্ছা করিয়া নর্ত্তকীদের মুখের মিষ্টি মিষ্টি বোল শুনিয়া সৌভাগ্য মনে করিতেন। তিনি যে একজন মহারসিক একথা তাঁহার মনে দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। আর ছিল যে, কমলপদের কোমল আঘাতে শরীর পবিত্র না করিলে রসিকের পরীক্ষা হয় না, রসিকনামও জাঁকিয়া উঠে না। যেমন আগুনে না পুড়িলে সোনার

আদর বাড়ে না, তেমনি কামিনী-কোমলপদের আঘাত সহ্য না করিলেও রসিক-নামের সার্থকতা হয় না।—বোধহয় এই অপকথাটা বসীরুদ্দিনের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগিত। তাই তিনি ঐ সকল কোমল পদের আঘাত সহ্য করিতেন—শরীর পবিত্র করিতেন। পূর্ব্বপুরুষের নামেও কিছু শুনিতেন।

আরও একটি আশা ছিল। মীরসাহেবের অনুগ্রহ আর সুদৃষ্টি—বিষয়াদির কার্য্যেও মীরসাহেব তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করেন, ইহাও তাঁহার অন্তরে অন্য একটি আশা। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে শেষ আশাটি কখনও পূর্ণ হয় নাই। বিষয়াদি কার্য্যে দেবীপ্রসাদের কথাই বলবৎ থাকিত। এই দুঃখে বসীরুদ্দিন সর্ব্বদাই চিন্তিত ও দুঃখিত থাকিতেন। সময় সময় সে দুঃখের কাহিনী মীরসাহেবের নিকট স্পষ্টভাবে বলিতেও ত্রুটি করিতেন না। মীরসাহেব কিন্তু সে কথায় কান দিতেন না। যাক সে কথা। এখনকার কথা এই যে, এত আমোদ মুহূর্তমধ্যেই বন্ধ হইল। এক দেবীপ্রসাদ আসিয়া নাচ, গান, বাজনা মাটি করিয়া দিল। এই কথাটা বসীরুদ্দিনের শিরায় শিরায় বসিয়া গেল।

মীরসাহবের গমনের আয়োজন, পালকি-বেহারা সমুদায় প্রস্তুত—হাসি, তামাশা, রসিকতা, রগড়ের কথা আর কাহারও মুখে নাই। সেতারের তার ছিঁড়িয়াই রহিল। নর্ত্তকীর পায়ের নূপুর ফরাসের উপরে যেস্থানে খসিয়া পড়িয়াছিল, সেইস্থানেই পড়িয়া রহিল। বসীরুদ্দিন বারান্দায় আসিয়া মৃদু-মৃদু স্বরে বলিতে লাগিল, "এখন না যাইয়া প্রাতে গেলেও হইতে পারিত।" মীরসাহেব সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। তিনি প্রস্তুত হইয়া পালকিতে উঠিলেন। বৈঠকখানাঘরের দ্বার বন্ধ হইল।

সা গোলাম বিনোদ খানসামার সহিত চুপি চুপি কি কথা কহিয়া তাঁহার বসিবার কুঠরিতে বসিয়া আছেন। চঞ্চল ভাব। রাত্রি প্রায় একটা—কি চিন্তা করিতে করিতে একবার বাটির মধ্যে তাঁহার শয়নকুঠরিতে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন। আবার বাটির মধ্যে গিয়া সমুদয় স্থান অতিসাবধানে বেড়াইয়া দেখিয়া আসিলেন। সকলেই নিদ্রিত, কাহারও সাড়া-শব্দ পাইলেন না। আজিই সময়, আজিই অবসর, এই উপযুক্ত সময়। মনে মনে স্থির করিয়া এক-পায়ে দু-পায়ে মীরসাহেবের তোশাখানার দিকে চলিলেন। তাঁহার এরূপ চলাফেরা নূতন নহে। আরও কয়েকদিন নিশীথ সময়ে মীরসাহেবের তোশাখানার দিকে পা ধরিয়াছেন। চুপে চুপে বাড়ির অনেক ঘর খুঁজিয়াছেন।

মাঙ্গন ও বিনোদ দুজনেই তোশাখানার জমাদার। মাঙ্গন মীরসাহেবের বিশ্বাসী এবং প্রধান চাকর। বিনোদ মাঙ্গনের সাহায্যকারী। দুলা মিয়া (জামাই-বাবু) অর্থাৎ সা গোলাম পূর্ব্ব হইতেই ঐ তোশাখানার কোথায় কি আছে বিনোদের সাহায্যে সকলি জানিয়াছিলেন। কোন দ্বার খোলা থাকে, কোন জানালা বন্ধ, কোন দিকে বাক্স, কোন পার্শ্বে আলমারি-সিন্ধুক সকলি তাঁহার জানা ছিল। জামাইবাবু সংসারের সমুদয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন। মীরসাহেবের আদেশ ও অনুগ্রহেই তাঁহার ঐ অধিকার।

মাঙ্গন মীরসাহেবের বিশ্বাসী তাহা জামাইবাবু বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। মাঙ্গনও বিশ্বাসের গৌরব দেখাইতে অনেক গুপ্তকথা, যাহা কেহ জানিত না, তাহার কিছু কিছু জামাইবাবুর নিকট প্রকাশ করিয়া বিশেষ বিশ্বাসী হইয়াছে। সা গোলামের বিশ্বাস, মাঙ্গন যাহা বলে সে-সমুদয়ই সত্য। মাঙ্গন গাঁজাখোর—কিন্তু সরল।

সা গোলাম বিনোদের সাহায্যে তোশাখানার দরজা খোলা পাইলেন। সাহসের উপর নির্ভর করিয়া চোরের প্রপিতামহের ন্যায় অতিসাবধানে পা ফেলিয়া তোশাখানার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিনোদের অনুগ্রহে তোশাখানা অন্ধকার। বাতিটি ইচ্ছা করিয়াই নিবাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঘোর অন্ধকার, কিছুই দেখিবার সাধ্য নাই! কেবল অনুমান আর হাতের আন্দাজ এই দুইটির উপর নির্ভর করিয়াই জামাইবাবু অন্ধকার ঘর-মধ্যে আপন অভিষ্ট সাধনের জন্য হামাগুড়ি দিয়া যাইতে লাগিলেন। মাঙ্গন কিছুই জানে না। বিনোদকেও আসল কথা বলেন নাই। কেবলমাত্র এই বলিয়াছিলেন যে, নিশীথ-সময়ে কোন গুপ্ত-স্থানে আমোদ-আহ্লাদ করিতে যাইব, তুমি তোশাখানার দ্বার খুলিয়া রাখিও। আমি তোমাকে খুব গোপনে জাগাইয়া লইয়া যাইব।

বিনোদ জানিলেও মা'র নাই—পূর্ব্ব মন্ত্রণাই তখন আশ্রয়। মাঙ্গন জাগিলেও শীঘ্র উঠিবে না। কারণ সে নেশায় ভোর। সা গোলাম গড়াইয়া হামাগুড়ি দিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। যে জিনিসের জন্য তাঁহার এত পরিশ্রম, এত চেষ্টা—মহাপাপকেও তুচ্ছ-জ্ঞান করিয়াছেন, সে জিনিসটি হস্তগত হইল। অছিয়তনামা যে বাক্সে আছে সন্ধানে জানিয়াছিলেন সে বাক্সটি হস্তগত হইল। বিশেষ সাবধানে হাতবাক্সটি বগলে চাপিলেন। মাঙ্গন টের পাইল যে, কে যেন ঘরের মধ্যে আসিয়া কি লইয়া গেল। নেশার ঝোঁকে উঠিতে ইচ্ছা হইল

না। চক্ষু বুজিয়াই 'দূর দূর' করিয়া আবার নীরব হইল। পূর্ব্ববৎ নিশ্বাস চলিতে লাগিল।

জামাইবাবু হাতবাক্সটি লইয়া তখনই নিজের বড় বাক্সে বন্ধ করিলেন। পাখিরা প্রভাতী গাইয়া উঠিল। শুকতারা মলিনভাবে নিজ গম্যপথে মিটিমিটি চাহিয়া যাইতে লাগিল, জামাইবাবু শয্যায় শুইয়া নাক ডাকাইতে আরম্ভ করিল।

অষ্টম তরঙ্গ

তদারক

পাবনা রাজশাহী জেলার অন্তর্গত। সময়ে সময়ে রাজশাহীর জজ দাওরার মোকদ্দমার বিচার করিতে পাবনায় আসিয়া থাকেন। কালেক্টরী মুন্সেফী সকলি আছে, সুতরাং জেলা বলিয়াই অভিহিত। পাবনা হইতে শালঘর মধুয়ায় আসিতে হইলে পদ্মা পার হইয়া আসিতে হয়।

পদ্মা পাড়ি দিয়া দক্ষিণপারে আসিলেই কুষ্টিয়ার থানা। পাঠক ! বর্তমান কুষ্টিয়া যে-স্থানে স্থাপিত সে স্থানের যথার্থ নাম কুষ্টিয়া নহে। পুরাতন রেলওয়ে ষ্টেশনের উত্তরদিকে কুষ্টিয়া গ্রাম আজি পর্যান্ত বর্তমান আছে। এইক্ষণ তাহার নাম পুরাতন কুষ্টিয়া। কুষ্টিয়ার থানা—পুরাতন কুষ্টিয়া হইতে উঠিয়া গৌরীনদীর দক্ষিণপার আসিলে, সে থানার নামও কুষ্টিয়া এবং সেই নামেই মহকুমা ইত্যাদি ও রেলওয়ে ষ্টেশনের নাম হইয়াছে। এইক্ষণে যে-স্থানে কুষ্টিয়ার থানা বর্তমান, সে-স্থানের নাম 'মজমপুর'। এইপ্রকারে বাহাদুরখালী, একপাড়া গ্রাম লইয়া কুষ্টিয়া। যে সময়ের ঘটনা, সে-সময় কুষ্টিয়ার মহকুমা হয় নাই, রেলওয়ে ষ্টেশন হয় নাই। বর্তমান থানারও সৃষ্টি হয় নাই। সেই পুরাতন কুষ্টিয়াতেই থানা—সে থানাতেও শালঘর মধুয়ার লুটের এজাহার পড়িয়াছে। অন্য লোকে এজাহার দিলে দারোগা-সাহেব সে লোকটিকে যাহা করিয়া বিদায় দিতে হয় করিতেন। কুঠির এজাহার না লইয়া উপায় নাই। মেমসাহেবের প্রেরিত লোকের এজাহার। বিশেষ দুর্দ্দান্ত প্রতাপান্বিত টি. আই. কেনীর কুঠিলুট। এ এজাহার না লইলে কি রক্ষা আছে ? লাভের প্রত্যাশা না থাকিলেও বাধ্য হইয়া এজাহার লইতে হইয়াছে।

থানাদার কেবল নিজ নাম সহি করিতে জানেন। তাই ফনবীমবাবুকে সঙ্গে লইয়া পাঁচজন বরকন্দাজসহ মাজেরাস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু লোক-

সাহেবের আদেশ হয় নাই বলিয়া তদারকে প্রবৃত্ত হন নাই। রীতিমত খোরাকি পাইতেছেন। থাকিবার স্থানও ভালই জুটিয়াছে। আহারাদি করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছেন। অনুসন্ধানে জানিয়াছেন মাজিষ্ট্রেটসাহেব স্বয়ং তদন্তে আসিবেন।

সূর্য্যোদয়ের সহিত স্থানীয় মাজিষ্ট্রেটসাহেব বাহাদুর সদর দারোগা (পাবনার) ও সদরের বরকন্দাজগণকে সঙ্গে করিয়া শালঘর মধুয়ায় দেখা দিলেন। প্রথমে মিসেস কেনীর সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া মোকদ্দমা তদন্তে প্রবৃত্ত হইলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব আরও একবার কুঠিতে আসিয়া মিসেস কেনীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন। সময় সময় চিঠিপত্র পাইতেন এবং লিখিতেন।

প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেরা কুঠি আক্রমণ করিয়াছে, অনেক সাক্ষী জবানবন্দি দিলেন। সাহেবপক্ষের দুইজন লোককে যে সাংঘাতিকরূপে আঘাত করিয়াছে, তাহারও বিশেষ প্রমাণ পাইলেন। জখমীদ্বয়কে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের সম্মুখে বাঁশের চাঙ্গিতে শোয়াইয়া আনা হইল। সড়কির আঘাতে একজনের বক্ষভেদ, লাঠির আঘাতে অপরের মাথাফাটা, তখনও নাক ও মুখ ভাসিয়া রক্ত পড়িতেছে। কথা কহিবার শক্তি নাই।—বোধ হয় বাঁচিবে না। বাঁচিবার ভরসা একেবারে নাই বলিলেও হয়।

মাজিষ্ট্রেটসাহেব বলিলেন, কুঠির লোক হইতে অধিক বিশ্বাস্য প্রমাণ এই দুইজন লোক। কুঠির সহিত ইহাদের কোন সংস্রব নাই। সাঁওতার জমিদারের লোক। আপন জমিদারের পত্র লইয়া সাহেবের নিকট আসিয়াছিল। সাহেব কুঠিতে না থাকায় পত্রের উত্তর পায় নাই। বাধ্য হইয়া ইহারা আপিস ঘরের বারান্দায় রাত্রে শুইয়াছিল। প্রাতের ঘটনাসমুদয় প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে। প্যারীসুন্দরীর লোক যে যে প্রকার এই দুই ব্যক্তিকে সাংঘাতিকরূপে জখম করিয়াছে, তাহাও ইহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে। ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ, ইহারাই মূল সাক্ষী।

উভয় জখমীকে পাবনার ডাক্তারখানায় ডাক্তারসাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিবার আদেশ করিয়া সাহেব থানার কামরায় চলিয়া গেলেন। মোকদ্দমা তদন্ত শেষ হইল। আপিস ঘরে কুঠির প্রধান নায়েব হরনাথ শ্রী মিশ্রী এবং অন্যান্য আমলাগণ বসিয়া মোকদ্দমার প্রমাণ, সাক্ষীর জবানবন্দি বিষয় আলোচনা করিতেছেন। পাবনার মোক্তার চাঁদ অধিকারীর নিকট পত্র লিখিতেছেন। সাহেব কুঠিতে নাই, আপিস ঘরেই তামাক চলিতেছে। কত ভদ্রলোক নায়েবমহাশয়ের মুখের একটি

কথার জন্য লালায়িত হইয়া বসিয়া আছেন। কেহ কাগজে মোড়ক করিয়া কিছু কিছু প্রণামী বাম পার্শ্বে রাখিয়া দিতেছে—নায়েবমহাশয় বেরেঁয়া। কথায়, কার্য্যে, হাসি-তামাশায় সকল দিকেই আছেন। প্যারীসুন্দরীর প্রসঙ্গেও হাসি-তামাশা চলিতেছে। মাজিষ্ট্রেটসাহেবের আরদালী সঙ্গীয় বেহারা এবং লোকজনের আহারের বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইতেছে। ইতিমধ্যে একটি স্ত্রীলোক 'আমার বাবা কোথায়, ওরে আমার বাবা কই ?' বলিয়া উচ্চস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে কাহারও বাধা না মানিয়া আপিস ঘরের নায়েবমহাশয়ের সম্মুখে মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। বলিতে লাগিল, "আমার বাবা সন্ধ্যার সময় বাড়ি হইতে আহাব করিয়া আসিয়াছে। নায়েবমহাশয়! আমার বাবা কই ? এই একমাস হয় নাই, তিনকুড়ি টাকা খরচ করিয়া বাবার বিবাহ দিয়াছি। (উচ্চস্বরে) ওরে আল্লা! ও খোদা! একি করিলে! ওরে এমন ডাকাত কথনই দেখি নাই। দিনে-দুপুরে ডাকাতি। সাহেবের চাকর হইয়া সুখে থাকিবে, গায়ে কাঁটার আঁচডটি লাগিবে না, তাহার ফল বুঝি এই হইল ? আপনারা আমার ছেলেকে কি কবিলেন ? আমার ছেলে কই নাযেব মহাশয় ? আপনার দুখানি পায় ধরিয়া বলিতেছি, আমাব কালু কোথায় ? দোহাই তোমাদের পিতামাতার, আমার কালুকে একবার দেখাও।"

হরনাথ শ্রী মিশ্রী মানুষ কিন্তু গঠিত পাষাণে। কুঠিয়াল নরব্যাঘ্র, তার চাকরের মনে মায়া-মমতা থাকা সম্ভবতই অসম্ভব। কিন্তু সে সময় সে কঠিন প্রাণও গলিয়া গেল। কালুর মাতার ক্রন্দনে সে নীরস, নির্দ্দয় হৃদয়েও দয়ার সঞ্চার হইল। মায়া-বশে সে বিকট চক্ষেও জল ঝরিল। জিহ্বায় জড়তা আসিল। মুখে কথাটি নাই। যার মুখে সর্ব্বদা কথা, মেজাজ গরম, নজর গরম—কালুর মাতার কথা কয়েকটিতে একেবারে বিপরীত ভাব ধারণ করিল। কি বলিবেন, কি করিবেন, কি বলিয়া তাহার কথার উত্তর দিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ক্ষণকাল পরে বহু কষ্টে বলিলেন, "চুপ কর, চুপ কর, কুঠিতে মাজিষ্ট্রেটসাহেব আছেন। গোল কর না। তোমার কালু ভালই আছে। কোন চিন্তা নাই। তার কিছু হয় নাই। কে বলেছে ? মিছে কথা—ও সকলি মিছে কথা।"

কালুর মা হরনাথের পদতলে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "ওরে বাবা! আমার ঐ একটি ছেলে। বড় দুঃখে ওকে বড় করেছি। ভিক্ষা করে

—নিজে পেটে না খেয়ে বাবাকে খাওয়াইয়ে মানুষ করিছি। ওর বয়স যখন সাড়ে চার বছর সেই সময় ওর বাপ মারা গেছে। আরে আল্লা! সে কথা না আমার মনে গাঁথা আছে। হায়! হায়! এখনও কলজে ফেটে যায়, এই সাহেবই তার হাত-পা টানা দিয়ে গাছে বেঁধে মার দিয়েছিলেন। তাতেই সারা! যে বিছানায় পলো, আর উঠে বসলো না। আর ধানের ভাত মুখে গেল না। পেট দিয়ে থানা থানা রক্ত পড়ে মাসখানেক ভুগে ভুগে যেখানকার লোক সেইখানে চলে গেল। দুটো মুখের কথা কয়ে দেলসা দেয়, এমন লোক দুনিয়ায় আমার কেউ ছিল না। এখনও নাই। খেয়ে না খেয়ে কালুকে মানুষ করেছিলাম। বাবা আমার! কাল রেতে ভাত খেয়ে সাহেবের কামরায় পাখা টানতে এসেছিল, রোজ রোজ বেলা উঠলে বাড়ি যায়, আজ দুদিনের মধ্যে তার খোঁজ-খবর নাই। লোকে যা বলছে তা মুখে আনতে পারি না। তোমরা আমাকে খুন কর।"

হরনাথের তখন মেজাজ একটু গরম হইল। বলিলেন, "চুপ কর, চুপ কর! প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেরা যে কালুকে জখমী করেছে তা কি তুই শুনিস নাই? ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব তাকে পাবনার ডাক্তারখানায় আরাম হবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। আরাম হলেই ফিরে আসবে। যে কদিন কালু বাটিতে না আসতে পারে, সে কদিন তোমার খাবার কোন কষ্ট হবে না। এই চারিটি টাকা দিচ্ছি, পেট চালাওগে। ফুরাইলে আবার আসিও।"

কালুর মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "নায়েবমহাশয়! আমি তোমার টাকা চাহি না। আমি আমার বাবাকে পাবনায় দেখিতে চললেম।" এই বলিয়া কালুর মাতা টাকা ফেলিয়া উচ্চস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে আপিস ঘর হইতে বাহির হইল।

নায়েবমহাশয় চৈত সিং আর দুই-তিনজন লোককে তখনি আদেশ করিলেন হারামজাদিকে ধরিয়া উহার বাটিতে লইয়া যাও। কিছুতেই বাটি ছাড়িয়া অন্য কোন স্থানে যাইতে না পারে। খুব সাবধানে রাখবে। খুব সাবধান! শীঘ্র যাও।"

হুকুম পাওয়ামাত্র যমদূতেরা পুত্রহারা মায়ের প্রাণে নূতন রকমের যন্ত্রণা দিতে লাঠি ঘাড়ে করিয়া অমনি ছুটিল।

বাঁদীর কাঁদিবার কেহ ছিল না। ষোড়শী মাত্র। সে আপন কুঁড়েঘরে

একা বসে কি ভাবিতেছে, ঈশ্বর জানেন। ভিন্ন গ্রামের মেয়ে ঘর হইতে বাহির হওয়া তাহার সাজে না। সে আর কুঠিতে গেল না। বাঁসী সাহেবের শয়নঘরের পাহারাদার ছিল। কালু ও বাঁসীর ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে তাহা পাঠক বুঝিতেই পারিয়াছেন। হায় রে সংসার! হায় রে শক্রতা! শক্রতাসাধনে লোকে না পারে এমন কোন কার্যাই নাই। ধন্য সংসার!

নবম তরঙ্গ

কালু ও বাঁসী

মোকদ্দমা সাজাইবার জন্য একজন পাহারাওয়ালা এবং পাংখাবরদারকে সাংঘাতিকরূপে আঘাত করা হইয়াছে। কালু সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়াছিল, কুড়ন সর্দ্দার হরনাথের হুকুমে কালুর পিছন হইতে বিনা অপরাধে দুঃখিনীর সন্তানকে সড়কি মারিয়া বুক পার করিয়া দিয়াছে। বাঁসী সমস্ত রাত্রি জাগিয়া গুদামঘরে গিয়া ঘুমাইয়াছিল। শয়ন অবস্থাতেই ঐ পাষণ্ড কুড়ন হরনাথের আজ্ঞায় বাঁসীর মাথায় লাঠির আঘাত করিয়া মাথা ফাটাইয়া দিয়াছে। গুদামঘরের মধ্যে হঠাৎ আর্ত্তনাদ এবং চীৎকারের কারণও তাহাই।

মাজিষ্ট্রেটসাহেব আসামীদিগের নামে গ্রেপ্তারী পরোওয়ানা বাহির করিয়া দুই থানার দারোগা মোতাইন করিলেন। কোনসময় কুঠি ছাড়িয়া পাবনাভিমুখী হইলেন, তাহা কথকের মনে নাই। তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব পাবনায় চলিয়া গেলে মীরসাহেব মেমসাহেবের সহিত দেখা করিয়া বাটিতে আসিয়াছিলেন, ইহা বেশ মনে আছে।

এদিকে টি. আই. কেনী যশোহর হইতে সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কুঠিতে আসিয়া সমুদয় বিবরণ শুনিলেন। তাঁহারও ইচ্ছা যে, প্যারীসুন্দরীর বাটি লুট করেন। কিন্তু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আপাততঃ ক্ষান্ত দিলেন। সাহসও হইল না। কারণ বেপাল্লা। সুন্দরপুরের নিকটে সাহেবের জমিদারি নাই। লোকজন সংগ্রহ করিয়া রাখারও কোন সুযোগ স্থান নাই। সাতপাঁচ ভাবিয়া মোকদ্দমার যোগাড়ই ভালরূপ করিবেন, ইহাই স্থির করিয়া প্রমাণ ইত্যাদি ও আর তদ্বির যাহা বাকি ছিল, তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আরও আদেশ করিলেন, "প্যারীসুন্দরীর চাকর কি প্রজা যাহাকে যে যে স্থানে পাও, ধরিয়া আমার নিকট হাজির করিলেই উপযুক্ত পুরস্কার পাইবে।"

দেশময় লুটের কথা—খুনের কথা—সত্য কথা—নানা কথা—নানা লোক নানা প্রকার, প্রকাশ্যে গোপনে বলাবলি করিতে লাগিল। চারিদিকে হুলুস্থুল ব্যাপাব—তুমুল কাণ্ড!

দশম তরঙ্গ

আক্ষেপ

রামলোচনের মুখে কথা নাই। লজ্জা রাখিবারও আর স্থান নাই। নিজে দলপতি হইয়া অপ্রস্তুত—শুধু অপ্রস্তুতের একশেষ। সঙ্গে সঙ্গে অর্থের বিনাশ—অযথা অর্থের শ্রাদ্ধ এবং শতমুখে নিন্দা। প্যারীসুন্দরীর নিকটে রামলোচন সকল কথা খুলিয়া বলেন নাই। সত্যমিথ্যা একত্রে, ভেলআসলে 'আমেজ' করিয়া যুদ্ধেব কথা শেষ করিয়াছেন।—"সন্ধানী লোকে মিথ্যা সংবাদ দিয়াছিল। মেম-সাহেব কি সাহেব কেহই কুঠিতে ছিলেন না। অনর্থক যাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু সাহেব মোকদ্দমা সাজাইতে ত্রুটি করেন নাই। কুঠির উপর পর্য্যন্ত যখন চড়াও করা হইয়াছে তখন সাহেব অল্পে ছাড়িবেন না। কোনরূপ মিথ্যা ফাঁদে ভাল করিয়া আটকাইবার চেষ্টা করিবেন। কথা ক্রমেই বাড়িয়া গিয়াছে, সকলেই শুনিয়াছে, প্যারীসুন্দবীর লাঠিয়ালেরা সাহেবের কুঠি লুট করিয়া লইয়া গিয়াছে। ১০।১২টি লোক জখমী, তিনটি খুন!"

প্যারীসুন্দরী এই কথা শুনিয়া একটুকুও ভীত হইলেন না। ক্ষণকালের জন্যও ভাবিলেন না। রামলোচনকে স্পষ্টভাবে বলিলেন, "বেশ হইয়াছে। আমার লাঠিয়াল কুঠি লুট করিয়াছে, দশজনের মুখে একথা শুনিয়াও আমার সুখ বোধ হইতেছে। আমি বাঙ্গালীর মেয়ে, সাহেবের কুঠি লুটিয়া আনিয়াছি, ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে! সাহেবের পক্ষে ১০-১২টি জখম, তিনটি খুন! চিন্তা কি, মোকদ্দমার পথে চলিলে প্যারীসুন্দরী কখনই হটিবে না। সদর নেজামত পর্য্যন্ত মোকদ্দমা চালাইবে। এতদিনে জানিলাম—কেনীর ক্ষমতাবল সকলি বুঝিলাম।—আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা নহে। তোমরা ক্ষণকালের জন্যও অন্তরে ভয়কে স্থান দিও না। একবার—দুবার—না হয় তিনবার—চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? আবার চেষ্টা। এখন তোমাদের কার্য্য মোকদ্দমার যোগাড়। অন্যদিকে আবার লাঠিয়ালসংগ্রহ। দেখি কয়বার ফাঁক যায়। একদিন হাতে পাইবই পাইব। আরও একটি কথা আমি তোমাকে বলি, যে ব্যক্তি যেকোন

কৌশলে কেনীর মাথা আমার নিকট আনিয়া দিবে, এই হাজার টাকার তোড়া আমি তাহার জন্য বাঁধিয়া রাখিলাম। এই আমার প্রতিজ্ঞা, আমার জমিদারি, বাড়ি, ঘর, নগদ টাকা, আসবাবপত্র যাহা আছে, সমুদায় কেনীর কল্যাণে রাখিলাম। ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া বলিতেছি সুন্দরপুরের সমুদয় সম্পত্তি কেনীর জন্য রহিল। অত্যাচারের কথা কহিয়া মুষ্টিভিক্ষায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব। দ্বারে দ্বারে কেনীর অত্যাচারের কথা কহিয়া বেড়াইব। যে ঈশ্বর জগতের মুখ দেখাইবার পূর্ব্বেই আহারের সংস্থান করিয়া মায়ের বুকে রাখিয়া দিয়াছেন, সেই ঈশ্বরের নাম করিয়া প্যারীসুন্দরী যাহার দ্বারে দাঁড়াইবে, সেইখানেই সমাদরে স্থান পাইবে। দুরন্ত নীলকরের হস্ত হইতে প্রজাকে রক্ষা করিতে জীবন যায় সেও আমার পণ। আমি আমার জীবনের জন্য একটুকুও ভাবি না। দেশের দুর্দ্দশা, নিরীহ প্রজার দুরবস্থার কথা শুনিয়া আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। মোকদ্দমার জন্য তোমরা ভাবিও না। যতপ্রকারের তদবির হইতে পারে তাহা কর।"

রামলোচন বলিলেন, "আমার বোধ হইতেছে শীঘ্রই থানাদার দারোগা, জমাদার, আসামী ধরিবার জন্য মফস্বলে গ্রামে গ্রামে আসিবে।"

প্যারীসুন্দরী বলিলেন, তাহাতে ভয় কি? যত টাকা লাগে দারোগাকে দেও, আর এই বলিয়া কৈফিয়ত দেওয়াইয়া দেও যে, আসামীর নামের কোন লোক আমার বাটিতে নাই, আমার সরকারে নাই। সুন্দরপুরগ্রামে নাই। আমার এলাকার মধ্যে নাই। আমরা কখনও সে নামের কথা শুনি নাই। সাহসে কম হইবে না। রামানন্দবাবুর উপার্জিত ঐশ্বর্য্য, জমিদারি সকলি আজ কেনীর জন্য তাঁহারই কন্যা প্যারীসুন্দরী রাখিয়া দিল। আর তাঁহারাও পৈতৃক জমিদারি নহে। ইহাও ইংরেজের অনুগ্রহেই হইয়াছিল। তাহারাও ইংরেজ, কেনীও ইংরেজ, একপ্রাণী বটে—তবে মানুষ আর শূকর। এক ঝাড়ের বাঁশ—কেহ হাড়ীর ঝাঁটা, কেহ পূজার ফুলের সাজি। কত ইংরেজ কত কার্য্যে এদেশে আসিতেছেন, কই কেনীর মত নর-রাক্ষস তো একটিও দেখি না। অনেককে দেবতা বলিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা করে। কুমারখালির ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেশমের কুঠির কল্যাণেই পিতার এত ঐশ্বর্য্য, এত জমিদারি। ইংরেজ বাহাদুরের শুভদৃষ্টিতেই সুন্দরপুরের ঘরের সৃষ্টি। বোধহয় কেনীর কল্যাণে সকলি মাটি হইবে। একেবারে সারা হইবে। তোমরা আমার আদেশ মত কেহই কার্য্য করিতে পার না, ইহাই আমার মনের দুঃখ। একজন—দৌরাত্ম্যকারী ইংরেজকে জব্দ করিতে পারিলে না, তাদৃশ

শিক্ষা দিতে পারিলে না। ছি! ছি! বড় লজ্জার কথা। বড় ঘৃণার কথা! দেখ তো এদেশে আমরাই সকল, আমাদেরই দেশ, আমাদেরই লোকজন লইয়া একা কেনী. আমাদের উপর এত অত্যাচার, এত দৌরাত্ম্য, এত জুলুম করিতেছে। তোমরা শতসহস্র লোক একত্র হইয়াও দুইবারে কিছুই করিতে পারিলে না! নিশ্চয় জানিলাম তোমাদের মাথায় কিছুই নাই। কিছুই নাই—খালি হাড আর পচা মজ্জা। কি করি মনের দুঃখ মনেই রহিয়া গেল। আমি স্ত্রীলোক—! কেনীর দৌরাত্ম্যে না টিঁকিতে পারিয়া এদেশের অনেকেই তাহার সহিত যোগ দিয়াছে, সত্য সত্যই কি তাহারা যোগ দিয়াছে? মনেও করো না—সেকথা কখনই মনে করো না। সে যোগ দায়ে পড়িয়া সে প্রণয় না পারিয়া. সে ভালবাসা, সে আনুগত্য—অপমানের ভয় প্রাণের ভয়. স্ত্রী-পরিবারের প্রতি অত্যাচারের ভয়. ভাবিয়া। যাহা মনে জাগে, তাহা তাদের মনেও জাগে। তাহারা কি কেনীর কুটুম্ব না আত্মীয়, না দেশের লোক? তাহাদের নিকটে যাওয়া-আসা করা চাই। যথাসাধ্য গোপনে গোপনে তাহাদের সাহায্য, তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হওয়া চাই। যাহাতে সকলের মন এক হয়, তাহার উপায় করা চাই। প্রকাশ্যে যাহাই করুক, হিন্দু-মুসলমানকে এক ভাবা চাই। শত্রুতা বিনাশ করিতে একতা শিক্ষা করা চাই। একতাই সকল অস্ত্রের প্রধান অস্ত্র। জাতিভেদে হিংসা, জাতিভেদে ঘৃণা দেশের মঙ্গলের জন্য একেবারে অন্তর হইতে চিরকালের জন্য অন্তর করা চাই। সকলের একপ্রাণ—একদেহ হইয়া কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করা চাই। একভাবে, একমতে বুদ্ধি চালনা করা চাই। আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি, যাহারা কেনীর পক্ষে আছে তাহারা মনের সহিত আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে না। কেনীর মন যোগাইতে হাঁ-হুঁ করিবে মাত্র। চেষ্টা করিলে, বিপদকালে সকলেই সকলের উপকার করিতে পারে। অর্থবল আর বাহুবলই যে বল তাহা নহে। শত্রু দমন করিতে হইলে, অন্য বলেরও আবশ্যক। চেষ্টা করিলে সকলেই সকলের কিছু না কিছু উপকার করিতেই পারে। আমি অর্থের বল চাই না। বহুবলেরও তত দরকার করিতেছে না। ঈশ্বর আমাকে এ দুই বল যা দিয়াছেন কেনীর জন্য উহাই যথেষ্ট। যে বলের অভাব সেই বলের অন্বেষণ কর। যদি পাও, সাহায্য চাও—সাহায্য লও। আর কেনী যে বলে বলীয়ান, তার অনুকরণ কর। দেখি, কেনী যায় কোথা? একা কেনী—আসিবার দিন একখানি বেত, আর একটি টুপি লইয়া আসিয়াছিল, তা লোকেরকাছে গল্পও করে যে: আমার বেত-টুপি সার। যদি নাই থাকতে পারি,

যাহা লইয়া আসিয়াছিলাম তাহাই লইয়া যাইব। দেখ তো কেমন সাহস! আর কেমন ভাল হওয়ার চেষ্টা। তোমাদের কি ওরূপ সাহস আছে, না উৎসাহ আছে? তোমাদের সকলি মুখে, কাজে কিছুই নাই। কেবলই হইহই। কার্য্য বুঝিয়া, কার্য্যের গুরুত্ব বুঝিয়া চলিবে না, বুঝিয়া করিবে না। আচ্ছা, যাহা বল তাহা করিতে পারিলেও মুখের গৌরব বজায় থাকে। কথার মূল্য বাড়ে। ফাঁকা আওয়াজ আর ফাঁকা কথা দুই সমান। কেবল বারুদ ক্ষয়, আর মাথা ক্ষয়। তোমরা বোঝ আর না বোঝ, পার আর না পার, মুখের জোর কিছুতেই কমে না। বাকি রহিল মাথা—সে মাথা একেবারে নাই বলিলেও হয়, কারণ প্রায়ই ঠিক থাকে না। যাহাহউক, আর বেশি বলতে ইচ্ছা করি না। মনে ভেবে রেখ, খুব দৃঢ়বিশ্বাস করে স্থির করে রেখ যে, সকলেরই শেষ আছে। আমি যদি এই জালেমের হাত থেকে আমার প্রজা রক্ষা করিতে না পারি তাতে দুঃখ নাই, কারণ কালে কেনীর ধ্বংস আছেই আছে। আমার দুঃখ এই যে, আমি যেসকল ঘটনা চক্ষে দেখিতে পারিব না। দয়ার হাতবিস্তার—নির্দ্দয়ের হাতসঙ্কোচ। যেদিন কেনীর সময় পূর্ণ হইবে, সেদিন সামান্য বলে, সামান্য কারণে কেনী মহা-অস্থির হইয়া উঠিবে।

কথা শেষ হয় নাই, এমন সময় খবর আসিল যে, দারোগা, জমাদার, বরকন্দাজ, চৌকিদারের প্রায় চারিশত লোক আসিতেছে।

প্যারীসুন্দরী বলিলেন, তাহারা কোম্পানীর লোক, তাহাদিগকে খুব আদর কর। কি জন্যে আসিয়াছে শোন। যদি সেই কারণেই আসিয়া থাকে, তবে এইক্ষণে সেসব আলাপ কিছু না করে—আগে আহারের যোগাড়, জলখাবার যোগাড়, বাসার যোগাড় বিশ্রাম উপযোগী স্থানের যোগাড় করিয়া দেও, পরে অন্য যোগাড়। কিছুতেই যেন তাহাদের সমাদর, আদরের, যত্নের ত্রুটি না হয়। সেলাম বাজাইয়া রামলোচন ত্রস্তে চলিয়া গেলেন।

একাদশ তরঙ্গ

দলিলের বাক্স

পাঠক! জামাইবাবুর সেই বাক্স চুরির কথাটা একবার মনে করুন। তিনি অন্য কোন মূল্যবান জিনিস না লইয়া সামান্য একটা বাক্স, অত পরিশ্রমে অত যোগাড়ে হস্তগত করার কারণ কি? তাহা বোধহয় বুঝিতেই পারিয়াছেন। সন্ধানী বিনোদ ঐ বাক্সে অছিয়তনামা—

বিনোদ বলিয়াছে, আমি জানি ঐ আলমারির নিকটে হাতবাক্সটির মধ্যেই অছিয়তনামা আছে। আমি মীরসাহেবকে রাখিতে দেখিয়াছি। আমি অছিয়তনামা চিনি। বিনোদ মীরসাহেবের বিশ্বাসী, মীরসাহেবের অনেক গুপ্ত-কথা জানে, সুতরাং অছিয়তনামার সন্ধানও যথার্থ। জামাইবাবু বিনোদকে একেবারে বড়লোক করিবেন—কোরান ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ইহার পরেও শতেক দেড়শত বিনোদের বাড়ি গিয়াছে। তাহার পরেও বিনোদের কত তোষামোদ, কত খাতির। বাক্সটি খুব সাবধানে রাখিয়া দিয়াছেন। সুযোগ পান নাই বলিয়া খুলিয়া দেখিতে পারেন নাই। একদিন খুলিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, চাবি নাই। অন্য অন্য চাবি দিয়াও দেখিয়াছেন, খোলে না। তালার কলটি পর্য্যন্ত ঘোরে না। ভাঙ্গিতেও সাহস হয়না। বাক্স ভাঙ্গার কথা প্রকাশ হইলে যদি ঐ বাক্সের তালাস হয়—না পাওয়া গেলেই সন্দেহ হইবে যে, জামাইবাবুই এ কীর্ত্তি করিয়াছেন। বাক্স ভাঙ্গার কারণ কি? রাত্রে বাক্স ভাঙ্গার আবশ্যক কি? নানা ভাবনার পর স্থির করিয়াছেন যে হাতে পাইয়াছি কাজ উদ্ধার হইয়াছে। যে দিন সুবিধা আর সুযোগ পাইব, সেইদিন আবার খুলিবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। নিতান্ত পক্ষে না খোলে ভাঙ্গিব। দেখি কি হয়। কিছুদিন চাপিয়া যাই। এমন সুন্দর বাক্সটি ভাঙ্গিতেও মনে কষ্ট হয়। ভাবি স্বার্থে অযথা ব্যাঘাত, ভয়, কলঙ্ক, অপবাদ, লজ্জা এই কয়েকটি বিষয় ভাবিয়া বাক্স খুলিবার কি ভাঙ্গিবার চেষ্টা আর করিলেন না। মনে মনে আরও স্থির করিলেন যে মূল দলিলত হাতে আসিল, এখন অন্য অন্য দলিল হাতে করা চাই।

সকলের সম্মুখে মীরসাহেব জামাইবাবুকে একদিন বলিলেন, চিরকাল শালঘর মধুয়ার কুঠির মালিক সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ ছিল, ঈশ্বর ইচ্ছায় "কেনী" এখন অনুগ্রহই করেন। এদিকে বিষয়াদিতেও আর কোন গোলযোগ দেখি না। এই সময় আমি একবার সেরাজগঞ্জ হইয়া আসি। অনেকদিন যাইনা। একবার গিয়ে দেখিতে হয়। এ বাটির কাজ সকলি আপনি দেখিবেন। বাপু! আমার আর কোন আশা নাই। সকলি তোমাদের, আমার আর কিছুই ভাল বোধ হয়না। তোমাদের কাজকর্ম্ম তোমরা দেখে শুনে কর। আমি নিশ্চিন্তভাবে বসে বসে দুটো খেতে পেলেই হল। তোমাদের ঘর সংসার তোমরা দেখে শুনে রক্ষা কর।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন, স্ত্রী, পরিবার বিহীন গৃহী বড়ই অসুখী। ঘরের লক্ষ্মীই ঘরণী। যদি তাহাতেই অনিচ্ছা, তবে একেবারে সর্ব্বত্যাগী হয়ে "ফকিরী" গ্রহণকরাই ভাল। গৃহী অথচ কিছুই নাই। হুজুর! এর অর্থ আমরা বুঝতে পারিনা।

মীরসাহেব বলিলেন, আবার! —জেনেশুনে আবার! যে নূতন সংসারী তার কাছেই সংসার সুখের। ভুক্ত ভোগীর নিকট অন্য প্রকার। সে ফাঁদে আবার পড়িব। সংসারে সুখ নাই। যদি বলেন আমার বংশলোপ হইবে, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, কিছুই নাই। তাহাতে দুঃখ কি? কতলোকের সন্তান জন্মিবে, বংশরক্ষা করিবে। আমার নাইবা হইল। আমি স্ত্রী, পরিবার এবং দুনিয়ার সুখ দুঃখ ভাল করিয়া ভোগ করিয়াছি। সন্তানের সাধ, বিষয় সম্পত্তির সাধ সকলি মিটাইয়াছি। আমোদ আহ্লাদের সাধ মিটাইতেও কম করি নাই। আর কেন? অনেক হইয়াছে। বয়সের সঙ্গে শরীরের অবস্থার সঙ্গে সংসারীর অনেক কার্যে যোগ আছে।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন, আপনি যদি বয়সের কথা পাড়েন, তবে ত, আমরা মারা গিয়াছি। বড় মীরসাহেব আমার ছোট ছিলেন। বয়সে কি করে?

মীরসাহেব বলিলেন, বয়সে কিছু না করুক। আমি আর ও ফাঁদে পা দিতে ইচ্ছা করি না। আমার গায়ে বাতাস লাগিয়াছে। সর্ব্বস্ব গিয়া একটি মাত্র ছিল তাহাও যখন গেল, আর আশা কি? সকলি ঈশ্বরের কৃপা। এখন আছি ভাল। দয়াময়ের দয়ায় এখন আছি ভাল।

কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় কেনীর চাকর কলিমসর্দ্দার আসিয়া, সেলাম বাজাইয়া বলিল,—

হুজুর! —সাহেব! —এই ডিহীতে নীল দেখিতে আসিয়াছিলেন, হুজুরের আমবাগানের নিকট, হাতীর উপরে আছেন, কি কথা আছে—সেলাম দিয়াছেন।

মীরসাহেব যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই বাগানের নিকট গিয়া, কেনীর সহিত সাক্ষাত করিলেন। অনেকেই দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের সাক্ষাতদৃশ্য দেখিতে লাগিল। কথাবার্ত্তা স্পষ্ট ভাবে হইলেও দূরতা হেতু কেহ স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারিল না। কেবল সময় সময় কেনীর মুখে চক্ষে, রাগের চিহ্ন দেখা—আম

প্যারীসুন্দরীর নাম কানে শোনা।—শেষের কথাটা বোধহয়, স্পষ্টভাবেই সকলের কানে গেল। "বেত আর টুপী—আবার উহা লইয়াই জাহাজে চড়িব।"

অনেকে অনেক অর্থ ঘটাইলেন। প্রায় একঘণ্টা কাল উভয়ের আলাপ হইল। কেনী যাইবার সময়ে, আর কয়েকটি কথা চুপি চুপি মীরসাহেবকে কহিয়া হাতিতে উঠিলেন। হাতিতে উঠিতে উঠিতে আবার বলিলেন, "ভুলিবেন না, ফের বলিতেছি, ভুলিবেন না।" পুনরায় উভয় উভয়কে সেলাম দিয়া কেনী দক্ষিণমুখী হইলেন। মীরসাহেব উত্তরমুখি হইয়া বাড়ির দিকে আসিতে লাগিলেন। গুপ্ত দর্শকগণ মীরসাহেবকে আসিতে দেখিয়া আমবাগান হইতে, নানা পথে ছুঠিয়া মীরসাহেবের অগ্রেই বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিয়া আপন আপন স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন।

মীর সাহেবও ধীরে ধীরে আসিয়া আপন ঘরে প্রবেশ করিলেন। মজলিস আবার জমাট বান্ধিয়া গেল। কথা চলিতে লাগিল।

মীর সাহেব বলিলেন, ধন্য বাঙ্গালীর মেয়ে। সাবাস সাবাস! সাহেবকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। সাহেব এতদিন সকলকে যেরূপ জ্বালাতন করিয়াছেন, তাহার প্রতিশোধ বুঝি প্যারীসুন্দরীর হাতে হয়। প্যারীসুন্দরী সাহেবের ধনে প্রাণে সারা করিতে স্থির হইয়া বসিয়াছে! আবার কুঠি লুট করিবে। কেনীর মাথা কাটিয়া লইয়া যাইবে। মেমসাহেবকে ধরিয়া লইয়া গিয়া দাসী বানাইবে, প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। সাহেব না কি এই সকল কথা, তাঁহার কোন বিশ্বাসী লোকের নিকট শুনিয়াছেন। শুনিয়া মহা ব্যস্ত হইয়াছেন। ব্যস্ত হইবারই কথা। হাজার লোক সংগ্রহ করিয়া কুঠিরক্ষা, আত্মরক্ষা, মেম-সাহেবকে রক্ষা করিবার উপায় করিয়াছেন। ধন্য—প্যারীসুন্দরী। এতবড় মোকদ্দমা মাথার উপরে, তার উপরেও এত সাহস! এত জেদ! এতদূর চেষ্টা।

অনেক কথাবার্ত্তার পর সময় বুঝিয়া দেবীপ্রসাদ বলিলেন, হুজুর! থাকের নকসাটা দেখা নিতান্তই আবশ্যক হইতেছে। কি কুক্ষনেই যে, আমার আলীর সহিত স্বর্গীয় বৃদ্ধ মীরসাহেবের বিবাদ বাধিয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত সমানভাবে চলিতেছে। দুই পুরুষ যায়। তবু বিবাদের শেষ হইল না। কত পুরুষ যে এই

বিবাদ থাকিবে ঈশ্বর জানেন। আবার এই সম্মুখের চর লইয়া বিবাদ উপস্থিত, নকসাটার নিতান্তই দরকার হইয়াছে।

"থাকের নকসা কেন? আমি অনেকদিন হইতে ভাবিয়া স্থির করিয়াছি, বিষয়াদির যাবতীয় দলিল এক ফিরিস্তি করিয়া "তুলা মিয়াঁকে" বুঝাইয়া দিব। যাহাদের কাজ তাহারা দেখে শুনে করুক। আমি আর ও ঝঞ্চাটে থাকিতে ইচ্ছা করি না। আজ সমুদায় দলিল বুঝাইয়া দেও।"

জামাইবাবু শ্বশুরের কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন! অন্তরে আঘাত লাগিল। এ অন্য আঘাত নহে, এ দুঃখের আঘাত নহে, ভক্তির সহিত প্রেমের আঘাতও নহে। এ গ্লানি! এ আত্ম-গ্লানির বিষম আঘাত।

যাহার সর্ব্বনাশ করিতে তিনি বদ্ধপরিকর হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, যাহার প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশ করিবার কথা সময় সময় অতিগোপনে মুখে আনিতেছেন, অস্ত্রে খুন, কি ঔষধে, নিজে কি অপরের দ্বারা, এ চিন্তাও মস্তকে আনয়ন করিয়াছেন, যাহার মুখ দেখিতে চক্ষু নারাজ! তাহার এই ভাব? এমন সরল ভাব এমন প্রেমপূর্ণ—পবিত্র ভাব? কি ভালবাসার কথা! "যাহাদের কাজ তাহারা করুক।" সা গোলাম অস্থির হইলেন। মনে সেই একপ্রকার নূতন ভাবের দেখা দিল। কিন্তু সে ক্ষণস্থায়ী শক্তিছটা—একটি কথায়, কোথায় সরিয়া গিয়া, ভয়ের সঞ্চার হইল, হৃদয় কাঁপিয়া গেল, অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, বুক শুকাইয়া দুর দুর করিতে লাগিল কথাটা কি? কথা আর কিছু নহে, মীরসাহেব মাঙ্গনকে দলিলের বাক্স আনিতে আদেশ করিয়াছেন, সমুদায় দলিল এখনই জামাইবাবুকে বুঝাইয়া দিবেন।

কোন কোন পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, ও কথায় অঙ্গ শিহরিবে কেন? ভয়েরই বা সঞ্চার হইবে কেন? জামাইবাবু, তো একপ্রকার শুভ সংবাদ, মঙ্গলের কথা—আনন্দের কথা। তাহা নহে, পাঠক! তাহা নহে, আনন্দের কথা নহে, সম্পূর্ণ নিরানন্দ। মহা-সঙ্কট! এবং বিষম ভয়। এখনও বুঝিতে পারেন নাই? জামাইবাবুর মুখশ্রী, বিশ্রী হইয়া ধূলা উড়িবার কারণ এখনও বুঝিতে পারেন নাই! "তাঁহার সেই চুরি করা বাক্স।" সেই বাক্সটিই যদি দলিলের বাক্স হয়, ঐ নিশীথ সময়ে তোষাখানার মধ্যে হামাগুড়ি পাড়িয়া যাইয়া চুরি করা বাক্সটি যদি দলিলের বাক্স বলিয়া চিহ্নিত থাকে, তবে তো এখনই মহা-গোলযোগ উপস্থিত

হইবে, ধরা পড়িলেও পড়িতে পারে। এই কারণে জামাইবাবু—চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। মনে মনে কত পীর, কত ফকির, দরবেশদিগের দরগায় নজর, সত্যপীরের সিন্নি, মাণিকপীরের খাজা, বড়পীরের মলিদা, মুস্কিল আসানের রোজা, কত কি মানত করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মাঙ্গন দলিলের বাক্স আনিয়া মীরসাহেবের সম্মুখে রাখিয়া দিল। জামাইবাবু বাঁচিলেন, নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন, গা দিয়া ঘাম ছুটিল, চিন্তা-বিকার ছাড়িয়া গেল, রক্ষা পাইলেন, ধরা পড়িলেন না। কেহ কিছু জানিতেও পারিল না। সে বাক্সের কোন কথাই উঠিল না। দলিলের বাক্স তবে অন্য বাক্স, তাহা স্বচক্ষেই দেখিতেছেন। আর চিন্তা কি ?

মীরসাহেব বাক্স খুলিয়া থাকের নকসাটা দেবীপ্রসাদের হাতে দিয়া, বাক্সসমেত দলিল জামাইবাবুর সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। এবং বলিলেন—

আপনি সমুদায় দেখিয়া আপন হাতে রাখিয়া দিন। জমিদারী সংক্রান্ত সমুদায় দলিল, ঐ বাক্সে আছে।

বিনা পরিশ্রমে, বিনা যত্নে, বিনা কষ্টে এবং অনায়াসে, জামাইবাবুর মনের আশা পূর্ণ হইল। মীরসাহেবের সরল ভাব, প্রেমপূর্ণ পবিত্র ভাব, সা গোলামের পাপময় চির-কলুষিত, হিংসাপূর্ণ অন্তরের দুষ্ট-দুরাশাও সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ করিয়া দিল।

মীরসাহেব উঠিয়া যাইবার সময়, দেবীপ্রসাদকে ডাকিয়া একটু গোপন-ভাবে চুপে চুপে বলিলেন, এখনই ৮০/৯০ জন লাঠিয়াল যোগাড় করিয়া, যত শীঘ্র হয়, শালঘর মধুয়ার কুঠিতে পাঠাইয়া দেও। বিশেষ দরকার—সাহেবেরও বিশেষ অনুরোধ।

দ্বাদশ তরঙ্গ

বিলাতী বুদ্ধি

উভয়পক্ষেরই গুপ্ত সন্ধানী, চর অনুচর, খবুরে,—সকলি আছে। সুন্দর-পুরের খবর কুঠিতে আসিতেছে, কুঠির খবর সুন্দরপুরে যাইতেছে। সাধারণের মনে বিশ্বাস, যে প্যারীসুন্দরী কিছুতেই কেনীকে ছাড়িবেন না। হাজার টাকা! কথার কথা—কেনীর মাথার মূল্য এখন হাজার টাকা। যে ঐ মাথা সুন্দরপুরে

লইয়া দিতে পারিবে, সেই ঐ টাকা পাইবে। মেমসাহেবকে চান—চাকরানীর জন্য। শাড়ী পরাইয়া, হাতে বালা দিয়া মনের মত জব্দ করিবেন, দেশের লোককে দেখাইবেন। কিন্তু কেনীও কম পাত্র নহে, সেও প্যারীসুন্দরীকে কুঠিতে লইয়া যাইবার যোগাড়ে আছে। কি কাণ্ড! ভয়ানক ব্যাপার! কার ভাগ্যে কি আছে কে বলিতে পারে? —আপন কথাই আপন মুখে প্রায়-লোকের ঠিক থাকে না। —বিশেষ বাঙ্গালী। পরের কথায়, কত কথাই যে, বাতাসের আগে আগে দৌড়িয়া যাইতে থাকে তাহার সীমা করা কঠিন।

বেলা প্রায় দুই প্রহর চারটা। মিসেস কেনী এবং কেনী, উভয়ে দ্বিতল গৃহের উপরের হলে, আজ বড়ই মিশামিশ, ঘেঁষাঘেষি। সম্মুখে শ্বেতপ্রস্তরের গোলাকার ক্ষুদ্র টেবিল—টেবিলের উপর টমলটপূর্ণ একসাব্রাণ্ডি। সোডাওয়াটারে মিশ্রিত, এখনও গ্লাসের নিম্নভাগ হইতে বুদবুদ উঠিতেছে, একসার রঙ ক্রমশই ফিকা হইতেছে।

কেনী, পাচারি করিয়া বেড়াইতেছেন। দুই-তিনপাক ফিরিয়া একটু ব্রাণ্ডি মুখে দিতেছেন। কিন্তু মস্তক চিন্তার কার্য্য ভুলে নাই। —কেনীর মস্তক এইক্ষণ বিশেষ একটি চিন্তায় রহিয়াছে। অবশ্যই কোন কার্য্য উদ্ধারের জন্যই চিন্তাদেবীকে স্মরণ করা হইয়াছে। ব্রাণ্ডির ঢোকে ঢোকে, মনগত ভাবের, উদয় হইতে শেষ পর্য্যন্ত ক্রমে কেনী, চিন্তা করিয়া তাহার দোষগুণ সমালোচনার জন্যেই মস্তিষ্কের সহিত কার্য্য-বিবরণের আলোচনা হইতেছে। মনের একাগ্রতা, চিন্তার বেগবৃদ্ধি, ভালমন্দ বিচার, পরিণাম এই সকল বিষয় বিশেষরূপে আলোচনার জন্যই বোধহয় অল্পমাত্রায়, ব্রাণ্ডি সেবনে মন দিয়াছেন। কারণ ব্রাণ্ডি যে মস্তকে যাহা পায়, তাহাই বৃদ্ধি করে।

মিসেস কেনীও কিছু গরমেই আছেন। অন্য টেবিলে, শেরির বোতল খোলা রহিয়াছে। —পিয়ানোর সহিত সুর মিলাইয়া, স্বামী-সোহাগিনী, গান ধরিয়াছেন, আবশ্যক-মত শেরির স্বাদ লইয়া রমনীহৃদয় প্রফুল্ল করিতেছেন। স্বামী-স্ত্রী এককক্ষে—আনন্দময়ী মদিরা সম্মুখে। স্ত্রী-কণ্ঠে গীত। হস্তে বাদ্যযন্ত্র। সুরনজিত, এবং সুসজ্জিত দ্বিতলগৃহ। সুখ-সেব্য-সামগ্রী, খাদ্যাদি প্রচুর—ভাণ্ডার পূর্ণ। —সুখের একশেষ। কিন্তু এ সুখ-সময়ে বিলাতী দম্পতীর বদনমণ্ডল প্রফুল্লতার বিশেষ চিহ্ন দেখা যাইতেছে না। উভয়েই আমোদপ্রমোদে, মনের

সুখে আছেন বটে—কিন্তু আন্তরিক নহে। —ভাবে বোধ হইল যেন উভয়েরই দুরন্ত শত্রু সময়, প্রয়োজন ও কার্য্যগতিকে, নিতান্ত আবশ্যকীয় ও প্রয়োজনীয়, মূল্যবান সময়কেও লোকে শত্রু মনে করে, ইহা মিথ্যা নহে। সেই অমূল্য সময়, এইক্ষণে ইহাদের পক্ষে নিতান্তই বিষম ও কষ্টকর বোধ হইতেছে। কারণ আছে!

মেঃ কেনীর চিন্তা অন্যপ্রকারের। চারিদিকে শত্রু, চারিদিকে গোলযোগ। যশোহর, মাগুরায়, পাবনায়, এই তিন জেলা মাখিয়া মোকদ্দমা। আদালত ফৌজদারী। নড়ালের রামরতন রায়, নলডাঙ্গার রাজা, পাংশার ভৈরববাবু, আরও কত জমিদার, তালুকদার—সহিত কত গোলযোগ। সকলের উপর সুন্দরপুর। মেমসাহেবকে লইয়া শাড়ী পরাইবে। বড় শক্ত কথা। আবার নিজের মাথার কথাটাও কম নহে। কোনদিক রক্ষা করিবেন।

মেমসাহেবের বিশ্বস্ত খানসামা ত্রস্তে আসিয়া হাতযোড় করিয়া বলিল— "হুজুর! পাবনার লোক ফিরিয়া আসিয়াছে।"

মেমসাহেব পিয়ানো ফেলিয়া মহাব্যস্তে বাদ্য-আসন হইতে উঠিলেন। তাড়াতাড়ি নীচে যাইয়া পাবনার পত্র লইলেন। নীচেরতালাতেই পত্রের লেপাফা খোলা হইল। এক লেপাফায় ছোট বড় দুইখানি কাগজ, ছোট কাগজখানা পাকেট পুরিয়া পত্র-হস্তে কেনীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

কেনী টমলট খালি করিয়া পুনরায় ব্রাণ্ডি ঢালিতেছেন। পাবনার পত্রের কথা শুনিয়া ব্যস্ততা-প্রযুক্ত ব্রাণ্ডিতে সোডাওয়াটার না মিশাইয়াই যত পারিলেন পান করিয়া, মিসেস কেনীর বামস্কন্ধে বামহস্ত রাখিয়া পত্রখানির আগা গোড়া দুই তিনবার মনে মনে পাঠ করিলেন। মুখে কথঞ্চিত হরিষের লক্ষণ দেখা দিল। বোধহয় কোন সুখবর।

সোনাউল্লা খানসামা বিশ্বাসী ও চতুর। সময়ে রাগী ও ধীর। স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই বিশ্বাসী, কেনী সোনাউল্লাকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া চুপে চুপে কি কি বলিয়া দিলেন। কেনী যেদিন বেশিমাত্রায় ব্রাণ্ডি চড়াইতেন, সেদিন বিষয়াদির কাজ আফিসে গিয়া করিতেন না। এমন কি উপরতালা হইতে কিছুতেই নীচে নামিতেন না। যদি কথা প্রকাশ হইত যে সাহেব আজ ব্রাণ্ডির বোতল খুলিয়াছেন, তবে কুঠিসমেত নীরব। কাহার মুখে উচ্চকথাটি বাহির হইত না। ভয়ে সকলের প্রাণ কাঁপিত। কেনীর আদেশ ছিল যে আমোদের সময় কোন

আমলা তাঁহার সম্মুখে না যায়। মেমসাহেবের পিয়ানোর আওয়াজ, আর গলার মিহি-স্বর শুনিয়াই কার্য্যকারকগণ বুঝিয়াছিলেন যে, আজ আমোদের দিন। আমাদেরও ছুটি। কেহ দাবায়, কেহ পাশার খ্যালে বসিলেন। কেহ অন্য আমোদে মন দিলেন।

ক্রমে দিনমণি অস্ত—সম্পূর্ণ অস্ত। ঘোর সন্ধ্যা। কোথাও লণ্ঠন জ্বলিল, কোথাও প্রদীপ দেখা দিল। কোথায় কোথায় মোমবাতি শোভা পাইল, ঝাড়ে, দেয়ালে, বৈঠকি সেজে, লণ্ঠনে নিজে পুড়িয়া আমোদে গলিয়া পড়িতে লাগিল।

সোনাউল্লা সাহেবের কয়েকজোড়া কাপড় তুলিয়া চিরুণী, ব্রাস, গ্লাস, অল্প পরিমাণ কিছু খাদ্য পুরিয়া একটি পোর্টম্যান সাহেবের সম্মুখে রাখিয়া দিল।

আহারের টেবিল সাজান হইয়াছে। কেনী তাড়াতাড়ি আহারে বসিলেন। মিসেস কেনী টেবিলে বসিলেন, কিন্তু আহার করিলেন না। কেনী সামান্য কিছু মুখে ফেলিয়া টেবিল হইতে উঠিলেন। সোনাউল্লার -মুখের দিকে তাকাইতেই সোনাউল্লা যোড়হাতে বলিল—

"খোদাবন্দ! পালকি বেহারা হাজির।" কেনী দেশলাই জ্বালাইয়া পাইপ মুখে ধরিলেন, এবং বলিলেন, সব ঠিক?

সোনাউল্লা পূর্ব্ববৎ বলিল—খোদাবন্দ! সকলি ঠিক।

কেনী মৃদুস্বরে কয়েকটি কথা মেমসাহেবকে বলিয়া সোনাউল্লাকে বলিলেন দেখ, বাবুরচিকে গিয়ে বল, ভাল ভাল খানা তৈয়ার করিতে। আর যা যা করতে হবে মেমসাহেবের কাছে শুনবে। এই বলিয়াই মেমসাহেবের হাত ধরিয়া নীচে নামিলেন। সিঁড়ির নিকটে পালকি, পালকিতে উঠিবার সময় কাহাকে কোন কথা বলিতে অবসর পাইলেন না। কারণ, স্ত্রীর-মুখে গাঢ়ভাবে চুম্বন করিতেই অন্য কথা ভুলিয়া গেলেন। চুম্বনের স্বাদ লইয়া পালকির দরওযাজা বন্ধ হইল। বেহারাগণ নিঃশব্দে কুঠির পশ্চাৎ দ্বার হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণমুখে চলিল।

কিছু দূর গেলেই মশাল, মশালচি, লোকজন সকলি সঙ্গে হইল। পালকি দক্ষিণদিকেই চলিল। কুঠিতে সোনাউল্লা এবং মেমসাহেব ভিন্ন, কেনীর গমন সংবাদ কেহই জানিতে পারিল না। জানিবার কথাও নহে।

মেমসাহেব উপরে আসিয়াই জাঁকালভাবে খানার টেবিল সাজাইতে আদেশ করিলেন। রূপার চামচ ইত্যাদি বাহির করিয়া দিলেন। সমুদায় ঝাড়ে

বাতি জ্বালান হইল। বাহিরের কাজকর্ম্ম সমুদায় ঠিক করিয়া ড্রেসিংরুমে প্রবেশ করিলেন। মনেরমত সাজশয্যায় অঙ্গ-সাজাইয়া ড্রেসিংরুম হইতে বাহির হইলেন। সে সময়ের ভাবই ভিন্ন-রূপ ভিন্ন। বৃহদাকার আরশির সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজের পরিচ্ছদ-সাজের নিজেই ভালমন্দ বিচার করিতে লাগিলেন। কোনখানে টানিয়া দিলেন। দুই একটি চুল যাহা বেকেতাভাবে কপালের কি ভ্রূর উপর উড়িয়া পড়িয়াছিল, তাহা হস্তদ্বারা, ব্রাসদ্বারা সোজা করিলেন। মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত হেলিযাদুলিয়া, বাঁকা হইয়া, পাস ফিরিয়া দেখিয়া "অল রাইট" বলিয়া জানালার দিকে মুখদিয়া ইজিচেয়ারে পা ছড়াইয়া দিলেন। মুহূর্ত্তকাল অতীত হইলেই দেখিতে পাইলেন যে একখানা পালকি আর জন পঞ্চাশ লোক নানারকম পোষাক পরা, ক্রমে আফিস-দালান বামদিকে রাখিয়া একেবারে তাঁহার দ্বিতল বাসঘরের সিঁড়ির নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। এবং পালকির দ্বার খুলিয়া গেল।

মিসেস কেনী আগ্রহের সহিত ও! মিষ্টার! মহানন্দে ত্রস্তপদে সিঁড়ির নীচে আসিয়া আগন্তুক ইংরেজের হাত ধরিলেন। যথারীতি অভিবাদনাদি করিয়া উপরে আসিলেন। পর্দ্দা সরাইয়া দ্বার অবারিত করিলেন। দস্তুরমত পাখা চলিতে লাগিল।

মিসেস কেনী পুনরায় তাড়তাড়ি নীচে গিযে সাহেবের লোকজনকে বিশেষ আদর করিয়া নীচেরতালায় স্থান দিলেন। তাহাদের আহারাদির জন্য সোনা-উল্লাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া উপরে আসিলেন।

পাঠক! আগন্তুক নূতন লোক নহেন। আপনাদের পূর্ব্ব-পরিচিত ম্যাজি-ষ্ট্রেট। সঙ্গের লোকজন ইঁহারাও নিরর্থক আসে নাই। উহাদের মধ্যে দারোগা, নায়েব দারোগা, বরকন্দাজ—সকলি আছেন। কিন্তু সকলেই ছদ্মবেশী। মেমসাহেব, সাহেবকে বসাইয়া ঐ কক্ষের নিম্নকুঠরিতে দারোগা, জমাদার এবং বরকন্দাজদিগকে যথোপযুক্ত স্থান নির্ণয় করিয়া দিলেন। কুঠির অন্য অন্য চাকর, আমলা প্রভৃতি কেহই এ নিগুড়তত্ত্ব জানিতে পারেন নাই।

উভয়পক্ষের গোয়েন্দাই চতুর। কে কোন সময়ে কোন সন্ধান লইতেছে, কি কৌশলে কি বেশে আসিয়া খবর জানিয়া যাইতেছে, সাবধান সতর্কে, বিশেষ সতর্কে থাকিয়াও কোনপক্ষই তাহা জানিতে পারিতেছেন না। কুঠির খবর দিন

দিন স্থন্দবপুবে যাইতেছে। —স্থন্দবপুরেব গুপ্তচর সংবাদ দিযাছে যে, কেনী আজ কুঠিতেই আছেন। আমোদে মাতিয়া আছেন। ব্রাণ্ডি-পানিতে মাতয়ারা—বিভোব। মেমসাহেব পিয়ানো বাজাইতেছেন। হাসি-তামাসা খুব চলিতেছে —ইত্যাদি—

মিসেস কেনী আজ যে অভিনয় ভার গ্রহণ কবিয়াছেন, কৃতকার্য্য হওয়া বডই কঠিন। তবে ভরসা এই যে, স্বয়ং-নেতৃ—সোনাউল্লা সাহায্যকারী—আগন্তুক পাবনাব দল প্রকাশ্যে সাহায্যকারী না হইলেও শান্তিরক্ষক, বিচারক। এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ, পবিদর্শক।

সোনাউল্লা মেমসাহেবের নিকট বলিল "হুজুব! মীবসাহেব তাহার নিতান্ত বিশ্বাসী লোকদ্বাবা এই পত্র পাঠাইযাছেন সে আপনাব সহিত দেখা কবিতে চাহে। পত্রের লিখা ছাড়া আবও কি কথা আছে।"

মিসেস কেনী অতিত্রস্তে নীচে আসিয়া গোপালকে দেখিযাই চিনিলেন। বলিলেন, "গোপাল! খবব কি?"

গোপাল সেলাম বাজাইযা বলিল—"হুজুর! একশত আসিযাছে। আব সমুদায় ঠিক। আফিসঘবে ইহাদেব স্থান দিলে ভাল হয়।"

মিসেস কেনী আফিসঘবের দ্বাববানকে ডাকিয়া বলিযা দিলেন। গোপাল এবং গোপালেব সঙ্গিরা আফিসঘরে স্থান পাইল।

মিসেস কেনী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবেব নিকট বসিয়া খোস-গল্প কবিতেছেন। আবাব সোনাউল্লা আসিয়া কবযোড়ে বলিল—"হুজুর! সান্যাল মহাশয় সাহেবের নিকট বিশেষ কি কথা বলিতে চান।"

মিসেস কেনী বলিলেন—"তুমি গিযে দেওয়ানজীকে বল, আজ সাহেবের শরীর অসুখ।"

সোনাউল্লা চলিয়া গেল, মুহূর্ত্তপবেই ফিবিয়া আসিয়া বলিল—"হুজুর! বড় জরুবী খবর—তিনি বলিলেন—"যদি সাহেবেব শরীব অসুখ হইয়া থাকে তবে মেমসাহেবের নিকটেই বলিতে হইবে। বডই জরুবী কথা।"

মিসেস কেনী উঠিলেন এবং সিঁড়ির নিকটে আসিয়া শম্ভু সান্যালকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি কথা?"

সান্যাল মহাশয় বলিতে লাগিলেন—"হুজুর! এখনই খবর পাইলাম যে,

প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়াল সুন্দরপুর হইতে রওযানা হইয়াছে। ঢাল, সড়কি, লাঠি ইত্যাদি গাড়ী বোঝাই করিয়া আনিতেছে। বহুতর লাঠিয়াল একত্রে আসিতেছে। সাহেবের সঙ্গে দেখা হইল না। কোন পরামর্শও করিতে পারিলাম না। দিন-বুঝিয়াই সাহেবের শরীর অসুখ হইযাছে, এখন উপায় কি ?

মিসেস কেনী বলিলেন—"কুঠিতেও আমার অনেক লোক আছে, ভয় কি।"

শম্ভু বলিলেন,—"হুজুর! কুঠিতে যে লোক আছে, তাহাদের দ্বারা কুঠি রক্ষা হইতে পারে না। প্যারীসুন্দরী এবারে বিশেষ যোগাড় করিয়াছে। আর একটি কথা, তাহারা শুধু কুঠি লুটপাট করিয়া যাইবে না, তাহাদের মনের ভাব ভাল নহে।"

মিসেস কেনী বলিলেন—"আর কি করিবে ? আমাকে সুন্দরপুরে লইয়া যাইবে। যে লোক আছে, তাহাতে যদি তোমাদের সাহস না হয়, আরও লোক সংগ্রহ কর। টাকায় কিনা হয়। দুই টাকার জায়গায় চারি টাকা খরচ করলে এই রাত্রেই কত লোক জুটিয়া যাইবে। যত পার সংগ্রহ কর আমার হুকুম।"

শম্ভু বলিলেন—"এত রাত্রে লোক পাওয়াই তো কঠিন কথা।"

মিসেস কেনী বলিলেন—"তবে সাহেবকে কি বলিতে আসিয়াছ ? কোথা পাইবে ? সে কি কথা ? কুঠির চারিদিকে আমারই প্রজা—তাহাদিগকে বেশী করিয়া টাকা দেও, অবশ্যই আসবে। যত লোক পার, আনিয়া কুঠির চারিদিকে খাড়া করিয়া দেও। রাত-প্রভাত না হওয়া পর্যান্ত খাড়া পাহারা দিবে।"

শম্ভু সান্যাল সেলাম বাজাইয়া বিদায় লইলেন। মিসেস কেনী নিজকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে সান্যাল মহাশয় বাসাবাড়িতে যাইয়া প্রধান কার্য্যকারক হরনাথ মিশ্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া লোক সংগ্রহের জন্য লোক মোতাইন করিলেন। হুকুম পাইলে কি আর রক্ষা আছে ? "ঝাকড়া চুল" লাঠিয়ালেরা দুহাতে সেলাম ঠুকিয়া নিশীথ সময়ে গ্রামে গ্রামে লোক সংগ্রহ করিতে ছুটিল।

উপস্থিত বিপদে আবশ্যকমতে সাহায্য করিবে এই আশ্রয়েই মিসেস কেনী নিকটস্থ প্রজাদিগকে আনিতে আদেশ ও রাত্রি-জাগরণে কষ্ট হইবে বলিয়া দ্বিগুন পারিশ্রমিক দিতে আদেশ করিয়াছেন।

স্বার্থ-ই অনর্থের মূল, স্বার্থ-ই দুর্দ্দশার সোপান, জগতে স্বার্থ-ই পতনের মূল কারণ—প্যারীসুন্দরী বলিয়াছেন, দেশের লোকই দেশের শত্রু, দেশের অনিষ্ট-কারী। কেনী বিলাত হইতে লোকজন সঙ্গে করিয়া এদেশে আসেন নাই। দেশের লোকদিয়াই স্বদেশীয়ের সর্ব্বস্বান্ত করিতেছেন। রাত্র জাগরণে প্রজার কষ্ট হইবে, সেদিকেও মিসেস কেনীর লক্ষ্য ছিল। থাকিয়া কি হইবে? কার্য্যকর্ত্তা বাঙ্গালী—অধীন চাকরগণ বাঙ্গালী, কিন্তু স্বার্থের দাস। দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দিয়া লোক সংগ্রহ করার আদেশ! এখন দেশের লোকের হাতে পড়িয়া নিরীহ প্রজাকুলের কি প্রকারে দুর্দ্দশা ঘটে—দেখুন।

লোক সংগ্রহকারীরা সেলাম ঠুকিয়া নিকটস্থ গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করিল। দেওয়ানের হুকুম কার সাধ্য আর রাত্রে ঘরে থাকিতে পারে? নিদ্রাত্যাগ করিয়া, শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতে হইল। যে উঠিতে বিলম্ব করিল, কি শরীর অসুস্থ—অসুখ হেতু কুঠির পাহারায় যাইতে নারাজ হইল, তাহার ভাগ্যে যাহা ছিল তাহা হইল। যন্ত্রণার দায়ে, প্রাণের ভয়ে, অপমানের ত্রাসে অনেকেই দেওয়ানজীর প্রেরিত লাঠিয়ালের সঙ্গী হইল। যাহারা দুই চারি আনা প্রণামী দিতে সমর্থ হইল, তাহারা আর আসিল না। যাহাদের পয়সা দিবার শক্তি নাই, বাধ্য হইয়া যাইতে প্রস্তুত হইল। কুঠি রক্ষার্থে চলিল কাহারা? যাহাদের পেটে অন্ন নাই, সংসারে কষ্টের সীমা নাই। কোথায় যাইতে হইবে, কি কার্য্য করিতে হইবে, কেন টানিয়া লয়, কেনই বা বিনাপরাধে লাথি, কিল, চড় মারে, সেকথা জিজ্ঞাসা করিবার সাধ্য নাই। অনেকেই সারাদিন নীলজমির কারকিদ করিয়া বাড়ি আসিয়াছে। নিজের জমি উপযুক্ত সময়ে চাষ আবাদের ক্ষমতা নাই। সময় বহিয়া যাউক, রৌদ্রে পুড়িয়া যাউক, জলে ডুবিয়া যাউক "জো" সরিয়া যাউক, কার সাধ্য নীলজমি ফেলিয়া ধানের আবাদ করিতে পারে। আগে নীল, পাছে ধান। কৃষকের জীবন উপায় শস্য বপনোপযোগী জমি প্রস্তুত করিতে বিঘ্ন, বুনিতে বাধা, কর দিতেও অক্ষম। কাজেই খাবার সংস্থান অনেকেরই নাই।

বাড়ি আসিয়া কেহ আধপেটা আহার করিয়াই কুহকিনী-নিশার কুহকে পড়িয়া মাতিয়াছে। কেহ অনাহারেই মাটিতে শুইয়া পড়িয়াছে। অল্প পরিমাণ ক্ষুধা নিবারণ জন্য একমুঠো অন্নও অনেকের ভাগ্যে ঘটে নাই। যাহা ছিল, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলি দিনেরবেলা নিরন্নে থাকিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মায়ের অঞ্চল

ধরিয়া কান্দিয়াছে। মায়ের প্রাণ! যাহা ঘরে ছিল, তাঁহাই সিদ্ধ-পোড়া করিয়া প্রাণ হইতে প্রিয়তর সন্তান-সন্ততিগণের মুখে শুধু নুনভাত দিয়া তাঁহাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছে। হাঁড়িতে আর অন্ন নাই। থাকিলে ছেলেমেয়েরাই আর কিছু খাইতে পারিত। কি করে সজল-নয়নে কৃষকপত্নী হাঁড়ি-আঁচড়া পোড়া ভাতগুলি যতনে স্বামীর জন্য রাখিয়া দিয়া স্বামীগত প্রাণাপত্নী কেবল ঈশ্বরের নাম করিয়া বসিয়াছে। স্বামী সারাদিন নীলকুঠির কাজ করিয়া বাটি আসিয়াছে, ছেলেমেয়ে দিনে খেতে পায় নাই। —সন্ধ্যাবেলাও ভরপেট হয় নাই। স্ত্রীর মুখে খবর শুনিয়া আর সে পোড়াভাতও মুখে দিতে সাধ্য হয় নাই। ঈশ্বর ভরসা। —মহাজনের বাড়িতে গিয়া দ্বিগুণ ত্রিগুণ লাভ-স্বীকারে ধান কর্জ্জ করিয়া আনিবেন তাহারও সময় নাই। রাত্রি-প্রভাত হইতে না হইতেই আমিন, খালাসী আসিয়া ধরিয়া লইয়া যায়। নীলজমির কারকিত, চাষ ইত্যাদিতে নিযুক্ত করে। তবে কিছু প্রণামী দিতে পারিলে সে, যমদূতগণের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। তাহাই বা কোথায় পাইবে? পেটে পাথর বান্ধিয়া থাকাই অভ্যাস। দিবসে দু-এক পয়সার জলপানই পূর্ণ আহার—পরিশ্রমের ইতি নাই—নিদ্রাদেবী ছাড়িবেন কেন? বিছানা থাক বা না থাক, বালিশে মাথা পড়ুক বা না পড়ুক, ঘুমের ঘোরে সকলেই কাতর। তাহার উপর এই দৌরাত্ম্য। যাহারা দুই-একআনা দিতে পারিল, তাহারা কিল. লাথি খাইয়া রক্ষা পাইল। যাহাদের দিবার শক্তি হইল না, তাহারা কুঠি পাহারা দিতে চলিল। হায় রে বঙ্গ! হায় রে নীলকর! হায় রে স্বদেশীয়!

মিসেস কেনী পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেরা রাত্রি-প্রভাত হইলেই কুঠি আক্রমণ করিবে। কৌশলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবেন, তাইতে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটকে গোপনে আনিয়া রাখা। আরও একটুকু সূক্ষ্ম কথা আছে যে. কেনীর মাথা কাটিয়া সুন্দরপুর লইয়া যাইবে। ভ্রমে যদি ম্যাজিষ্ট্রেটের মাথাটা কাটা যায়, তবে কেনীর মনস্কামনা শীঘ্রই সিদ্ধি হয়। প্যারী-সুন্দরীর সর্ব্বনাশ, কেনীর জয় জয় আনন্দ। কুঠি ছাড়িয়া গুপ্তভাবে যাওয়ার কারণও তাহাই।

মিসেস কেনী সাহসে নির্ভর করিয়া ভিন্ন কক্ষে জাগিয়া আছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ভিন্ন কক্ষে নিদ্রিত। স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট—শান্তিরক্ষকগণ-সহ রক্ষার জন্য

উপস্থিত, কঠিব লোকজনও সতর্কিত, বিপদেব আশঙ্কা নাই বলিলেই হয়। কিন্তু মন অস্থিব, মহাঅস্থির! আজ বাত্রে নিদ্রার সহিত তাহার দেখা নাই। কি জানি কি হয়। বিপদ সম্ভাবনায় অবশ্যই অধিক ভয়, ঘটনাচক্রে কোথায লইয়া ফেলে, কি ঘটে কি হয সমুদায ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহিত। কাজেই অস্থির—কাজেই চঞ্চল। —কাজেই চিন্তা, কাজেই আকুল।

উষাদূত-কুক্কুট বাত্রি শেষ হওযাব সংবাদ ঘোষণা কবিল। পাখিরা এখনও বাসা ছাড়ে নাই। পাখা ঝাড়া দিয়া ডালে বসে নাই। প্রভাতী গানেও জগৎ মাতায নাই। দয়াময়েব সত্যনাম ঘোষণা কবে নাই। পাখা ঝাড়া দিয়া কেবল ডাকিতেছে। মিসেস কেনী মোবগেব ডাকেব দিকেই মন দিয়াছেন; এক ডাক, ক্রমে তিন-চাবি ডাক শুনিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবও একপ্রকাব শব্দ তাহাব কর্ণে প্রবেশ কবিল। এরূপ শব্দ আব একদিন তিনি শুনিযাছিলেন। সেই ডাক, সেই ভীষণ বব। শরীয বোমাঞ্চিত হইল, হৃদয কাঁপিতে লাগিল। শব্দ ক্রমেই নিকটবর্ত্তী, ক্রমেই বেশী আতঙ্ক। ব্যস্তভাবে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবেব কক্ষেব দ্বারে আঘাত কবিতে লাগিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও অর্দ্ধ-নিদ্রিত ভাবে ছিলেন। মিসেস কেনীব গলার স্বব শুনিয়া পালঙ্ক হইতে লাফাইযা উঠিলেন। দ্বাব খুলিযা দিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন—"ব্যাপাব কি?"

পাঠক! এইস্থানে লিখক ক্ষমা প্রার্থনা কবিতেছে। অস্বাভাবিক দোষেব পোষকতা হেতু লিখক দোষী, তাহাতেই ক্ষমা প্রার্থনা। মিসেস কেনী এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব উভয়ে বিলাতী, সম্মুখে বিপদ আশঙ্কা, মিসেস কেনী ভয়ে ভীতা ও আশঙ্কিতা। এ অবস্থায় জাতীয ভাষাতেই কথাবলা যুক্তি সঙ্গত। আপনাদের অসুবিধা ও শ্রুতিকঠোব হইবে বলিয়া বাঙ্গলা ভাষাতেই সে কথার ভাবার্থ আপনাদিগকে শুনাইতে হইল।

মিসেস কেনী বলিলেন—"শুনিতেছেন না?"

ম্যাজিষ্ট্রেট—"কৈ আমি তো কিছুই শুনিতে পাইতেছি না।"

মিসেস—'ঐ শুনুন, বিপক্ষদল নিকটবর্ত্তী! বাঙ্গালী বিক্রমের ঐ শব্দ! প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালগণ ঐরূপ শব্দ করিয়াই আসিয়া থাকে। সেদিনও আসিয়াছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট—"কোন চিন্তা নাই। আপনি নিশ্চিন্তভাবে আপন কামরায়

থাকুন। আমি নীচে যাইতেছি। গভর্ণমেন্টব রাজ্য—আমি ব্রিটিশ গবর্ণবের পক্ষের লোক। আমি থাকিতে আপনাব কোন ভাবনা নাই। আপনি নির্ভয়ে উপরে থাকুন। আমি নীচে চলিলাম।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাড়াতাড়ি আপন পরিচ্ছদ লইয়া জোবপায়ে নীচে নামিলেন। প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেরা বিষম বিক্রমে কালীগঙ্গার পশ্চিমপারে আসিয়াই পুনরায় ডাক ভাঙ্গিল। দারোগা, জমাদার সকলেই আপন আপন পোষাক লইয়া সাহেবেব আদেশে কোমর বান্ধিলেন, কিন্তু ঘবেব বাহিব হইলেন না। কুঠির-হাতায় প্রবেশ কবিলেই গ্রেপ্তাব কবিবেন. ইহাই তাঁহাদেব ইচ্ছা,—ঘটিলও তাহাই।

এখনও রাত্র-প্রভাত হয় নাই, ঊষা দেখা দেয় নাই—তাবাদল লইয়া তারা-পতি এখনও স্ব-স্থানে চলিয়া যান নাই। একে একে যাইতেছেন—এখনও সম্পূর্ণ-রূপে চক্ষের আড়াল হন নাই। আবার সেই হো হো শব্দ। সেই ঝ ঝ শব্দ! সেই হৃদয়-কম্পিত, দেহ-কম্পিত শব্দ—ভীষণ রব মেমসাহেবের কর্ণে প্রবেশ করিল। পশ্চিমেও ঐ শব্দ দক্ষিণেও ঐ।

বামলোচন এবাবে বিশেষ যোগাড কবিয়াছেন। কুঠির পশ্চিম এবং দক্ষিণ উভয়দিক হইতে কুঠি আক্রমণেব যোগাড়। মিসেস কেনী, দুইদিকে দুইপ্রকাব শব্দ শুনিয়া আরও ভীতা হইলেন। নিমকহালাল চাকব সোনাউল্লাব চক্ষে নিদ্রা নাই। কি হইল? —এঁকি ব্যাপার? সাহেব কুঠিতে নাই, একি কাণ্ড! এই সকল ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে মহা-অস্থিব। একবাব নীচে একবার উপবে যাইতেছে। ক্রমে কুঠির নেগাহবান সর্দ্দাবগণও জাগিয়া উঠিল—ঢাল, সডকি, লাঠি লইয়া সকলেই খাড়া হইল।

সোনাউল্লা সিঁড়িব নিকটে মেমসাহেবকে পাইয়া বলিল, "হুজুব! মীব-সাহেবেব চাকর গোপাল সর্দ্দাব হুজুরে সেলাম দিতে চায়।"

বোধহয় পাঠকগণেব মনে নাই—মনে করিয়া দিতেছি। মীরসাহেব আমবাগানের নিকট কেনীব সহিত সাক্ষাৎ কবিয়া আসিয়া যে লাঠিয়াল জোটাইতে আদেশ করিয়াছিলেন—সেই আদেশেই সর্দ্দারগোপাল একশত লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছে। আফিসঘবে স্থান পাইয়াছে।

মিসেস কেনী বলিলেন—"গোপাল! তুমি আমার এই ঘর রক্ষা কর।

কুঠির লাঠিয়ালেরা কুঠি রক্ষা করিবে। প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালের সম্মুখীন হইয়া লাঠি মারিবে—তুমি আমাকে রক্ষা কর।'

পুনরায় দক্ষিণদিকে পূর্ব্ববৎ শব্দ হইল—গোপাল বলিল—হুজুর! প্যারী-সুন্দরীর লোক পশ্চিম এবং দক্ষিণ এই দুইদিক হইতে নিশ্চয়ই আসিতেছে। দক্ষিণদিকে কোন বাধা নাই। পশ্চিমে নদী—বেশী জল—অধিক পরিমাণ পরিসর না হইলেও নদী—কিন্তু দক্ষিণে খোলা মাঠ, পূর্ব্বেও তাহাই। পূর্ব্বদিকে তত আশঙ্কা নাই। কারণ দক্ষিণদিক হইতেই পূর্ব্বদিকে যাইবার পথ। এখন দক্ষিণ-দিক না ঠেকাইলে কুঠি রক্ষা করা বড়ই কঠিন হইবে। পশ্চিমে নদী—জল কম হইলেও তত্রাচ ঐদিক হইতে শত্রুদল আসিতে যত বিলম্ব হইবে, দক্ষিণদিক হইতে আসিতে তত বিলম্ব হইবে না। আমি দক্ষিণদিকেই চলিলাম। হুজুর! আর বিলম্ব করিতে পারি না।—এই পর্য্যন্ত বলিয়া গোপাল মেমসাহেবকে আবার সেলাম বাজাইয়া বেগে ছুটিল।

কুঠির নিযুক্তিয় লাঠিয়ালেরাও ডাক ভাঙ্গিয়া কুঠির পশ্চিম দিকে দ্বিতল গৃহের পশ্চিমদিকে 'আলি" বাঁধিয়া দাঁড়াইল। কত লোক কুঠির উত্তর সীমায় প্রবেশ দ্বারে ঢাল, তরবার বাঁধিয়া খাড়া হইল। এখনও সম্পূর্ণরূপে প্রভাত হয় নাই। গোপাল সর্দ্দার আপন বেরাদরীদিগকে বলিল "দক্ষিণে এত আলো কিসের?"

সকলেই দেখিল অনেকের হাতেই মশাল। মশালের আলোতে আরও দেখা গেল, সড়কির অগ্রভাগের চাকচিক্য, লাঠির দীর্ঘতা, কোমরবান্ধা, মুখপাট্টা বান্ধা, বাঙ্গালার যোধ, অগণ্য লাঠিয়াল দেখিতে দেখিতে বিকট চিৎকার করিতে করিতে ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে।

কালীগঙ্গার পশ্চিম পারেও ঐরূপ আলো, ঐ প্রকার বিকট রব,—মাঝে মাঝে ভয়ানক চীৎকার,—দেখিতে দেখিতে কালীগঙ্গার পশ্চিমতট আলোক-মালায় পরিশোভিত হইল—জলে-স্থলে জ্বলন্ত মশালের শিখা অধো-উর্দ্ধভাবে প্রভাত বায়ুর প্রতিঘাতে হেলিতে দুলিতে লাগিল। চমৎকার দৃশ্য! সে সুদৃশ্য বেশীক্ষণ থাকিল না। উষাদেবী পূর্ব্বদিক হইতে দুহাতে অন্ধকার সরাইয়া চারিদিক পরিস্কার করিয়া দিলেন। প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেরা 'মার মার' শব্দে গঙ্গাজলে

ঝাঁপ দিয়া বীরত্বের শেষ, সাহসের শেষ, কার্য্যের শেষ দেখাইয়া মহাতেজে কুঠি অভিমুখে আসিতে লাগিল।

কুঠির সকলেই জাগিয়াছে। —মুচ্ছুদ্দী, দেওয়ান, নায়েব, পেষকার, ইত্যাদি আমলাগণ, লাঠিয়ালগণের হু-হুঙ্কারে ভীষণ চীৎকারে জাগিয়াছেন, কুঠির লাঠিয়ালেরাও প্রস্তুত হইয়া উত্তরদিকে প্রবেশদ্বারে বীরদর্পে দণ্ডায়মান হইল। প্রায় শতাধিক লাঠিয়াল নদীর পূর্ব্বপারে দাঁড়াইয়া জলস্থ শত্রুদলের আগমনে বাধা দিতে লাগিল।

প্যারীসুন্দরীর কড়া-হুকুম। কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিলে বিশেষ পুরস্কার আছে। তাহারপর এক হাজার টাকা অতিরিক্ত। যে সেইকাজ পারিবে, তাহার ভাগ্যেই হাজার—সে হাজার কাহার ভাগ্যে আছে তাহা কেহই জানে না। কিন্তু আশা আছে আমি পাইব।

রে টাকা! তোর অসাধ্য কিছুই নাই। পরের জন্য, পরের প্রয়োজনীয় মাথার জন্য জলে ঝাঁপ, সম্মুখ-শত্রুর অস্ত্রের মুখে বক্ষবিস্তার, লাঠিরতলে মস্তকদান। রে টাকা! তোর জন্যই কেনীর বিলাত পরিত্যাগ। তোর জন্যই নীলের ব্যবসা। জমিদারের পত্তন। তোর জন্যই নিরীহ বঙ্গের প্রজার প্রতি অত্যাচার—পিশাচি! তোর জন্য আজ এই বাঙ্গালা যুদ্ধ। পরিণামফল ভবিষ্যৎ গর্ভে। জয়-পরাজয় অবশ্যই হইবে। পরাজয় পক্ষেও তুমি। জয় পক্ষেও তুমি তোমারই জয়, জগতে তোমারই জয়!

প্যারীসুন্দরীর পক্ষের লোকেরা পূর্ব্বেই স্থির পরামর্শ ছিল যে, পশ্চিম-দক্ষিণ উভয়দিক হইতেই কুঠি আক্রমন করিবে। করিলও তাহাই।

দক্ষিণদিকে গোপাল—গোপালের দলের সহিত খুব চলিতেছে। স্বয়ং গোপাল সুশিক্ষিত। সঙ্গিরাও বাছা বাছা। সহজে পরাস্ত হইবার নহে। লাঠি, সড়কি সমানভাবে চলিতেছে। প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেরা—একপাও অগ্রে বাড়িতে পারিতেছে না। যেখানে বাধা সেইখানেই দণ্ডায়মান।

এদিকে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে ভিন্নপ্রকার কাণ্ড। একদল জলে ঝাঁপাইয়া ভিজা কাপড়ে ডাঙ্গায় উঠিতে অগ্রসর হইতেছে। অপরপক্ষে উপর হইতে লাঠি-দ্বারা আঘাত করিবার চেষ্টা করিতেছে। একশত লোকে কি করিবে? দক্ষিণে ফিরাইতে ফিরাইতে বামদিক হইতে অসংখ্য শত্রুদল কেনীর লাঠিয়ালদিগকে

ঘিরিয়া ফেলিল। এখন তাহাদের প্রাণ যায়। আর কতক্ষণ—মাথা-ভাঙ্গা, পা-ভাঙ্গা, মাজা-ভাঙ্গা, হাত-ভাঙ্গা, হইয়া পিঠ দেখাইল। লাঠি, সড়কি ফেলিয়া কেনীর দ্বিতল শয়নকক্ষের দিকে ছুটিল। —ছুটিল তো ত্রাসে একেবারেই ছুটিল। কে কোন্ পথে কোথায় পালাইল তাহার খবর আর কে করে? কিন্তু সেসময় সন্ধান করিলে বাবুরচিখানায়, ঘোড়ার আস্তাবলে, নীল হাউজের মধ্যে, জাঁতঘরের জাঁতের নীচে অবশ্যই অনেককে পাওয়া যাইত। দেওয়ানজীর আদেশে আবার বেশী পরিমাণ লাঠিয়াল, কুঠির পশ্চিমে কালিগঙ্গা-তীরে ডাকে-হাঁকে বিক্রমে উপস্থিত হইয়া প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়াল প্রতি লাঠি ঝাড়িতে লাগিল। জল হইতে তাহারা আর ডাঙ্গায় না উঠিতে পারে। কুঠি আক্রমণ করা দূরে থাকুক কুঠির সীমায় পা ধরিতে না পারে, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল।

কার সাধ্য আজ প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালগণকে বাধা দেয়? কার সাধ্য তাহাদের সম্মুখে দাঁড়ায়? কালীগঙ্গাজলে—লাঠিয়াল পূর্ব্বতীরে কেনীর লাঠিয়াল —পশ্চিমতীরে প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়াল, ক্রমাগত আসিয়া জুটিতেছে। আর ডাক ভাঙ্গিয়া 'আলী আলী' শব্দ করিতে করিতে জল পড়িতেছে। কয়েকজনকে কয় হাতে বাধা দিবে? মাথা ফাটিল, জলে ডুবিল, হাবুডুবু খাইয়া আবার উঠিল। একদিক এইরূপ চলিতে লাগিল, কিন্তু বামদিক হইতে জল সাঁতরাইয়া 'মার মার' শব্দে লাঠিয়ালগণ কেনীর লাঠিয়ালদিগকে ঘিরিয়া লাঠিবাজির প্রতিশোধ আরম্ভ করিল। কুঠির দক্ষিণদিকেও খুব গোল। —পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্যারীসুন্দরীর কতক লাঠিয়াল দক্ষিণদিক হইতে আসিয়া পশ্চিম, পূর্ব্ব এই দুইদিক হইতে একেবারে আক্রমণ করিবে ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মীরসাহেব প্রেরিত লাঠিয়ালগণ দক্ষিণ-দিক রক্ষা করিতেছে, গোপাল স্বয়ং লাঠি ধরিয়াছে।

নদীতীরে এখন আর লাঠির ঠকাঠক শব্দ হইতেছে না। —কারণ কুঠির লাঠিয়ালগণ বেগোছ দেখিয়া পিঠটান দিয়াছে। —আর কোন বাধা নাই। প্যারী-সুন্দরীর কতক লাঠিয়াল 'মার মার' শব্দে কেনীর শয়নঘরের সম্মুখে আঙ্গিনায় আসিয়া কেনীর নাম ধরিয়া বেজায় গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল।

আয়, নামিয়া আয়! দালানের মাঝে কপাট দিয়া কেন? পুরুষ-বাচ্চা হও —বাহিরে এসো। দেখি একবার তোমাকে। আর তুমি মনে করো না যে দালানের কপাট এঁটে বাঁচতে পারবে। পঞ্চাশ-তোড়া টাকা ছড়াইয়া দিলেও,

আজ খালি হাতে যাবার লোক নাই। তোমার মাথা হাতে হাতে সুন্দরপুর যাইবে। বাহির হও, শীঘ্র বাহির হও।

মিসেস কেনী ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নানাপ্রকার সান্ত্বনা বাক্য বুঝাইয়া শেষে বলিলেন, আপনার কোন চিন্তা নাই।—ঐ লাঠিয়া-লেরা আর একটু অগ্রসর হইলেই পাকড়াও করিব। আপনি ব্যস্ত হইবেন না।

মুখের কথা মুখে থাকিতে থাকিতে লাঠিয়ালেরা লাঠি ভাঁজাইতে ভাঁজা-ইতে একেবারে সিঁড়ির নিকটে আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে উদ্যোগ করিল। এমন সময় লালপাগড়িবাঁধা কয়েকজন লোক বাহিরে আসিয়া 'পাকড়ো পাকড়ো' শব্দ করিয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করিল।

লাঠিয়ালের চক্ষে লালপাগড়ি বড়ই মারাত্মক অস্ত্র, বড়ই ভয়ের কারণ। —নামডাকের লাঠিয়াল হইলেও লালপাগড়ির নিকট মাথা হেঁট।

লালপাগড়ি দেখিয়া প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালগণ থতমত খাইয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া যাহা দেখিল তাহাতে পূর্ব্বভাব অনেক পরিবর্তন হইল। স্পষ্ট বলিতে লাগিল। যা থাকে কপালে হইবে আগে ধর বেটাকে। এই কথা বলিয়াই আবার যেন কি মনে হইল। —পিছে হটিল। ক্রমেই পিছে হটিতে লাগিল। একজন বলিতে দশজন বলিয়া উঠিল। ও তো কেনী সাহেব নহে? আমি বেশ চিনিতে পারিয়াছি, কখনই ও কেনী নহে।

সন্দেহটা শীঘ্রই মিটিয়া গেল। কারণ লালপাগড়িওয়ালা সেপাই সাহেবরা 'পাকড়ো পাকড়ো' বলিয়া বেগে ছুটিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও স্বীয়দলের পৃষ্ঠ-পোষক হইয়া ঐ বোল 'পাকড়ো', দারোগা, জলদি পাকড়ো, লোককো হাতকৌড়ি লাগাও—

লাঠিয়ালেরা বলিতে লাগিল। "আজ মারা গিয়াছি। ধরা পড়িলাম। এতদিনের পরে মারা পড়িলাম। আর দেখ কি, ও কেনী নহে! আমি ভাল করিয়া চিনি, ইনিই সেই ম্যাজিষ্ট্রেট—"

ইহারাও 'পাকড়ো পাকড়ো' করিয়া ছুটিয়াছেন, কিন্তু একজনকেও পাকড়াতে পাচ্ছেন না। পিছে হটিয়াই নদীতীর পর্যন্ত চলিয়া গেল। লালপাগড়িধার সেপাই সাহেবেরা মুখে 'পাকড়ো পাকড়ো' করিতেছেন, পাকড়া করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিতেছেন কিন্তু তাহাদের লাঠির নিকট যাইতে সাহসী হইতেছেন না।

তাগড়া লাঠিয়ালেরা লাঠি ভাঁজিতে ভাঁজিতে জলে নামিল—সেপাই সাহেবেরা কাপড় কসিতে কসিতে 'ডিঙ্গি লাও ডিঙ্গি লাও' বলিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে তাহারা নদী পার হইয়া কালীগঙ্গার পশ্চিমতীরে যাইয়া উঠিল। কেহ পলাইল না। পিঠ দেখাইয়া দৌড়িল না। সকলেই দাঁড়াইল এবং সাহেবকে বলিতে লগিল। হুজুর ' আপনি রাজা—আপনি দেশের বাদশা। আমরা তাবেদার, চাকব, গোলাম, নফর—দয়া করে আমাদিগকে মাপ করিবেন। হুজুরের সহিত আমাদের কোন কথা নাই। —

যোড়হাতে লাঠিয়ালগণ এইরূপ বলিতে লাগিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং দারোগা জমাদার নদীপারের নৌকার উপর থাকিয়াই ঐ সেইকথা—সেই বুলি—নৌকা পশ্চিমতীরে লাগিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঘোড়া সহিত পার হইয়াছেন। ঘোড়ায় উঠিয়াই দারোগা মাহাম্মদ বক্সকে বলিলেন—"কি কর তোমরা কর কি ? একজনকেও ধরিতে পারিলে না ?"

লাঠিয়ালেরা ঐরূপ কাকুতি-মিনতি করিতে করিতে ক্রমে পিছে হটিতেছে। ইহারাও অগ্রসর হইতেছেন।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঘোড়া উঠাইয়া যাইতেই মাহাম্মদ বক্স দারোগা বলিল—"হুজুর ! লাঠিয়াল গ্রেফতার করিতে আপনি যাইবেন না। আমরা উপস্থিত থাকিতে আগে হুজুরের যাওয়া ভাল দেখায় না। তবে যে বেটা দৌড় দিবে, তাহার পাছে পাছে ঘোড়া উঠাইবেন।"

মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহাবিরক্ত হইয়া দারোগাকে গালাগালি দিয়া বলিলেন, এত বরকন্দাজ, এত চৌকিদার, কেনীর এত লোকজন থাকিতে উহাদের একগাছা সড়কি, কি একখানা লাঠি ধরিতে পারিলে না ? লাঠিয়াল গ্রেফতার করা তোমার কাজ নহে।

লাঠিয়ালদল হইতে একজন হাতযোড় করিয়া গলায় কাপড় বান্ধিয়া বলিতে লাগিল—"ধর্ম্মাবতার ! আজ ফিরিয়া যাউন। দারোগা সাহেবকেও ফিরিয়া যাইতে আদেশ করুন। দোহাই ধর্ম্মাবতার ! ফিরিয়া যাউন, একজনকেও ধরিতে পারিবেন না। আর আগে বাড়িবেন না। কেনীর কপালের ভারি জোর ! হুজুরের সাহায্যে আজ বাঁচিয়াছে ! হুজুর না থাকিলে এতক্ষণ তাহার মাথা সুন্দরপুর নিশ্চয়ই যাইত। ধর্ম্মাবতার ! যোড়হস্তে বলিতেছি আজ ফিরিয়া যাউন।

আমরা বড়ই কষ্ট পাইতেছি। দারোগাসহ আজিকার মত ফিরিয়া যাউন আমরাও ফিরিয়া যাইতেছি।

সাহেব শুনিলেন না। বেশীর ভাগ, ড্যাম, শুয়ার, ডাকু ইত্যাদি বলিয়া গালাগালি দিলেন এবং মাহাম্মদ বক্সকেও যাহা বলিবার তাহা বলিলেন। জমাদার বরকন্দাজ কেহই বাকি রহিল না।

মাহাম্মদ বক্স নিরুপায় হইয়া ত্রস্তপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জমাদার, বরকন্দাজ, চৌকিদারগণও 'ধর ধর' রব করিতে করিতে দারোগা সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল—সাহেবও ত্রস্তপদে ঘোড়া চালাইলেন।

প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়াল পুনরায় বলিতে লাগিল, "ধর্ম্মাবতার! আপনি রাজা আমরা প্রজা, আমাদিগকে নষ্ট কবিবেন না। আজ ছাডিয়া দিন। যোড-হাতে গলায় কাপড লইয়া বলিতেছি, আজ ফিরিয়া যাউন। আর আমাদিগেব সঙ্গে সঙ্গে আসিবেন না। কিছুতেই আমাদিগকে ধরিতে পারিবেন না। আপনি সমস্ত দিন এ-প্রকারে সঙ্গে সঙ্গে আসিলেও ধরিতে পারিবেন না।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। আর একটু ত্রস্তে যাইয়া একেবারে লাঠিয়ালদিগকে ধরিবার উপক্রম করিলেন।

লাঠিয়ালগণ মধ্য হইতে উচ্চৈস্বরে ডাক ভাঙ্গিয়া তখনি আনি বান্ধিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল। "ভাই সকল! আর দেখ কি? বাঁচিবার আশা তো নাই। হাতে অস্ত্র থাকিতে রাখালের হাতে ধরা পড়িব, বড়ই দুঃখের কথা! সাহেব কিছুতেই যখন শুনিতেছেন না, আমাদেব কথা মানিতেছেন না। এত মিনতি, এত কাকুতি করিয়া বলিলাম, কিছুতেই যখন তাহার মত ফিরিল না, তখন স্ত্রীলোকের ন্যায় কান্দাকাটি করিয়া মরি কেন? ধর দারোগা! ধর জমাদার বরকন্দাজ—নে মাথা, নে ঐ বেটার মাথা—একে একে দেখাইয়া দেই। আয় আমাদিগকে ধরিয়া নিয়ে যা। দেখি তোদের বুকের পাটা—দেখি তোদের বুকের সাহস। আয় বেটা! কেনীর গোলাম। হারামখোর আয়! ধর দেখি কাকে ধরিবি। আয়!"

মাজিষ্ট্রেট সাহেব ক্রোধে অধীর হইয়া মাহাম্মদ বক্সকে পুনঃ পুন: বলিতে লাগিলেন। "পাকড়ো পাকড়ো, পাকড়ো ডাকু লোককে পাকড়ো।"

মাহাম্মদ বক্স সাহেবের আজ্ঞায় একটু অগ্রসর হইলেই মাজিষ্ট্রেট সাহেব

দেখিলেন যে, একজন লাঠিয়াল ঢাল মাথায় করিয়া 'ঝি ঝি' শব্দ করিতে করিতে আসিয়া মাহাম্মদ বক্সের বক্ষে সড়কি মারিয়া পিঠ পার করিয়া দিল। পলক ফেলিতে ফেলিতে আট গাছি সড়কি মাহাম্মদ বক্সের বুক, পেট পার হইয়া রক্ত মুখে বাহির হইল। অন্য দিকে আর একটি বরকন্দাজের মাথা লাঠির আঘাতে ফাটিয়া গেল। সাহেব সকলের পাছে. কিন্তু চক্ষু সকলের অগ্রে-চারিদিকে ঘুরিতেছে। নজর পড়িল—তিন, চারগাছা সড়কি তাঁহার মস্তক, বক্ষ লক্ষ্য করিয়া উঠিতেছে। সাহেব, মাহাম্মদ বক্সের অবস্থা দেখিয়াই একপ্রকার চৈতন্য হারাইয়াছেন। কোনদিকে কোন পথে যাইবেন, পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। লাঠিয়ালের হস্তে প্রাণ যাইবে সেই ভাবনাই অধিক। সম্মুখে আর একজন বরকন্দাজ পড়িয়া গেল। সাহেব অশ্বকে সজোরে কশাঘাত করিয়া চম্পট দিলেন না—প্রস্থানও করিলেন না রণে ভঙ্গ দিয়া পালাইলেন না। আত্মরক্ষা করিলেন। চক্ষের পলকে বাতাসের আগে আগে উড়িয়া বহুদূর আসিয়া পড়িলেন। জমাদার, বরকন্দাজ এবং চৌকিদারেরা লাঠিয়ালদিগের হাতে পায়ে ধরিয়া তাহারাও আত্মরক্ষা করিল। কিন্তু মাহাম্মদ বক্সের মৃতদেহ লাঠিয়ালেরা ফেলিয়া গেল না। প্রায় পঞ্চাশ গাছা সড়কির আগায় গাঁথিয়া ডাক ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে 'মার মার' শব্দে চলিয়া গেল। যেখান হইতে আসিয়াছিল সেইখানে চলিয়া গেল। দারোগার লাস লইয়া চলিয়া গেল।

মাহাম্মদ বক্সের মৃতদেহ প্যারীসুন্দরীর ভারলের কাছারিতে লইয়া গেলে, কার্য্যকারক মহাশয় ভীত হইলেন না। সাহসের উপর নির্ভর করিয়া কর্ত্তব্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু মুখে বলিলেন—' সর্ব্বনাশ দারোগাখুন ! বড় ভয়ানক কথা।"

লাঠিয়ালেরা বলিল, "দারোগাখুন সহজ কথা ! যে বিপাকে পড়িয়াছিলাম যে ফাঁদে আমাদিগকে আজ আপনি ফেলিয়াছেন, আর একটু থাকিলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকেই এই অবস্থায় দেখিতে পাইতেন। কি করি প্রাণের দায় মহাদায় ! যাহা হইবার হইয়াছে, এখন যাহাতে আমরা বাঁচি তাহার উপায় করুন। মাজিষ্ট্রেটকেও তাড়াইয়াছি। দারোগার দশা সাহেব স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন। বাঁচিবার আশা যে আর নাই তাহা বুঝিয়াই আপাততঃ রক্ষার এক উপায় করিয়া আসিয়াছি মাত্র। আমরা বিদায় হইলাম। আর আমাদের দেখা পাইবেন না। এখন আপনাদের রক্ষার পথ আপনারা দেখুন। আমরা বিদায়। যদি প্রাণে বাঁচি হুজুরে হাজির

হইব। নতুবা এই শেষ দেখা—শেষ বিদায়। আমরা চলিলাম। এই কথা বলিয়াই লাঠিয়ালেরা ঢাল, সড়কি ফেলিয়া তখনি চলিয়া গেল। কাছারি আঙ্গিনায় দারোগার মৃতদেহ পড়িয়া রহিল।

কার্য্যকারক মহাশয় কি করিবেন, কোথাকার খুন কোথায় আসিয়া পড়িল। কাহার ঘাড়ে চাপিল। যাহারা খুন করিল তাহারা তো চম্পট। তাহাদের বাড়ি কোথা? কি নাম কাহারও জানা নাই। সকলেই অচেনা।

মাহাম্মদ বক্সের শরীর সহস্রখণ্ডে খণ্ডিত হইয়া চাপাইগাছি বিলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। প্রকাণ্ড বিল—কোথায় কোন মাছ বা কচ্ছপের উদরে গিয়া পড়িল, কে বলিতে পারে? কাল মাহাম্মদ বক্স পাবনা—আজ মৎস্য-কচ্ছপের উদরে।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব কুঠিতে আসিয়াই শুইয়া পড়িয়াছেন। নিদ্রার-কোলে অচেতন হন নাই। ভাবটা অচেতনের। মনে মনে নানাচিন্তা, মাহাম্মদ বক্সের পরিণাম দশা—পরাধীনতার প্রত্যক্ষ প্রতিফল। চাকুরীর দায়ে প্রাণ বিয়োগ—কি উপায়ে অপরাধীগণকে ধৃত করিয়া শাস্তি দিবেন, বোধহয় এই সকল চিন্তাই চক্ষু বুজিয়া করিতে ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে জমাদার, বরকন্দাজ প্রভৃতি সঙ্গিয় লোকজন আসিয়া জুটিল—সাহেব সংবাদ পাইয়া শয্যা হইতে উঠিলেন। এবং জমাদারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। "মাহাম্মদ বক্সের লাস কি হইল?"

জমাদার উত্তর করিল—ধর্ম্মাবতার! লাস শূন্যে শূন্যে যে কোথায় লইয়া গেল, তাহার কোন সন্ধানই করিতে পারি নাই। নিজের প্রাণ লইয়াই পালাইয়াছি। লাসের শেষ অবস্থা কিছুই জানিতে পারি নাই।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব একটু চিন্তা করিয়া কুঠির হেফাজতে জমাদার বরকন্দাজ প্রভৃতিকে মতাইন রাখিয়া, তখনি জিলায় যাইতে প্রস্তুত হইলেন। না—তখনই চলিয়া গেলেন।

ত্রয়োদশ তরঙ্গ

হাত বাক্স

যাহার জন্য চিন্তা—দিনরাত চিন্তা, কত কৌশল, কত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, অধিকন্তু আরও শ্রম চেষ্টা করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাহা আর কিছুই করিতে হইল না। নিষ্কণ্টকে, সমুদায় দলিল-দস্তাবেজ সা গোলাম্মের হস্তগত হইল।

খুসির সীমা নাই। অছিয়তনামা যে বাক্সে ছিল, সে বাক্সটিও চুরি করিয়াছেন। কিন্তু সুযোগ ও সময়াভাবে বাক্সটি খুলিয়া দেখিতে পারেন নাই। এখন কি প্রকারে যথার্থ অছিয়তনামার লিখিত সর্ত্ত ও নির্দ্দিষ্ট অংশ বদলাইয়া জাল অছিয়তনামা প্রস্তুত কবিবেন, এই চিন্তাই সা গোলামের মাথায় ঘুরিতে লাগিল। রাত্রে দেবীপ্রসাদের বাটিতে যাইবেন। অছিয়তনামার বাক্সটিও সঙ্গে করিয়া লইয়া দেবীপ্রসাদেব সম্মুখে খুলিয়া অছিয়তনামা হইতে কোন কোন কথা পরিবর্ত্তন করিয়া কি কি কথা বসাইতে হইবে তাহার পরামর্শ যুক্তি অদ্যই করিবেন। অছিয়তনামা দুরস্ত না হওয়া পর্যন্ত যেভাবে আছেন সেই ভাবেই থাকিবেন। কার্য্য সিদ্ধি হইলে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিবেন, ইহাও মনে মনে স্থির কবিয়াছেন।

ক্রমে সন্ধ্যা-ক্রমেই ঘোর অন্ধকার—রজনী সমাগতা। কাহাকে হাসাইতে কাহাকে কান্দাইতে রজনী সমাগতা। সংসারী মাত্রেই সংসারের কার্য্য হইতে অবসব লইয়া বিশ্রাম, আরাম, ঈশ্বরে মন-নিবেশ করিলেন। মীবসাহেবও সেতার, তবলা এবং প্রিয় মোসাহেব বসীরুদ্দিনকে লইযা গান বাদ্য, হাসি-তামাসায় মন দিলেন। সা গোলাম আহার কবিয়া সকালে সকালেই নিদ্রারভান করিয়া শয়ন গৃহে গমন কবিলেন। বাড়িব অন্যলোক ক্রমে আহারাদি করিয়া আপন আপন নির্দ্দিষ্ট বিশ্রামস্থানে চলিযা গেলে—সা গোলাম উঠিলেন, এবং তাহার স্ত্রীকে বলিলেন যে, "আমি বিশেষ আবশ্যক জন্য বাহিবে যাইতেছি। আসিতে বিলম্ব হইবে।"

সা গোলামের স্ত্রী পূর্ব্ব হইতেই স্বামীব চরিত্র বিশেষরূপে জানিতেন। কোন উত্তর করিলেন না।

সা গোলাম বিশেষ গোপনে বাড়ি হইতে বাহির হইলেন। চুরি করা হাত বাক্সটিও সঙ্গে লইলেন। বাটির বাহির হইতেই হাঁচি, টিকটিকি সকলি পড়িয়া গেল। কিন্তু তিনি সেদিকে দৃকপাতও করিলেন না। মাথায় চাদর জড়াইয়া, বাক্স বগলে দাবিয়া দেবীপ্রসাদের বাটিতে উপস্থিত হইলেন।

দেবীপ্রসাদেব চবিত্র ভাল ছিল না। সে সময় কেন অতি বৃদ্ধাবস্থাতেও নিশাচরের ন্যায় বাহির হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সময়ে অনেক স্থানে 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়" সহ্য করিতে হইয়াছিল, তত্রাচ স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় নাই। দেবী—দিব্বি সাজগোজ করিয়া বাহির হইতেছেন, এমন সময় সা গোলামকে দেখিয়া মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইলেন। এবং মায়া জানাইয়া ভালবাসা দেখাইয়া বলিলেন—

"আপনি কি পাগল হইয়াছেন? একা একা এতরাত্রে বাটির বাহির হইতে আপনার কিছুমাত্র ভয় নাই? আপনার পায় পায় শত্রু, সর্ব্বদা সাবধান সতর্কে থাকা চাই। রাত-দুপুর সময় একা, কি আশ্চর্য্য!"

সা গোলাম বলিলেন—"কি করি যে বোঝা মাথায় করিয়াছি, ভালয় ভালয় নামাইতে পারিলে হয়। কিছুতেই মনের শান্তি নাই!"

দেবীপ্রসাদ বলিলেন—"নূতন আর কি কথা আছে যে, এতরাত্রে?"

"না থাকিলে কি আসিয়াছি? এই দেখুন সেই অছিয়তনামার বাক্স। যদি খুলিতে পারি খুলিব না হয় ভাঙ্গিব। অছিয়তনামা দেখিয়া কোথায় কি পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, তাহা আজ রাত্রেই আপনাকে বলিতে হইবে।"

"এ বাক্স কাহার? এত মীরসাহেবের বাক্স নয়।"

"বলেন কি? সেই বাক্স। আমি বহু পরিশ্রমে এই বাক্স হাতে পাইয়াছি।"

"তা যাইহউক, না খুলিলে আমি কিছুই বলিতে পারি না। এই দেখুন না ইহার নীচে রুইধরা। মীরসাহেব এই বাক্সে অছিয়তনামা রাখিয়াছেন, আমার তো কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।

"এখনি দেখিবেন! এখনি সন্দেহ দূর হইবে। এই দেখুন আমি আপনার সম্মুখেই খুলিতেছি।"

এক গোছা চাবি বাহির করিয়া সা গোলাম কত চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই খুলিতে পারিলেন না। এসকল চাবি অনেকবার লাগাইয়া দেখিয়াছেন। তত্রাচ দেবীপ্রসাদের সম্মুখে এক এক করিয়া লাগাইয়া দেখিলেন। একটিও লাগিল না। বাক্সও খুলিল না। শেষে বাক্স ভাঙ্গাই স্থির হইল। দেবীপ্রসাদ একখানি "দা" আনিয়া দিলেন। সা গোলাম অতি কষ্টে বাক্সটি ভাঙ্গিয়া যাহা দেখিলে, এবং যাহা পাইলেন, তাহাতে আর মুখে কথা সরিল না। মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

দেবীপ্রসাদ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"সাহেব! দেখিলেন! বাক্সে কি আছে! "কাগজপত্রের নামও নাই। একদলা রুইর মাটি। বোধহয় বহুকালের পুরাতন কোন কাগজপত্র রুইতে খাইয়া একেবারে মাটি করিয়াছে। বাক্সের তলা উল্টাইয়া মাটির দলা ফেলিয়া দিলেন। তলাতেও স্থানে স্থানে ছিদ্র, সা গোলামের

মুখেরভাব এবং আকৃতিতে বোধ হইতে লাগিল যে, তিনি এ জগতে নাই দেহটা যেন অকারণে পড়িয়া আছে। এক প্রকার সংজ্ঞাহীন—কত কষ্টে, কত পরিশ্রমে, যে চুরি করিয়াছিলেন, তাহা তিনিই জানেন। এমন সাংঘাতিক বেদনা তাহার জীবনে অনুভব করেন নাই।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন—"আর চিন্তা করিয়া কি করিবেন এবারেও ঠকিয়াছেন। সন্ধানী যথার্থ সন্ধান দিতে পারেন নাই।"

"কিসে যে কি হইল, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ইহার কারণ কি? যে এই বাক্সের সন্ধান দিয়াছিল, সে মিছে বলিবার লোক নয়।"

"সন্ধানীর দোষ না হইতে পারে, আপ৷-হ আন্ধারে ভুল করিয়াছেন! সোনা ধরিতে ছাই ধরিয়াছেন।"

সা গোলাম অপ্রস্তুতের একশেষ হইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, আপনার কথাই ঠিক হইল। বোধ হয় আমিই ভুল করিয়াছি। যাহাহউক রাত্রও অধিক হইয়াছে, আজকার মত বিদায় হই।

এই বলিয়া সা গোলাম যতনের ধন বাক্সটি বগলে করিয়া উঠিলেন। দেবীপ্রসাদও রক্ষা পাইলেন। তাহার প্রাণে ভরসার জল গড়াইতে লাগিল। সা গোলামের প্রস্থান তাহার গমন—

সা গোলাম ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছেন। সদর রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। নিকটেই গৌরীনদী, গৌরীর স্রোত অবিরত বেগে কুমারখালির দিকে যাইতেছে। নদীতটে দাঁড়াইয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন। বাক্সটি গোপনে লইয়া আসিয়াছি—আবার এ ভাঙ্গা-বাক্স ফিরাইয়া লইয়া কি করিব। এই বলিয়া বাক্সটি গৌরীগর্ভে ফেলিয়া দিলেন এবং ভাবিতে ভাবিতে বাটি আসিয়া বিছানায় পড়িলেন। বালিসে মাথা দিলেন।

মীরসাহেবের আমোদ তখনও শেষ হয় নাই। বসীরুদ্দিন মাথায় পাগ বাঁধিয়া হাতে চামর ধরিয়া জারী আরম্ভ করিয়াছেন।

চতুর্দশ তরঙ্গ

মিসেস কেনীর বিলাত যাত্রা

টি. আই. কেনী. মাগুরা হইতে আসিয়া কুঠির অবস্থা সমুদায় শুনিলেন। দারোগার লাস পাওয়া যায় নাই, তাহাতে বড়ই দুঃখিত হইলেন। মাজিষ্ট্রেট

সাহেবের বুদ্ধিকে শত শত ধিক্কার দিয়া দুঃখের সহিত বলিলেন—দারোগার লাস ছাড়িয়া দেওয়া নিতান্তই অন্যায় হইয়াছে। মোকদ্দমাটি মাটি হইয়াছে। যাহা-হউক কিছুদিনের জন্য প্যারীসুন্দরী মাথা নোয়াইয়া থাকিবেন। কুঠি লুটের মোকদ্দমা এ পর্যন্ত শেষ হয় নাই। তাহার পর আবার এই ঘটনা। এ মোকদ্দমার সাক্ষী প্রমাণের তত আবশ্যক হইবে না। স্বয়ং মাজিষ্ট্রেট সাক্ষী। প্যারীসুন্দরীকে জব্দ করিতে আর বেশি চেষ্টা করিতে হইবে না। কোম্পানী বাহাদুরই এখন বাদী। দারগা খুন, কম কথা নয়। মোকদ্দমার খোঁজ খবর রাখা তদন্ত করা, আসামীগণকে ধরিয়া থানাদারের হাওয়ালা করাই এখন আমাদের কার্য্য নায়েব, দেওয়ান যাহাকে যাহা বলা আবশ্যক মনে করিলেন বলিয়া "প্রাইভেট রুমে" গুপ্ত কক্ষে যাইয়া বার দিলেন। মামলা-মোকদ্দমা বিষয়াদি এবং নীল রেশমের অধিক আবাদ সম্বন্ধে নানা প্রকার চিন্তা ও মনে মনে বাদানুবাদ করিয়া যাহা স্থির করিলেন মনেই রাখিলেন। এসকল চিন্তার পর একটি বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। মনে মনে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সাব্যস্ত হইল। মিসেস কেনীকে আপাততঃ বিলাত পাঠান কর্তব্য। মেমসাহেবকে স্থানান্তর করিলে প্রধান একটি চিন্তা হইতে অবসর হওয়া যাইবে। বিশেষ—অন্য আর একটি চিন্তারও সুবিধা হইবে।

কেনী মনে মনে "মনের কথা" সুস্থির করিয়া মেমসাহেবের নিকট বলিলেন। "প্যারীসুন্দরীর টাকা অনেক, জমিদারীও আমার অপেক্ষা অনেক বেশি, বুদ্ধিও বেশি, সাহসও বেশি। জমিদারের মেয়ে জমিদার, তাহার কথাই স্বতন্ত্র। সে যাহা যাহা বলিয়াছে, তাহা করিতে বিশেষ চেষ্টা করিবে। দুবার তিনবার ঠকিলে কি ফেল করিলে, পারিয়া না উঠিলে যে কখনই পারিবে না, একথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না।"

সেখানে অন্য লোক আর কেহই ছিল না। তত্রাচ কেনী, মিসেস কেনীর সহিত অতি মৃদু মৃদু স্বরে অনেক কথা বলিলেন। মাঝে মাঝে মেমসাহেবের চেহারায় আনন্দ আভা চমকিতে লাগিল মুখেও ফুটিল "হোম"—

"হোম" যে কি জিনিস, "হোম" কথাটি যে কত মিষ্টি তাহা বিলাতী অন্তর না হইলে আমাদের অনুভব করার সাধ্য নাই। আমরা বাঙ্গালী, আমাদের হোমকে আমরা কেবল পদতলেই দলিত করিতে শিখিয়াছি। কি প্রকারে পূজিতে

হয় তাহা জানি না। এই হোমই যে, স্বর্গসুখ ভোগ করা যায়, তাহাও স্বীকার করি না। এই ঝাড, জঙ্গল, জলে ডোবা, সেঁত সেঁতে, কুঁড়েঘর শোভিত হোমই যে, পবিত্র স্বর্গ হইতে গরিয়সী, তাহাই বা কয়জনে মনে করি। সামান্য কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, প্রভৃতিরও "হোম" মায়া আছে। হোমের প্রতি যত্ন আছে, আদরও আছে। বিলাতী হৃদয়ে থাকিবারই তো কথা। আমরা নিমকহারাম, আমরা কৃতঘ্ন, তাহাতেই এই দশা। আমরা বাঙ্গালী প্রায়ই মা বাপের মর্য্যাদা বুঝি না। সুপুত্র বলিয়াই হোমের কুচ্ছা, হোমের গ্লানি, হোমটা একটা "নেষ্টী প্লেস, বাঙ্গলা-দেশ পায়খানার সামিল" অধঃপাতে যাক—আমরা স্বাধীন। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সমাজ যথেচ্ছারূপ ব্যবহার করিতে পারি, আমরা স্বাধীন। আমাদের মন স্বাধীন। হোমের আবার নির্দ্দিষ্ট কি? জগৎময় হোম। সমুদয় জগৎ আমাদের হোম। কনষ্টান্টিনোপল কি আমাদের নহে? সেন্টপিটার্সবর্গ কি আমাদের হোম নহে? হোম কি আমাদের হোম নহে? যে দেশ, যে স্থান ভাল সেই আমাদের হোম।

এ তো লাক কথার এক কথা, একথার উত্তর নাই! আমি উদাসীন পথিক। মনের কথা বলিতেছি। —এ জগতে আমার কেহই নাই, সেকথা আগেই বলিয়াছি। ধরিবার লক্ষ্য নাই, পা রাখিবার স্থান নাই। ইহার পরেও সময় সময় অনেকের নিকট পাগল সাব্যস্ত হইতে হয়। এ অবস্থাতেও পাঠক! হোমের জন্য পথিকের প্রাণ কাঁদে।

অনেক বাজে কথা বলা হইল। মিসেস কেনী হোমের নামেই গলিয়া পড়িলেন। তবে এখানেও অনেক সুখ, সেখানেও অনেক সুখ। বেশীর ভাগ জন্মভূমি।

হোমের আলাপেই মিসেস কেনী গলিয়া পড়িলেন। প্রাণ খুলিয়া স্বামী-মুখ চুম্বন করিলেন। বিশেষ আদরের প্রতিদানও পাইলেন। বিলাত যাওয়া স্থির হইল। মিসেস কেনীর বিলাত যাত্রার কথা পাকা হইয়া দাঁড়াইল।

প্রভাতে সকলেই শুনিল মেমসাহেব বিলাত যাইতেছেন। বজরার দাঁড়ি, মাঝি, সাজ-সরঞ্জামসকল সংগ্রহ হইল। পাঁড়ে, দোবে, চোবে, সিং, চার জওয়ান নৌকা রক্ষক হইয়া চলিল। মিসেস কেনী বেলা বার টার সময় কলিকাতা যাত্রা করিলেন। কলিকাতা যাইয়া বজরা বিদায় দিবেন জাহাজে চাপিবেন।

মেমসাহেব বিলাত যাত্রা করিলেন টি. আই. কেনী তিন দিবস শয়নগৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন না। কোন কাজকর্ম্মও দেখিলেন না।

মামলা-মোকদ্দমার কথাও কিছু শুনিলেন না। সন্ধান নিলেই জানা যায় যে, সাহেব "শোয়ার কামরায়।" কার্য্যকারকগণ অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সাব্যস্ত করিলেন, মেমসাহেব বিলাত গিয়াছেন, তাহাতেই সাহেবের মন ভাল নাই।—কাজকামের দিকে তত মন নাই।

সাহেবের মন ভালই থাক আর যাহাই থাক, তিনদিন তিন-রাত্রের পর কেনী সাংসারিক কার্য্যে মন দিলেন। কুঠির লোকে দেখিল সাহেব নীচে নামিয়া ফুলবাগানদিক যাইয়া পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছেন। "পাইপ" চলিতেছে।

কেনী শুধু পায়চারি করিতেছেন না। মনের কথা মনেই তুলিতেছেন, মনেই আলোচনা, মনে মনেই মীমাংসা করিতেছেন।

প্যারীসুন্দরীর সহিত মোকদ্দমা চলিল। মোকদ্দমার ফলাফল দেখিয়া পরে অন্য কথা। পাংশার ভৈরববাবু, নলডাঙ্গার রাজা, নড়ালের রতন রায়, এই তিনটিই এখন দেখিতেছি। কিন্তু ইহাদের সহিত লাঠালাঠি, মারামারি নাই। আইন-আদালতের মার পেঁচে আমাকে জব্দ করিবেন, তারই যোগাড় হইয়াছে। চলুক—কিন্তু মারামারি, লাঠালাঠি না হইলে মনের ফূর্ত্তি হয় না। আমি প্রস্তুত, কিন্তু তাহারা কেহই ওপথে যাইতে চাহে না!

ভৈরববাবু ভারী চতুর! কিছুতেই দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ভেড়ে না। বাবুকে বশে আনার জন্য এত চেষ্টা করিলাম, কিছুতেই কিছু হইল না। নিকটে নয় কি করি। আচ্ছা এবারে একহাত বাবুর সহিত খেলাইতে হইবে।

কেনী পায়চারী করিতেছেন। একবার দক্ষিণমুখী হইতেছেন, আবার ফিরিয়া উত্তরদিকে যাইতেছেন। একবার দেখিলেন, হরনাথ কতকগুলি কাগজ-পত্র হস্তে করিয়া বাগানের প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। সাহেবের নজর পড়িতেই হরনাথ প্রায় মাটি পর্য্যন্ত মাথা নোওয়াইয়া সেলাম বাজাইলেন। কেনী ইঙ্গিতে হরনাথকে ডাকিলেন। হরনাথ বাগানের মধ্যে আসিয়া পুনরায় দস্তরমত সেলাম বাজাইয়া খাড়া হইলেন। কথা চলিল—

মোকদ্দমার কথা—খুনী মোকদ্দমার কথা, লুটের মোকদ্দমার কথা, রাজার কথা, নড়াইলের কথা, নানা কথা চলিতে লাগিল। হরনাথ সাহেবের পিছে পিছে হাঁটিতে লাগিলেন। তাহার হাওয়া খাওয়া—ইহার প্রাণে মরা। পাঠক! আমরা নির্জ্জীব বাঙ্গালী, হাওয়া খাইতে ভালবাসি না। ঘরে বসিয়া কেবল

বাতাস খাইতে বড়ই ভালবাসি। হরনাথের গা দিয়া ঘাম ছুটিল। কেনী একটি কথায় রাগিয়া দাঁড়াইলেন। হরনাথ রক্ষা পাইল।

কেনী বলিতে লাগিলেন—"আমি ভয় করি না—আমি তোমার বাঙ্গালার সকল ভেদ বুঝিয়াছি। বাঙ্গালার—সাহস, বল, বিক্রম সকলি জানিয়াছি। বাবুকে একবার দেখা চাই। তোমরা আমাকে এইমাত্র খবর দিবে যে, অমুক তারিখে ভৈরববাবুর জমিদারীর সদর খাজনা অমুক পথে যশোহর রওয়ানা হইল। আর আমি কিছুই চাই না। এই খবরটি চাই মাত্র।"

হরনাথ যে আজ্ঞা, যে হুকুম হুজুরের, আবার সেলাম বাজাইয়া বাগানের বাহির হইলেন। সাহেবও শয়নকক্ষে ঢুকিলেন।

পঞ্চদশ তরঙ্গ

পাঠক বিরক্ত হইবেন না। একটু ধৈর্য্য ধরিয়া পথিকের মনের কথা শুনিয়া যাইবেন। এ কথার বান্ধুনী, মিল-গরমিলের দিকে আদৌ লক্ষ্যই নাই। মনের কথা, তায় আবার কানে শোনা। সে শোনাও সেই ছোটবেলায়। অসংলগ্ন, ভুল ভ্রান্তি হওয়াই সম্ভব। যেখানে সন্দেহ, যেখানে গরমিল বোধ করেন, দয়া করিয়া নিজগুণে সংশোধন ও সংলগ্ন করিয়া লইবেন। মনে হয়?—পোষাপাখির কথা মনে হয়? জকি গাড়ওয়ানের পোষাপাখি। বুলি ধরিয়াছে, বেশ কথা কয় —মনে হয়? কেনী যে কথাটা শেষে বলিয়াছিলেন মনে আছে? "উচিৎ মূল্য দিয়া আনিবে, সকের জিনিস জবরানে লইব না।"

পাখিটার কি হইল? জকি সম্মত হইয়া দিল—কি জবরানে আনা হইল, সে কথা এ পর্যন্ত মুখে আনি নাই। কিছু আভাষ প্রথম তরঙ্গে দিয়াছি। মার্জ্জনা করিবেন, সময় পাই নাই।

ডাকে খবর আসিল—মিসেস কেনী নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় পৌঁছিয়া জাহাজে উঠিয়াছেন। কেনী একদিকে নিশ্চিন্ত হইলেন। মেমসাহেব ফিরিয়া আসিতে আসিতে এদিকে প্যারীসুন্দরী টিকিবেন কি না? তাহাতেই সন্দেহ! ইহাতে কার বালা কে পরায়? আর কার শাড়ী কে পরে?

টি. আই. কেনী নিয়মিতরূপে বিষয়াদির কার্য করেন, এবং প্রায় সকল সময়েই কুঠিতে থাকেন। ডিহি দেখিতে আর—কুঠির বাহির হন না। আফিস-দালানে বসিয়া মামলা-মোকদ্দমার পরামর্শ করিতে করিতে, বিষয়াদির কার্য্যে

দেখিতে দেখিতে হঠাৎ উঠিয়া যান। কিছুক্ষণ শয়নঘরে থাকিয়া আবার আফিস-ঘরে আইসেন। দশ পোনের মিনিট অতীত না হইতেই পুনরায় শয়নকক্ষের দিয়ে ছুটিয়া যান। কেন জান? তিনিই জানেন। কেন তাহার মন এত উতাল তিনিই জানেন।

অদৃষ্ট ফিরিতে কতক্ষণ? প্রভুর অনুগ্রহ পাত্র হইলে, তাহার অদৃষ্ট ফিরিতে কতক্ষণ? জকি গাড়ী চালাইত, কুলি, মজুরের সঙ্গে হাডভাঙ্গা খাটুনি খাটিত। এখন তাহার কপাল ফিরিয়াছে। জকি এখন আর গাডওয়ান নাই, এক ময়নাই জকির সকল দুঃখ ঘুচাইয়াছে।

মিসেস কেনী কুঠিতে থাকিতে জকিকে কেহ কুঠির হাতায় দেখে নাই সেই গাড়ীর আড্ডায়।

এখন দিন দিন জকির উন্নতি—কপালের জোরে ক্রমে ক্রমে সাহেবের ঘরের কার্য্যে নিযুক্ত হইল। সকলেই শুনিল, জানিল এবং দেখিল, সাহেব জকিকে বড়ই ভালবাসেন। সাহেবের ইস্তক বন্ধনশালা, লাগাদ শয়নকক্ষ, সকল স্থানেই জকির সমান অধিকার! সোনাউল্লা যে এত বিশ্বাসী খানসামা ও পুরাতন চাকর, সময়ে সময়ে জকি তাহাকেও কটু কথা কহিতে ত্রুটি করে না। সাহেবের পেয়ারের চাকর বলিয়া সোনাউল্লা কিছুই বলে না। ক্রমে জকির নাম জাঁকিয়া গেল। যে জকিকে কুঠির আমীন, তাগাদগীর, প্যাদা পাইক যা ইচ্ছা তাই বলিয়াছে, এখন বড় বড় আমলা—বড় বড় লোক জকির নামে চমকিয়া উঠেন। যে দেখে, জকির সহিত যাহার দেখা হয়, সেই আদর করে, ভালবাসে।—কেমন আছ জিজ্ঞাসা করে—মায়া দেখায়, মমতা জানায়। সময় সময় কার্য্য উদ্ধারের জন্য জকিকে কেহ কেহ সেলামীও দেয়।

জকি, সাহেবের নিকট বলিতে পারুক বা না পারুক, সাহেবের অনুগ্রহ ও ভালবাসা সকলেরই বিশ্বাস যে, জকি যাহা বলে, সাহেব তাহাই শুনেন। অল্প-দিনের মধ্যে জকির কপাল একেবারে ফিরিয়া গেল। জকি যাহা বলিত প্রায়ই তাহা হইত। জকি বলিল, উহার চাকুরী যাইবে, রাত্র প্রভাত হইতে না হইতে সাহেবের অর্ডার পাশ হইল। নির্দ্দোষী বেচারীর চাকরী গেল। জকি বলিল আজ ঐ আমীন বেটার পিঠের চামড়া উঠাইব, সূর্য্য ডুবিতে না ডুবিতে আমীন মহাশয়ের পিঠে চাবুক পড়িল, চামড়াও উঠিল। দেখিয়া শুনিয়া জকির নামে

অনেকেই কাঁপিতে লাগিলেন। এখন যা করে জকি।—আমীন, তাগাদগীরি, খালাসী, পাইক, বরকন্দাজ, প্যাদা, বাবুরচি, খানসামা, খেদমতগার জকির জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িল। জকি অনেক সময় প্রধান প্রধান কার্য্যকারকদিগের প্রতিও হুকুম চালাইত। তাহারা মান-সম্ভ্রম বজায় রাখিতে বাধ্য হইয়া জকির হুকুম তামিল করিতেন।

দিন দিন জকিব অবস্থা পরিবর্তন হইতে লাগিল। বাটিতে বড় বড় ঘর উঠিল। বাঁশের খুঁটি উঠিয়া শাল কাঠের খুঁটি হইল। ভাল ভাল গরু ও ভেড়াতে গোশালা পরিপূর্ণ হইল। প্রতিবেশীরা শেষে গ্রামস্থ লোকেরা সকলেই জকিকে ভালবাসিতে লাগিল। সদাসর্ব্বদা জকিব বাটিতে লোকের গতিবিধি, আমোদ-আহ্লাদ, লেনা দেনা, কথাবার্তা, পবামর্শ চলিতে লাগিল। যে জকি এক কাঠা ধানের জন্য মহাজন বাড়িতে ছালা পাতিয়াছে। আজ মনিবের ভালবাসায়, গোলাভরা ধান, বাক্সভবা টাকা। কত লোককে ধান কর্জ্জ দেয়, টাকা কর্জ্জ দেয়। জকি এখন মহাজন। ইচ্ছাধীন চাকুরী। পরিবার মধ্যে এক স্ত্রী। যে কারণেই হউক জকি আবার বিবাহ কবিতে ইচ্ছা করিল।

জকির ময়না বেশ কথা কয়। মানুষের মত কথা কয়—কান পাতিয়া কথা শুনে। কথার উত্তর করে। এ বিবাহের কথা শুনিয়া কিছুই বলিল না।

জকিব বিবাহেব সম্পূর্ণ ব্যয় সাহেব দিলেন। সাহেবই ভালবাসিয়া আবার বিবাহ দিতেছেন, কুঠির লোকে এই বলিতে লাগিল। এক বলিতে দশজনে রাজি হইল। সতীনের ঘর বলিয়া কেহই কোন আপত্তি করিল না। সপ্তাহ মধ্যে বাজি বাজনায়, জকির বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের খাওয়া দাওয়া বিদায়, ইত্যাদি গোলযোগ মিটিয়া গেল। একদিন টি. আই. কেনী জকিকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, যে আজ হইতে তোমার অন্য কাজ আর কিছুই করিতে হইবে না। কেবল আমার হাতি, ঘোড়া, গরু ইত্যাদির তদারক করিবে. আর ইহাদের দানার বন্দোবস্ত তোমার হাতে থাকিবে। সুবিধা মত প্রতিদিন কোন সময়ে একবার কুঠিতে আসিয়া হিসাবমত দানা বাহির করিয়া মাহুত ও সইসের জেম্বা করিয়া দিয়া যাইবে। আর কোন কার্য্য করিতে হইবে না। সেই হইতে জকি দুই এক দিন পর কি সপ্তাহে একদিন কুঠিতে যাইয়া দানা বাহির করিয়া দিয়া আসিত। আর কোন সময় কুঠিতে যাইত কি না তাহা কেহ বলিতে পারে না। একদিন জকি

কুঠি হইতে আসিতেছে, বাটির নিকটেই জকির খুড়তুত ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হইল, তাহার নাম কি আমরা জানিতে পারি নাই, পূর্ব্বে এক বাড়িতেই ছিল, এক্ষণে সুন্দরপুর প্যারীসুন্দরীর এলাকায় বাড়ি করিয়াছে। জকি বহুদিনের পর ভাইকে পাইয়া খুব খুশি হইল। বাটিতে লইয়া গিয়া হাত, পা ধুইবার জল আনিয়া দিল। ভাল একটি মাদুর ও পরিস্কার একখানি কাঁথা ও একটি বালিশ আনিয়া বাহির-বাটিরঘরে বিছানা করিয়া দিল। জকির বাটিতে ডাবা-হুকার অভাব ছিল না। তামাক সাজিয়া একটা নিজে খাইতে খাইতে আসিল, আর একটি ভাইয়ের হাতে দিয়া দুই ভাইতে কথাবার্তা চলিল। অন্যান্য কৃষক হইতে জকির অবস্থার উন্নতির সহিত খাদ্যাখাদ্যেরও অনেক উন্নতি হইয়াছে। ঘরে খাদ্য-সামগ্রীর অভাব নাই সকল সময় খাজা, বাতাসা, চিড়ে, মুড়কি, গুড়, দুধ সকলি থাকিত। ঐ সকল জিনিসে ভাইকে জল খাওয়াইয়া সন্ধ্যার পরেই ভাতের যোগাড় করা হইল। দুই ভাই একত্রে আহার করিয়া অনেক কথাবার্তাব পব, আগন্তুক ভ্রাতা প্রত্যুষেই বাড়ি যাইবে বলিয়া বিদায় হইয়া রহিল।

দুইদিন পর জকি ছোট স্ত্রীকে বাটির কাজকর্মের কথা বলিয়া শেষে বলিল যে, আমি ভাইয়ের বাড়িতে সুন্দরপুর যাইতেছি। বাড়ির কাজকর্ম্ম দেখিয়া করিও। ভাইয়ের বাড়ি আজ যাইতেছি, দুই-এক দিন বিলম্ব হইতে পারে। এই কথা—ছাতা, লাঠি লইয়া রঙ্গিন গামছাখানা কাঁধে করিয়া বাটির বাহির হইল। দুইদিন চলিয়া যায়, জকির খোঁজ খবর নাই। কুঠির ঘোড়া গরুর দানা বন্ধ। কারণ জকির হাতেই দানার ঘরের চাবি। জকির বাটি পর্যন্ত খোঁজ করা হইয়াছে। জকির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কুঠির লোকে জকির বাহিরবাটি হইতেই জিজ্ঞাসা করে। কেহ বাটির মধ্যে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হয় না। সর্দ্দার, পাইক, মৃধা, বরকন্দাজ, প্রভৃতিরা অন্যান্য বাজে চাকরের বাটির উপর জোর জবরানে চলাফেরা করে—জকির বাটির উপর গিয়া বড় করিয়া কথা কহিতে কাহারও সাহস হয় না। জকি বাটিতে নাই এ-স্থির করিয়া শেষে সাহেব পর্যন্ত খবর হইল যে, জকি বাড়িতে নাই। কোথায় গিয়াছে কেহ বলিতে পারে না। দুইদিন যায় কোন খবর নাই। গুদাম বন্ধ, দানা বাহির করার কোন উপায় নাই। ঘোড়া, গরু মারা পড়িল।

টি, আই. কেনী. বলিলেন—জকি যেখানে গিয়াছে আমি জানি, গুদামের

চাবি বোধহয় তাহার বাড়িতেই রাখিয়া গিয়াছে। চাবি আনিয়া গুদাম খুলিয়া দেও। জকিকে জব্দ করিবার আশায় যাহারা সাহেব পর্যন্ত এতলা দিয়াছিল তাহারা বড়ই অপ্রস্তুত হইল।

পরদিন জকি বাটি আসিয়া বাটির কাজ কাম দেখিয়া কুঠিতে যাইয়া আপন কর্তব্য কার্য্য করিয়া আসিল। জকির বিরুদ্ধে সাহেবের নিকট কোন কথা কহিতে কেহই আর কোনদিন সাহসী হইল না।

জকি তিন চারদিন বাটিতে থাকিয়া কোথায় চলিয়া যায়। সুন্দরপুর হইতে কুটুম্ব-স্বজনও প্রায়ই আসা যাওয়া করে। গোপনে গোপনে অনেক পরামর্শও হয়। এই সকল দেখিয়া ময়না ভারি চটিয়াছে। লোকজন চলিয়া গেলে মিষ্টি মিষ্টি রাগের সহিত বলিতে লাগিল। "এত ঘন ঘন ভায়ের বাড়িতে যাওয়া ভাল হইতেছে না। মারা পড়িবে।" তাহাতে জকি যে উত্তর করিল, তাহা শুনিয়া ময়না মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

ষোড়শ তরঙ্গ

ভয়ানক ব্যাধি

রাত্রি জাগরণেই হউক কি অন্য কোন অনিয়মেই হউক মীরসাহেব পীড়িত হইলেন। পীড়ার কয়েকদিন পূর্ব্বে রাত্রে দুগ্ধপান করিতে দুগ্ধের স্বাদ-বিস্বাদ-বোধে সে দুগ্ধ পান না করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সেই হইতে শরীর অসুস্থ, ক্রমে জ্বর, ভয়ানক জ্বর—একেবারে চৈতন্যরহিত। মীরসাহেব বাহির দালানের কুঠিরীতে পড়িয়া ছটফট করিতেছেন। মাঙ্গন, বিনোদ বিশ্বাসী চাকর, তাহারা নিকটে আসেন না। একমাত্র গরিবুল্লা! যথাসাধ্য মনিবের সেবা-শুশ্রূষা করিতেছে। বাড়িপোরা লোকজন, কেহই তাহার দিকে ফিরিয়া তাকায় না। কি মনে করিয়া যে, মনিবের পীড়ার সময় সেবা-শুশ্রূষা করিতে নারাজ, তাহা তাহারাই জানে। একা গরিবুল্লা কি করিবে? বাটির অন্যান্য লোকজন স্বচ্ছন্দে "খানা-পিনা" করিয়া বেড়াইয়া বেড়ায়। বাড়িতে সে একটি পীড়িত লোক আছে—সে কথা কাহারও মনে আছে ভাবে এরূপও বোধ হয় না। কেবল বসীরুদ্দিন সদা সর্ব্বদা দেখাশুনা করে। সা গোলাম বসীরুদ্দিনকে দুই চক্ষে দেখিতে পারে না। বসীরুদ্দিনের দিকে নজর পড়িলেই মুখ ফিরাইয়া অন্যদিকে ঘুরিয়া বসেন। বাটির কর্ত্তা-ব্যক্তির কুদৃষ্টি হইলে কয়দিন কে টিকিতে পারে? বিশেষ বসীরুদ্দিন যাহার

বলে সা গোলামকে গ্রাহ্য করিতেন না, যে দাঁত কিচিরমিচির ভয় করিতেন না, তিনি শয্যাগত পীড়িত। উঠিবার শক্তি নাই, বসিবার শক্তি নাই, কথা বলিবার শক্তি নাই, তাঁর কথা কে শুনে। বিশেষ নূতন আমল প'লে, পুরাতনে প্রায়ই লোকের ঘৃণা হয়। কোন দোষ না থাকিলেও, একটু বেশি পরিমাণ আদর পাবার লোভে, সাচা, মিছা, হক, নাহক সাতকথা বলিয়া মন হইতে তফাত করিতে চেষ্টা করে। এ গুণটা প্রায়ই মোপ্তা-খোড়া জ্ঞাতি—কুটুম্ব এবং বাড়ির চাকর-চাকরাণী ও দাস-দাসীর হইয়া থাকে।

দিন দিন পীড়ার বৃদ্ধি, কষ্টের একশেষ। রোগির পথ্য, সেবা-শুশ্রূষার প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই। কে প্রস্তুত করে, কে চেষ্টা করে, কেইবা যত্ন করে, কেইবা কার কথা শুনে? সা গোলাম মাঝে মাঝে দেখিতে আসিতেন, কিন্তু রোগির আপাদমস্তক একধ্যানে চক্ষু পাতিয়া দেখিতেন। নাড়ি-জ্ঞান ছিল কিনা জানি না। সা গোলাম মনের ব্যাগ্রতায় কোন কোন দিন শ্বশুরের হাত ধরিয়া নাড়ির গতি দেখিতেন।

টি. আই. কেনীও শুনতে পাইলেন যে, মীরসাহেব অত্যন্ত পীড়িত। হাতিতে চাপিয়া, মীরসাহেবকে তখনই দেখিতে আসিলেন। সেদিন মীর-সাহেব একটু ভাল। কেনী আসিয়া দেখিলেন, সা গোলাম একজন কবিরাজের ঔষধ মীরসাহেবকে খাওয়াইতে জিদ করিতেছে—মীরসাহেব খাইবেন না, কবি-রাজের ঔষধ খাইবেন না বলিয়া ঔষধ খাইতে অস্বীকার হইতেছেন। সা গোলাম কত অনুনয় বিনয় করিতেছেন। মীরসাহেবের পীড়া শীঘ্র শীঘ্র আরাম হওয়ার জন্য সা গোলাম বড়ই ব্যস্ত। টি. আই. কেনী চিকিৎসা শাস্ত্র ভালই জানিতেন। নানা প্রকারের ঔষধ তাহার কুঠিতে থাকিত। কোন পীড়িত ব্যক্তি ঔষধ চাহিলে বিনামূল্যে দান করিতেন। কেনী মীরসাহেবের হাব ভাব, চক্ষু দেখিয়া কি পীড়া, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। পীড়ার প্রথম অবস্থা এবং এ পর্য্যন্ত কি কি ঘটিয়াছে কি প্রকার চিকিৎসা হইতেছে, সমুদয় বৃত্তান্ত মনোযোগের সহিত শুনিলেন। কেনীর মুখের ভাব দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণ সকলেই বুঝিল যে, মীরসাহেবের পীড়ার ভালরূপ চিকিৎসা হইতেছে না। ইহা ভিন্ন মানুষে আর কি বুঝিবে কেনী অনেকক্ষণ পর্যন্ত সা গোলামের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কোন কথা বলিলেন না। কিছুক্ষণ পরে মীরসাহেবকে বলিলেন—আপনি কোন চিন্তা

করিবেন না। আমি আপনার ঔষধ করিব। কুঠিতে গিয়াই আপনার ঔষধ পাঠাইব। আমি জ্বরের কথা শুনিয়া কয়েকটি ঔষধ সঙ্গে আনিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি আপনার এ-জ্বর ভয়ানক জ্বর, বিষাক্ত জ্বর, আর ভয় নাই। আরাম পাইবেন। আজ যে ঔষধ পাঠাইব, তাহা খাইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমার ঔষধে আরাম পাইবেন কি না। আমি আপনাকে বার বার নিষেধ করিতেছি কাহারও ঔষধ খাইবেন না। আমি এখনি ঔষধ পাঠাইয়া দিব। যে যে নিয়মে পান করিতে হইবে তাহাও পত্রে লিখিয়া পাঠাইব। টি. আই. কেনী এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সা গোলামের মনের আশা পূর্ণ হইল না। যে নূতন চাল চালিয়াছিলেন, তাহাতে কিস্তিমাত হইল না। কেনীর ঔষধ ভিন্ন মীরসাহেব আর কাহারও ঔষধ খাইবেন না। সা গোলাম স্বয়ং কমল কবিরাজের বাড়িতে গিয়া যে যে ঔষধের যোগাড় করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা কবিরাজের পুঁটুলিতেই রহিয়া গেল। প্রাণ বাঁচিল, টাকাও থাকিল। উপস্থিত ঘটনায় সা গোলাম মনে মনে হাসিলেন কি কান্দিলেন, তাহা তাহারই মনে জানে। প্রকাশ্যে সকলের নিকটেই বলিলেন—ঔষধ না খাইলে আর আমি কি করিব! কমল কবিরাজের মত কবিরাজ বোধহয় এদেশে আর নাই। তারই ঔষধে যখন তাঁর ঘৃণা, তখন আর ভরসা নাই। সাহেবের ঔষধ কত ভাল হয় দেখতে পারবেন। সা গোলাম কমল কবিরাজকে অনেক কথা কহিয়া বিদায় করিলেন। একটি টাকা দর্শনী দিলে কবিরাজ মহাশয় আর দুটি কথা বলিতেন না। সা গোলাম শ্বশুরের খাতিরে একমুঠো টাকা কবিবাজের হাতে দিয়া, কবিরাজ বিদায় করিলেন। ব্যবস্থা লওয়া হইল না, ঔষধও গ্রহণ করা হইল না। একমুঠো টাকা দিয়া কবিরাজ বিদায় করিলেন।

টি. আই. কেনীর প্রদত্ত ঔষধ বসীরুদ্দিন মহাযত্নে মীরসাহেবকে সেবন করাইলেন। এতদিনের পর ঔষধ সেবন-মাত্রই চক্ষে নিদ্রা আসিল, ঘোর-নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন।

সা গোলাম এতদিন নিশ্চিন্ত থাকেন নাই। মীরসাহেবের বাক্স, পেটারা ও সিন্দুক মাকন-বিনোদের সাহায্যে তন্ন তন্ন করিয়াছেন, কোন স্থানেই অছিয়ত-নামা প্রাপ্ত হন নাই। খুঁজিতে আর বাকি নাই। শেষে মীরসাহেবের পীড়ার কিঞ্চিৎ উপসম হইলে, সা গোলামের মনে হইল যে, হা! এত সুযোগ পাইয়াও

তাঁহার হাতবাক্সটি খুঁজিলাম না কেন? যদিও বাক্সটি মীরসাহেবের নিকটেই থাকে, চেষ্টা করিলে অবশ্যই দেখিতে পারিতাম। তাহার মধ্যে কিঁ আছে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পারিতাম। এইক্ষণে সে উপায় আর নাই। ক্রমেই সুস্থ হইতেছেন। হাতবাক্সের কাছে যায় কে? একটি কথা—সামান্য হাতবাক্স মধ্যে যে ঐ মহামূল্য দলিল রাখিয়াছেন, তাহাই বা কি করিয়া বিশ্বাস করি।

অছিয়তনামার চিন্তাই—সা গোলামের প্রধান চিন্তা। মীরসাহেব দিন দিন সুস্থ হইতে লাগিলেন। চাকরেরাও কিছু কিছু করিয়া নিকটে আসিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে সপ্তাহ-মধ্যে একেবারে নিরোগ হইয়া কার্য্যক্ষম হইলেন। কেনী প্রতিদিন মীরসাহেবের খবর লইতেন। ক্রমেই ভালকথা, ভাল-খবর, একেবারে নিরোগ হইয়াছেন শুনিয়া একদিন মীরসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। মীরসাহেবকে দেখিয়া বলিলেন, আপনি প্রতিদিন খুব ঠাণ্ডা জলে স্নান করিবেন, ঠাণ্ডা জিনিস খাইবেন।

কেনী পীড়া সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিয়া শেষে সা গোলামের কথা তুলিলেন।

মীরসাহেব বলিলেন, "ডুলা মিঁয়া" আজ বাটিতে নাই, চাপড়ার বিলে পাখি শিকার করিতে গিয়াছেন।

কেনী বলিলেন আপনার জামাতা বড চতুর। বুদ্ধিও খুব পেঁচাও। যে মানুষের সর্ব্বদাই ভ্রূ কুঞ্চিত থাকে তাহার মন সরল নহে।

মীরসাহেব বলিলেন, বুদ্ধি যে খুব পেঁচাও, তাহা জানিয়াই বিষয়াদির কাজকর্ম্ম সমুদায় তাহার হাতে দিয়াছি। বিষয়াদির চিন্তায় আর আমাকে এখন চিন্তিত হইতে হয় না। কার্য্য তিনিই করিয়া থাকেন। আমাকে আর কিছুই দেখিতে হয় না। খুব চতুর ছেলে। বেশ সুখে আছে।

কেনী একটু হাসিয়া বলিলেন। জামাই পরের ছেলে।

মীরসাহেব বলিলেন, না না, সে পরের ছেলের মত পর নহে। আমাকে বিশেষ ভক্তি করে, পিতার ন্যায় পূজা করে, মান্য করে। আমার পীড়ার সময় নিজে কবিরাজের বাড়ি পর্য্যন্ত গিয়া কবিরাজ আনিয়াছিল। ঔষধ খাওয়াইতেও কত যত্ন করিয়াছিল। কত অনুনয়-বিনয় করিয়াছিল। কবিরাজের ঔষধে আমার ভক্তি নাই বলিয়া খাই নাই। তত্রাচ সা গোলাম কবিরাজকে টাকা দিতে কম করে নাই।

কেনী বলিলেন—ভালহয় সে ভালকথা। কিন্তু হঠাৎ হাতছাড়া করিবেন না। ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কার্য্য করিবেন।

মীরসাহেব কেনীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল তাঁহার মুখে কোন কথাই আসিল না। একটু পরে বলিলেন ভালকথা দারোগা খুনের কি হইল?

"সে মোকদ্দমায় মহা-হুলস্থুল বাধিয়াছে। শেষে সেকথা বলিব। বলুনতো পাংশার ভৈরববাবু সম্বন্ধে কি করি। তিনি আমার সহিত সময় সময় দেখা করেন বটে, কিন্তু আসলকাজে ভিড়িতেছেন না। লোকটি ভারি চতুর বটে। আমি বাঙ্গালাদেশের অনেক লোককে দেখিলাম। অনেকের সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদ করিলাম। স্ত্রীলোকের মধ্যে প্যারীসুন্দরী—নাম করিতেও ভয় হয়। আর পুরুষের মধ্যে ভৈরববাবু। ভৈরববাবুর আরও গুণ এই যে, তিনি নিতান্তই কৌশলী, দাঙ্গা-ফেসাদে অগ্রসর হইতে চাহেন না। বিষয়াদি লিখিয়া দিতেও অস্বীকার হন না। অথচ এরূপভাবে লিখিত-পড়িত করিতে চাহেন যে, আমি তাঁহার একটা তহশীলদার মাত্র থাকি। বিনাব্যয়ে খাজনার টাকা মাস মাস পান। ইহাই তাঁহার আন্তরিক-ভাব। নিজের লাভ ব্যতীত কিছুতেই ক্ষতি স্বীকার করিতে চাহেন না।

"ভৈরববাবু বডঘরানা বনিয়াদীবাবু। আমাদের সহিত এত নিকট-সম্বন্ধ যে, হিন্দু-মুসলমান বলিয়া কোনপ্রকার হিংসার ভাব নাই। পুরুষানুক্রমে ভ্রাতৃভাব চলিয়া আসিতেছে। জাতিব-বিদ্যায় মহাপণ্ডিত, ফারসী ও আরবীতে মহাবিদ্বান, সঙ্গিত-বিদ্যায় এদেশে অমন গুণীলোক আর দ্বিতীয় কেহ নাই। যাহাই করুন তাঁহাকে সম্মত করিয়া করিবেন। এইটি আমার বিশেষ অনুরোধ।

তাঁহার অসম্মতিতে আমি কিছুই করিব না। কিন্তু তিনি কেমন ভৈরব-বাবু আমি একবার পরীক্ষা করিব। তিনি বাঙ্গালাদেশের বুদ্ধিমান, চতুর। আমিও বিলাতী 'শয়তান' দেখি, তাঁহার বাঙ্গালী-বুদ্ধির দৌড় কত? আমি তাঁহার সহিত বিবাদ করিব না, কেবল বুদ্ধির দৌড় দেখিব। মস্তিস্কের ক্ষমতা বুঝিব।

মীরসাহেব বলিলেন—আচ্ছা তা দেখবেন—প্যারীসুন্দরীর কি হইল?

কেনী বলিলেন—হাঁ হাঁ! সে কথাটা ভুলিয়াছি। জানেন—আমরা বিলাতের লোক যতগুলি এইদেশে বাস করিতেছি, আপনাদের সহিত বন্ধুত্ব

করিয়া মনের কথা বলিতেছি, কিন্তু আমাদের মনের নিগূঢ়তত্ত্ব—গুপ্তকথা কখনই পাইবেন না। আপনি দেখিবেন, কালে প্যারীসুন্দরীর যথাসর্ব্বস্ব যাইবে। খুঁচি-হস্তে দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইবে। এ ঘটনা শীঘ্র ঘটিতেছে না। কারণ এখনও টাকার অভাব হয় নাই। ঘটিতে বিলম্ব আছে। কুঠি লুটের মোকদ্দমায় হাজিরা আসামীগণ সাতটি বৎসরের জন্য জেলে গিয়াছে। দারোগা খুনের মোকদ্দমায় স্বয়ং কোম্পানী বাদী। শীঘ্রই দেখিবেন সুন্দরপুরের জমিদারী খাস হইয়া কোম্পানীর হস্তগত হইয়াছে আর অধিক কি বলিব।

"আমিও একবার সৌলি যাইতে ইচ্ছা করিযাছি। আপনার এই গোলযোগে সেবারে যাইতে পারি নাই। তাহারপরই জ্বর,—জ্বর নয় বিষম জ্বর, প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

"আরও কয়েকদিন বিলম্বে যাইবেন। শরীরটা ভালকরে শুধরে যাক, তার পর যাইবেন। আর একটি কথা—বিরক্ত হইবেন না। খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে একটু সাবধান-সতর্কে দেখিয়া শুনিয়া খাইবেন।

এ পর্য্যন্ত বলিয়াই কেনী উঠিলেন। মীরসাহেব কেনীর সঙ্গে সঙ্গে দালানের সিঁড়ি পর্য্যন্ত আসিলেন। কেনী সেকহ্যাণ্ড করিয়া অশ্বে চাপিলেন। সইস, বর-কন্দাজ প্রভৃতি কেনীর-সঙ্গের লোকজন মীরসাহেবকে ভক্তির সহিত সেলাম করিয়া সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িল।

সপ্তদশ তরঙ্গ

অনন্ত-আকাশে ময়নাপাখি

আশাই জীবনের আশ্রয়, আশাই সংসারের মূল—আশাই মানব-হৃদয়ের একমাত্র ভরসা। ভাবিতে গেলে—আশাতেই সংসার। কে না জানে মরিতে হইবে। তথাচ মরিতে অনিচ্ছা কেন? মরিবার নামে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে কেন? আজ যদি কেহ বলে যে, কাল তোমাকে মরিতে হইবে—আর তাহা যদি নিশ্চয় হয়, তবে কাল কেন? যখন মৃত্যুর কথা কানে প্রবেশ করে, তখনই যেন মরিয়াছি বলিয়াই বোধহয়। মরণে ভয় করিয়াও আশার কুহকে পড়িয়া মরণ কথাটি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। মনে করিয়াছি, জগৎ চিরস্থায়ী,—আমিও চিরস্থায়ী। এত ভ্রম হইবার কারণ কি? আর কিছুই নাই, কেবল একমাত্র

আশা। আশা আমাদিগকে মাতাইয়াছে,—মজাইয়াছে। আশাই আমাদিগকে ভুলাইয়াছে।

জকির আশা কি? সে কি আশায় সুন্দরপুর গ্রামে ভ্রাতার বাড়ি যাওয়া-আসা করিতেছে। গরু, লাঙ্গল, জমি, বাড়ি, ঘর, ধান, টাকা যাহা জকির আশা ছিল, সকলই তো একপ্রকার সম্পূর্ণ হইয়াছে। এখন আর কি আশা? এ ভাই তো পূর্ব্বেও ছিল। আগে এত যাওয়াআসা হয় নাই। এখন এত ঘন ঘন আসা কেন? আর একদিন ছাতি, লাঠি হাতে করিয়া জকি ভ্রাতার বাড়ি যাইতে উদ্যত হইলেই ময়না বলিল—"দেখ! কুটুম্ববাড়িতে এত যাওয়াআসা ভাল নয়।"

জকি দাঁড়াইয়া লাঠি দিয়া মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে বলিল—"একটা কথা ছিল তাহাতেই"—

"কথা থাকুক সুন্দরপুর যাওয়াআসার কথা সাহেবের কানে গেলে কি ঘটিবে? তুমি সাহেবের প্যারাচাকর, তুমি সাহেবের শত্রুর এলাকায় কুটুম্বিতা করিতে যাও। নিশ্চয়ই জেনো, সাহেবের কানে গেলে তিনি হাড়ে হাড়ে চটে যাবেন। জল, জঙ্গল, মনিব কোনকালেই আপন নহে। আবার প্যারীসুন্দরীও সাহেবের প্যারাচাকর—মনে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন।

"প্যারীসুন্দরী আমাকে কিছুই বলিবেন না। তিনি আমাকে বড় ভাল-বাসেন।"

ময়না আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল "তিনি তোমাকে ভালবাসেন? তার মানে কি? তুমি কি তাহার বাটিতে যাও নাকি?"

জকি চুপে চুপে কয়েকটি কথা ময়নার কানের নিকট কহিয়া আপন শয়নগৃহ-মধ্যস্থিত হাতচাঙ্গির উপর হইতে ধুতি-চাদর বাহির করিয়া আনিয়া ময়নাকে দেখাইল। আর যাহা পাইয়াছিল, তাহা আর দেখাইতে সাহসী হইল না। কারণ সে পাঁচশত টাকার একটি তোড়া—টাকার তোড়া ধানের ডোলের মধ্যে থাকিল। তাহা বাহির করিয়া ময়নাকে দেখাইতে কিছুতেই জকির সাহস হইল না। ময়না ধুতি-চাদর দেখিয়া বলিল "দেখ, এ কাঁপড় তুমি কখনই পরিও না। লোকে দেখিলেই সন্দেহ করিবে। তুমি যে কথা বলিয়া সকলকে প্রবোধ দিবে তাহা কেহই বিশ্বাস করিবে না। যে যেমন, তাহার আশাও তেমন। চক্ষুও তেমন—পছন্দও তেমন। নিশ্চয় লোকে একথা বলিবে যে, তুমি এ কাপড় চুরি করিয়া আনিয়াছ।

না হয় তোমাকে বড়লোক দিয়াছে। এ ধুতি-চাদর কালীগঙ্গায় ফেলিয়া দেও। নয় পোড়াইয়া ফেল। আর ঘরে রাখিও না। আমার কথা শুন।"

জকি বড়ই দুঃখিত হইল। মনে করিয়াছিল, ময়না তাহার কার্য্যে যোগ দিবে—কত প্রশংসা করিবে। ধুতি-চাদর দেখিয়াই এইকথা—পাঁচশত টাকার কথা শুনিলে তো আজই আগুন জ্বালাইয়া দিয়া ছারখার করিয়া দিবে। টাকার কথা না বলিয়াই ভাল করিয়াছি। জকি মনে মনে এইকথা কহিয়া ময়নার সম্মুখ হইতে ধুতি-চাদর উঠাইয়া লইয়া গেল। একটুকু পরে আসিয়া বলিল যে, আর সুন্দরপুর যাইব না।

"কুটুম্ব-স্বজনের বাড়ি যাওয়াআসায় দোষ কি? তবে ঘন ঘন যাওয়াটা ভাল দেখায় না—আদরও থাকে না। মুখে কিছু না বলুক, মনে মনে বড়ই বিরক্ত হয়। আমি যাইতে বারণ করি না, মাসেক-ছমাস পরে কুটুম্ববাড়ি যাওয়াই ভাল।"

"না আমি সে বাড়িতেই আর যাইব না। সুন্দরপুর গ্রামেই আর যাইব না। সেখানে আমার কোনই কাজ নাই।"

ময়না কাতরস্বরে বলিতে লাগিল। "দেখ আমার পেটের বেদনা আজ বড়ই বেশী হইয়াছে। সাহেবের নিকট হইতে যদি একটু ঔষধ চাহিয়া আনিয়া দিতে তাহা হইলে বাঁচিতাম, কত লোককে তিনি ঔষধ দেন। তুমি চাহিলেই ঔষধ দেবেন।"

জকি সুন্দরপুর না যাইয়া কুঠিতে চলিয়া গেল। ময়না মাটিতে বসিয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। ভাবনা কি? স্বামীর সহিত সময় সময় দেখা হয়, কিন্তু বিবাদ-বিসম্বাদ, বিচ্ছেদ, মিলন কিছুই নাই। স্বপত্নী আছে, তাহার সহিতও মনবাদ নাই। ময়নাই ইচ্ছা করিয়া স্বামীকে বিবাহ দিয়াছে। স্বপত্নী-ঘরে আনিয়াছে। একদিনের জন্যও স্বপত্নী সহিত বাদ-বিবাদ হয় নাই। অন্ন-বস্ত্রে ময়নার কোন বিষয়ে কষ্ট নাই। তাহার আচরণে, কথাবার্ত্তায় প্রতিবেশি-গ্রামস্থ লোক সকলে একমুখে ভাল বলে। এবং ভালবাসে। প্রতিবেশিনীর মধ্যে একজন বয়োধিকা স্ত্রীর সহিত ময়নার বিশেষ আলাপ ছিল। সে সর্ব্বদাই ময়নার নিকট কথাবার্ত্তা কহিত, হাসি-তামাসাও করিত। ময়নার পীড়ার কথা শুনিয়া দেখিতে আসিয়া বলিল—

"কি হয়েছে দিন দিন যে একেবারেই সারা হইতেছ? আগে তো ভালই ছিলে,—পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে তোমার ভাব অনেক বদল হইয়াছে। আবার আজ কয়েকদিন হইতে তো একেবারেই যাচ্ছেতাই দেখিতেছি। ক্রমেই যে সারা হলে? কথাটা কি বলত?"

ময়না কোন উত্তর করিল না। কিন্তু চক্ষু দুটি জলে পরিপূর্ণ হইল। চক্ষুজল সম্বরণ করিতে ক্ষমতা হইল না। দুই-এক ফোঁটা মাটিতে পড়িল অবলা নিঃসহায়ার চক্ষুর জল মাটিতে পড়িয়া মাটি ভিজাইল। পরে বলিল "আমার কিছু হয় নাই। কোন পীড়াই আমার শরীরে নাই। তবে বলবে এ ভাব কেন? সতীনের জ্বালায় জ্বলিতেছি—তাহাও নহে। সে সতীন তো আমিই আনিয়াছি—এ সংসারে আমিই কর্তা, আমার হাতেই সকল, কিছুতেই আমার দুঃখ নাই। অথচ এ জগতে আমার আর সুখ নাই। আমার মনের কথা মনেই রহিল।"

"বোন! অনেকদিন হ'তে ইচ্ছা একটি কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিব, কিন্তু সময় পাই নাই। তোমার সম্মুখে কেহ বলে না। ভেঙ্গেচুরে খোলাসা করেও কেহ বলিতে সাহসী হয় না। আকার-ইঙ্গিতে অনেকেই অনেক অনেক কথা বলে। ভাই জকির সহিত তুমি কথা বল না। সে তোমার ঘরে আসে না। এ কথাটা প্রকাশ্যেই সকলে বলে। পুরুষ বাঁজা হইলে দশটি বিয়ে করিলেও ছেলেপেলে হয় না। এ কথাটাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে। কিন্তু তোমার মুখের ভাব, শরীরের অবস্থা দেখে অনেকেই অনেক কথা বলে। কিন্তু মুখফুটে কেহই কিছু বলিতে সাহস পায় না। একটু ঘাৎ রাখিয়া দেয় যে, হলেই দেখা যাইবে।"

ময়না নিরব—কিন্তু চক্ষের জলে মাটি ভিজিতেছে।

প্রতিবেশিনী পুনরায় বলিল, কান্দ কেন? সকলই কপালের লেখা। ময়না অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিয়া বলিল বোন! আমি সকলকেই চিনিয়াছি। বিশেষ করিয়া স্বামীকে চিনিয়াছি। স্বামী, আপন স্বামী—হায়!

জকি ঔষধের শিশি লইয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, সাহেব ঔষধ দিয়াছেন।

প্রতিবেশিনী বলিল—কিসের ঔষধ?

ময়না বলিল—বেদনার ঔষধ।

জকি শিশি রাখিয়া ঔষধ খাওয়াইবার জন্য ভারি ব্যস্ত হইল। সাহেব বলিয়াছেন তোমার স্ত্রীর হাতে ঔষধ দিও। তুমি খাওয়াইও না। এ কথাটা

বলিতে তখন জকির সাহস হইল না। কারণ সম্মুখে পাড়ার একটি স্ত্রীলোক। কিসে ঔষধ খাওয়াইবে, এইকথাই বার বার বলিতে লাগিল।

ময়না বলিল ঔষধ দেও খাই! ব্যস্ত হইতেছ কেন?

জকি বলিল—না না ব্যস্ত কি! তা—না—ঔষধ খাও। এখনই বেদনা সারিয়া যাইবে।

ময়না বলিল—"দেও তুমিই হাতে করিয়া দেও খাইতেছি।"

জকি—তা আচ্ছা দেই, খাও বলিয়া শিশির সমুদায় ঔষধ ময়নার মুখে ঢালিয়া দিয়া জকি নিস্তার পাইল। ঔষধ গলাধ করিতে ময়নার মহাকষ্ট হইল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিশ্বাস ফেলিতে পারিল না।

জকি ঔষধ খাওয়াইয়া বলিল যে, সাহেব জল দিয়া মিশাইয়া খাইতে বলিয়াছিলেন, তাহা তো হইল না। সে কথাটা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। তাড়াতাড়ি ঘটি আনিয়া ময়নার সম্মুখে রাখিয়া দিল। ময়না জলপান করিল না। জকি শিশিটি লইয়া বার বার দেখিতে লাগিল, এবং শিশির গলায় সুতা বাঁধিয়া ঘরের বেড়ায় ঝুলাইয়া রাখিল। এবং তামাক খাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে হুঁকা-কলকে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইল। প্রতিবেশিনী আবার জিজ্ঞাসা করিল বোন! কিসের বেদনা?

ময়না একটু স্থির হইয়া বলিল—বেদনা আমার মাথা আর মুণ্ডু!

জকি কলিকায় তামাক সাজিতে সাজিতে বলিতে লাগিল—সাহেব বলিয়া দিয়াছেন যে, ঔষধ খাওয়াইলে কিছুক্ষণপর কি ভাব হয়, বেদনা কমে কি বাড়ে, আসিয়া বলিও।

প্রতিবেশিনী বলিল—বোন! আমি এক্ষণে যাই, বাড়ির কাজকাম অনেক বাকি আছে। আবার আসিয়া দেখিয়া যাইব। প্রতিবেশিনী চলিয়া গেল। ময়না যেখানে ঔষধ খাইল, সেইখানেই বসিয়া রহিল। ক্রমে পেটমধ্যে যেন আগুন জ্বালিয়া দিল। কয়েকবার উঠিয়া ঘরের কানাচি-গিয়া শেষে একেবারে অচল হইয়া পড়িল। সপত্নী ব্রজ বাড়ির অনেক কথাই জানিত। ময়নাকে ধরিয়া কয়েকবার কানাচি লইয়া গেল। শেষে ময়না অস্থির হইয়া পড়িল। কাপড় অসামাল হইল। জকি সাহেবের নিকট সংবাদ দিতে দৌড়িয়া ছুটিল। বাঁচিবার ভরসা নাই, চক্ষু ঘোর হইয়া আসিতে লাগিল, সপত্নী ব্রজের ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া

অতি মৃদু মৃদু স্বরে বলিতে লাগিল—"বোন! আমি যে, ঔষধ খাইয়াছি কেন, তাহা তুমি বোধহয় জান? যে জন্য ঔষধ খাওয়া তাহা অপেক্ষা মরণ ভাল। আমার স্বামী বর্ত্তমান। ঐ ঔষধের পরিমাণের বেশী আমি খাইয়াছি। যিনি ঔষধ দিয়াছেন, তিনিই আমাকে বলিয়াছিলেন, বড় ভয়ানক ঔষধ। যাহা দিব তাহার চারিভাগের একভাগ চারিগুণ জলে মিশাইয়া খাইবে। যদি তাহাতে না হয়, তবে সেদিন আর খাইবে না। তারপরদিন আবার ঐ পরিমাণ ঔষধ আটগুণ জলে মিশাইয়া খাইও। এই ছিল ঔষধের ব্যবস্থা। সেই ঔষধের ব্যবহার-নিয়ম জানিয়াও যে অকাতরে শিশির সমুদায় ঔষধ বিনাজলে পেটে ঢালিলাম কেন? মরিব বলিয়া। আমার বাঁচিবার সাধ নাই। আমি অনেকদিন হইতে মরিয়া রহিয়াছি।

বোন! তুমি তোমার স্বামীকে চিনিতে পার নাই, আমি অনেকদিন হইতে চিনিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেককে চিনিতে পারিয়াছি। ইহার বিচার অবশ্যই একদিন হইবে। যিনি সকলের বিচারের মালিক, তাঁহার হাতে একদিন পড়িতেই হইবে। কথা অনেক, কিন্তু বলিবার সাধ্য নাই। বোন! একটি কথা বলি—তোমার স্বামীকে তুমি কখনই বিশ্বাস করিও না। তিনি না করিতে পারেন, এমন কোন কার্য্য দুনিয়ায় নাই। মানুষে যাহা কখনই করিতে পারে না, তিনি তাহা টাকার লোভে অনায়াসে করিতে পারেন। পারেন তো পরের কথা—করিয়াছেন। আর কি বলবো বোন! আর কি বলবো! ঐ যে ধুতি-চাদর দেখিয়াছ, নিশ্চয়ই জানিও ঐ ধুতি-চাদরেই তোমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। ঐ কাপড়েই তোমাদের যথাসর্ব্বস্ব যাইবে। প্রাণ যাইতেও বড় আশ্চর্য্য নাই। আগেই বলিয়াছি, তোমার স্বামী টাকা পেলে না পারে, দুনিয়ায় এমন কোন কু-কাজই নাই। প্রথম লোভ ধুতি-চাদর তারপর যে লোভ আছে সে লোভ তোমার স্বামী—কখনই সামলাইতে পারিবে না।

আমি তো চলিলাম, তুমি যদি বাঁচিয়া থাক তবে দেখিবে তোমার স্বামীর কি দুর্দ্দশা ঘটে। বোন! "তোমার স্বামী" বলিলাম বলিয়া মনে কোন দুঃখ করিও না। মনের কথা চিরকাল মনেই রাখিয়াছি। এখন আর কেন? ইচ্ছা করিয়া শিশির সমুদায় ঔষধ খাইয়াছি। খাইলাম কেন? আপন প্রাণ আপন-হাতে বাহির করিলাম। তাহা বলিব না। ময়নার মন জানে, আর সেই পাক-পরওয়ারদেগার জানেন।

একদিকে স্বামী, অন্যদিকে দুরন্ত বাঘ! বাঘ হাঁ করিয়া ধরিতে আসিল, স্বামী রক্ষা না করিয়া, আরও বাঘের মুখে ধরিয়া দিল। আর বাঁচি কি করিয়া, যাই কোথা—কে রক্ষা করে? খোদায় আছেন জানি, তিনি সকলের রক্ষক তাও লোকের মুখেই শুনি! সেও হতভাগিনীকে তো রক্ষা করিলেন না! আর শক্তি নাই—কথা কহিবার আর শক্তি নাই। উহু! স্বামীর এই কার্য্য! জকির মুখ আর দেখিব না বলিয়া ময়নার দুটি চক্ষু একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। ব্রজ এই তিনটি অস্ফুট কথা শুনিল মাত্র। নির্দ্দয় স্বামী! নির্দ্দয় ইংরেজ! মুখের কথা মুখেই রহিল। ময়নার প্রাণবায়ু কোনপথে কোথায় চলিয়া গেল ব্রজ তাহার কিছুই দেখিতে পারিল না। নিরবে কান্দা ভিন্ন ব্রজের আর কি ক্ষমতা আছে? —কান্দিতে লাগিল।

জকি সাহেবের নিকট পীড়ার অবস্থা জানাইতে গিয়াছিল, উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিল, সর্ব্বনাশ হইয়াছে! সাহেব কত দুঃখ করিতেছেন। আমাকে মারিতে তাড়া দিয়াছেন। আর পাছা থাবড়াইয়া বলিতেছেন "ও ম্যান—তুম ক্যা কিয়া"। ঔষধে জল দেই নাই, আর সমুদায় ঔষধ খাওয়াইয়াছি শুনিয়া কেনী আঙ্গুল দাঁতে কাটিতেছেন। সাহেব মহাব্যস্ত হইয়াছেন।

এখন কেমন? ময়নার নাকেমুখে হাত দিয়া দেখিয়া জকি মাথায় ঘা মারিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। ব্রজের কান্না তখন একটু বাড়িল। প্রতিবেশিনীরা যে যেখানে ছিল ছুটাছুটি করিয়া ব্রজের কান্নার সহিত যোগদিয়া কান্দিতে কান্দিতে চক্ষের জলে নাকের জলে একাকার করিয়া ফেলিল। জকি প্রতিবেশীদের সাহায্যে ময়নার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার যোগাড় করিয়া তাড়াতাড়ি ময়নার ঘরের জিনিস-পত্র বাক্স-পেটারায় বন্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

অষ্টাদশ তরঙ্গ

জন্মভূমি

জন্মভূমি কাহার না আদরের? উপমা-রহিত কাহার না ভাল বাসস্থান? জন্মভূমির জন্য কে না লালায়িত? বহুদিন পরে প্রবাসী দেশে আসিলে তার মনে কতই সুখ! আনন্দ! মিসেস কেনীর মন কিরূপ তাহা জানিনা। বাঙ্গালার কাল-মুখের ভাব এবং খোলা বুকের ভিতরের খবর বুঝিয়া উঠাই দুঃসাধ্য। তাহাতে

সেই ধবধবে সাদা মুখের হাব-ভাব, সাদা চোখের চাউনির আভাষে, এবং আটা-সাটা সাতপ্রকার কাপড়ে ঢাকা—সাদা-চর্ম্ম সাদা-অস্থি জড়িত—সাদা কি কালো ঈশ্বর জানেন—কোমল কি কঠিন ভগবান জানেন, সে মনের ভাব বুঝিয়া ব্যক্ত করা উদাসীন পথিকের সাধ্য নহে। জন্মভূমি পশুরাও ভালবাসে, পক্ষীরাও ভাল চেনে, কীট-পতঙ্গ ক্ষুদ্র প্রাণীরাও বোধহয় হঠাৎ ভুলিয়া যায় না। আপন আপন বাসস্থান, বাসা, কোটর, গর্ত্ত, অগাধজলে অনায়াসে চিনিয়া যাওয়াআসা করে। সীমা-বিশিষ্ট—জ্ঞানের ভালবাসাই চেনা, এবং আপন আপন স্থানে সময়মত চিনিয়া যাওয়া।

মিসেস কেনী জন্মভূমিতে পা রাখিয়াই যেন বিরক্ত হইয়াছেন। কেহ দুহাত তুলিয়া, ঘাড় নোওযাইয়া, মাটিতে মাথা ঠুকিয়া দস্তুরমত সেলাম বাজায় না। সরিয়াও দাঁড়ায় না। গা ঘেঁষিয়াই যাতায়াত করে। মান মর্য্যাদার নাম নাই। খানসামা নাই, বেয়ারা নাই, বাবুরচি নাই, সর্দ্দারবেয়ারা নাই, বয় (boy) নাই। সমুদায় কাজ নিজে করিতে হয়। ইস্তক রন্ধন-লাগাদশয্যা, তাহার পরেও ছি! ছি! বড় ঘৃণার কথা। নিজের মলমূত্র নিজেই পরিষ্কার—চিঠিখানা দিতে হলেও ডাক-ঘরে নিজে যাইতে হয়। হুকুমের-তাঁবে কেহই খাটে না। একে বলিতে দশজন আসিয়া উপস্থিত হয় না। অন্যায় হুকুম কেহই শুনে না। ভদ্রতা ব্যবহারে কার্য্য করিতে হয়, কথা বলিতে হয়। সকলের সহিত নম্রতা এবং ভদ্রতা ব্যবহার না করিলে বড়ই অপদস্ত হইতে হয়। চক্ষু রাঙ্গাইয়া, সাদা মুখ বাঁকা করিয়া কার্য্য লওয়া দূরে থাকুক, প্রতি কার্য্যে ধন্যবাদ না দিলে, অসভ্য, জঙ্গলী বলিয়া বেতন-ভোগী কার্য্যকারকেরাও উপেক্ষা করে। নির্দ্ধারিত এবং নিয়মিত কার্য্য সময়েই একটু নরম বোধহয়। তাহারপরেই যেন অন্যভাব। খাওয়া দাওয়াতেও অসুখের একশেষ। মুরগী মেলে না। আণ্ডা পাওয়া যায় না। তরকারীও তথৈবচ। পাওয়া যে না যায় তাহা নহে। দাম কত? সে দামের কথা হঠাৎ শুনিলে, সোনার ভারতের কথা মনে পড়ে। এইপ্রকারে মিসেস কেনী ভাবিতেছেন আর বলি-তেছেন—এমন প্রভুভক্ত দেশ কোথাও নাই, আমার বোধহয় জগতে নাই। চাকরে-মনিবে কি সম্বন্ধ, রাজা-প্রজায় কি সম্বন্ধ, তাহা ভারতবাসীরাই জানে। সেকথা আর কি বলিব। আমাদিগকে দেবদেবীর ন্যায় পূজা করে। রাস্তা-ঘাটে দেখিলে সেলাম বাজাইয়া পঞ্চাশ হাত সরিয়া যায়। দিবারাত্রি খাটুনি—চাকর

হইলেই যেন সে চিরকালের জন্য বাধা পড়িল। সর্ব্বদা প্রস্তুত, সর্ব্বদা যোড়হাত ; মার কাট কথাটি মুখে নাই। যত ইচ্ছা মাথায় বোঝা চাপাও, আহা কি উহু শব্দটি মুখে নাই। যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লও কিছুই বলিবে না। যেমন অবোধ তেমনই সরল। আর কত বলিব। যাহা ইচ্ছা তাহা কর, সৌভাগ্য-জ্ঞানে সহ্য করিবে, কত সাহেব শিকার করিতে যাইয়া, মানুষ শিকার করিয়া বসেন, কিছুই হয় না। ক্রোধবসে এড়ির গুতোয় পিলে ফাটাইয়া দেন, টুঁ শব্দটি মুখে আনে না। টাকা লইতে ইচ্ছা হইল, হুকুম জারি করিয়া দাও অমনি আদায়। আমাদের প্রতি এমনি বিশ্বাস যে, রূপা বলিয়া দস্তা হাতে দেও, মাথায় করিয়া লইয়া যাইবে। এমনই ভক্তি যে আরাধ্য দেবতাকে ভুলিয়া আমাদিগকেই কায়মনে পূজা করে, মনের সহিত সেবা করে। তাহারা পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু উপার্জন করে, এ দেশের ছাইভস্ম জিনিস দেখিয়া—ভুলিয়া সকলই আমাদিগকে দেয়। এই আমি যে খণ্ডে বাস করি, সমুদায় ক্ষমতা আমার হস্তে—আমি ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারি। পরিশ্রম তাহাদের, ভোগ আমাদের। এমনই সরল, এমনই সাধু যে, সর্বস্ব দিয়াও আমাদের খাতির রাখে, মন যোগায়। হায়! হায়! অমন সোনার দেশ কি আছে? আমার এত কষ্ট হইতেছে যে, একমুখে তাহা প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই। খাওয়া দাওয়ার সুখই বা কত! দান-দাতব্যের ঘটাই বা কত! আদর-অভ্যর্থনার ধুমই বা কত! সকলেরই বাড়ি, ঘর, দোর আছে, খাইবার সংস্থা আছে। সাতপুরুষ দূরে থাকুক এক জীবনের মধ্যে ষাট দিনও কেহ গাছতলায় বাস করে না। ভাড়া দিয়াও পরের ঘরে নিদ্রা যায় না। যেমনই হোক থাকিবার, শুইবার ঘর সকলেরই আছে। ছল, চাতুরী, জুয়াচুরি জানে না। মিথ্যাভান করিয়া কাহারও সম্পত্তি হরণের কেহ চেষ্টা করে না। তবে যাহারা পাওনাদার, তাহারাই দাবী করে, মামলা-মকদ্দমাও হয়। সে বিচারও আমরাই করিয়া থাকি। বিচার-দরুন নজর সেলামী টাকা লই। তাহাদেরই দেশ, তাহাদেরই টাকা, তাহাদেরই সম্পত্তি—মজা করি আমরা। এমন সুখ কি আর কোথাও আছে?

আহা সে দেশের স্ত্রীলোকদিগের কষ্ট দেখিয়া মনে বড়ই ব্যথা লাগে। তাহারা যেন বন্দিনী! চিরবন্দিনী! ঘাটে-মাঠে বাহির হয় না। সর্ব্বদা মাথা, মুখ ঢাকিয়া থাকে। অপর কাহারও সঙ্গে কথাবার্তা কহা দূরে থাক, হঠাৎ নজর

পড়িলেই ঘরের মধ্যে লুকায়। একটু বেশি বয়স হইলে জন্মদাতা পিতার সম্মুখে আসিতেও লজ্জা বোধকরে এক পরিবারস্থ একবাড়ির আপন আত্মীয়-স্বজন— এমন কি পিতার সম্মুখেও আহার করে না। স্বামীসহ সর্ব্বদা একত্র উঠাবসা করিতে মাথা কাটিয়া ফেলিলেও স্বীকার হয় না। অন্যের কথা কে বলে। পুরুষেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা, পুরুষেরাই তাহাদের হর্ত্তাকর্ত্তা একরূপ বিধাতা। স্বামীমুখে কতকথা শুনিতেছে, কত বকুনি খাইতেছে সময় সময় স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিতেছে, প্রহার পর্য্যন্ত করিতেছে। নালিশ নাই, ফরিয়াদ নাই, পুরুষে সকলই পারে। স্ত্রীলোকেরা কেবলই সহ্য করে। এত কষ্ট, এত অসুখ, এত যন্ত্রণা, তবু পিতামাতায় ভক্তি, ভ্রাতাভগ্নীতে ভালবাসা, স্বামী-স্ত্রীতে একাত্মা, একপ্রাণ কি আশ্চর্য্য! এমন আশ্চর্য্য দেশের কথা কোথায়ও শুনি নাই। কেতাবে স্বর্গের কথা শুনিয়াছি, মিথ্যা বলিতেছি না, আমবা সেই স্বর্গের রাজ্যে বাস করিতেছি। এই কতকদিনে আমার মন বড়ই চঞ্চল হইয়াছে। ক্ষণকালও আর এদেশে থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে না। আজই মিষ্টার কেনীকে পত্র লিখিব এবং এই সপ্তাহেই দেশের মুখে চুনকালি দিয়া সোনার ভাবতে যাত্রা করিব। বাপরে! এমন বে-আদব, বেতমিজ দেশে ভদ্রলোক বাস করে? সকলই সমান। কেহ কাহারও খাতির রাখে না—গ্রাহ্য করে না—মান্যও করে না। দু-দণ্ড বসিয়া খোসগল্পেও সময় অতিবাহিত করে না। চাকর বেতনভোগী। চাকর মনিবের কত প্রশংসা করিবে, কত প্রকার যশঃগান গাইবে। সে কথার আভাষ কাহারও মুখে নাই। নির্দ্ধারিত বেতন, নিয়মিত কার্য্য। আর সকলেই যেন ব্যস্ত, আপন আপন কার্য্যে সকলেই ব্যস্ত। ইস্তক লক্ষ্যপতি ধনী, লাগাদ মুটে, মজুর, সকলেই আপন আপন কার্য্যে সমান ব্যস্ত। কার্য্যের মূল্যে অবশ্যই ন্যূনাধিক আছে। কিন্তু ব্যস্ত ও যত্নের মূল্য সকলেরই সমান। এমন কড়া দেশে আর আমার বাস করা সাজে না। আমি শীঘ্রই এদেশ পরিত্যাগ করিব। এ জীবন থাকিতে আর জন্মভূমির নাম করিব না।

মিসেস কেনী সেইদিবসই শালঘর মধুয়ায় কেনীর নিকট পত্র লিখিয়া নিজে ডাকঘরে দিয়া আসিলেন। পত্রের ভাবার্থ এই যে বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা বড়ই কষ্টকর! নাথ! আর আমার সহ্য হয় না! বিরহ-বেদনায় বড়ই অস্থির হইয়াছি। প্রাণ যায় যায় হইয়াছে। এরূপ ঘটিবে আগে জানিলে, বিরহে এত যাতনা আগে বুঝিলে,

নাথ! আমি কখনই শালঘর মধুয়া পরিত্যাগ করিতাম না। ক্ষণকালের জন্যও ছাড়িয়া আসিতাম না। খুব শিক্ষা হইল। আর না কখনই আর এরূপ হইবে না। আমি শীঘ্রই পৌঁছিতেছি। এই সপ্তাহেই জাহাজে উঠিব। অদ্যই টিকিট খরিদ করিব।

ঊনবিংশ তরঙ্গ

প্যারীসুন্দরীর পরিণাম

কুঠি লুটের মোকদ্দমায়, হাজারী আসামীগণের ফাটক হইয়াছে। দারোগা খুনের মোকদ্দমায় আসামী হাজির হয় নাই—গ্রেপ্তারও হয় নাই। কিছুই সন্ধান হইতেছে না। সরকার বাহাদুর প্যারীসুন্দরীর সমুদায় জমিদারী ক্রোক করিয়া আছি-সরবরাহকার নিযুক্ত করিয়াছেন। বরিশালের নিকট সায়েস্তাবাদ নিবাসী সৈয়দ আবি আবদুল্যা অছি-সরবরাহকার নিযুক্ত হইয়া আসিয়া সমুদায় জমিদারী সরকার বাহাদুরের পক্ষ হইতে ক্রোক করিয়া কার্য্য চালাইতেছেন। প্যারীসুন্দরী সদর দেওয়ানীতে আপীল করিয়াছেন। বহু তদবির, বহু যত্ন, বহু পরিশ্রম ও বহু অর্থব্যয়ে জমিদারী খালাস করিলেন।

নিরপরাধী কয়েকজন আমলা এবং বাজে চাকর, বিনা অপরাধে সাক্ষীর দোষে, দোষী সাব্যস্ত—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইল। অনুদায়ে চাকুরীতে মজিয়া, একেবারে প্রাণেই সারা পাইল। রামলোচন খালাশ পাইলেন। "আহম্মদ" মনিবের আদেশে বিশেষ কর্তব্য-কার্য্য করিতে গিয়া বেঘোরে প্রাণ হারাইল। কাশুর মাতার চির-কান্না সার হইল। রাঁসীর স্ত্রী বাপের বাড়ি চলিয়া গেল। প্যারীসুন্দরী জমিদারীর কতক অংশ পত্তনী ইত্যাদি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ঋণ-দায় হইতে মুক্তি হইলেন। আয়ের শ্রেষ্ঠ অংশই প্রায় কমিয়া গেল। পাঠক! প্যারীসুন্দরীর প্রসঙ্গ সাঙ্গ হইয়া অন্য কথা আরম্ভ হইল।

বিংশ তরঙ্গ

মীরসাহেবের নৌকাযাত্রা

পূর্ব্বকথা অনুসারে মীরসাহেব এক্ষণে সিরাজগঞ্জের অধীন সৌলিগ্রামে ভগ্নীর বাটিতে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। নিকটেই গৌরীনদী হইয়া ধুমাকলের

নৌকা (ষ্টিমার) প্রায়ই উজান-ভাটি যাতায়াত করে। কিন্তু কোথায় যায়, কোথা হইতে আইসে তাহার খোঁজ খবর কেহই রাখেন না। সকলের মনেই বিশ্বাস যে, সাহেবলোক না হইলে, ধুমাকলের নৌকায় দেশীলোকের চড়িবার অধিকার নাই। সাহস করিয়া সে সময় ষ্টিমারে চড়িতেও কেহ ইচ্ছা করে নাই।

নদীগর্ভে দপ্ দপ শব্দ হইলে এবং আকাশে ধোঁয়া দেখিলেই তীরস্থ গ্রাম-বাসীরা আপন আপন কর্ম্ম ফেলিয়া নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইত এবং চলতি ষ্টিমার দেখিয়াই চক্ষু জুড়াইত। নদীতীরে যে যে স্থানে পাথুরিয়া কয়লার আড্ডা, সেই সেই স্থানে ষ্টিমার আগাইয়া কয়লা লইয়াই চলিয়া যাইত। কোন আরোহী কি বাঙ্গালীর মালামাল লইত না। কেহ মাল দিতেও প্রস্তুত হইত না। কোম্পানীর কার্য্যই করিত, মালামাল যাহা কিছু আমদানী-রপ্তানি হইত সে কুঠি-য়াল নীলকরের একচেটিয়া।

মীরসাহেব নৌকাযোগে সিরাজগঞ্জ যাইতেছেন। বিছানা, বালিশ, খাদ্য-সামগ্রীর ভার, ভারে ভারে দাঁড়ী-মাঝিরা এবং কুলী মজুরেরা নৌকায় তুলি-তেছে। বাবুরচিখানা নৌকোয়—জ্বালানী কাষ্ঠ, বাউলী, বটি, হাতা, তামার পাতিল ঝাঁকা বোঝাই করিয়া উঠাইতেছে। বসীরুউদ্দিন নিজের কাপড়ের গাঁটরী, সেতার, তবলা ইত্যাদি বাহকের মাথায় দিয়া নৌকায় উঠাইতেছে, পাশা খেলার কোট, গুটী আপনহাতে রাখিয়াছেন।

সা গোলাম, দেবীপ্রসাদ এবং অন্যান্য কর্ম্মচারী, দুই চারিজন প্রতিবেশী মীরসাহেবের সঙ্গে সঙ্গে নদীতীরে নৌকা পর্যান্ত যাইতেছেন। সা গোলামের মুখে কথা নাই, বড়ই দুঃখিত, বড়ই চিন্তিত। এত চেষ্টা করিয়াও কোন ফল হইল না, অছিয়তনামা হাতে আসিল না। কি হইল? শেষে কি হইবে? এই চিন্তাতেই একবারে সারা হইতেছেন। আহার-বিহারে, সাংসারিক কার্য্যে কিছুতেই মন নাই —কিছুতেই আরাম নাই, বড়ই উদ্বিগ্ন—চিন্তার সহিত উদ্বিগ্ন।

অছিয়তনামা নিশ্চয়ই মীরসাহেবের হাতবাক্সে আছে, এইটি তার ধ্রুব বিশ্বাস। এইতো হাতছাড়া হইয়া চলিল। এইতো চলিয়া গেল। আর কি হইবে। সকল আশায় ছাই পড়িল। ঐ তো এখনি হাতবাক্স হাতছাড়া হইয়া চলিল। উপায় কি? মনের আশা মনেই মিটিয়া গেল। মধ্যখানে কতগুলি কথা দেবীপ্রসাদের কানে গেল। একবার মনে করিলেন, হাতবাক্সটা চাকরের হাত

হইতে কাড়িয়া লই। অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহা হইবে। আবার ভাবিলেন যদি এ বাক্সেও না থাকে, তবে আরও বিপদ। এতকালের পরিশ্রম, চিন্তা সকলই মাটি। সাত-পাঁচ ভাবিয়া বড়ই দুঃখিতভাবে সকলের সঙ্গে সঙ্গে ঘাট পর্য্যন্ত যাইতে লাগিলেন।

মীরসাহেব গৌরীতটে যাইয়া নৌকায় না উঠিয়া জলের কিনারায় দাঁড়াইলেন। সঙ্গীরাও দাঁড়াইল। সা গোলামকে দুঃখিত দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—বাপু! চিন্তা কি? আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব। আমি তো আর চিরকালের জন্য যাইতেছি না যে, এত দুঃখিত হইয়াছ। বিষয়াদি, বাড়ি, ঘর, পরিবার সকলই থাকিল। আপন কাজকর্ম্ম দেখিয়া করিবে। ঈশ্বর-ইচ্ছায় কোন বিষয়ে ভাবনা-চিন্তার কারণ থাকিল না! মধ্যে মধ্যে কেনীর সহিত সাক্ষাৎ করিও। কোন গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইলে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া, তিনি যেরূপ উপদেশ দেন, সেইরূপ করিবে। সাবধান! কেনীর সহিত কোন বিষয়ে গোলযোগ না হয়। সাবধান! লোকের কথায় তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইও না। এইপ্রকার নানা কথা বলিয়া, সা গোলামের মাথায়, মুখে, হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া মীরসাহেব বিদায় হইলেন। সকলেই মাথা নোয়াইয়া সালাম বাজাইল। নৌকার সিঁড়ির উপর উঠিতেই কি কথা মনে হইয়া হাতবাক্স আনিতে অনুমতি করিলেন। বাক্স খুলিয়া একখান জড়ান কাগজ বাহির করিয়া, সা গোলামকে বলিলেন—আমি নৌকাপথে যাইতেছি। পদ্মা, যমুনা হইয়া যাইতে হইবে। ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না না। এই দলিলখানিই মূল। ইহাই আমাদের সর্ব্বস্ব-ধন! আমার পিতা-কৃত "অছিয়তনামা" এই দলিলখানি বড় দরকারী এবং আবশ্যকীয় দলিল—হারাইলেই সর্ব্বস্ব হারাইতে হইবে। কারণ এ সম্পত্তির শত্রু অনেক। আর যত দলিল আপনাকে দিয়াছি, সকলের অপেক্ষা এ-খানি অধিক সাবধানে যত্নের সহিত রাখিতে হইবে। জলের উপরে যাওয়া, এ সকল দলিল বাটিতে সাবধানে রাখাই ভাল। বাপু! সাবধানের মার নাই। আমি বহু যত্নে দলিলখানি সর্ব্বদা আপনকাছে রাখিতাম, তুমিও যত্নেই রাখিবে। বিশেষ সাবধানে রাখিবে বলিয়া অছিয়তনামা সা গোলামের হাতে দিলেন।

সা গোলাম অছিয়তনামা হাতে পাইয়া একেবারে আত্মবিস্মৃত হইলেন। যা কখনও স্বপ্নেও ভাবেন নাই তাহাই ঘটিল। যাহার জন্য এত চক্র, যে দলিল

হস্তগত করিবার জন্য দুগ্ধে বিষদান, কবিরাজের সহিত ষড়যন্ত্র, কত চক্র, কত চেষ্টা, কত পরিশ্রম, আজ তাঁহার ভাগ্যে লক্ষ্মী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকেই বিশ্বাসী পাত্র করিয়া মীরসাহেবের সর্ব্বনাশ ঘটাইতে মীরসাহেব হস্তেই অছিয়তনামা সা গোলামের হস্তগত হইল। কি আশ্চর্য! ঘটনাস্রোত নিবারণ করে সাধ্য কার! বিধির-নির্ব্বন্ধ ঘুচাইতে ক্ষমতা কার! আত্মবিস্মৃতে শ্বশুরকে প্রণাম করিতেও সা গোলামের মনে হইল না। মীরসাহেব নৌকায় উঠিলেন। মাঝিরা লগি উঠাইয়া "দরিয়া গাজী, পাঁচ পীর বদর বদর" বলিতে বলিতে নৌকা জলে ভাসাইয়া দিল। সুবাতাস পাইয়া দাঁড়ীরা আর গুণ টানিতে নামিল না। পাইল খাটাইয়া মনের আনন্দে যাইতে লাগিল। নৌকা গৌরীর জলে, গা ভাসাইয়া বায়ু-সহযোগে স্রোত অতিক্রম করিয়া উজান ছুটিয়া চলিল। মীরসাহেব জলে ভাসিলেন। চিরকালের মত জলে ভাসিলেন।

একবিংশ তরঙ্গ

গারদের কয়েদী

ছয়মাস যায় পেটে অন্ন নাই, তবে বাঁচে কিসে? প্রাতে প্রতিজন একসের ধান পায়। সেই ধান হাতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া চাল বাহির করে। সেই চাল আর সন্ধ্যার সময় এক ঘটী জল ইহাই মালখানার কয়েদীর আহারের ব্যবস্থা। কেনীর গারদ বড়ই কঠিনস্থান। যাহার ভাগ্যে সে গারদবাসের অবসর হয় তাহার জীবনে সংশয়। পাঁড়ে, দোবে, চোবের অত্যাচারে, অর্থপিশাচদিগের অমানুষিক ব্যবহারে প্রাণ আর বাঁচে না। তবে যাহার আত্মীয়-স্বজন আছে, দুটাকা সেলামী—গারদ-সেলামী দিবার সাধ্য আছে, তাহার পক্ষে দুই একদিন একটু নরমে যায়। তাহারপরেই হাড় ভাজাভাজা হয়। প্রাণ যাই যাই করে। মানুষের কঠিন প্রাণ—বিশেষ বিপদগ্রস্ত, বিপদাপন্ন ব্যক্তির কষ্টের জীবন। সহজে প্রাণ বাহির হয় না। তাহাতেই কেনীর গারদের কয়েদী—কাজী সমসের আলী এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণের প্রাণ আজ পর্য্যন্ত বাহির হইয়া সংসারচক্রের জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পায় নাই। হায়! কি দুঃখের কথা! বিনাপরাধে কয়েদ। পৈতৃক সম্পত্তি লিখিয়া দেয় নাই, তাহাতেই এই বিপদ—গারদে আবদ্ধ। দ্বারে দ্বারে খাড়া পাহারা। হায়! কেমন করিয়া লিখিয়া দিবে? কোন হাতে, কোন কলমে, কোন

কালিতে, কোন কাগজে লিখিয়া দিবে? পৈতৃক সম্পত্তি, যাহার আয়ের প্রতি নির্ভর করিয়া কতজনার প্রাণ বাঁচিতেছে। কত বিধবার জাতি, ধর্ম্ম রক্ষা পাইতেছে। কত পিতৃহীন বালকের একমুঠো ডালভাতের সংস্থান রহিয়াছে। কত পুত্রহীনা বৃদ্ধার জীবনোপায়ের উপায় রহিয়াছে। কোনপ্রাণে বিনাপণে লিখিয়া দিবে? আবার প্রাণেও আর সহ্য হয় না। কষ্টের দিন শীঘ্র যায় না। সে রজনী শীঘ্র প্রভাত হয় না। এ সকল সহিয়াও সমসের আলী ভ্রাতুষ্পুত্রগণসহ আজ ছয়মাস বন্দী। সেই যে বসন পড়িয়া শয়ন করিয়াছিল, সেই যে বিছানা হইতে হাত পা রাখিয়া, নিশীযোগে ডাকাতের ন্যায় কেনীর লাঠিয়াল সমসের আলীর বাড়িতে পড়িয়া, শয়নঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া কুঠিতে আনিয়াছে। ভ্রাতুষ্পুত্রগণ বৃদ্ধ খুড়ার উদ্ধারহেতু কুঠিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক আসিয়া ধরা পড়িয়াছে, ফাঁদে আটকিয়াছে, গারদখানায় নীত হইয়া বৃদ্ধ খুড়ার সহিত যন্ত্রণার একশেষ ভোগ করিতেছে। ক্ষৌরী কার্য্য নাই। চুল বাড়িয়াছে, হাতপায়ের নখ বাড়িয়া সেই এক বিশ্রীভাব ধারণ করিয়াছে। চিন্তায়, ভাবনায়, পেটের জ্বালায় অস্থি-চর্মসার হইয়াছে। যাহাদের বীরত্ব কুষ্টিয়া অঞ্চলে প্রসিদ্ধ, সেই সকল বীরবাহুগণ, বীরশ্রেষ্ঠ বীরগণ অন্নাভাবে ক্ষীণকায় এবং হীনবল হইয়া জরাগ্রস্ত চিররোগীর ন্যায় গারদের মধ্যে পড়িয়া জীয়ন্ত মৃত্যুযাতনায় অস্থির হইয়া ছটফট করিতেছে। কে দেখে? কে জিজ্ঞাসা করে? সূর্য্য-অস্ত না হইলে আর দ্বার খোলা হয় না। পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হইলেও কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞেস করে না। কাছে আসে না, একঘটী জল এগিয়ে দেয় না। খুড়া—ভাইপোয়ে অতি ক্ষীণস্বরে কথাবার্ত্তা হইয়া সাব্যস্ত হইয়াছে যে, আর কতকাল এভাবে থাকিব। সাহেব যে প্রকারে লিখাপড়া করিতে চাহে, দিয়া চল অন্যদেশে ভিক্ষা করিয়া জীবন রক্ষা করি। পরিবার প্রতিপালন করি। এ-কষ্ট আর সহ্য হয় না। এ-যন্ত্রণা আর প্রাণে সয় না। সম্পত্তির জন্যই যখন এতকষ্ট তখন আর সে সম্পত্তিতে লাভ কি? বিপদসাগরের একমাত্র কাণ্ডারীই নগদ অর্থ বা ভূসম্পত্তি। ভাগ্যক্রমে আমাদের সেই সম্পত্তিই আমাদের কাল হইয়াছিল। সম্পত্তি ছিল বলিয়াই এতকষ্ট। পৈতৃক বিষয়বিভব ছিল বলিয়াই আজ আমরা কেনীর গারদে। সন্ধ্যার পর দরজা খুলিবেই, একঘটী করিয়া জল দেওয়া—ওটা একটা ভান মাত্র। দুবেলা দুবার দরজা খোলার কারণই এই যে, আমরা কোন কৌশলে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করি, কি

পারদে কয়েদী অবস্থাতেই থাকি, কি নূতন কোনরূপ ঘটানোর মন্ত্রণার চেষ্টা করি। অবশ্যই দরজা খুলিবে সেইসময় বলিয়া দিব যে, আমাদের বিষয়াদি, বাড়িঘর সমুদায় লিখিয়া দিতে রাজী আছি। আমাদিগকে কয়েদখানা হইতে বাহির কর। প্রাণ বাঁচাও।

সময়মত জীবনদাতার নিকটে মনের কথা জানাইলেন। কিন্তু কোনই ফল হইল না। অবশ্যই সে তাহার কর্তব্যকার্য্য করিয়াছে। প্রধান কার্য্যকারক হরনাথ মিশ্রীর নিকট বলিয়াছে। কোনই ফল হইল না। হরনাথ মিশ্রী, শম্ভু সান্যাল প্রভৃতি কার্য্যকারকগণ মহাঅস্থির—সপ্তাহকাল সাহেবের সঙ্গে দেখা হয় না। কেনী শয়নকক্ষ হইতে আর নীচে নামিয়া আইসেন না, উপরেই থাকেন। কি ভাবে থাকেন, তাহা কাহারও জানিবার ক্ষমতা হয় না। যে কেনী সাংসারিক কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত, সর্ব্বদা প্রস্তুত। মুহূর্তের জন্যও সংসার ভুলে না। আজ সপ্তাহ-কাল একেবারে নিরব। আরদালী, চাপরাসী দ্বারা খবর পাঠান হইয়াছে কোন উত্তর আইসে নাই। কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কেনীর হুকুম "আমার বিনাদেশে আমার নিকট কেহ না আইসে।" সে আদেশ ঠেলিয়া কারসাধ্য সে-দিকে পা ধরে। কাজেই সকলে মহাব্যস্ত। পাংশার ভৈরববাবুকে লইয়াই এখন চলিতেছে। কত মাব পেঁচ, পেঁচাও বুদ্ধির পাক নায়েবমশায়ের মাথায় ঘুরি-তেছে। কত মিথ্যা প্রবঞ্চণার বৃহৎকনা সকল নীলকরের চাকরের মরুভূমিসদৃশ মনক্ষেত্রে চাকচিক্য দেখাইয়া, মনিবের মনভাবের কারণ অব্যক্ত অজ্ঞাতহেতু চিন্তা-বায়ুর ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া কোথায় পড়িতেছে, তাহার কিছুই ঠিকানা হইতেছে না। কুল-কিনারা পাইতেছে না। এতদিন কয়েদের পর সমসের আলী পৈতৃক সম্পত্তি যোলআনা বিনাপণে লিখিয়া দিতে রাজি হইয়াছে। সে কথাও জানাইতে পারিতেছেন না। একেবারে নিষেধ। কেহ কোনকথা লইয়া তাঁহার বিনানুমতিতে কে তাহার সম্মুখে যায়।

মেমসাহেবের আসিবার দিনও অতিনিকট হইয়া আসিতেছে। প্রথম বিলাতেব পত্র, তাহারপর কলিকাতার পত্র পাওয়া গিয়াছে। সেও প্রায় দশ বার দিন। বাতাসের জোর নাই বলিয়া, বজরা-নৌকা আসিতে বিলম্ব হইয়াছে। সকলেরই অনুমান এই যে, অদ্য লাগাদসন্ধ্যা অবশ্যই বজরা ঘাটে লাগিবে। নিতান্ত পক্ষে না আসিলে কাল আর কিছুতেই পথে থাকা সম্ভব নহে।

টি. আই. কেনী আজ সপ্তাহকাল নির্জ্জনে বাস করিতেছেন। বিষয়বিভবের কথা ভুলিয়াছেন, মামলা-মোকদ্দমার কথা ভুলিয়াছেন। শয়নকক্ষের দরজা বন্ধ কি কারণে, তিনিই জানেন। যাঁহার স্ত্রীর মনের ভাব বুঝিয়া পাঠকগণের নিকট প্রকাশ করিতে উদাসীন পথিকের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে, সে স্ত্রীর, স্বামীর মনোগত ভাব বুঝিবার পথিকের ক্ষমতাই নাই। কেনী কয়েকদিন হইতেই বিষাধিত, চিন্তিত, ভাবিত। সময় সময় সাদা চক্ষু সাদা জলে পরিপূরিত। কারণ কি? সে সুদীর্ঘ গোঁপ এবং গালপাট্টা সংযুক্ত ধবল মুখ এত মলিন হওয়ার কারণ কি? সে নিটোল, নিরেট বিলাতী মজ্জাপূর্ণ বৃহদাকার মস্তক সর্ব্বদা বালিশের আশ্রয়ে থাকিবার কারণ? সে রক্তরাগ পরিপূর্ণ হৃদয়-মধ্যে সর্ব্বদা জাগে কি? সাধ্য নাই—বুঝিবার সাধ্য নাই! উদাসীন পথিকের বুঝিবার সাধ্য নাই। সহস্র অবলার অঙ্গাবরণ হরণকালে যে হৃদয় একটুও নড়ে নাই, শত-সহস্র প্রজার ঘরের চালের আগুন দেখিয়া যে হৃদয়ে ব্যথা লাগে নাই—জ্বালাও, লাগাও, লুটিয়া লও, এই সকল হুকুম করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া বঙ্গের নিরীহ প্রজার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন, কুল-বধুর বস্ত্রহরণ ইত্যাদি মহাপাপ কার্য্য দেখিয়া যে বিলাতী হৃদয়ে কিছু মাত্র দয়ার সঞ্চার হয় নাই, যে চক্ষু ঐ সকল মহামারী ঘটনা দেখিয়া একটু নীচে নামে নাই, সে চক্ষে জল! গণ্ডস্থল ভাসিয়া বালিশ ভিজিতেছে। পালঙ্গের গদি ভিজিতেছে, ইহার মর্ম্ম কে বুঝিবে? তবে কি যে কারণে মহাবিদ্বান অপদস্থ, বুদ্ধিমান নিরস্থ, পূণ্যবান অধস্থ, ধনবান বিপদগ্রস্ত, বীরশ্রেষ্ঠ মহাবীর পরাস্ত, সেই কারণেই কি এই কারণ?—যাক যাহা নির্ণয় করিতে অক্ষম, আলোচনা নিস্প্রয়োজন। মনের কথা কে জানে? যে জানে, সে জানে, যে বুঝে তাহার গোপন করাই কর্ত্তব্য। উভয়েই বন্দী, কেহ ইচ্ছায় কেহ অনিচ্ছায়।

দ্বাবিংশ তরঙ্গ

মিলন

অনুমান মিথ্যা হইল। মিসেস কেনী সেদিন আসিয়া পৌঁছিলেন না। প্রধান প্রধান কার্য্যকারকগণের দ্বিতীয় একটি চিন্তার কারণ হইল। আজিকার দিনও যায় যায়। কিন্তু কুঠির আমলা, চাকর, নেগাহবানগণ সকলেই দেখিল যে, কেনী পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিয়া শয়নগৃহের সম্মুখস্থ, ফুলবাগানে ধীরে

ধীরে বেড়াইয়া বেড়াইতেছেন। বাগানের সংলগ্ন কালীগঙ্গা, দুই একবার ফিরিয়া ঘুরিয়া কালীগঙ্গার তীরে যাইয়া দক্ষিণমুখী হইয়া দূরবীন দ্বারা কি যেন দেখিতেছেন। হরনাথ মিস্ত্রী সময় বুঝিয়া বন্দী কাজী সমসের আলীকে লইয়া বাগানের গেটের নিকট যাইয়া দাঁড়াইলেন। কেনী দ্বিতীয়বার ঘুরিয়া আসিতেই হরনাথের উপর নজর পড়িল। একটু ত্রস্ত-পদে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, খবর কি? কাজীসাহেব এবেশে কোথা হইতে আসিলেন।

হরনাথের মুখে কথা ফুটিতে না ফুটিতেই কাজী সমসের আলী বলিতে লাগিলেন সাহেব! তোমাব যেরূপ ইচ্ছা হয় লিখিয়া লও। আর আমরা বাঁচি না। আর প্রাণে সহ্য হয় না।

কেনী একটু মুচকিয়া হাসিয়া উত্তর করিলেন—কি হইয়াছে? আপনি এতদিন আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই কেন? এতদিন কোথায় ছিলেন? ভাল আছেন তো? লোকে আগে বুঝে না, শেষে পায় ধরিয়া কান্দিতে থাকে। আচ্ছা আর আমার কোন আপত্তি নাই। সকলই মিটিয়া যাইবে—লিখাপড়া কল্যই হইবে। আব আপনাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না।

কাজীসাহেব বলিলেন—ব্যস্ত আমরাই এখন বেশী হইয়াছি। প্রাণের মায়া বড় মায়া। আর অধিক কি বলিব! পৈতৃক তালুক, জোত ইত্যাদি স্থাবর-অস্থাবর যাহা কিছু আছে, সমুদায় লিখিয়া লইয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া দিন। আর বাঁচি না। দোহাই আপনার! প্রাণ গেল—আর বাঁচি না।

কেনী বলিলেন—"বাঁচি না. বাঁচি না" করিতেছেন, আগে বুঝেন নাই কেন? আচ্ছা, আজ কোনকথা হইবে না। বোধহয় মেমসাহেব এখনই আসিয়া পৌঁছিবেন। আমি তাঁহার বজরার মাস্তুল দেখিতে পাইয়াছি। বোধহয় কুঠির বজরাই আসিতেছে আপনি এখন আপনার বাসস্থানে গমন করুন। কাল লিখা-পড়া হইবে—আজ দিব্বি আহার করিয়া শয়ন করুন গে।

কাজী সাহেব মাথা হেঁট করিয়া বলিতে লাগিলেন—অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে। বরাতে যাহা আছে তাহাই আহার করিব। কোন পাপে ইহা ঘটিল—খোদায় মালুম। আর আপনাকে কি বলিব। চলিলাম, আপনার গুদাম ঘরেই চলিলাম।

কেনী মুচকি হাসির আভা দেখাইয়া আবার নদীর তীরে যাইয়া দূরবীন

চক্ষে ধরিলেন। দেখিলেন, এবারে স্পষ্ট দেখিলেন। সেই বজরা—সেই তাঁহারই কুঠির বজরা। যে বজরায় মেমসাহেব কলিকাতায় গিয়াছিলেন। সুবাতাস পাইয়া পাইলভরে জল কাটিয়া স্রোত ঠেলিয়া যেন উড়িয়া আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে বজরা নিকটবর্ত্তী হইল, পাইল পড়িয়া গেল সকলেই দেখিল মেমসাহেব ছাতের উপর ইজিচেয়ারে কুঠির দিকে তাকাইয়া আছেন। মুহূর্তমধ্যে বজরা ঘাটে লাগিল। লাগিবামাত্র সিঁড়ি পড়িল। টি. আই. কেনী ত্রস্ত-পদে যাইয়া প্রিয়-তমার হস্ত ধারণ করিলেন। কমলমুখীর কমলদলসদৃশ মুখমণ্ডলের সুখবোধ-স্থানে বার বার চুম্বন করিলেন। এবং প্রাণ প্রতিমার দক্ষিণহস্ত বামবগলে চাপিয়া ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া ফুলবাগানে প্রবেশ করিলেন। মেমসাহেবের আসবাব, লওয়াজিমা ঘরে উঠিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাদেবী জগৎ অস্বীকার করিয়া লোকের চক্ষুজ্যোতি হরণ করিলেন। বিরামদায়িনী নিশা সমাগতা হইয়া পুরাতন দম্পতির বিচ্ছেদের পর মিলনসুখের সুযোগ করিয়া দিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চন্দ্রমা হাসিতে হাসিতে, তারাদল ফুটিতে ফুটিতে সময় সময় মিটিমিটি ভাবে চাহিতে চাহিতে, বিমানরাজ্যে বিহার করিতে করিতে ক্রমে রজনীর শোভাবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। পুরাতন-দম্পতি বিশ্রামগৃহে, মখমলমণ্ডিত-কৌচে উপবেশন করিয়া হাসিমুখে নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

সোনাউল্লার স্ফূর্ত্তি দেখে কে? সর্দ্দার বেহারার ছুটাছুটির অন্ত পায় কে? দেয়ালগীর, ল্যাম্প, লণ্ঠন, হাতবাতি যেখানে যাহা প্রয়োজন মনের আনন্দে জ্বালিয়া দিয়া মেমসাহেবের শয্যার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল।

নিয়মিত সময় সাহেব, মেমসাহেব আহারাদি সমাপন করিয়া আপন আপন শয্যায় গমন করিলেন। মিসেস কয়েকমাস পরে কুঠিতে আসিয়াছেন। পরিবর্তন-শীলা জগতে পরিবর্তন কথা নূতন নহে। মিসেস কেনী রাত্রিবাস পরিধেয়ে অঙ্গ ঢাকিয়া পালঙ্কে বসিয়াছেন। মনে নানাকথা উদয় হইয়াছে। স্বামীর হাবভাব, চাকরদের মুখভাব দেখিয়া তাঁহার মনে মনে নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার অনুপস্থিতকালে, বিশেষ কোন ঘটনা যেন ঘটিয়া গিয়াছে। কি ঘটিল? কি হইল? এমন ঘটনা কি? কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনেক চিন্তা করিলেন, কোন কিছুই স্থির হইল না। স্বভাবতঃই হউক কি চিত্তের বিকারেই

হউক, কি দশ-বারদিন নৌকায় থাকা গতিকে মাথার দোষেই হউক, স্থির করিলেন, একটি স্থির করিতে দশটির প্রমাণ পাইলেন। প্রথম বজরায় স্বামীর করস্পর্শ—সে পরশে যেন তাঁহার শরীর রোমাঞ্চ হয় নাই, সে অপূর্ব্ব বিজলীছটা শরীরের নানাস্থানে খেলা করিয়া যেন হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নাই। সে অপূর্ব্ব রসময় প্রেম-চুম্বনে প্রেমানুরাগ যেন বৃদ্ধি করে নাই। বজরার সিঁড়ি হইতে নামিবার সময়, হরিহরআত্মা হইয়া নামিয়াও প্রেমউল্লাসে মন গলিয়া যায় নাই। কারণ কি ? তাইতো একত্র একাসান বসিয়াও হৃদয়কমল, অনুরাগ প্রতিভায় যেন সম্পূর্ণ বিকশিত হয় নাই। গায়ে গায়ে মিশিয়া একত্র আহারেও যেন পূর্ব্বের ন্যায় সুখ বোধহয় নাই—তৃপ্তি জন্মে নাই। সুমধুর স্যাম্পিনের গ্রাস স্বামীহস্তে গ্রহণ করিয়াও যেন মন খোলে নাই। কারণ কি অনেক চিন্তা করিলেন, অনেক কথা মনে তুলিলেন, কিছুতেই মন বুঝিল না। শান্তিসুখে মন ভরিল না—মজিল না। কেন এমন হইল ? দোষ কাহার ? লজ্জিত হইলেন। নিকটস্থ বৃহৎ দর্পণে মুখখানি ভাল করিয়া দেখিলেন। লজ্জায় অধোমুখী হইয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। উপস্থিত চিন্তার সমালোচনার ফল প্রকাশ হইতে বাকি রহিল না। সে মনোবেগ আমাতে প্রবেশ করিবে, আমার মনোবেগ তাঁহাতে যাইবে। ইহাতে নিশ্চয়ই বোধহইল দোষ তাঁহার ? তাঁহারই মনে যেন কি বসিয়াছে। স্বামী-হৃদয়েই যেন কি পশিয়াছে। পুরুষের হৃদয়-কন্দরে প্রবেশ করিতে কতক্ষণের কাজ। চিন্তা কি ? আজ নাহয় কাল, কাল নাহয় পরশু, বুঝিতেই পারিবে। কয়দিন গোপনে থাকিবে ? রাত্রিও অধিক হইয়াছে। কয়েকদিন জলের উপর থাকিয়া এখনও যেন মাথা ঢুলিতেছে। একটু ঘুমাই।

ত্রয়োবিংশ তরঙ্গ

অধঃপাতের সূত্রপাত

ময়নার মৃত্যুর পর জকি প্রায়ই সুন্দরপুর যাইত। দুই-তিনদিন থাকিয়া আবার আসিত। জকির প্রতি টি. আই. কেনীর বিশেষ অনুগ্রহ। ময়নার মৃত্যুর পর জকির ইচ্ছাধীন চাকুরী হইয়াছে। জকী অভাবে কোন কাজকর্ম্ম আর বন্ধ থাকে না। গুদামের চাবি, দানার গোলার চাবি জমাদারের হস্তে গিয়াছে। জকির ছোট স্ত্রী মাখনা সপত্নীর নিকট যে কয়েকটি কথা শুনিয়াছিল, তাহা তাহার প্রতিবর্ণ অন্তরে বসিয়া গিয়াছে। জকিকে দেখিলেই মাখনার শরীরে আগুন

জ্বলিয়া উঠে। মাখনা ভ্রূকুঞ্চিত করে, চক্ষু পাকল করে, ভার ভার মুখখানি আরও ভারি করিয়া সরিয়া যায়। জকির মুখ দেখিতেই একেবারে নারাজ। কি করে, উপায় নাই। আর কি করিতে পারে?

ভারতে স্ত্রীর নিকট স্বামীর বড়ই মান ও আদর। বড় করিয়া কথা কহিতেও ভয় করে। স্বামী দেবতা, স্বামী অন্নদাতা, স্বামী বিধাতা, স্বামী ত্রাণকর্তা,—স্বামীই বুদ্ধি, স্বামীই বল, স্বামীই সকল, স্বামী পদসেবা করাই কুলস্ত্রীর প্রধান ধর্ম্ম। জকি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, সুন্দরপুরের কোন লোক আজ আসিয়াছিল? মাখনা বলিল—"একটি লোক আসিয়াছিল। তোমার নাম করিয়া ভাই! ভাই! বলিয়া, কয়েকবার ডাকিয়া কোথায় চলিয়া গেল। বাটিতে কেহই ছিল না আমি কোনকথার উত্তর দেই নাই।"

জকি রোষভরে বলিল—"এমন হতভাগিনী তো আর দেখি নাই যে, আমি বাটিতে নাই বলিয়া কি আর কাহার সহিত কথা কহিতে নাই? তোদের তো বুদ্ধি নাই। তোরা মানুষও নহিস। বনের পশুও নহিস। একটি কাজ নষ্ট হইয়া গেল।" মাখনা বলিল—"আমি কি জানি, তোমার সহিত তাহার কি কাজ। ভাই ভাই করিয়া ডাকিল, আমি বেড়ার আড়ালে থাকিয়া দেখিলাম সে একা নহে। তাহার সঙ্গে আরও একটি লোক আছে। আর সেই লোকটির বগলে কাপড়ে জড়ান একটা ভারী কি জিনিস আছে। অনেক ডাকাডাকি করিয়া বগল হইতে কাপড়ের পুঁটলি মাটিতে ফেলিতেই বোধহইল যেন কতকগুলি পয়সা কি টাকাই একত্রে বান্ধা।"

জকি শুনিয়াই অস্থির। প্রকাশ্যে বলিতে লাগিল—"তোদের কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান নাই! আমি সাহেবের কুঠিতে থাকিয়া দেখিতেছি, নূতন কোন সাহেব আসিলে মেমসাহেব নিজে যাইয়া আগু বাড়াইয়া আনেন। দুইজনে চুমা খাওয়া হয়, গলায় গলায় মিশিয়া হাত ধরাধরি হয়। তোরা কোন কার্য্যের নহিস। কেবল ঘোমটা—তোদের কেবলই ঘোমটা।"

"আমি গরিব, দুঃখী বাঙালীর মেয়ে। বাঙ্গালা আমাদের দেশ। আমার দেশের চাল-চলন যাহা আছে তাহাই করিব। সাহেব বড়লোক, দেশের রাজা। তাঁহারা যাহা করেন, আবার সে সকল দেখিয়া দরকার কি? আমি গরিব মানুষ, মেমসাহেবের মত ব্যবহার করিতে আমার ক্ষমতা নাই। হইবেও না।"

"আমি জানি, যে আমার ঘরের লক্ষী ছিল সে চলিয়া গিয়াছে।"

"সে চলিয়া গিয়াছে না বাঁচিয়াছে। তোমার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। তুমি টাকার লোভে তাহার সঙ্গে যে ব্যবহার করিয়াছ, তাহাকে যে পথে চালাইয়াছ, যে প্রকারে বাঘের মুখে—মানুষ-বাঘের মুখে ধরিয়া দিয়াছ তাহা সকলি শুনিয়াছি। তুমি টাকা হাতে পাইলে না পার এমন কোন কুকাজ দুনিয়া-জাহানে নাই। সে কি করিবে? তোমার হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় ছিল না। নিজের প্রাণ নিজে দিতেও কতদিন সে প্রস্তত হইয়াছে, পারে নাই। নিরুপায় হইয়া তোমার অত্যাচার সহিয়াছে। স্বামী হইয়া যাহা করিয়াছ, ভালই করিয়াছ। সে পাপের ভোগ তোমাকে কোনদিন ভোগ করিতেই হইবে। তা যা করিয়াছ ভালই করিয়াছ। আমি তোমার দুখানি পায় ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিতেছি, আমার বাপ-মায়ের বাড়িতে আমাকে পাঠাইয়া দেও। আমার মন বড়ই অস্থির হইয়াছে। অনেকদিন হইতে মাকে দেখি না—বাবাও আর এখানে আসেন না। তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য আমার মন বড়ই উচাটন হইয়াছে। আমি খোদার নাম করিয়া বলিতেছি, এখানকার কোনও কথা আমি কাহারও নিকট বলিব না। আমাকে শীঘ্রই পাঠাইয়া দেও। কিছুদিন পরে আমি আবার আসিব। তুমি না পাঠাও তাহাদিগকে খবর দিলে তাহারা আমাকে লইয়া যাইবে।"

জকির মুখে কথা নাই। যে কথা কেউ জানে না—মনের অগোচর, স্বপ্নের অগোচর, সেই কথা তুলিয়া এতকথা বলিল। জকির গা দিয়া ঘাম ছুটিল। রোষভাব বহুদূর সরিয়া গিয়া লজ্জায় মাথা নিচু হইল। কালমুখ আর কাল হইয়া গেল। এই সময় বাটি হইতে কে উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিল, 'ভাই জকি বাড়িতে আছে?'

জকি গলার আওয়াজেই চিনিতে পারিয়া ভাঙ্গাস্বরে উত্তর করিল—ভাই! বাড়ির ভিতরে আইস। আমার ঘরের লক্ষ্মী আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। এখন এক অলক্ষ্মীর হাতে পড়িয়াছি—আর আমার ভালাই নাই।

আগন্তুক বাড়ির মধ্যে উপস্থিত। জকি আদর করিয়া একখানি পিঁড়ি আনিয়া দিল, আগন্তুক ভ্রাতা ছাতি, লাঠি সম্মুখে রাখিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসিল। তখনই তামাক, তখনই হাত-পা ধুইবার জল, তখনই জলযোগের (নাস্তার) খই, বাতাসা ভাইয়ের সম্মুখে দিয়া ময়নার মরণকথা অতি সংক্ষেপে বলিয়া নানা-

প্রকার দুঃখ করিতে লাগিল।

আগন্তুক বলিল—'ভাই! দুঃখ করিয়া আর কি লাভ হইবে! সেকি আর ফিরিয়া আসিবে? যে ভালহয় সে থাকে না। এখন কথা শুন! আমি আবার এখনই যাইব। বড় জরুরী কাজ।"

"কথা তো শুনিয়াইছি, আমিও প্রস্তুত আছি। তবে কথাটা কি জান? আশা অনেকেই দেয়, কার্য্য-উদ্ধারের জন্য অনেকেই কথা বলিয়া থাকে। কার্য্য শেষ হইলে বুঝিতেই পার—তুমি বা কে আমি বা কে?"

"সে কি কথা! তুমি কি আমাকেও অবিশ্বাস কর?"

জকি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিতে লাগিল। "না—না তাও কি হয়। তোমায় অবিশ্বাস করিব? তাও কি হয়।"

"তবে আর আপত্তি কি? আব দেখ তোমাকেই তো আগে বিশ্বাস করিয়াছে। কিছুই হয় নাই। কাজের কিছুই হয় নাই। আগেই তোমার হাতে একটি নয়, দুইটি নয়, দশটি নয়, পাঁচশত দিয়াছে। আর চাই কি? অৰ্দ্ধেক তো হাতেই আসিয়াছে। আবার আমিও কিছু আনিয়াছি। এরপর যাহা বাকি থাকিবে, তুমি আমার নিকট হইতে লইও। তুমি জানিও, এদিকের চন্দ্র ওদিকে গেলেও সে ঘরের কথা, একটুও এদিক-ওদিক হইবে না। এখন তুমি পারিলে হয়। আর আমি বেশীক্ষণ তোমার বাটিতে থাকিব না। এই টাকা আর এই সেই জিনিস নেও, যত শীঘ্র হয় করিবে। আমি চলিলাম।"

জকি টাকার তোড়া এবং কাঠের ছোট একটি কৌটা ত্রস্তে ভাইসাহেবের হস্ত হইতে লইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল। ভাইসাহেবও ত্রস্তপদে বাড়ির মধ্য হইতে বাহির হইয়া সরিয়া পড়িলেন।

জকি ঘর হইতে বাহির হইয়া স্ত্রীকে বলিল—"তুমি প্রস্তুত হও, আমি বেহারাবাড়ি চলিলাম আজই তোমাকে পাঠাইয়া দিব।"

জকি বাড়ির বাহির হইয়া মনে মনে স্থির করিল যে, এই বালাইকে আর এখানে রাখিব না। আজ আমাকে বলিল, কাল আর একজনকে বলিবে, ক্রমেই কথা প্রকাশ হইবে। ভাল হইল, কিছুদিন বাপ-মার বাড়ি গিয়া থাকুক।

চতুর্বিংশ তরঙ্গ

বিষ

জকি স্ত্রীকে বাপেরবাড়ি পাঠাইয়া কুঠিতে হাজিরা দিতে আসিয়াছে। সে-দিন নাই, সে-কাল নাই, সে আদর নাই, জকির সে খাতির নাই। জকির নামে কাহার ভয়ও নাই। প্রতিদিন হাজিরা দিতে হয়। নিয়মিত সময় উপস্থিত না হইলে, মেমসাহেবের বকুনি খাইতে হয়। কিন্তু মেমসাহেবের কামরা ব্যতীত জকির সকলস্থানেই যাওয়ার অধিকার আছে। সেটা এখনও বারণ হয় নাই।

অন্যকক্ষে সাহেব-মেম উভয়ে ব্রাণ্ডিপানীর স্বাদ লইতেছেন। মিসেস কেনী পূর্ব্বে ব্রাণ্ডির নাম শুনিতে পারিতেন না—এবারে বিলাত হইতে আসিয়া খুব চালাইতেছেন। সকল সময় হাসি-খুশী-বাজনায় গানে সময় কাটাইতেছেন।

জকি মেমসাহেবের নিকট হাজিরা দিয়া সেলাম বাজাইয়া বিদায় হইল। কিন্তু বাড়িতে আসিল না। একবার নীচে একবার উপরে, একবার বাবুরচিখানায়, একবার সাহেবের লিখিবার ঘরে, এইরূপে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। জকি যেন মনে মনে কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। কোন জিনিস খুঁজিবার ভাব নহে। সময় খুঁজিতেছে। সুযোগের সন্ধান করিতেছে।

খানসামা, সর্দ্দার বেহারা সকলেই আপন আপন নির্দ্দিষ্টস্থানে বসিয়া নানা-প্রকারের গল্প ফাঁদিয়া বসিয়াছে। জকি পুনরায় উপরে আসিল। খানার মেজ সাজান। সাহেব-মেম অন্য কামরায়। খুব হাসি-তামাসার রগড় চলিতেছে। জকি ক্রমে ক্রমে খানার কামরায় উপস্থিত। চারদিকে তাকাইয়া অগ্রসর, আবার তাকাইয়া আরও অগ্রসর—চারদিক দেখিয়া দাঁড়াইল। কোমরের খুঁট হইতে একটা কৌটা বাহির করিল। কৌটার পরিচয় আর বিশেষ করিয়া কি দিব। সেই কৌটা ভায়ের-দত্ত কৌটা। কৌটা হইতে কি যেন উঠাইয়া চা-দানির মধ্যে ফেলিয়া দিল। চা-দানির সরপোষ দিয়া পূর্ব্বমত ঢাকিতেই ভয়ে হাত কাঁপিয়া উঠিল। সরপোষের প্রতিঘাতে একটু শব্দ হইল। ঠিকভাবে পূর্ব্বমত সরপোষ বসিল না। ভাল করিয়া পূর্ব্বমত ঢাকিতেও আর সাহস হইল না। তাড়াতাড়ি অন্য দরজা দিয়া নীচে নামিয়া গেল। সোনাউল্লা, সর্দ্দার বেহারার খোশ-গলপে মন মাতাইয়া বসিয়াছিল। খানারকামরা মধ্যে হঠাৎ একটি শব্দ হইয়া তাহার কানে গিয়াছিল। কিন্তু উঠিয়া আসিয়া দেখা, কি, কি কারণে শব্দ তাহার কারণ অনুসন্ধান করা তত

আবশ্যক মনে করিল না। কারণ মুখ ফিরাতেই দেখিল যে, জকি সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিতেছে। আর কোনরূপ সন্দেহের কারণই হইবার কথা নহে। জকি ঘরের চাকর, সাহেবের বিশ্বাসী ও ভালবাসার। অন্যলোক হইলে তখনই উঠিত। কি কারণে শব্দ হইল তাহার অনুসন্ধান করিত। জকিকে চিনিয়া আর উঠিল না। কান পাতিয়া রেঙ্গুনের গলপ শুনিতে লাগিল।

কিছুক্ষণপরেই মেমসাহেবের হাত ধরিয়া কেনী খানারকামরায় আসিলেন। সোনাউল্লা, বেহারা প্রভৃতি চাকরেবা হাজির। খানার বাসনের সরপোষ উন্মোচন হইল। ছুরি-কাঁটা চলিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে স্যাম্পিনের কাক ফুটিতে আরম্ভ হইল। প্লেট বদল হইতেছে। ছুরি চলিতেছে। গ্লাস উড়িতেছে। একটির পর একটি খাদ্য উদবে ঢুকিতেছে। পবস্পব কথাবার্তাও হইতেছে, উচ্চহাসি, মৃদুহাসি উভয়েব মুখেই দেখা দিতেছে। পাকা একঘন্টাব পব আহার শেষ হইল। এখন "চা" খাওয়ার পালা। সোনাউল্লা চা-দানির নিকট গিয়া দেখে যে, চা-দানির সরপোষ নিয়মমত বসান নাই। কোন অজানালোক সব-পোষটি চা-দানির উপর রাখিয়া গিয়াছে সন্দেহ হইল। সোনাউল্লার মনে সন্দেহ হইল। হঠাৎ সেই শব্দের কথা মনে পরিল। সোনাউল্লা অনেক বিবেচনা করিয়া সাহেবের নিকট যোডহাতে বলিতে লাগিল—"হুজুব, ! এই চা-দানির সরপোষ আমি যেভাবে রাখিয়াছিলাম, ঠিক সেইভাবে নাই। আর একটি কথা—আমি বাহিরে বসিয়া ঘরের মাঝে একটি শব্দও শুনিতে পাইয়াছিলাম। সেইসময় জকি এই ঘর হইতে পাশের দরজা দিয়া বাহির হইয়া নীচে নামিয়া গিয়াছিল। তাহাও দেখিয়াছি। আমার মনে সন্দেহ হইতেছে। যেই হউক চা-দানির সরপোষ উঠাইয়াছে!"

সাহেব চা-দানির নিকট যাইয়া বলিলেন—"জকি খানারকামরায় আসিয়া চা-দানি নাড়িবে কেন?"

সোনাউল্লা বলিল—"সে তো চিরকাল খানারকামরায় আসিয়া থাকে।"

মিসেস কেনী বলিলেন—"খানার ঘরে তাহার কাজ কি? সে এখানে কেন আসিবে? তোমরা এ ঘরে তাহাকে আসিতে দাও কেন? শুনিয়াছি যে, সে ঘরের কাজের চাকর। তার যে কি কাজ, তাহা আমি দেখি নাই। অথচ সে ঘরের চাকর—কি অন্যায় কথা।

মেমসাহেব চা-দানি হইতে, প্যালায় চা ঢালিয়া কেনীকে দেখাইলেন—চায় আসল রং নাই। একটু ময়লা ময়লা রং! বেশী কড়া হইলেও এরূপ হয় না। টি. আই. কেনীর মনে সন্দেহ হইল। প্যালার চার মধ্যে এক টুকরা রুটি ভিজাইয়া মেমসাহেবের কুকুরকে খাইতে দিলেন। টরী লেজ নাড়িতে নাড়িতে চপর চপর শব্দে বিষাক্ত রুটি উদবস্থ করিল। কেনী ঘড়ি ধরিয়া খানারকামরা-তেই বসিয়া রহিলেন। ত্রিশ মিনিট অতীত হইতে টরী ভারী-অস্থির হইল। এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, একখানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। গড়াগড়ি দেয়। অস্বাভাবিক স্বরে খেউ খেউ করে। খানসামা, খেদমতগার, বাবুরচির মুখ শুকাইয়া গেল। একঘন্টা পূর্ণ না হইতে টরী মাটিতে হাত-পা ছড়াইয়া পড়িয়া গেল। গড়াগড়ি পড়িয়া হাউ-মাউ করিতে করিতে একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া গেল। সোয়া-ঘণ্টার মধ্যে কুকুরের চেতনা রহিত, মৃত্যু।

কেনী ক্রোধে অধীর হইয়া জমাদারকে ডাকিয়া বলিলেন—"যত সর্দ্দার, বরকন্দাজ, লাঠিয়াল আমার চাকর আছে, এই মুহূর্তে যাইয়া জকিকে বান্ধিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত কর।"

জমাদার সেলাম বাজাইয়া, তখনই লাঠি ঘাড়ে করিয়া ছুটিল। জকির প্রতি কেহই সন্তুষ্ট ছিল না। অনেকে পূর্ব্ব-দাদ তুলিতে সর্দ্দারের সঙ্গি হইয়া জকিকে ধরিয়া আনিতে চলিল। কেনী—সোনাউল্লা, সর্দ্দার, বেহারা, বাবুরচি, মশালচি, পাখাওয়ালা সমুদায় চাকরকে আটক করিয়া রাখিলেন।

জমাদারদিগকে জকির বাড়ি পর্যন্ত যাইতে হইল না। জকি কুঠিতেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সাহেবের খানাখাওয়া হইলে ছটফটি দেখিয়া সুন্দরপুর যাইবে মনস্থ করিয়াছিল। তাহা আর ঘটিল না। ঈশ্বর টি. আই. কেনীকে রক্ষা করিলেন। একজনের চক্ষে পড়িতে পড়িতে জকি দশজনের চোখে পড়িয়া ধৃত হইল। বন্ধন-অবস্থায় সাহেবের নিকট আনীত হইল, সাহেব দালানের খাম্বার সহিত বান্ধিতে আদেশ করিয়া, শ্যামচাঁদ বাহির করিয়া আনিতেই জকি বলিতে লাগিল—হুজুর! আমাকে প্রাণে মারিবেন না। আমি যখন ধরা পড়িয়াছি আমার জীবন শেষ হইয়াছে। আপনার যা ইচ্ছা হয় করুন।

টি. আই. কেনী কিছুতেই ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দুই চার ঘা মারিতেই জকি বলিতে লাগিল—আমি বিষ দিয়াছি। ধর্ম্মবতার! আমি

চার মধ্যে বিষ মিশাইয়া দিয়াছি। বিষের কৌটা এখনও কোমরেই আছে। সাহেব প্রহার ক্ষান্ত দিয়া কোমরের কাপড় খুলিতে খুলিতে কৌটা পড়িয়া গেল, আর জকিকে প্রহার করিলেন না! বন্ধন অবস্থায় একটি কক্ষে তালাচাবি দিয়া বন্ধ করিবার আদেশ দিলেন। আরও আদেশ করিলেন যে, এই রাত্রেই জকির বাড়ি, ঘর, দ্বার ভাঙ্গিয়া কালীগঙ্গায় ভাসাইয়া দেও। মালামাল, টাকাকড়ি যাহা থাকে, সমুদায় কুঠিতে লইয়া আইস।

আদেশ মাত্র রামইয়াদ, ধনইয়াদ, লছমীপৎ সিং, রামলাল তেওয়ারী, কুড়ান, জুড়ান, নবীন প্রভৃতি প্রধান প্রধান সর্দ্দার, দেশওয়ালী উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। কুঠির বাজে চাকর যাহারা চিরকাল জকির নামে হাড়েচটা তাহারাও লাঠিয়ালদিগের সঙ্গে যাইয়া জকির বাড়ি লুট আরম্ভ করিল।

জকির স্ত্রীর পূর্ব্বেই পিতার বাটিতে গিয়াছিল। বাটিতে কয়েকজন চাকর মাত্র ছিল। কে কোথায় পালাইল, তাহার আর সন্ধান হইল না।

টি. আই. কেনীর চক্ষে সে রাত্রে নিদ্রা নাই। কুকুরের দশা যাহা স্বচক্ষে দেখিলেন, নিজের অবস্থাও তাহাই ঘটিত—এই সকল চিন্তা করিয়া আরও নানা-প্রকার কথা মনে উঠিল। চিন্তিতভাবেই সে রাত্রি কাটিয়া গেল।

প্রত্যুষেই প্রধান কার্য্যকারক হরনাথকে ডাকিয়া জকির অবস্থা বলিলেন। আর আদেশ করিলেন যে, তুমি নিজে যাইয়া দেখ, জকির সমুদায় ঘর ভগ্ন হইয়াছে কিনা। যদি না হইয়া থাকে—একেবারে সমভূমি করিয়া কালীগঙ্গায় ফেলিয়া দিও। বাড়ীর নিশান মাত্র না থাকে। এবং ভিটায় চাষ দিয়া এখনই নীল-বুনানি করিয়া আসিবে ইহার কোন বিষয়ে ক্রটি না হয়।

হরনাথ সেলাম বাজাইয়া মনিবের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে চলিলেন। সাহেব পুনরায় ডাকিয়া বলিয়া দিলেন। আর একটি কথা। মুসলমানেরা কবরকে বড় মান্য করে। কোন কবরের উপর যেন চাষ দেওয়া না হয়। সাবধান! আমি এখনই জকিকে পাবনায় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট চালান করিব।

হরনাথ পুনরায় সেলাম করিয়া বিদায় হইলেন। টি. আই. কেনী পাবনার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত লিখিয়া জকিকে বন্ধন করিয়া পাবনায় পাঠাইয়া দিলেন।

পরে জকির স্বীকৃত-জবাবে বিষ পরীক্ষার পর সেসনের বিচারে জকির

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডাজ্ঞা হইল। জকির স্ত্রী পিতা-মাতার বাড়ি থাকিয়া স্বামীর অবস্থা শুনিয়া কান্দিয়া, নাকের নথ, হাতের চুরি সমুদায় খসাইয়া ফেলিল। জকির প্রসঙ্গ, জকির দ্বীপান্তর গমনের সঙ্গে সঙ্গে একেবারে শেষ হইয়া গেল।

পঞ্চবিংশ তরঙ্গ

ভৈরববাবু

পাংশা স্টেশনের নিকটেই ভৈরববাবুর বাড়ি। ভৈরববাবু বনিয়াদীবাবু। যে সময়ের কথা, সে সময় বাবুর সংখ্যা বড়ই কম ছিল। বাবু বলিতে ভৈরব-বাবু। বিশেষ মান্য-গণ্য, বনিয়াদী-ঘরানা, সচ্চবিত্র, সৎ-স্বভাব, সকলেব প্রিয় যিনি, তিনিই বাবু নামে পরিচিত হইতেন। শুধু আলবার্ট কেতায় চুল কাটাইয়া সিঁথির বাহার উড়াইলে সে সময় বাবু হওয়া যাইত না। বাবুর বাজার বড়ই কড়া ছিল। ভৈরববাবু যথার্থ বাবু। ভৈরববাবুকে জব্দ করাই এখন কেনীর মতলব। মীরসাহেব ভৈরববাবু সম্বন্ধে অনেক বলিয়াছেন। বাবুকে বিশেষ কোনরূপ বিপদগ্রস্ত না করিয়া তাঁহাকে একটু জব্দ করাই কেনীর নিতান্ত ইচ্ছা। সকলেই বলে ভৈরববাবু ভারি চতুর, বুদ্ধিমান, সহজে ঠকিবার পাত্র নহেন। কেনীর তাহা সহ্য হয় না। বাঙ্গালী বুদ্ধিমান, বাঙ্গালী সুচতুর, বাঙ্গালী বিচক্ষণ-একথা কেনীর সহ্য হয় না। ভৈববাবুকে আচ্ছা করিয়া জব্দ কবিয়া সাধারণকে দেখাইবেন, বিলাতী চাল চালিয়া বাবুকে মাত করিবেন, এই আশাতেই বড় সাবধানে ব'ড়ে টিপিতেছেন। বাবুও কম নহেন আত্মরক্ষায় খুব সাবধান হইয়াছেন। তিনিও তুখোড় খেলোয়াড়, সহজে পড়িতেছেন না।

কেনীর প্রধান গোয়েন্দা ফটিক, আর হরিদাস। ফটিক প্রায়ই ফকির-বেশে গোয়েন্দাগিরি করে। হরিদাস বৈরাগী সাজিয়া খমক বাজাইয়া মনিবের কার্যোদ্ধার জন্য গান করিয়া বেড়ায়। সময় সময় খনজনীও বাজায়। ভিক্ষাও করে।

ভৈরববাবুর চাকরেরা সন্ধানে জানিয়াছে যে, এবারে লাটের কিস্তির খাজনা যশোহরে যাইতেই, যে কৌশলে হউক পথ হইতে কেনী লুটপাট করিয়া লইবে।

বাবুও সে কথা শুনিয়াছেন।

খাজনা দাখিলের দিন নিকটে আসিল। আমলারা সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল যে, বাবু খাজনা পাঠানোর কোন উপায় করিলেন না। পক্ষে

কেনী এবারে নিশ্চয়ই টাকা লুটিয়া লইবে। তাঁহার ইচ্ছা এই যে, টাকা লুটিয়া লইলে, যশোহরের খাজনা দাখিল হইবে না। মহাল লাটে উঠিবে। যত টাকাই হউক, নিলাম ডাকিয়া খরিদ করিবে। বাবু সে-বিষয় কোনই যোগাড় করিতেছেন না। কেনী যে দুরন্তলোক—সে যাহা মনে করিয়াছে তাহা করিবেই, করিবে। সম্পত্তি নিলামে উঠিলে কি আর রক্ষা আছে? কার সাধ্য কেনীর সম্মুখে নিলাম ডাকে? কোন কোন পাঠক বলিতে পারেন, কথাটা এমন গুরুতর নহে। নোট খরিদ করিয়া ডাকে পাঠাইলেই তো হইতে পারিত। সে সময় নোটের চলতি এত ছিল না। ডাকবিভাগের অবস্থাও এত ভাল ছিল না। মহকুমা ব্যতীত গ্রামে গ্রামে ডাকঘরও ছিল না। টাকারই কারবার। নগদ টাকারই বেশী চলতি।

ভৈরববাবুর বৈঠকখানা অতি পরিস্কার। ফরাসের চাদর, বড় বড় তাকিয়ার খোল পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। বাবু বড় একটি তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন। সোনা-বান্ধান, রূপা-বান্ধান হুঁকাগুলি, ধুতরাফুলে কলকি ও রূপার সরপোষ মাথায় করিয়া বৈঠকের উপর বসিয়া আছে গুড়গুড়িও মজলিসে স্থান পাইয়াছে। শ্যামাদানে বাতি জ্বলিতেছে, দুই একটি দেয়ালগিরি ও নারিকেল-তেলে জ্বলিতেছে। ভৈরববাবু বড় শৌখিন, সঙ্গীতবিদ্যায় মহাপণ্ডিত। প্রতিদিনই সন্ধ্যার পর সঙ্গীত শাস্ত্রের আলোচনা হয়। অদ্যও হইতেছে। প্রধান শিষ্য মাধবচন্দ্র রায় তানপুরা লইয়া, সুরট, মল্লার খেয়াল ধরিয়াছেন। বাবুর মধ্যম পুত্র দেববাবু পাখওয়াজ বাজাইতেছেন। পিতার নিকটেই শিক্ষা, অন্যান্য শিষ্য অপেক্ষা পাখ-ওয়াজ-তবলায় দেববাবুর হাত খুব খুলিয়াছে। চমৎকার বোল উত্তরিয়াছে। অশ্লীলতা শ্রুতি-দোষ, দোষভাবাপন্ন কোনপ্রকার গান তাঁহার বৈঠকখানায় স্থান পাইবার অধিকার ছিল না।

প্রধান কার্য্যকারক মহাশয় সেলাম বাজাইয়া দণ্ডায়মান হইলে, ফরাসের এক-পার্শ্বে বসিতে অনুমতি পাইলেন। সে সময় আর খাজনা পাঠানোর কথা কহিতে অবসর পাইলেন না। কেনীর চক্রান্তের কথাও বিশেষরূপে বাবুকে বুঝাইয়া বলিতে পারিলেন না। সেদিন বড় জাঁকাল-মজলিস। প্রাচীন নগর দিল্লী হইতে বিখ্যাত কালওয়াত খাজা খাঁ আসিয়াছেন। মাধববাবু গান শেষ করিয়া তানপুরা রাখিলেন। খাজা খাঁ বৃহৎ এক তানপুরা লইয়া, সাত আটবার সেলাম বাজাইয়া তানপুরা ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন।

খাজা খাঁ দেখিতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, মাথায় সাদা পাগড়ি, দাড়িগুলিও সম্পূর্ণ সাদা—পাগড়ি, দাড়ি আর দন্ত এই তিনটি সাদা জিনিসেই সকলের দৃষ্টি পড়িতেছে। তানপুরার আড়াল, ঘোর কৃষ্ণবর্ণের চেহারায় খাজার সাদা জিনিস কয়েকটি ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইতেছে না।

খাজা খাঁ মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গান করিলেন। তুশ বাহাব পড়িতে লাগিল। খাজা খাঁও সেলাম বাজাইতে বাজাইতে অস্থির হইয়া পড়িলেন। কালওয়াতজিব গান শেষ হইলে মাধব রায় পুনবায় গান ধরিলেন। রায়জি মাথা মুখ হাত নাড়িয়া গলাবাজী কবিতে ক্রটি কবিলেন না। খাজা খাঁ পর্য্যন্ত রাযজিকে বাহবাব বাতাসে খুব দোলাইয়া দিলেন। বাঙ্গালীব মুখে বাঙ্গালাদেশে এই প্রথম তানলয় পরিশুদ্ধ গান আজ শ্রবণ কবিলেন। রায়জির আনন্দের সীমা নাই। মজলিস ভাঙ্গিয়া গেল। তানপুবা খোলে পুরিয়া কালওযাতজি বিশ-পঁচিশবাব সেলাম বাজাইয়া বাসায় চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মজলিসের অধিকাংশ লোক বাহিবে আসিল। কার্য্যকাবক মহাশয় বসিয়াই বহিলেন। তিনি আর উঠিলেন না।

ভৈরববাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন কথা আছে নাকি?

কার্য্যকারক মহাশয বলিলেন—হুজুব! কেনীব কথা তো ক্রমেই বেশি বেশি শুনিতেছি। পথে পথে লোক রাখিয়াছে। গোয়েন্দা রাখিয়াছে। শুনিতেছি লাটেব খাজানা যশোহরে লইযা যাইতেই সুযোগ ও সুবিধামত—দিনে হউক বাত্রে হউক, যে উপায়ে হউক লুটিযা লইবে। সর্ব্বদা সন্ধানী লোক ঘুরিতেছে। কে কোন বেশে, কোন সুযোগে যে আমাদেব কাজকর্ম্মেব সন্ধান লইতেছে তাহার কোন সন্ধান পাইতেছি না। অথচ আমরা এখানে যেদিন যে কার্য্য করিতেছি, তাহার খবব প্রতি মুহূর্তে সাহেবের নিকট যাইতেছে। আশ্চর্য্য! এমন লোক কে আমাদের এখানে আসা যাওয়া করে যে, তার কল্যাণে এখানকার কোন কথাই আর গোপন থাকে না—যে পরামর্শ, যে গুপ্ত-মন্ত্রণা করা হয়, অমনই প্রকাশ হইয়া পড়ে। এখন উপায় কি? লাটের দিন অতি নিকট, কোন পথে, কি উপায়ে টাকা পাঠাইব তাহার কোন উপায় করিতে পারিতেছি না। অন্য কিছু নয়, খাজানার টাকা। দেখুন কি আশ্চর্য্য কথা! যে পথে টাকা পাঠান সাব্যস্ত করি, অমনি সংবাদ আসিয়া পড়ে যে, সন্ধানীরা সে পথেও ঘুরাফিরা করিতেছে। সন্ধি-

পথে সাহেবের গুপ্ত লাঠিয়াল নিয়োজিত হইয়াছে। যে বেশেই হউক, যেভাবেই হউক তাহারা গম্যপথে বাধা দিবেই দিবে। টাকাও কাড়িয়া লইবে।

ভৈরববাবু বলিলেন—আমিও সে বিষয় না ভাবিতেছি তাহা নহে। ঈশ্বর রক্ষা করিলে কিছুতেই মার নাই। সেই একমাত্র বল ভরসা। যাহা হউক আগামী পরশু দিবস নিশ্চয় টাকা রওয়ানা কবিব। ঈশ্বর রক্ষা না করিলে আর উপায় কি? আমাদের যেরূপ সংসার, আয় হইতে ব্যয়ের ভাগই অধিক। খাজানাগুলি মারা গেলে বিষয় রক্ষা কবিবার আর কোন উপায়ই দেখিতেছি না। লাটের খাজনা যদি সাহেবের হস্তগত হয় তবে বিপদের একশেষ দেখিতেছি। কোথা হইতে আবার টাকা সংগ্রহ করিব। কাজেই একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে। সর্ব্বস্ব যাইবে। ঈশ্বব আছেন!

ভৈরববাবু এই সকল কথা বলিতেছেন, এমন সময় দুইজন বাহক বড় বড় দুইটি ঝাঁকা-পূর্ণ, নূতন হাঁড়ি মাথায় করিয়া বৈঠকখানার মধ্যে উপস্থিত, ভৈরব-বাবু তাহাদিগকে দেখিয়াই—উঠিলেন, এবং কার্য্যকাবক মহাশয়কে বলিলেন রাত্রও অধিক হইয়াছে। খাজানা পাঠানোর সমুদায় বন্দোবস্ত কাল কবিব। আপনি বিশ-পঁচিশজন ভাল ভাল লোকের জোগাড় কবিয়া রাখিবেন। এই কথা বলিয়াই বাবু বাহকদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া বৈঠকখানা হইতে চলিয়া গেলেন।

ষড়বিংশ তরঙ্গ

খাজানার চালান

রাত্র প্রভাত হইবার বেশি বিলম্ব নাই। চোকগেল পাখি জগতের পাপ-তাপ সহিতে না পারিয়া 'চোক গেল চোক গেল' করিয়া রব করিতেছে। কেনীব গোয়েন্দা ছদ্মবেশে তখনও ঘুরিয়া ঘুরিয়া সন্ধান লইতেছে। গোয়েন্দা একজন ফকির একজন বৈরাগী যেখানে যাহার সহিত কেনিব শত্রুতা-বিবাদ সেইখানেই গোয়েন্দা, সেইখানেই গুপ্ত-সন্ধানী। সেইখানেই তাহাদের গমন। ফকিরকেও লোকে ভক্তি করে, বৈরাগীকেও শ্রদ্ধা করে, ভিক্ষাও দেয়। ফকির, বৈষ্ণবের প্রতি কাহারও কোনপ্রকারের সন্দেহ হইতে পারে না। বিশেষ গ্রাম্য-জমিদার—তায় আবার বহুকালের কথা। সেকাল আর একাল অনেক প্রভেদ। দেউড়িতে নেগাহবান থাকিলেও প্রবেশ-প্রস্থানে তত মনযোগ নাই। বেশি কড়াকড়ি,

আঁটাআঁটি নিয়মও নাই। অনায়াসেই বাহির আঙ্গিনায়, পূজার প্রাঙ্গণে—ইচ্ছা করিলে অন্দরখণ্ডেও ফকির, বৈষ্ণব যাইতে পারে। কোন বাধা নাই।

গোয়েন্দা যে সংবাদ পায়, সুযোগ মত অনুচর, সহচর, সঙ্গীলোক দ্বারা সমুদায় খবর কুঠিতে পাঠায়। এখন ভৈরববাবুর বাড়িতে বৈরাগী বাবাজির আগমন। চারদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধান লইতেছেন। ইতিপূর্ব্বে আরও কয়েকদিন বৈরাগীঠাকুর বাবুর বাড়িতে যাইয়া ভিক্ষা আনিয়াছেন। সুযোগ আর সময় পাইলে অন্দর মহলে গিয়াও দুই একটি গান শুনাইয়া পাড়ার ছেলেমেয়ে একত্র করিয়া ভিক্ষা করেন। আজ বৈরাগী শেষ নিশিতে উঠিয়া তিলক-চন্দন ফোঁটা কাটিয়াছেন, গায়ে হরিনামের মার্কা মারিয়াছেন। করতাল বাজাইয়া হরিনাম করিতে করিতে ভৈরববাবুর বৈঠকখানার সম্মুখ হইয়া চলিয়া যাইতেছেন এবং তাঁহার কর্ত্তব্য-কার্য্য করিতেছেন

দেখিলেন যে বাবু অন্দরমহল হইতে বাহির হইলেন। সঙ্গে সাত আটজন ভারী বাঁক ঘাড়ে করিয়া বাহির হইল। বাঁকের দুইদিকে তোড়া বোঝাই। দেখিতে অল্প, কিন্তু খুব ভারী। বাঁক বাহকের ঘাড়ে দুলিয়া পড়িয়াছে। দেউড়ির পরেই সদর দরজায় আসিলে আটজন দেশওয়ালী ঢাল-তরবারি বান্ধা, গোঁপে তা দেওয়া বড় বড় পাগড়ি মাথায় বান্ধা—ভারীদিগকে মাঝে করিয়া ছাতি ফুলাইয়া আগেপিছে চলিল। বাড়ির বাহির হইলেই ভৈরববাবু বৈঠকখানায় আসিলেন। বৈরাগীও প্রভাতী গাইতে গাইতে অন্য আর এক বাড়িতে চলিয়া গেল।

সূর্য্যোদয় হইতে হইতে দেশওয়ালীরা ভারীসহ গ্রামের বাহির হইয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িল। বৈরাগীও অন্য আর একপথ দিয়া তাহাদের সঙ্গী হইল। দেশওয়ালীরা সকলেই বৈরাগীকে চিনিত। মনিব বাড়িতে প্রায়ই দেখিয়াছে। বিশেষ আসিবার সময়েও প্রভাতে প্রভাতী গাইতে শুনিয়াছে।

রাম সিং জিজ্ঞাসা করিল—"ঠাকুর! এদিকে কোথায় যাওয়া হইবে?

বৈরাগী হাঁটিতে হাঁটিতে—উত্তর করিতে করিতে চলিল—"বাবাজি! একবার ঝিনদর দিকে ভিক্ষায় যাইব ইচ্ছা আছে।"

রাম সিং বলিল—"আচ্ছা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চল। এ-পথে একটু ঘুরা হইবে, তা হ'ক, একসঙ্গে সকলেই কথায়-বার্ত্তায় যাইব।"

বৈরাগী বলিল—"বাবা! আমি ভিখারী, একমুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে

ঘুরিয়া বেড়াই। তোমরা বাবা বড়লোকের চাকর, তোমাদের সঙ্গে যাওয়া আমার সাধ্য নাই। আমি যে কতদিনে যাইব তাহারও ঠিক নাই। ভগবান যে পথে লইয়া যাইবেন সেই পথেই যাইব।

রাম সিং বলিল—"আচ্ছা ঠাকুর! আজিকার দিনতো একত্রে যাই।" নানাকথায় এবং কথার উত্তর-প্রত্যুত্তর, অপর কথা, উড়তি কথা, বাজে আলাপ করিতে করিতে সকলেই যাইতে লাগিল। সকলেই একদম খুব হাঁটিলেন। হাঁটিতে হাঁটিতে রৌদ্রের উত্তাপে গলদঘর্ম্ম হইয়া রাস্তার পাশের একটি বটগাছ তলায় সকলেই দাঁড়াইলেন। হাঁফ ছাড়িলেন। ভারীগণ ভার নামাইয়া গামছার বাতাস খাইতে লাগিল। কেহ কেহ আবশ্যকীয় কার্য্য করিতে গেল। রাম সিং প্রভৃতি নেগাহবান মাটিতে বসিয়া কাঁধের ঝোলান বাটুয়া বাহির করিয়া খর্সান তামাকে চুন মিশাইয়া হাতের তালুতে আঙ্গুলি-দ্বারা টিপিতে লাগিল। কেহ গাঁজার ভাঁটা বাহির করিয়া কাটাছেঁড়ায় মন দিল, বৈরাগী ভিক্ষার ঝুলি নামাইয়া 'গৌর-নিতাই হরি বোল' শব্দে শ্রান্তি দূর করিল।

রাম সিং বলিল—"বাবাজি ত্বরিতানন্দ সেবা হবে কি?"

বৈরাগী বলিল "না বাবা! আমি ও সকল আনন্দে আনন্দিত নই। পেটের ভাত জোটাইতে পারি না, তার উপর আবার আনন্দ করবো!"

"আচ্ছা বাবা! আনন্দ নাই করলে, একটি গান কর শুনি। বেশ ছায়ায় বসিয়াছি। বড় জোরে এই তিনক্রোশ পথ হাঁটিয়া আসিয়াছি, বড়ই মেহনত হইয়াছে। বাবাজি! একটি গান গাও শুনে মনটা স্থির করি।"

রাম সিং প্রভৃতি খুব দম কষিয়া ত্বরিতানন্দের সেবা করিল। চক্ষু লাল হইয়া উঠিল। দুই একবার কলিকা ফেরা-ঘোরার পরেই পুনরায় রাম সিং বৈরাগীকে গান করিবার অনুমতি করিলে, বৈরাগী ঝোলা হইতে খনজনী বাহির করিয়া চাটি দিয়া গান আরম্ভ করিলেন। রাম সিং না বলিলেও বৈরাগী বাধ্য হইয়া গান ধরিত। সুযোগ পাইতে ছিল না বলিয়া ক্ষান্ত ছিল।

বৈরাগী খুব বড়স্বরে গাইতে লাগিল—

"ওরে ললিতে কি বিশাখা, একবার এনে দেখা,
মলেম মলেম প্রাণে না হেরিয়া বাঁকা।

আমরা তো জানিনা তোরাই তো জানালি,
এমন সরল প্রেমে কেন গরল মাখালি"—ইত্যাদি—

রাস্তার উভয়-পার্শ্বস্থ গ্রামেই বৈরাগীর গলার আওয়াজ প্রবেশ করিল। ছোটবড় ছেলেমেয়ে কেহ অর্দ্ধবসন, কেহ শূন্য-বসনে আসিয়া গাছতলায় যাইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু দশ বারজন লাল পাগড়িওয়ালা ঢাল-তরবার বান্ধা সেপাই দেখিয়া একটু দূরে দাঁড়াইল। একেবারে গা-ঘেঁষা হইয়া নিকটে আসিল না। দূরে দাঁড়াইয়া বৈরাগীর গান শুনিতে লাগিল। একটি গান শেষ হইতে না হইতেই রাম সিং, পাঁড়ে পুনঃ অনুরোধ করিল, বাবাজি! দোসরা আর একটি গান হউক। খুব ভাল গান।

বৈরাগীর অভিলাষ এখনও পূর্ণ হয় নাই। যে উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে গান এখনও তাহা সফল হয় নাই। মহাব্যস্ত হইযা চতুর্দ্দিকে চাহিতেছেন। ক্রমে গ্রামের অনেকে বটতলায় আসিয়া গান শুনিতে লাগিল। বৈরাগীও চারিদিকে তাকাইযা গান গাইতেছেন। তিনি যে মুখ দেখিতে ইচ্ছা করেন, সে মুখ দেখিতেছেন না। কাজে কাজে গানও থামিতেছে না। দেখিতে দেখিতে ঐ জনতার মধ্যে মনোমত রূপ দেখিলেন। তাহার উদ্দেশ্য সফল হইল। তাড়াতাড়ি সে গানটি সারিয়া নূতন-তালে আর একটি নূতন গান ধরিলেন—

গান

"তোমরা যাও সবাই এখন ঘরে ফিরে রে!
আমি যাই রে, ওরে এসেছি এই ভবে একা, একা যেতে হল রে॥"

—কেহই ফিরিয়া গেল না। একমনে বৈরাগীর গান শুনিতে লাগিল। তবে একজন ফকির ঐ গোলের মধ্যে দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছিল, সে তখনই চলিয়া গেল। আর দাঁড়াইল না। ত্রস্তপদে জনতা ভেদ করিয়া রাস্তার বামপার্শ্বে নামিয়া গ্রাম ধরিল। বৈরাগী দুই তিনবার গানটি আওড়াইয়া যখন দেখিল ফকির সম্পূর্ণরূপে চক্ষের আড়াল হইল—গানভঙ্গ দিয়া খনজনী ঝোলায় বন্ধ করিলেন।

রাম সিং সঙ্গীদিগকে—বাহকদিগকে বলিতে লাগিল—"চল ভাই চল খুব ঠাণ্ডা হুয়া, আবার চল, দেখি কত দূর যাইতে পারি।" ভারীরা ভার ঘাড়ে ঝুলাইল। দেশওয়ালীরাও পূর্ব্বমত ভারীদিগের অগ্র-পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। বৈরাগী বাবাজিও জোরে জোরে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন।

সপ্তবিংশ তরঙ্গ

আশ্চর্য্য ডাকাতী

পাংশা গ্রাম হইতে যশোহর জেলা অন্যূন ৩৫ ক্রোশ ব্যবধান। পাংশা হইতে যে সময়ই কেন বওনা হউক না যশোহব যাইতে তাহাকে পথে একরাত্রি প্রবাস থাকিতেই হইবে। ভৈববববাবুর আর একটি কাছারি পাংশা হইতে চোদ্দ-পনেরো ক্রোশ ব্যবধান। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে রাম সিং, পাঁড়ে প্রভৃতি টাকা লইয়া কাছারিতে উপস্থিত হইল। কাছাবিব কার্য্যকাবক ভৈরববাবুব উপদেশপূর্ণ পত্র পূর্ব্বেই পাইযাছিলেন। কেনী টাকা লুটিয়া লইবে তাহাও পত্রে লিখা ছিল। কর্ম্মচারী টাকার তোড়াগুলি স্বহস্তে অতি সাবধানে কাছারি-গৃহের মধ্যস্থ বড একটি সিন্দুকে বাখিয়া তালাচাবি ভালরূপে পবীক্ষা কবিযা চাবি বন্ধ করিলেন। টাকার শব্দ না হয় বলিযা বিশেষ সতর্কতার সহিত সিন্দুকে তোডা বোঝাই করিলেন। এবং সকলকে বলিলেন, একরাত্রি কষ্টে-স্থষ্টে সকলকেই জাগিযা থাকিতে হইবে। সাবধানের মার নাই, অসাবধানে শতবিঘ্ন। অদৃষ্টে যাহাই থাকুক আজ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিতে হইবে। তোমবা সকালে সকালে আহাবাদিব জোগাড় করিয়া আহার শেষ করিয়া আইস। কাছাবিব নেগাহবানগণকেও নায়েব মহাশয় বিশেষ সাবধান করিয়া দিলেন যে, তোমরাও শীঘ্র শীঘ্র আহাব কবিযা আসিবে। আজ রাত্রি বড় ভয়ানক বাত্রি। বড সাবধানে—বড় সতর্কে থাকিতে হইবে। আর অতিরিক্ত যে কয়েকজন লোককে রাখা হইয়াছে তাহাবাও মায় হাতিয়ার, সড়কি, লাঠি, সুলফী লইয়া সমস্ত বাত্রি বাঁধাকোমরে থাকিয়া পাহারা দিবে। আমিও তোমাদেব সঙ্গে জাগিয়া থাকিব। এই সকল বিলি-বন্দোবস্ত করিয়া নায়েব মহাশয় দেশওয়ালী, বরকন্দাজদিগের আহারের জোগাড় করিয়া দিলেন। রাম সিংএর অনুগ্রহে বৈরাগীঠাকুরও চাউল, দাউল, তরকারী ইত্যাদি আহার্য্য-সামগ্রী প্রাপ্ত হইলেন। সকলেরই আহারের সুব্যবস্থা নায়েব মহাশয় করিয়া দিলেন। বৈরাগী আহার-অন্তে নায়েব মহাশয়ের নিকট আসিয়া পরিচিত হইলেন। নায়েব মহাশয় স্বয়ং টাকার সিন্দুকের উপর শয্যা রচনা করিয়া হুঁকা হাতে করিয়া বসিয়া কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। বৈরাগী ঠাকুরকে সিন্দুকের নিকট বসাইয়া ধর্ম্ম কাহিনী শ্রবণ করিতে মন দিলেন। ধর্ম্ম কথার পর হরি গুণগান শ্রবণে নায়েব মহাশয়ের নিতান্তই ইচ্ছা হইল। বৈরাগীকে বলিলেন, বাবাজি! আমি রাম সিংএর নিকট শুনিয়াছি আপনার

শ্যামা বিষয় সংকীর্তনে বেশ ক্ষমতা আছে। যদি সত্য হয় তবে শুধু শুধু বসিয়া রাত্রি জাগরণ অপেক্ষা আমোদে থাকা মন্দ কথা নয়। ঈশ্বরের নামও হইবে, পাহারার কার্য্যও চলিবে।

বৈরাগী বলিলেন—"বাবাজি! কথাটা ভালই শুনালেন কিন্তু, বলি কি রাত্রি জাগরণটা বড ভয়ানক কথা। আর এই সকল সিপাই-বাবাজিরা সারাদিন হাঁটিয়া যে পবিশ্রম করিয়া আসিয়াছে এখন কি আর জাগরণেব সময়? যেই বিছানায় পডিবে অমনি ঘুমাইবে।"

নায়েব মহাশয় বালিশে ঠেস দিয়া তামাক টানিতেছেন আর বাবাজিব সহিত আলাপ করিতেছেন। নাযেব মহাশয়ের অনুরোধ বাবাজি ঠেলিতে পারিলেন না। খনজনী বাহিব করিয়া আরম্ভ কবিলেন। খনজনীর চাটায় শব্দ অনেকদূর যাইয়া ফকিবের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। রাত্রের শব্দ দিন অপেক্ষা বহুদূরে যাইতে লাগিল। বৈরাগী অনেকক্ষণ খনজনী বাজাইয়া গান আবম্ভ করিল।

গান

"আয় মা সাধন-সমরে।
দেখবো মা হাবে, কি পুত্র হারে॥
অশ্বারোহণ করিয়ে কালীসাধন রথে, তপ-জপ দুটো অশ্বযুতে তাতে,
দিযে জ্ঞান ধনুকে টান, ভক্তি ব্রহ্মবাণ বসেছি ধ'রে॥
মা দেখ্‌বো তোমার বাণে, শঙ্কা কি মরণে,
ডঙ্কা মেরে লব মুক্তিধন—
তাতে রসনা ঝঙ্কাবে, কালী নাম হুঙ্কারে,
কার সাধ্য আমার বলে রণ॥
বাবে বারে বল তুমি দৈত্যজয়ী, এই আমার বাণ, এস ব্রহ্মময়ী,
ভক্ত রসিকচন্দ্র বলে, মা তোমারই বলে,
জিনবো তোমারে॥"

গানটি শেষ হইলেই বাবাজি তামাক ইচ্ছা করিয়া নায়েব মহাশয়ের হস্তে কলিকা দিলেন। রাম সিং প্রভৃতিরা শরীরের বেদনা তাড়াইতে কষে গাঁজায় দম দিয়া জাগিতে জাগিতে ঘোর-নিদ্রায় নাক ডাকাইয়া পাহারা দিতে লাগিল। সর্দ্দারেরা লাঠিখানি বগলে করিয়া "একটু কাৎ হই" বলিয়া নিদ্রায় অভিভূত

হইল। জাগরণের মধ্যে কেবল নায়েব মহাশয় আর বৈরাগী বাবাজি। বৈরাগীর মনেও নানা কথা, নায়েব মহাশয়ের মনেও নানা কথা—এবারকার পূজার খরচটা উপরি-টাকায় করিবেন মনে করেছিলেন। প্রজারা বাদী হওয়ায় তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বিবাদী প্রজাগণকে কি কি কৌশলে জব্দ করিবেন সেও এক প্রধান চিন্তা। সে জমাখরচটা কাছারিতে দাখিল করিয়াছেন তাহার সমুদায় খরচ মঞ্জুরা পাইবেন কিনা, সেও এক প্রধান চিন্তা। তার নেয্য খরচ একভাগ, আর তিনভাগই মিথ্যা। অনেক ফর্দ্দে ঠিক নামাইতে বেঠিক করিয়াছেন। কোন স্থানে শুন্য বেশী করিয়া দিয়া নামাইয়া রাখিয়াছেন। কিছু কিছু বাজেয়াপ্ত হইলেও আসলে মার নাই। সদরের আমলাগণকেও রীতিমত রূপচাঁদ সহায়ে সেলাম বাজাইয়া আসিয়াছেন। সময় সময় পাঁঠা, ঘৃত ইত্যাদি দিয়াও তাঁহাদের মন যোগাইয়াছেন। বাবুর চক্ষে পড়িলে ধরা পড়িবেন এইটি মহা চিন্তা। তাহারপর কেনীসাহেব যে কাছারি লুট করিয়া খাজানা লুটিয়ে লইয়া যাইবে সে চিন্তাটাই বেশী চিন্তা। লুটিবে কথায় চিন্তিত হন নাই। লুটিলেও ভাল না লুটিলেও ভাল। যদি লুটই হয়, তবে লুটের বাহানায় কিছু কিছু সরাইয়া আত্মসাৎ করিবেন। কোন কোন জিনিস এবং নগদ তহবিলের সমুদায় সরাইবেন কি কিছু রাখিবেন ও কাগজপত্রগুলো একেবারে পোড়াইয়া ফেলিবেন কি জলে ডুবাইবেন, তাহাও স্থির করিতে পারেন নাই। লুট হইলেই ভাল। আরও কিছু লাভ না হয়, মোকদ্দমা খরচে বেশ একহাত মারিতে পারিবেন।

পুনরায় বৈরাগী বাবাজিকে বলিলেন বাবাজি। গানটি বড় চমৎকার। আর একবার গানটি হক। গানটি বড় মিষ্টি।

যত রাত শেষ হইতেছে ততই বৈরাগীর চিন্তা বাড়িতেছে। সহযোগী-ফটিক (ফকির) কুঠিতে গিয়া টাকা রওয়ানা সংবাদ সময়মত সাহেবকে দিতে পারিয়াছে কি না? এ কথাও তাঁহার চিন্তার এককথা। পুনর্ব্বার খনজনীতে ঘা দিয়া "আয় মা সাধন সমরে" বলিয়া প্রথম ধুয়া ধরিতেই 'হো হো' শব্দে লাঠিয়ালেরা মশাল জ্বালিয়া ডাক ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে কাছারিঘরে আসিয়াই নায়েব মহাশয়কে চক্ষের পলকে বাঁধিয়া ফেলিল।

বৈরাগী বাবাজি সঙ্কেতে দেখাইয়া দিল যে ঐ সিন্দুক। সঙ্কেত করিবা মাত্র কুঠারাঘাতে সিন্দুক খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। সিন্দুকস্থ টাকার তোড়া

লাঠিয়ালেরা বাহির করিয়া সঙ্গিয় বাহকগণের মাথায় দিয়া ডাক ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে কাছারিঘরের বাহির হইয়া পঞ্চাশজন সর্দ্দার সঙ্গে দিয়া টাকা কুঠিতে পাঠাইয়া দিল। অবশিষ্ট দুইশত লাঠিয়াল কাছারির অন্য অন্য ঘরের জিনিস পত্র লুটপাট করিয়া লইতে লাগিল। রাম সিং প্রভৃতি সর্দ্দারদিগকে লাঠির আঘাত, সড়কির গুতায় জাগাইয়া তুলিল। সকলেই নিদ্রার ক্রোড়ে অচেতন। গুতা খাইয়া থতমত হইয়া উঠিয়া পড়িল। কিন্তু কেহই কিছু করিতে পারিল না। বাবাজি ঘরের সকল জিনিস জোরে জোরে বাহির করিয়া আনিয়া লাঠিয়ালদিগের সম্মুখে রাখিতে লাগিল। কাছারি লুট করিয়া লাঠিয়ালেরা দলবদ্ধ হইয়া কাছারির সম্মুখ-সীমায় মশাল জ্বালিয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া ডাক ভাঙ্গিতে লাগিল। কাছারির কোন লাঠিয়াল আর অগ্রসর হইল না। কে কোথায় পালাইয়াছে তাহার সন্ধান নাই। সাহেবের লাঠিয়ালেরা অনেক ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং গালিগালাজ দিয়া মশাল জ্বালিতে জ্বালিতে চলিয়া গেল। শেষে রাম সিং, হনুমান সিং, বেতবন হইতে বাহির হইয়া "ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া" করিয়া নায়েব মহাশয়ের বন্ধনদশা মোচন করিল। আর আর সকলে যাহারা পলাইয়াছিল, কেহ লাঠি, কেহ সড়কি-হস্তে আসিয়া মহা-ধুমধাম আরম্ভ করিয়া দিল। "কোথা গেল, সাহেবের লাঠিয়ালরা কই ? এক চোটে ফযের করিব। কই কোথা গেল" বলিয়া আপন আপন মর্দ্দামী দেখাইতে লাগিল।

নায়েব মহাশয়ের মুখে কথাটি নাই। তাঁহার নিজের বাক্স, পেটরা, থালা, ঘটী বাটী যাহা ছিল সকলি গিয়াছে। দেখিলেন বৈরাগীর ঝোলা, খনজনী সকলি পড়িয়া আছে। নানা প্রকার মতলব, পরামর্শ আঁটিতে আঁটিতে পূর্ব্বদিক ফর্সা হইয়া প্রভাত বায়ু বহিতে লাগিল। ভৈরববাবুর কাছারি লুট এই পর্য্যন্ত শেষ হইল।

অষ্টাবিংশ তরঙ্গ

টাকা নয়—খাপরা

রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। সাহেবের লাঠিয়ালেরা যে পথেই চলিল, সূর্য্যদেব সকলকেই দেখাইলেন যে, ভৈরববাবুর কাছারি লুট করিয়া চোদ্দ তোড়া টাকা লইয়া চোদ্দ জন মুটিয়া এবং ঢাল-সড়কি কোমর বান্ধা লাঠিয়ালেরা ত্রস্তপদে মার মার কাটকাট শব্দে পথ জাঁকাইয়া চলিয়াছে। যে দেখিতেছে সেই বলিতেছে যে, ভৈরব-

বাবুর সর্ব্বনাশ হইল লাটের খাজনা লুট! আর সর্ব্বনাশের বাকি কি? হঠাৎ এত টাকা এই কদিনের মধ্যে কোথা হইতে জোটাইয়া বিষয় রক্ষা করিবেন! লাটের দিন কি ভয়ানক দিন। বাজকর আদায়ের কড়া এমনি নিয়ম, যে সূর্য্যঅস্ত হইলেই দফা রফা, কার্য্য শেষ। জমিদারী নিলাম—নিলাম তো সত্য-সত্যই নিলাম। আর দেয় কে, আর পায় কে? কিস্তিমত টাকা দাখিল না হইলে কিছুতেই আর রক্ষা নাই।—হাজার হউক বেলাতী বুদ্ধি, সে বুদ্ধির কাছে বাঙ্গালী বুদ্ধি কোনই কাজের নহে। ধন্য কেনী! কি কৌশলে কি সন্ধানে টাকাগুলি হস্তগত করিল। এমন কৌশলে ধন্য! ধন্য তোমার সাহস।

কেনী শোক, তাপ, বিরহ, বিচ্ছেদ নানা প্রকার মনকষ্ট ভোগ করিয়া শেষ-কালে বাঙ্গালীর উপর চটিয়া গিয়াছেন। হাড়ে হাড়ে চটিয়াছেন। বাঙ্গালীর নামেই জ্বলিয়া ওঠেন। চক্ষের শূল মনে করেন। লাঠিয়ালদিগকে ভাল না বাসিয়া পারেন না বলিয়া মুখে ভালবাসা জানান। কার্য্যেও দেখান যে, তোমরাই আমার সকল। বাঙ্গালীর কথায়-কার্য্যে আর তাঁহার বিশ্বাস নাই। বিশ্বাসতরুর মূলে তাহারই ভালবাসা জকি—বিষবারি সিঞ্চন করিয়া বিষময় ফল ফলাইয়া গিয়াছে। তাহাতেই এত চটা। কেনীর অদৃষ্ট-চক্রের গতি ক্রমেই উর্দ্ধে! যে কার্য্যে হাত দিতেছেন তাঁহাতেই প্রতুল হইতেছে। নীল, রেশমে বিস্তর আয় হইতেছে। জমিদারীতেও বেশ লাভ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। দিন দিন উন্নতি—দিন দিন মজুদ টাকার সংখ্যা বৃদ্ধি। চারিদিক হইতে টাকা আসিতে থাকে তখন চারদিক কেন, দশদিক হইতে বিশপ্রকারে টাকা আসিতে থাকে।

সন্ধ্যা নিকট। কেনী ফুলবাগানে মেমসাহেবের সঙ্গে বাগানের শোভা, কালীগঙ্গার শোভা, সায়ংকালীন সেই প্রকৃতির শোভা দেখিয়া মনপ্রাণ শীতল করিতেছেন আর উভয়ে—হাত ধরাধরি করিয়া পরচক্ষে প্রণয়ভাব গাঢ়রূপে দেখাইয়া মৃদুমন্দভাবে মনের আনন্দে পা-চারি করিয়া বেড়াইতেছেন। এমন সময় ফকির গোয়েন্দা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া সেলাম বাজাইয়া বলিল—"হুজুর! বকশিশ চাই।"

সাহেব বলিলেল—"বকশিশ পরে দিব, খবর কি?"

"হুজুর! বকশিশের হুকুম হউক, কাজ ফতে হইয়াছে। বাবুর ভুল ভাঙ্গি-য়াছি। বাঙ্গালা-রাজ্যে এমন কোন লোক নাই যে, হুজুরকে ঠকায়। মামলা,

মোকদ্দমা, লাঠিবাজী, আর একটিতেও হুজুরকে কেহ পরাস্ত করিতে পারিবে না। বাবুর কাছারিতে চোদ্দ তোড়া পাওয়া গিয়াছে। আমাদের লাঠিয়াল সর্দ্দারের নিকট বাবুর লোকজন মাথা তুলিয়া একটি কথা বলিতেও সাহসী হইল না। কে কোথায় পালাইল তাহার খোঁজ খবর পাওয়া গেল না। ফকিরের কথা শেষ হইতে না হইতে লাঠিয়ালগণ শোরগোল করিতে করিতে পাঁয়তারা করিয়া লাঠি ভাঁজিতে ভাঁজিতে চোদ্দ তোড়া টাকাসহ সেলাম বাজাইয়া বকশিশের প্রার্থনায় সাহেবের সম্মুখে কাতার বান্ধিয়া দাঁড়াইল। সাহেব পাঁচশত টাকা বকশিশের হুকুম দিলেন। আরও বলিলেন "দেখ ভৈরববাবু বড় চতুর। ও সকল তোড়া-গুলি এখনি জ্বালাইয়া ফেলিতে হইবে। টাকা আমার সম্মুখে ঢালিয়া তোড়া-গুলি জ্বালাইয়া ফেল। আর এ টাকা খাজাঞ্চীখানায় লইয়া দেও।" আদেশ মাত্র তখনি রামইয়াদ পাঁড়ে গায়ের বড় চাদর মাটিতে বিছাইয়া টাকার তোড়া একে একে নামাইয়া মুখ খুলিতে লাগিল। সহজে খুলিতে পারিল না। বড়ই কৌশলে বাঁধা এবং লাবাতা দিয়া মুখ আঁটা। তোড়ার মুখের দড়ি কাটিয়া সাহেবের সম্মুখে ঢালিল। সাহেব দেখিয়া অবাক। তাড়াতাড়ি অন্য একটি তোড়ার মুখ কাটিয়া খোলা হইল, তাহাতেও অবাক! ক্রমে চোদ্দটি তোড়ার মুখ খুলিয়া টাকা ঢালা হইল। কাহারও মুখে কথা নাই। চতুরের চাতুরী—আশ্চর্য্য বাটপাড়ি। একটি তোড়াতেও টাকা নাই। সমুদায় খাপরা।—আর একদলা করিয়া সীসা। ভৈরববাবুর চাতুরীতে কেনীর মাথা ঘুরিয়া গেল। পর-স্পর মুখ চাওয়া-চায়ি ভিন্ন মুখে কাহারও কোন কথা নাই। লাঠিয়ালদিগের উৎসাহ—বকশিশ সকলি খাপরায় পরিণত হইল। কেনী বড়ই অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন—ভৈরববাবু বড় ঠকাইয়াছে। বাঙ্গালীর মাথায় এত বুদ্ধি, ইহা আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই। সাহেব মাথা হেঁট করিয়া এক দুই পায়ে প্রিয়তমার হাত ধরিয়া কামরায় ঢুকিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, ছালাগুলি নদীতে ফেলিয়া দেও। রামইয়াদ পাঁড়ের চাদর পাতাই সার হইল। খাপরা সমেত তোড়া চোদ্দটা কালীগঙ্গায় বিসর্জ্জন করা হইল। তিন-দিবসের মধ্যে সাহেব ঘর হইতে বাহির হইলেন না।

ভৈরববাবু ছাড়িবার লোক নহেন। ইংরেজ দেখিয়া ভীত হইবার পাত্র নহেন। রীতিমত রাজদ্বারে কাছারি লুটের নালিশ উপস্থিত করিয়া দিলেন।

প্রমাণের অভাব হইল না। কাছারি লুট, চোদ্দ তোড়া টাকা লুট—এ-কথার প্রমাণ সহজেই পাওয়া গেল। কেনীর পক্ষীয় কয়েকজন লোকের বিশেষ শাস্তি হইল। কিন্তু ভৈরববাবু তাহাতেও ক্ষান্ত হইলেন না। চোদ্দ হাজার টাকার দাবীতে আদালতে নালিশ উপস্থিত করিয়া মায়-খরচা-সমুদায় দাবী ডিক্রি করিলেন।

উনত্রিংশ তরঙ্গ

বাঙ্গালীর হৃদয়

কিছুদিন পরে যশোহরে সদরআলার এজলাসে ভৈরববাবুর সহিত কেনীর দেখা হয়। যদিও, কেনীও বড়লোক। বিস্তর টাকা। কিন্তু খাপরার পরিবর্তে— চোদ্দ হাজার টাকা নগদ দিতে কাহার না কষ্ট বোধহয়? কেনীর ইচ্ছা যে আপোষে নিষ্পত্তি হয়। খরচাটা লইয়া বাবু দাবির টাকা ছাড়িয়া দেন—এই কেনীর আন্ত-রিক ইচ্ছা। কিন্তু কোনমুখে একথা বলিবেন। হাকিমের সম্মুখে, এজলাসের মধ্যে কেনী ভৈরববাবুকে দেখিয়া বলিলেন।

"তুমি বাবু বড় জুয়াচোর। খাপরা দিয়া তোড়া পুরিয়া চোদ্দ হাজার টাকার দাবী করিয়া ডিক্রি করিয়াছ।"

"ভৈরববাবু বলিলেন—"আমি জুয়াচোর, তুমি গরুচোর।" কথা দুইটি পথিকের কল্পনা প্রসূত নহে। হাকিমের সম্মুখে ভৈরববাবু ও কেনীর কথাপ্রসঙ্গ আজ পর্য্যন্ত ঐ অঞ্চলে সাধারণের মুখে চলিয়া আসিতেছে। ভৈরববাবু কেনীর শুধু গরুচোর বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। আরও বলিলেন—"দেখ! তুমি আমাদের দেশের রাজা! দেশের লোকে তোমাকে ভয়েই হউক, আর ভক্তিতেই হউক, রাজার তুল্য মান্য করে। আমাদের দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া কিছু টাকা উপার্জ্জন করিবে, এইতো তোমার ইচ্ছা! তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তাহা না করিয়া তুমি আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছ। যাহা যাহা করিয়াছ, এদেশের লোকে তাহা কখনই করিতে পারে না। দয়া, মায়া, ধর্ম্ম, এবং হৃদয় হইতে তাহারা বঞ্চিত নহে। তুমি দেশের গরুচুরি করিয়া কৃষি-প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়াছ। তোমার নিকটস্থ জমিদার, তালুকদারের যথাসর্ব্বস্ব লইয়াও তোমার উদর পরিপূরণ হয় নাই। এখন দূরস্থিত তালুকদার, জমিদারের সর্ব্বস্ব লইয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিবে ইহাই তোমার আন্তরিক ইচ্ছা। তুমি এদেশে

আসিয়া কত পাপের কার্য্য করিয়াছ, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি? কত সতীর সতীত্বনাশ, কত শত প্রজার যথাসর্ব্বস্ব হরণ, ঘর জ্বালানী, দিনেরাত্রে ডাকাইতি, নিরপরাধে দণ্ড, এসকল তোমার অঙ্গের ভূষণ। সকল ধর্ম্মে যে কার্য্য পাপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তাহার একটিও তুমি বাকি রাখ নাই। তুমি ইংরেজ জাতির পাপ-কন্টক। তোমার মত ইংরেজকে শতধিক! আমি খোলা-খাপরায় তোড়াবন্দী করিয়া টাকা বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম, তাহা স্বীকার করি। তুমি ভাবিয়াছিলে যে বাংলাদেশে লোক নাই, বাঙ্গালার মানুষ নাই। এ রত্নগর্ভা ভারতভূমির বঙ্গ খণ্ড কেন? যে খণ্ডে যাইয়া সন্ধান করিবে তোমার পক্ষে কাল ভৈরবস্বরূপ—শত শত ভৈরব—দেখিতে পাইবে। রাজশরীর, রাজমন, রাজচরিত্র, রাজনীতিজ্ঞ, রাজবুদ্ধি, রাজচক্ষু, রাজ-বিবেচনা সংযুক্ত দেহেরই যে অভাব আছে—তাহাও মনে করিও না। আর সকল মস্তকই যে বিকৃত তাহাও নহে। অনেক মস্তকেই প্রধান, প্রধানমন্ত্রীর মস্তক-সদৃশ-মজ্জা আছে। মহাবীর, মহাবলশালী যোদ্ধার ন্যায় বাহুবলও আছে? সাহস আছে, হৃদয় আছে—ধরিতে গেলে কি না আছে? তবে সময় মন্দ হইলে কিছুতেই কিছু হয় না। আজ তোমার নামে গগন ফাটিয়া যাইতেছে। ভয়ে গর্ভিনীর গর্ভ পর্য্যন্ত পাত হইয়া যাইতেছে। খুঁজিলে তোমার মত নামজাদা লোকই যে এই পরাধীন রাজ্যে না পাওয়া যায় তাহাও নহে। সময় মন্দ, কপাল মন্দ, তাতেই এই দশা।

কেনী বলিলেন—বাবু! "তুমি আমাকে বড় ঠকাইয়াছ।"

বাবু বলিলেন—"আমি তোমাকে ঠকাই নাই। তুমি আমাকে পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলে, আমিও তোমাকে পরীক্ষা করিলাম। এবং দেখাইলাম ডাল-ভাতের গুণ কি? বাঙ্গালীর মাথায় আছে কি? আমি টাকার প্রত্যাশী নহি। অধর্ম্ম করিয়া টাকা লইয়া আমার কয়দিন যাইবে। তুমি আমার কাছারি লুট করিয়াছ যথার্থ। আমি যদি ঐ কাছারির পথে সত্য-সত্যই খাজানার টাকা পাঠা-ইতাম তাহা হইলে তুমি কি করিতে? আমারই টাকা দিয়া আমারই বিষয় খরিদ করিতে—এইতো তোমার মনের কথা।"

কেনী বলিলেন—বাবু! আমি তোমার নিকট ঠকিয়াছি।

ভৈরববাবু বলিলেন—বেশ তুমি ইংরেজ, তোমার মান্য কোথায় না আছে? আমি বাঙ্গালী, আমার নিকট পরাস্ত স্বীকার করিলে, আমি টাকা পাইলাম।

দেখ ! বাঙ্গালীর-হৃদয়ে সাহস আছে কি না। দেখ ! ভৈরবের হৃদয় আছে কি না। এই বলিয়া পকেট হইতে ডিক্রিখণ্ড বাহির করিয়া স্বহস্তে ছিঁড়িয়া কেনীর হস্তে দিয়া বলিলেন—"যাও ! তোমায় ভিক্ষা দিলাম। চোদ্দ হাজার টাকার ডিক্রি হইতে তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম।" কেনী মহালজ্জিত ভাবে বিশেষ নম্র ও ভদ্রতার সহিত ভৈরববাবুর হস্ত ধরিয়া কাছারিগৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—বাবু ! আমি জানিলাম তুমি যথার্থ বাবু। আমি আব কখনও তোমাব সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদ কবিব না। তোমার সহিত আর আমার কোনদিন কোন কারণে বিবাদ হইবে না এই প্রতিজ্ঞা করিলাম।"

পরস্পর করমর্দ্দন করিয়া বিদায় হইলেন। সকলে ভৈববাবুর সাহস, উদারতা দেখিয়া অবাক হইল। কেনী সেই হইতে জীবিতকাল পর্য্যন্ত ভৈরববাবুর সঙ্গে বন্ধুত্বভাব বজায় বাখিয়াছিলেন। প্রতিজ্ঞা বক্ষা করিয়াছিলেন।

ত্রিংশ তবঙ্গ

সংসার

পাঠক ! মীরসাহেবকে অনেকদিন হইল গোবীনদীর গর্ভে সাঁওতার ঘাট হইতে নৌকায় ভাসাইয়া দিয়াছি। আজিও ভাসিলেন, কালিও ভাসিলেন বলিয়া বিদায় করিয়াছি। তিনি সময়মতো সিরাজগঞ্জ যাইয়া ভগ্নীর-বাটিতে গিয়াছেন। বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধাযন করিতেছেন। এদিকে সা গোলাম "অছিয়তনামা" আপন মনমত পরিবর্তন করিয়া লইয়াছেন। আব আর যাহা অবশিষ্ট ছিল. যে যে দলিল পরিবর্তন করিতে আবশ্যক হইয়াছিল, সুযোগ পাইয়া সমুদায় দলিল পরিবর্তন করিয়াছেন। সেরেস্তার অন্যান্য কাগজপত্র যাহার যেখানে দোষ ছিল, সমুদায় সারিযাছেন। প্রধান প্রধান জালসাজদিগের আশ্রয়ে, অর্থেব সাহায্যে এ সকল সাংঘাতিক ঘটনা-ঘটাইয়া, আটঘাট বান্ধিয়া দলিল দস্তাবেজ দুরস্ত করিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া আছেন। চাকর-চাকরাণীরা অনেকদিন হইতেই তাঁহার বাধ্য হইয়াছে। কাহাকে কৌশলে, কাহাকে অর্থে, কাহাকে তোষামোদে—যাহাকে যাহা দিয়া বাধ্য করিতে হয়, দিয়া আপন মনমত সাজে সাজাইয়া রাখিযাছেন। ঘরাও-বিবাদে প্রতিবেশি এবং দেশের লোকের বড়ই আনন্দ। লক্ষ্মীশ্রী যাহার চক্ষে সহ্য হয় না, নির্ব্বিবাদে কোন পরিবার একত্র একজোটে থাকা যে নরাধম দেখিতে পারে না, আপন স্বার্থের জন্য সা গোলামের সঙ্গে যোগ দিয়াছে। যে

পিশাচ ঘরাও-বিবাদ বাধাইয়া দিয়া বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া আদর বাড়ায়, সকল লোকেই সা গোলামের সাহায্যে দাঁড়াইয়াছে। যাহারা মীরসাহেবের নিকট কখনই স্থান পায় নাই তাহারাই এক্ষণে সা গোলামের পরামর্শদাতা। যে নীচ প্রকৃতির লোকেরা সাঁওতাব বাটির চতুঃসীমায় আসিতে থরহরি কম্পে কাঁপিয়াছে, তাহারাই এক্ষণে সা গোলামেব প্রধান সাহেব। যাহাদের কোন স্বার্থ নাই, তাহারাও খোসগল্পের একঅঙ্গ মনে কবিয়া সময় সময় আসিতেছেন, যাইতেছেন। ঐ সকল কথা লইয়াই তোলাপাড়া করিয়া কাল কাটাইতেছেন। কাহার সর্ব্বনাশ, কাহার পৌষমাস। কেউ ধনেপ্রাণে বিষয়-সম্পত্তি-হারা হইয়া পথের কাঙ্গাল হই-তেছে। কেহ ঐ ঘটনা লইয়া কত কথায় কত আমোদ মনে কবিয়া আমোদে মাতিয়াছে। কেহ "মামার জয়" মতে মত প্রকাশ করিতেছে। কেহ কেহ সা গোলামের মনেব মধ্যে প্রবেশ করিতে মৌখিক মীরসাহেবের স্বপক্ষ হইয়া দুটি কথা বলিয়া অপর পক্ষের উত্তবেই হাব মানিয়া চুপ করিয়া বসিয়া সা গোলামের মনের মধ্যে যাইতে ঘুরিতেছে। সা গোলাম নিজেই নাচিতে দাঁড়াইয়াছেন। তাহাবপর তোষামোদে কুকুরের পদ-সেবার আনন্দে মাতিয়া সকল কথা ভুলিয়া ঘরভাঙ্গা লোকেব কথায় কান দিয়া, আরও নাচিয়া উঠিয়াছেন। একথা ভাবি-তেছেন না যে জগৎ কয়দিনের! মিথ্যা-প্রবঞ্চনা করিয়া একজনকে ঠকাইলে তাহার প্রতিফল অবশ্যই একদিন না একদিন ফলিবে। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত একদিন হইবেই হইবে। সে পাপভোগ একদিন ভুগিতেই হইবে। একপ্রকার গুপ্ত-ডাকাতি করিয়া মীবসাহেবকে পথের ভিখারী কবিতে বসিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরের মহিমা অপার! যে ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই তাঁহাব জীবিকা নির্ব্বাহের কোন উপায় করিয়া দিবেন। কথা চিরকাল থাকিবে। জগৎ যতদিন কথাও ততদিন! হায়রে সংসার!

দেবীপ্রসাদের মন্ত্রণায় জামাইবাবু সকল কার্য্য দৃঢ়রূপে পাকা করিয়া রাখি-তেছেন। শেষদিনের কথা এখন কিছুতেই মনে স্থান পাইতেছেন না। রে মানুষ! রে সংসার! রে বিষয়! রে জমিদারী! রে লোভ! রে জামাই! তোর অসাধ্য কিছুই নাই।

মীরসাহেব ভগ্নীর-বাটিতে কয়েক মাস থাকিয়া তাঁহার বিষয়াদির সুশৃঙ্খলা করিয়া বাটি আসিতে মনস্থ করিলেন। ইহার মধ্যে দুই-তিন খানি মাত্র পত্র

জামাইকে লিখিয়াছেন—একখানিরও উত্তর পান নাই। উড়-উড়ভাবে কয়েকটি কথা তাঁহার কানে গিয়াছে—কর্ণপাত করেন নাই। তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে ঘরাও বিবাদ বাধাইয়া দিতে দেশের কতকগুলি লোক বড়ই পটু। এই যুক্তিতেই —মনে কোনরূপ সন্দেহের কারণ হয় নাই। কার্য্য শেষ করিয়া বাটি আসাই মনস্থ করিলেন। ভগ্নীর নিকট সমুদায় ব্যক্ত করিয়া শীঘ্র শীঘ্র বাটি আসাই স্থির করিলেন। নৌকার জোগাড় করিয়া মীরসাহেব সিরাজগঞ্জ অঞ্চল হইতে রওয়ানা হইলেন।

সা গোলাম শৌলি পর্য্যন্ত লোক রাখিয়াছেন। সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া মীরসাহেবের গুপ্তসন্ধান গোপনে লইয়া সা গোলামকে বলিতেছে। সংবাদ আসিল, মীরসাহেব বাটি অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তিন চার দিবস পরেই দ্বিতীয় সন্ধানী আসিয়া বলিল, মীরসাহেব পাবনা পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। বোধহয় দুইতিন-দিন পাবনায় বিলম্ব হইবে। সেখানে অনেক আলাপী লোক আছে। জেলায় বহুতর লোক। নানা দেশ-বিদেশের লোকে পরিপূর্ণ। বিশেষ মুন্সী নাদির-হোসেন, পাবনা জেলার নাজিরের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব। দুই তিন দিবস পাবনায় না থাকিয়া আসিতে পারিবেন না।

সা গোলাম এদিকে ভালরকমে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মীরসাহেব পাবনা পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। একথা গ্রামের লোক, চতু:পার্শ্বস্থ গ্রামের লোক, সকলেই শুনিয়াছে। বাটি আসিলে তাঁহার ভাগ্যে যাহা ঘটিবে তাহাও সকলে পূর্ব্ব হইতেই জানিয়াছে। অনেকেই তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় আছে। কিভাবে তিনি পৈতৃক বসতবাড়ি, পৈতৃক সম্পত্তি হইতে তাড়িত হন, সকলেরই তাহা দেখিবার ইচ্ছা। এক দুই করিয়া তিনদিন কাটিয়া গেল। পাবনাতেও জামাই-বাবুর সম্বন্ধে মীরসাহেব অনেক কথা অনেকের মুখেই—তাঁহার পূর্ব্ব শোনাকথার ন্যায়—শুনিলেন। মনে কিছু সন্দেহ হইল। কথাটার মধ্যে কিছু সত্যাংশ না থাকিলে এত দূর ছড়াইবে কেন? সাধারণে শুনিবে কেন? সে কথা লইয়া আন্দোলনই বা হয় কেন? অবশ্যই কিছু হইয়াছে। অবশ্যই কোন কথা নূতন উঠিয়াছে। অবশ্যই কিছু না কিছু হইয়াছে। নানারূপ চিন্তায় মশগুল হইয়া পদ্মা পার হইলেন। নৌকা গৌরীস্রোতে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। মাঝিরা জোরে দাঁড় টানিতেছে। সন্ধানী লোকেরা প্রতি মুহূর্ত্তে সংবাদ দিতেছে যে, এই পর্য্যন্ত আসিলেন—অমুক স্থান হইতে নৌকা ছাড়িলেন।

মীরসাহেব লাহিনীপাড়া গ্রামের ঘাট ছাড়িয়া সাঁওতার ঘাটের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন যে, বহু-সংখ্যক লোক ঘাটে দণ্ডায়মান। মনে মনে ভাবিলেন যাহা শুনিয়াছি তাহা যদি মিথ্যা হয় তবে নিশ্চয়ই সা গোলাম লোকজন সহকারে আমার অভ্যর্থনার জন্য ঘাটে দাঁড়াইয়া আছে। নৌকা যত নিকটে আসিতে লাগিল মীরসাহেব ততই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিলেন। দেখিলেন সা গোলাম আছে, দেবীপ্রসাদ আছে, আরও অনেক লোক আছে। কিন্তু দৃশ্য ভিন্ন, এ দণ্ডায়মানের অর্থ ভিন্ন—ভাব ভিন্ন। লাঠি, সড়কি, ঢাল, তরবার, বাঁধাকোমর, রুদ্রভাব—রোষের লক্ষণ। সকলেই দণ্ডায়মান। ডাঙ্গার নিকটে নৌকা ভিড়িতেই উচ্চস্বরে একজন বলিয়া উঠিল "যদি প্রাণ বাঁচাইতে চাও, যদি মান রাখিতে চাও তবে এঘাটে নৌকা-ভিড়াইও না। ভাসিয়া আসিতেছ, ভাসিয়াই চলিয়া যাও। এ-ঘাটে কোন প্রয়োজন নাই। নৌকা লাগাইবার কোন অধিকার নাই।"

স্রোতস্বতী গৌরীরস্রোতে নৌকা টানিয়া ধরিয়া নৌকার বেগরক্ষা করিতে বা ফিরাইতে কাহারও সাধ্য নাই। মুখের কথায় কেমন করিয়া কূল না ধরিয়ে কি প্রকারে অন্যদিকে যাইবে অথবা ফিরাইবে? স্রোত ছাড়াইয়া মন্দস্রোতে নৌকা পড়িতেই দাঁড়িরা দাঁড় ছাড়িয়া লগী ধরিল। তখন দেবীপ্রসাদ পুনরায় বলিতে লাগিল—"এখানে নৌকা ভিড়াইতে পারিবেন না, কেন অপ্রস্তুত হইতেছেন।"

পাঠক! যে জামাই শতহস্ত ব্যবধান থাকিতে সেলামের উপর সেলাম বাজাইয়া শ্বশুরের নিকট ভক্তি প্রকাশ করিত, স্নেহ-আকর্ষণের আকর্ষণী ফেলিয়া শ্বশুরের মনকে শতহস্ত দূর হইতে টানিয়া লইত, আজ সেই জামাই স্বয়ং তরবারি হস্তে বুক ফুলাইয়া চক্ষু উল্টাইয়া সজোরে দণ্ডায়মান। চাকরের হস্তে বন্দুক। সেলাম আলায়কুমের নামও মুখে নাই। ইহার পর দেবীপ্রসাদের ঐ কথা। জামাইবাবু এখন পর্য্যন্ত কিন্তু নীরব। আজ কে কাহার অভ্যর্থনা করে। আজ কে মীরসাহেবকে মান্য করে? সর্দ্দার, লাঠিয়াল, এবং অন্য অন্য আরও অনেক হাত সেখানে ছিল, কিন্তু মীরসাহেবকে সেলাম বাজাইতে আজ কোন হাতই উপরে উঠিল না।

মীরসাহেব বুঝিলেন যে গুড়ে বালি পড়িয়াছে। দুধে গো-চনা মিশিয়াছে। দেবীপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নৌকা ভিড়াইবে না কেন?"

দেবীপ্রসাদ বলিলেন—"নৌকা লাগাইয়া কি হইবে? নৌকা লাগাইতে আমরা দিব না। আপনি দেখিতেছেন না?"

"কই আমি তো কিছুই দেখিতেছি না! তোমরা কি আমাকে আগু বাড়াইয়া লইতে আইস নাই?" তখন জামাইবাবুর মুখে কথা ফুটিল।

সা গোলাম কর্কশভাবে বলিলেন,—"না, না, খাতির-তওয়াজা করিয়া লইতে আসি নাই। একেবারে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতে আসিয়াছি। এ মাটি তোমার নয়, এ-ঘাট তোমার নয়, এ জমিদারী তোমার নয়, এ-বাড়িও তোমার নয়। বড় মীরসাহেব অভাবে সকলি তাঁহার কন্যার—তোমার ইহাতে কোন স্বত্ব নাই!"

মীরসাহেব হাসিয়া বলিলেন—বাপু! তুমি সুখে থাক! আমি চলিলাম।

জলের উপর থাকিয়াও জামাইয়ের কথায় মীরসাহেব যেন দশহাত মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। মাঝিদিগকে নৌকা ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলেন। কোনদিকে যাইবেন, কোথায় যাইবেন কিছুই বলিলেন না। গৌরীস্রোতে নৌকা ভাসিয়া চলিল। সাঁওতার ঘাট ছাড়াইয়া ক্রমে চাপড়াগ্রামের সীমা ধরিল। তখন মীরসাহেব বলিলেন—'ওরে কোথায় যাই'?

নৌকা লাগাইতে অনুমতি করিলেন—আর বলিলেন, 'এপারেই থাকিব না। পাড়ি দিয়া ওপারে যাও। মাঝিরাও নৌকার মুখ ফিরাইয়া দাঁড় ধরিল। অতি অল্প-সময়ের মধ্যেই নৌকা অপরপারে গিয়া চরে ঠেকিল। মীরসাহেব পৈতৃক-বাটি, জমিদারী ও জিনিসপত্র ইত্যাদি সমুদায় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হইতে আজ সম্পূর্ণরূপে বেদখল হইলেন। তাঁহার চিরসাধের আশাতরী সোনার-চাঁদ জামাই তরবারি হস্তে আজ গৌরী-গর্ভে ভাসাইয়া দিয়া সুস্থির হইলেন। হাসিমুখে দলবলসহ বাটি আসিলেন আশা পূর্ণ হইল। কিন্তু চিন্তার ভাগ কিছু বেশী বোধ হইল। অন্য অন্য সকলেই আজিকার এই ঘটনায় মহা-দুঃখিত হইলেন। মীরসাহেব কাহারও নিকট এ-দুঃখ প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার সেই পূর্ব্ব-সাহস, সেই পূর্ব্ব-বল, সেই পূর্ব্ব-আমোদ, পূর্ব্ব-ভাব, সকলি সমভাবে রহিয়া গেল। তিনি প্রায় ছমাস নৌকায় নৌকায় থাকিয়া নানা স্থান বেড়াইয়া নানা কারণে বাধ্য হইয়া সাঁওতার অতি সংলগ্ন লাহিনীপাড়া গ্রামে মুন্সী জিনাতুল্লার কন্যা বিবি দৌলতন-নেসাকে বিবাহ করিলেন। আবার সংসারী হইলেন।

একত্রিংশ তরঙ্গ

দৌলতননেসা

মাননীয়া দৌলতননেসা দেখিতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, মধ্যমাকৃতি। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ভ্রূ, ললাট নিখুঁত। সে পবিত্র রূপের বর্ণনা করা পথিকের অসাধ্য। অপরের সহিত তুলনা করিয়া, দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বুঝাইয়া দিতেও অক্ষম। মুসলমান রমণী মধ্যে অনেক খুঁজিলাম, পাইলাম না। হয় তো এ কথায় পাঠক মাত্রেই উদাসীন পথিককে পাগল মনে করিতে পারেন। কি করিব! পথিকের চক্ষে যদি জগতের কোন রমণীকেই দৌলতননেসার সহিত তুলনা করিয়া দেখাইতে না পারে তবে সে কি করিবে? তবে কি উপমা রহিত? না তাহাও নহে। কিন্তু পথিকের চক্ষে বটে। এই সকল কথায় কোন পাঠক ক্রোধে জ্বলিয়া-পুড়িয়া যদি এই তরঙ্গ পাঠ না করেন, আক্ষেপ নাই। কারণ জগৎ পরাধীন, মন স্বাধীন।

পথিকের চিন্তাপথে কতকগুলি মুসলমান রমণী আসিয়া বিশুদ্ধভাবে দাঁড়াইলেন। ইহাদের মধ্যে রাজকন্যা, মহামাননীয় বংশের অতি-পবিত্রা, সদ্‌-চরিত্রা, দেবীসদৃশ্যা, রমণীকুলের শিরোমণি মহোদয়গণও রহিয়াছেন। মহামতি লিখকগণ-হস্তে যিনি, যে অবস্থায় যে প্রকার কল্পনার চক্ষে পড়িয়াছেন উহার মধ্যে তাঁহারাও অনেক রহিয়াছেন। কিন্তু পথিকের চক্ষের দোষে, তাঁহাদিগকে যেন কেমন কেমন দেখাইতেছে। উপস্থিত রমণীগণ মধ্যে—অনেকেই পবিত্রা, অনেকেই স্বর্গীয়া রমণী-সদৃশ্যা। অনেকেই রূপেগুণে ভুবন-বিখ্যাত। কিন্তু সর্ব্ব-বিষয়ে সর্ব্বাঙ্গিনী সুন্দরী বলিয়া বহু চেষ্টাতেও পথিক আপন মনকে সেকথা স্বীকার করাইতে পারিল না। সে মনে দৌলতননেসার রূপই যেন জগতের আরাধ্যা, পথিক-চক্ষে ঐ রূপই যেন সকল রূপের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং তুলনা করিয়া পাঠকগণকে বুঝাইতে সক্ষম হইল না। তবে প্রাচীন কয়েকটি কথা শুনাইয়া উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়াস পাইল বটে, কিন্তু তাহাতে অনেকেই চটিতে পারেন। মহানিন্দুক, মহাপাপী, বলিয়া নানাপ্রকার ভর্ৎসনা করিতে পারেন—করুন, পথিক তাহা সহ্য করিবে। কিন্তু কথা শুনাইতে ক্ষান্ত হইবে না। যাহার যেরূপ মনের গতি এবং মাথার ক্ষমতা, তিনি সেইরূপ বুঝিয়া লইবেন। যথা—

প্রভু মহম্মদের স্ত্রী, ইহারা মহাপবিত্রা এবং পুণ্যবতী? দৌলতননেসা

তাঁহাদের কিঙ্করীর কিঙ্করী ! মুসলমান জগৎ-চক্ষে তাঁহাদের দাসীর দাসী। কিন্তু সপত্নী বাদে, হিংসার আগুনে তিনি মনে মনে জ্বলিয়া-পুড়িয়া খাক হইয়াছেন কিনা তাহা অন্তর্যামী ভগবান ভিন্ন মানুষে কখনই জানিতে পারে নাই। আকার-প্রকারে, হাবভাবেও কখন সে ভাব কেহ দেখে নাই। তাহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জ্বলন্ত অক্ষরে পরে দেখাইব। আর একটি কথা—

প্রভু মহম্মদের কন্যা মহামান্য হাসেন-হোসেনের জননীবিবি যিনি ইসলাম জগতে রমণীকুলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। সকলের মাননীয়া এবং আশ্রয়দাত্রী। তিনিও কিন্তু সপত্নীবাদ—মহানলকে হৃদয়ে আশ্রয় দিয়াছিলেন। সে মহাযাতনাসম্ভূত মহাবিষ সে পবিত্র শরীরেও প্রবেশ করিয়াছিল। পয়গম্বরের দুহিতা, এমামের জননী, মহাবীরের অঙ্ক-লক্ষ্মী হইয়াও (হিংসার কল্যাণে) সে মহাবেগ হইতে মনকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। অনেক সময় বিবি হন্নুফার নামে জ্বলিয়া উঠিতেন।

পথিকের পূজনীয়া দেবী, এক মুহূর্ত্তের জন্য শত্রুমুখে কখনও অপবাদগ্রস্ত হন নাই! সে মিথ্যাবাদে অতি অল্পকালের জন্যও স্বামীর মন হইতে সরিয়া যান নাই। ইহা কি কুলস্ত্রীর গৌরবের কথা নহে? —উদাসীন পথিকের কি গৌরবের কথা নহে?

বিবি আয়েষাসিদ্দিকা হজরত মহম্মদের প্রিয়তমা স্ত্রী। শাস্ত্রে বলে হজরত নূরনবী মহম্মদ, আয়েষাসিদ্দিকার বক্ষে পবিত্র মস্তক রাখিয়া জগৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন। জীবনের শেষসীমায় ভালবাসার সম্পূর্ণ চিহ্ন জগতে ভাল করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। সে সময় আয়েষাসিদ্দিকার বয়স সবে আঠার বৎসর ছিল। এত অল্পবয়সে পতি-পরায়ণা, পতিগত-প্রাণা ছিলেন। বদরল আকবরির যুদ্ধের পর মদিনায় ফিরিয়া আসিতে মিথ্যাপবাদে কিছুদিনের জন্য সে পবিত্র রমণীকেও স্বামীর অপ্রিয়পাত্রী হইতে হইয়াছিল।

রমণী-প্রধানা বিবি খাদিজা প্রভু মহম্মদের প্রধানা স্ত্রী। কয়েক স্বামীর পর চল্লিশ বৎসর বয়সে হজরত মহম্মদের কার্য্যে ও বিশ্বাস-গুণে বয়সের ন্যূনাধিক্য থাকা সত্ত্বেও যুবা মহম্মদকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। সে সময় প্রভুর বয়স পঁচিশ বৎসর। তখনও ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়া আরব-খণ্ডে পরিচিত হন নাই।

পথিকের পূজনীয়া দেবী আজীবন এক স্বামীপদ কায়মনে সেবা করিয়া, সেই স্বামীপদ-প্রান্তে মস্তক রাখিয়া জগৎ কান্দাইয়া, জগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন। ইহাও পথিকের কম গৌরবের কথা নহে।

অন্যরূপ চিত্র দেখুন। আফ্রিকাখণ্ডে নীলনদ-তীরে সুবিখ্যাত মিশর নগরের রাজমন্ত্রী আজিজ মেসেরের স্ত্রী, যাহার গুণের বর্ণনা পারসিক মহাকবি জামী-মহোদয় সহস্রমুখে বর্ণনা করিয়াছেন। নাম "জুলেখা"। তিনিও ধর্ম্মের মাথায় কুঠার মারিয়া পবিত্র-প্রণয়-বন্ধন ছিন্ন করিয়া, মহামতি ইউসুফের প্রেমে মজিয়া, —রূপে মোহিত হইয়া, রমণীকুলে কলঙ্করেখা পাতিয়া গিয়াছেন। ইউসুফের মন ভুলাইতে, কত যত্ন, কত চেষ্টা, শেষে "হফতম খানা" (সপ্ততল বাসর) নির্ম্মাণ করিয়া নিজ-মূর্ত্তিসহ মানসাঙ্কিত নাগরে প্রেম-ভাবপূর্ণ, কুরুচি-সম্পন্ন, নানাবিধ চিত্র, বিখ্যাত চিত্রকর দ্বারা চিত্রিত করিয়া ইউসুফের মন ভুলাইতে, প্রিয়দর্শনের হস্ত ধরিয়া চিত্রগুলি দেখাইয়াছিলেন। মহাঋষির মন ভুলাইয়া কুপথে আনিতে কত প্রকার যত্ন করিয়াছিলেন। যাহার রক্ষক ঈশ্বর, তাহার মতিগতি ফিরাইতে সাধ্য কার? সে চিত্রে সে মন ভুলিল না। জুলেখা মিথ্যাভান করিয়া হৃদয়ের রত্ন—মহারত্ন ইউসুফকে অযথা অপরাধী করিয়া বন্দিখানায় পাঠাইতেও ত্রুটি করেন নাই। সুতরাং পথিক তাহা হইতে চক্ষু ফিরাইল।

ভাবতরমণী "নূরজাহান" শেষে রাজরাণী। প্রথমে শের আফগানের মন-মোহিনী ছিলেন। আশ্চর্য্য পতিভক্তি। অনায়াসে স্বামীঘাতককে পতিত্বে বরণ করিলেন। রাজরাণী হইয়া আরও যশস্বিনী হইলেন। অকাতরে পতিঘাতককের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া প্রেম বিতরণ করিলেন। ইহাতেও কি বলিব নূরজাহান রমণীরত্ন? রাজদৌরাত্ম্য-ভয় অবশ্য ছিল, স্বীকার করি, কিন্তু স্বামীর উদ্দেশ্যে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কি সে-সময় কোন উপায় ছিল না? যাহার ইচ্ছা হয়, তিনি সৈনিক—সীমন্তিনীর রূপগুণের প্রশংসা সহস্রমুখে করুন কিন্তু উদাসীন পথিক যাহা ভাবিবার ভাবিয়া চক্ষু অন্যদিকে ফিরাইল।

তৃতীয় চিত্র—কবিবর বঙ্কিম যে-চক্ষে আয়েষার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যে "পজিসনে" তিলোত্তমার "ফটো" তুলিয়াছেন। যে তুলিতে কুন্দ-নন্দিনীর শরীর আঁকিয়াছেন। এবং গুণাকর যে রুচি ও প্রবৃত্তিতে কু-স্বভাব-সম্পন্না—মালিনীর মুখে বিদ্যার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, পথিক সে চক্ষু, সে পজিসনে, সে তুলি, সে প্রবৃত্তিতে দৌলতননেসারের রূপগুণ বর্ণনা করিতে অক্ষম। কাজেই শেষকথা দৌল-তননেসা পবিত্রা, মহাপবিত্রা, দয়াবতী, পুণ্যবতী, এবং আজীবন চিরসতী। সে পবিত্রপদই পথিকের মুক্তিপদ, পূজনীয় পদ। স্বর্গ হইতেও গরিয়সী। ইহা

অপেক্ষা পথিক আর কি বর্ণনা করিবে। তুলনা করিয়াই বা আর কি দেখাইবে ? কাজেই নীরব। কাজেই সেকালের কথা, একালের কথা আপাততঃ এইখানেই শেষ। মনযোগ করিয়া এখন মনের কথা শুনুন।

মীরসাহেব পৈতৃক-বসতবাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি হইতে জামাইয়ের চক্রে অদৃষ্টের লিখায় বঞ্চিত হইয়াছে। পথের ভিখারী হইয়াছেন। এই সকল ভাবিয়া দৌলতননেসা তাঁহাকে বিশেষ যত্ন ও আদরের সহিত সযত্নে রাখিয়াছেন। পিতার সঞ্চিত সমুদায় অর্থ স্বামী হস্তে অর্পণ করিয়া স্বামী পদসেবায় সর্ব্বদা-রত রহিয়াছেন। কোন কারণে তাঁহার মনে কোনরূপ কষ্টের কারণ না হয় তদপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন।

দৌলতননেসাবের পিতা রঙ্গপুর জেলায় মীরমুন্সীর কার্য্য করিতেন। কথায় কথায় টাকা আসিত। তাঁহার বংশের প্রদীপ, উজ্জল-রত্ন, মহামূল্য-মণি যাহা বল, সকলই ঐ একমাত্র কন্যা। সুতরাং কন্যার আদরে জামাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। বিবাহের তিন বৎসর পর মুন্সী জিনাতুল্যা পরলোক গমন করিলে সংসারের সমুদায় ভার মীরসাহেবের শিরেই পড়িল। ভাগী নাই, অংশী নাই, অন্য দাবী নাই, কোন বিষয়ে অভাব নাই। পাঠক! দয়াময় জগদীশ মীরসাহেবকে বাহ্যিকসুখে একপ্রকার সে-সময় ভালই রাখিয়াছিলেন। সর্ব্বদা হাসি-খুসী, রঙ্গ-তামাসাতেই। সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। বসিরুদ্দীন আবার আসিয়া জুটিয়াছে। গান, বাজনা, রগড, আমোদ, বেদম চলিতে লাগিল।

দৌলতননেসা নিজগৃহে শয়ন করিয়া আছেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া যাইতেছে। মীরসাহেব আমোদ-আহ্লাদেই আছেন। দৌলতননেসাবের কর্ণে গানের স্বর আসিতেছে, বাজনার শব্দ যাইতেছে। বামাকণ্ঠের মধুরধ্বনিও সময় সময় প্রবেশ করিতেছে। নূপুরের ঝনঝনীও কানে লাগিতেছে—বাজিতেছে। যত রাত্রিই হউক স্বামীর সহিত দেখা হইলে, সেই বিশুদ্ধভাব, সেই বিশুদ্ধ-প্রেমভাব, সেই হাসিমুখে সেই মধুমাখা হাসি-কথা।

পাড়া-প্রতিবেশীরা সময় সময় অনেক অনেক কথা বলিত। তোমারই বাড়ি, তোমারই ঘর, তোমারই বিষয়, তোমারই সকল। তুমি একঘরের একটি মেয়ে, তোমার আদরের সীমা নাই। আর তোমার স্বামী সর্ব্বদা রঙ্গ-রসে আমোদে মত্ত। আমোদ চুলোয় যাক, মাঝে যে আবার কি ঘটনা। মীরসাহেবের এ-নিতান্তই

অন্যায়। তুমি কিছুই বলিতেছ না, কিন্তু ভাল হইতেছে না। শেষে বড়ই পস্তাইবে।

দৌলতননেসা হাসিয়া বলিতেন। বাড়ি-ঘর, টাকা, কাহার? বল তো বোন! আপন জীবনই যখন আপনার নয়, এ-জগতই যখন চিরস্থায়ী নয়, তখন গৌরব কিসের? তারপরে তাঁহার সকলি ছিল। আমার সম্পত্তির চতুর্গুণ সম্পত্তি তিনি কিনিতে পারিতেন, এত টাকা তাঁহার ছিল। না ছিল কি? সন্তান-সন্ততি, পরিবার সকলই ছিল। সংসারে লোকের যাহা চাই, সকলি অতি পরিপাটিরূপে তাঁহার ছিল। সে সকল এখন নাই। আশ্চর্য্য কথা—তিনি সে সকল কথা লইয়া কোনদিন কোন কথা মুখে আনেন না। কিন্তু তাঁহার মনে যে কিছু না বলে এরূপ নহে। এখন ভাব দেখি বোন! তাঁহার মনে দুঃখ কত? ও গান-বাজনা, নাচ ধরিতে নাই। ও বামাকণ্ঠে কোন কুভাবের কারণ নাই। আর কারণ থাকিলেই বা কি? আমি ইহাই চাই, আর ইহাই ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা করি যে তিনি সুখে থাকুন। তাঁহার অসীম-চিন্তা অন্তর হইতে দূর হউক, তাঁহার মনের দুঃখ ক্রমে উপশম হউক। তিনি যাহাতে সুখে থাকেন সেই আমার সুখ। প্রতিবেশীরা এই সকল কথা শুনিয়া অবাক হইয়া রহিত। কেহ বা রাগ করিয়া উঠিয়াই চলিয়া যাইত।

দ্বাত্রিংশ তরঙ্গ

অপূর্ব্ব দৃশ্য

জগৎ অসীম নহে। সমুদ্রতলও অতলস্পর্শ নহে। জগতে যাহা আছে, তাহার সীমাপরিমাণ, শেষ যাহাই কেন বল, না অবশ্যই আছে। সুখ, দুঃখ, বিরহ, যন্ত্রণা, উন্নতি, অবনতি সকলই ঐ সীমারেখারই মধ্যগত। জন্মই মৃত্যুর কারণ। সুস্থতাই পীড়ার পূর্ব্ব-লক্ষণ, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে ঐ দুইটি কথার মধ্যে, আদি, মধ্য, অন্তসীমা সকলই রহিয়াছে! আবার দেখুন, উদয়ই অস্তের কারণ! রজনীই প্রভাতের আদি-লক্ষণ! প্রভাত আছে বলিয়াই আবার সন্ধ্যা। সুতরাং উন্নতির শেষসীমাই অবনতির সূত্রপাত। সীমারেখা-স্পর্শ করিলেই পরিবর্তন। কেনীর দৌরাত্ম্যে অগ্নি রহিয়া রহিয়া জ্বলিয়া একেবারে সীমারেখা পর্য্যন্ত গিয়া ঠেকিয়াছে। কার সাধ্য রক্ষা করে? প্রকৃতি কাহারও নিজস্ব-রূপে আয়ত্তাধীন নহে। স্ব-ভাবের অভাব কখনই হইতে পারে না। জমিদার, তালুকদার,

মধ্যশ্রেণী, কৃষকশ্রেণী প্রভৃতি যাবতীয় শ্রেণীর লোকেরই অসহ্য হইয়া উঠিল। প্রাণ যায়, আর সহ্য হয় না। কি করে কোথায় গেলে রক্ষা পায়! কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না। কিন্তু মনের গতি অন্যপ্রকার দাঁড়াইয়াছে!

অন্যদিকে হরিশের হৃদয়ভেদী বক্তৃতায়, এবং "পেটরিয়টের" সেই জ্বলন্ত ভাবপূর্ণ বাক-বিতণ্ডায় অনেক বঙ্গভূষণের হৃদয় দুঃখে গলিয়া গিয়াছে। নীলকরের বিরুদ্ধে একটু উত্তেজিত না হইয়াছে তাহাও নহে। দীনবন্ধু, দীনবন্ধুর মহামূল্য দর্পণখানি অনেকের ঘরেই উঠিয়াছে। অনেকের হস্তে উঠিয়া যাহা দেখাইবার তাহাও দেখাইতেছে। ভারত-বন্ধু লং দর্পণখানি বেলাতীসাজে সাজাইতে গিয়া কারাবাসী হইয়াছেন। জরিমানার হাজার টাকা দাতা কালী সিংহ আনন্দ-সহকারে দান করিয়া তবজমা-কারককে খালাস করিয়াছেন। মাননীয় হর্সেল বাহাদুর ভারতীয় সিভিল সার্ভিস আকাশে পূর্ণ-জ্যোতি-সহকারে, পূর্ণ-কলেবরে, পূর্ণচন্দ্র-রূপে দেখা দিয়াছেন। প্রজার দুর্দশা স্বচক্ষে দেখিতেছেন। প্রজার আর্তনাদে বঙ্গেশ্বরের আসন পর্য্যন্ত টলিয়াছে। মহামতি লাটবাহাদুর প্রজার দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য নীলকরের দৌরাত্ম্য স্বয়ং তদন্ত জন্য "সোনামুখী" আশ্রয়ে মফস্বলে বাহির হইয়াছেন।

বর্ষাকাল। কালীগঙ্গা জলে পরিপূর্ণ। "সোনামুখী" নদীয়া অঞ্চল ঘুরিয়া, কুমারনদ হইয়া কালীগঙ্গায় পড়িয়াছে। কালীগঙ্গার আজ অপার-আনন্দ। বঙ্গেশ্বরের বাষ্পীয়তরী বক্ষে করিয়া প্রজার দুরবস্থা, নীলকরের অত্যাচার দেখাইতে দেখাইতে ক্রমে শালঘর মধুয়ার কুঠি পর্য্যন্ত লইয়া আসিয়াছে। পাঠক! যখন সৌভাগ্য গগনে সুবাতাস বহিতে থাকে, তখন তাহা নিবারণ করিতে কাহারও সাধ্য হয় না। আজ প্রজার ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে। সকলেই শুনিয়াছে যে এই জাহাজে লাটসাহেব আসিয়াছেন। আমাদের যথার্থ রাজা এই কলের নৌকায় আসিয়াছেন। প্রাণ ভরিয়া প্রাণের কথা লাটসাহেবকে শুনাইব। মনের কথা মন ভরিয়া বলিব। আমাদের দুঃখের কাহিনী শুনিতেই বঙ্গাধীপ স্বয়ং মফস্বলে বাহির হইয়াছেন। প্রজার মনে এই বিশ্বাস। ঘটনাও তাহাই—ঘটিলও তাহাই।

কালীগঙ্গার দুইধারে সহস্রাধিক প্রজা ষ্টিমারের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া চলিল। শুধু দৌড়িল তাহা নহে—সহস্রমুখে বলিতে লাগিল—দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমরা

মারা গেলাম। আমরা একেবারে সারা হইলাম। আপনি রাজা, আমরা প্রজা, আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা ধনেপ্রাণে সারা হইয়াছি। আমাদিগকে রক্ষা করিয়া যান। দোহাই ধর্ম্মাবতার। আমরা ধনেপ্রাণে একেবারে সারা হইয়াছি। আমাদের দুঃখের কথা শুনিয়া যান। যমের হাত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া যান। "শ্যামচাঁদ" আঘাতে পৃষ্ঠে দাগ বসিয়াছে একবার পবিত্রচক্ষে সেই দাগগুলি দেখিয়া যান। আপনি দেশের রাজা! আমাদের পেটের দিকে মুখের দিকে একবার চাহিয়া যান। দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমাদের দুরবস্থার প্রতি একটু দৃষ্টি করিয়া যান।

সে কান্না কে শোনে? কাহার কর্ণেই বা যাইবে? ইঞ্জিনের স্বাভাবিক বিকট-শব্দে প্রজার আর্ত্তনাদ লাটমহামতির কর্ণে উঠিবে কেন? বোধহয় তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, গ্রাম্যলোক স্টিমার কখনও দেখে নাই, তাহাই ছুটাছুটি করিয়া শোরগোল করিয়া আমোদের সহিত দেখিতেছে। আহ্লাদে দৌড়িতেছে। ক্রমেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ক্রমেই কান্নার-রোল দ্বিগুণ বৃদ্ধি। স্টিমার উজানমুখে যাইতেছে। স্রোতবেগ অতিক্রম করিয়া যাইতে সম্ভবতঃ একটু ধীরে চলিয়াছে। কালীগঙ্গাও বেশী প্রশস্ত নহে। একপারের কথা অপরপারের লোকে বিনামনযোগে বুঝিতে পারে। স্টিমারের সেই কর্ণভেদী ধব-ধব-ঘস-ঘস শব্দ পরাজয় করিয়া সে হৃদয়-বিদারক আর্ত্তনাদ গ্রাণ্টমহামতির কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি চৈতন্য হইলেন। যেমনই মনযোগ, অমনি হৃদয়ে আঘাত। উভয়কূলের বহুসংখ্যক প্রজার আর্ত্তনাদে আজ বঙ্গেশ্বরের মন গলিয়া গেল। মনে মনে মনস্থ করিলেন সে জেলায় যাইয়া ইহার ব্যবস্থা করিবেন। প্রজার দুরবস্থা নিবারণ জন্য বিশেষ যত্নবান হইবেন। মহামতির মনেরভাব প্রজার জানিবার ক্ষমতা হইল না। আশ্বাসমূলক একটি কথা শুনিতেও তাহাদের ভাগ্য হইল না। তাহারা ভাবিয়াছিল যে আমাদের এই কান্নায় লাটসাহেব স্টিমার থামাইতে আদেশ করিবেন, আমরা মনের দ্বার খুলিয়া দেখাইব। দুরবস্থার কাহিনী আজ মনের সাধে শুনাইব। তাহা হইল না। স্টিমার থামিল না। কি ভীষণ দৃশ্য! "নীলকরের দৌরাত্ম্য আগুনে আর কতকাল জ্বলিব। রাজগোচরে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জন করিব সেও স্বীকার! তত্রাচ নীল আর বুনিব না।" এই কথা স্থির করিয়াই সহস্রাধিক প্রজা নদীকূল হইতে জলে ঝাঁপ দিয়া ডুবিতে ডুবিতে ষ্টিমার দিকে আসিতে লাগিল। প্রাণের মায়া নাই, জীবনের আশা নাই,

কোনরূপ সুখের ইচ্ছাও আর নাই। কেনীর দৌরাত্ম্যে মরিতেই হইবে। আর কেন? রাজ-সম্মুখেই ডুবিয়া মরিব। এই কথা মনে করিয়াই সহস্রাধিক প্রজা জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, নদীস্রোতে অঙ্গ ভাসাইল। মহামতি লাটবাহাদুর মহা-ব্যতিব্যস্ত হইলেন। ষ্টিমার থামাইতে আজ্ঞা করিলেন এবং ষ্টিমারস্থ সমুদায় জালিবোট জলে নামাইয়া প্রজাদিগকে উঠাইতে আদেশ করিলেন। যাহারা সন্তরণ দিয়া ষ্টিমার ধরিল, ষ্টিমারের উপর উঠিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া দুরবস্থার বিষয় বলিতে লাগিল। ক্রমে সমুদায় প্রজা ষ্টিমারের চতুঃস্পার্শ্বে, কেহ জলে, কেহ জালিবোটে, কেহ ডাঙ্গায় থাকিয়া আপন আপন দুঃখের কান্না কান্দিতে লাগিল। প্রজার দুরবস্থার কথা শুনিয়া লাটবাহাদুর অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। দশ-বার জন প্রজাকে ষ্টিমারে লইয়া অপর অপর সকলকে আশ্বাস বাক্যে বুঝাইয়া বলিলেন—"তোমাদের যাহার যে নালিশ থাকে, আগামী পরশু শনিবার পাবনায় গিয়া আমাকে জানাইও। আমি তোমাদের বিচার অবশ্যই করিব। তোমরা কুঠিয়ালকে ভয় করিও না। এ-দেশে তাহারাও যেমন প্রজা, তোমরাও সেইরূপ প্রজা!" এই বলিয়া ষ্টিমার ছাড়িয়া দিলেন। অল্পক্ষণ-মধ্যেই সোনামুখী গৌরীর অগাধ জলে আসিয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে গৌরী পার হইয়া পদ্মার স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া পাবনা অভিমুখে চলিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ তরঙ্গ

সূত্রপাত

নীল—বিদ্রোহের সূত্রপাত। বাঙ্গালায় নীলকরের অধঃপতনের সূত্রপাত। প্রজার আনন্দের সীমা নাই। সকালে সকালে স্নান-আহার করিয়া—ঘরে যাহা ছিল সিদ্ধপোড়া, ভাতেভাত যাহা জুটিল আহার করিয়া গ্রামের মাথালপ্রজা ছাতি-লাঠি, গামছা লইয়া লাটদরবারে যাত্রা করিল। নীলকরের দৌরাত্ম্য আগুনে যাহারা পুড়িয়া ছারখারে যাইতেছিল, তাহারাই জিলায় চলিল।

এদিকে কেনী পথে পথে লাঠিয়াল সর্দ্দার, দেশওয়ালী, দোবে, চোবে, পাড়ে, সিং মোতাইন করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার এলাকার যে প্রজা পাবনায় যাইবে তাহার পিঠের চামড়া থাকিবার তো কথাই নাই। তাহার পর অন্য ব্যবস্থা। ফিরে গিয়ে বাস্তুভিটার মাটি আর চোখে দেখিতে হইবে না। স্ত্রী-পরিবারের ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই হইবে।

একথা কুঠিয়াল পক্ষের মুখে জারী হইল। প্রজার কানে উঠিতেও বাকি রহিল না। কিন্তু কেহই গ্রাহ্য করিল না। বাতাসে কথা আসিল বাতাসেই উড়িয়া গেল। প্রজার মনে সেই উৎসাহ, সেই আনন্দ। কার কথা কে শোনে? কে আজ সেকথা গ্রাহ্য করে. আমীন, তাগাদগীর. পাইক, বরকন্দাজের হুকুমের চোটেই আগুন জ্বলিয়াছে, আজ খোদকেনীর হুকুম শূন্যে শূন্যে উড়িয়া গেল। এক কানে প্রবেশ,—অন্য কানে বাহির! হুকুম অতুলের ভয়ে প্রজার হৃদয় থরহরি কম্পে আজ কাঁপিয়া উঠিল না। সাহসের উপর নির্ভর করিয়া সকলে এক জোটবদ্ধ হইয়া জিলায় চলিল। কি আশ্চর্য্য! খোদযমের হুকুম আজ শূন্যে শূন্যে উড়িয়া গেল।

হিন্দু-মুসলমান একত্রে একযোগে পূর্ণ উৎসাহে বক্ষবিস্তার করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিল। কাহারও কোন কথা কানে করিল না। কারও বাধা মানিল না। কাল বঙ্গেশ্বরের মুখে যে কথা শুনিয়াছে সেই কথাতেই প্রজার চির-পরিশুষ্ক হৃদয়ে কথঞ্চিৎ আশাবারির সঞ্চার হইয়াছে। তাহাতেই এত আনন্দ। কার সাধ্য বাধা দেয়? কার সাধ্য সে মাতওয়ালদিগের গতি, ভয় দেখাইয়া বলপূর্ব্বক রোধ করে? কে তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিতে পারে? কার সাধ্য তাহাদের সম্মুখে ঐ কথা মুখে করিয়া দাঁড়ায়? পথ-ঘাট ভরিয়া প্রজাগণ দলে দলে পাবনা অভিমুখে মনের আনন্দে চলিল। প্রজার বল, প্রজার সাহস, প্রজার ঐ সকল কথা কেনীর কর্ণে উঠিলে কেনী কি করিতেন, জানি না। তাঁহার কর্ণে এইমাত্র উঠিল যে—"অমুক-অমুক গ্রামের প্রজারা হুকুম মানিল না। নিশ্চয়ই তাহারা পাবনায় যাইবে।"

আর কি কথা আছে? যেই শুনা অমনি হুকুম। প্রধান প্রধান আমলাগণ হাতিঘোড়ায় চড়িয়া, যমদূতের ন্যায় বাছা বাছা সর্দ্দার, লাঠিয়াল, হিন্দুস্থানী. দেশ-ওয়ালী সেপাইগণ সঙ্গে করিয়া মনিবের নিকট বাহাদুরী লইতে, গ্রামে গ্রামে প্রজাদমনে চক্ষুরাঙ্গা করিয়া চলিলেন। চলিলেন—না ছুটিলেন। যে দল যে গ্রামের প্রজার চক্ষে পড়িল, তাহাদের চক্ষের চাউনি দেখিয়াই তাহাদের শরীর গরম হইয়া গেল। চক্ষের কথা তো আগেই বলা হইয়াছে। কারণ যাহা কখনো দেখেন নাই, কানে শোনেন নাই, তাহাই দেখিলেন এবং শুনিলেন। গ্রামে প্রবেশ করিতেই একজন শোর করিয়া বলিয়া উঠিল—"ঐ আসিয়াছে, ঐ আসিয়াছে, তোরা কে কোথায়?"—

হাতের মাথায় যে যাহা পাইল, সে তাহা লইয়া ছুটিল। চক্ষের পলক ফিরাইতে না ফিরাইতে বহু-লোক একত্রে দলবদ্ধ হইয়া হাত নাড়িয়া নাড়িয়া বলিতে লাগিল—"ভাল মানুষ হও তবে চলে যাও. যদি প্রাণের ভয় থাকে তবে ফিরে যাও। আব এক-পা এদিকে আসিলেই মাথা ভাঙ্গবো। কাল লাটসাহেবেব মুখে শুনিয়াছি, কুঠেলসাহেববা আমাদের রাজা নয়. হর্ত্তাকর্ত্তার মালিকও নয়। ওবে! আমবা আগে বুঝিতে পারি নাই। আজ আমরা আমাদের রাজার দরবারে যাইব। এতদিন যা-যা কবেছ, তাই জানাব। একটি কথাও মিছে বলিব না। এখন বেশ বুঝেছি। আর হবে না—এখন খুব বুঝেছি, আমবাও প্রজা তোমরাও প্রজা! আমরাও যা তোমবাও তাই। ভাল চাস ফিরে যা—আব আগে বাড়িস না। আমবা যথার্থ বাজাব কাছে যাচ্ছি। তোদের ও-ভেল—রাজার কথা কে শোনে রে?"

কুঠিব চাকর! কমপাত্র নহে সহসা হটিবার লোক নহে—হটিল না। কিন্তু প্রজার কথায় পায়ের তালু হইতে মাথা পর্য্যন্ত জলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়া গেল। ভাবিল না, চিন্তাও কবিল না, চিন্তা কবিবার সময়ও পাইল না। হঠাৎ এরূপ কেন হইল? এরূপ পরিবর্ত্তন কেন ঘটিল? উপস্থিত ক্ষেত্রে ভাবাও কঠিন কথা। চিন্তা করাও শক্ত কথা। তাহাতে কুঠিব চাকব, পূর্ণমাত্রায় সর্ব্বদাই রাগেচড়া। ঐ সকল মর্ম্মভেদী কথায় বেগে ভূত হইলেন। স্ব-স্ব পদ-মর্য্যাদা, কুঠির ক্ষমতা, নিজ এলাকা। কাল যাকে চাবুক সই কবেছি, সাহেবের শ্যামচাঁদের ঘা আজ পর্য্যন্ত পিঠে বিরাজ করছে। উঠতে কানমলা, বসতে কানমলা, লাথি, কিল, চড়চাপড়ের সীমা কে করে? মেয়েমানুষ ধবে নীল কাটাইয়াছি। যে ব্যাটা হাত নেড়ে বেশী কথা বলছে, কালও এই কালীগঙ্গায় ঐ ব্যাটার ঘাড়ে গুণবাড়ি দিয়া নীলের নৌকায় গুণ টানাইয়াছি। আজ এতবড় কথা, কি কাণ্ড! এই সকল কথা মনে মনে তুলিয়া শেষ করিতে করিতেই উত্তেজিতভাবে তেড়িমেরী করিয়া মুখে স্পষ্ট কথা ফুটিল—

মার! দের! মার! দের! একমুখ হইতে কথা ছুটিতেই অধীনস্থদিগের পঞ্চাশ মুখে ঐ কথা—

ঐ পীট পীট প্রায় পাঁচশত মুখে আন্তরিক ক্রোধের সহিত ঐ কথা—বেশীর

ভাগ প্রজার মনের অন্তঃস্থান হইতে বাহির হইল আর কি? কর খুন! মার! দের! ভাঙ্গ মাথা, মার লাঠি—

যাহা ঘটিবার ঘটিল—শেষে যাহা ঘটিল, সে কথা প্রকাশ করিতে যথার্থ বলিতেছি পথিকের মনে বড়ই কষ্টবোধ হইল! চক্ষে জল আসিল! পাঠক! যথার্থ বলিতেছি মনে সেই একপ্রকার ভাবের উদয় হইল। যে, হা! কাল কি আজ কি ভগবান! তোমার যে অপার মহিমা, তোমার যে অপার লীলা! তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত আজিকার এই ঘটনা। নীলকর এবং প্রজার ঘটনা। সাধারণ চোখে দেখিতে গেলে কিছুই নহে। হয়ত কাহারও চক্ষে নাও পড়িতে পারে। কিন্তু স্থিরভাবে একবার ভাবিয়া দেখিলে আজিকার এই ঘটনার ভগবানের একটি মহৎ-মহিমার স-প্রমাণ হইল।

পাঠক! অনেকেই গান গায়, অনেকেই গানে গলিয়া যায়। কেনীর কার্য্য-কারক, লাঠিয়ালদিগের অবস্থা দেখিয়া মাননীয় ভ্রাতার একটি গান পথিকের মনে পড়িল। গানটি শুনুন—উপস্থিত ঘটনার ভাব এই গানেই পাইবেন.—বিস্তারিত বর্ণনায় আর শক্তি হইল না গানেই বুঝিবেন। শুনুন—

গান

দেখ ভাই জলের বুদ-বুদ, কিবা অদ্ভুত, দুনিয়ার সব আজব খেলা।
আজি কেউ বাদশা হয়ে দোস্তল'য়ে রংমহলে করছে খেলা—
কাল আবার সব হারায়ে ফকির হয়ে সার করেছে গাছেরতলা
আজি যে ধন গরিমায়, লোকের মাথায় মারছে জুতা এড়িতোলা—
কাল আবার কপনী পরে টুকনী করে, কান্ধে ঝোলে ভিক্ষাবঝোলা ॥
আজি যেখানে শহর কতই নহর বসিয়াছে বাজারমেলা—
কাল আবার তথা নদী নিরবধি করছেরে তরঙ্গ খেলা ॥

পাঠক! কুঠির লোক প্রজাশাসনে দল বান্ধিয়া দলে দলে কুঠির নিকটবর্তী যে যে গ্রামে বাহাদুরি লইতে আসিয়াছিল—যে দল যে গ্রামে ঢুকিল. সেই গ্রামেই ঐ এক কথা। একরূপ অভ্যর্থনা। একরূপভাব। শেষফল সকল স্থানেই সমান। গ্রাম বিশেষ, কিছু ইতর বিশেষ যে না ঘটিল তাহাও নহে। কোন-দলই দল বাঁধিয়া আর কুঠিমুখ হইতে পারিল না। নানা পথে, নানা ভাবে, নানা আকারে, যে যে প্রকারে সুবিধা-সুযোগ পাইল, প্রাণ লইয়া কুঠিমুখে ছুটিল।

ছুটিল কি? পালাইল। কাহাকে বাধ্য হইয়া ঘোড়াটি ছাড়িয়া যাইতে হইল। কেহ কেহ পরিধেয় বসন ফেলিয়া বাধ্য হইয়া দিগম্বরবেশে মাঠে মাঠে দৌড়িয়া পালাইল। ঢাল, তরবার, লাঠি, ঠেঙ্গা কালীগঙ্গার স্রোতে যাহা ভাসিবার ভাসিয়া চলিল, যাহা ডুবিবার ঐখানেই ডুবিয়া পড়িল। জলে ফেলিল কে? অমোঘঅস্ত্র সকল আজ জলে বিসর্জ্জন করিল কে? সকলি সেই দয়াময়ের মহিমা। কুঠির লোক প্রাণ লইয়া পার। কেনার অস্ত্র প্রজা হস্তে আজ প্রথম জলে ভাসিল, এই প্রথম জলে ডুবিল। যাহারা দরবারে যাইতে একটু বাধা পাইয়াছিল, তাহারা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মনের আনন্দে সম্পূর্ণ উৎসাহে জিলায় লাটদরবারে চলিল। পূর্ব্বে যাহাদের যাইবার কোন কথাই ছিল না, উপস্থিত ঘটনায় তাহারাও অনেকে তাহাদের সঙ্গি হইল। কি জানি আবার কোন দুস্মন কোন পথে কি ঘটনা ঘটায়। হিন্দু-মুসলমান একত্রে আপন আপন ইষ্ট দেবতার নাম করিয়া সার বাঁধিয়া পথে বাহির হইল। কালীগঙ্গায় গৌরীগর্ভে নৌকায় পদ্মার ঘাটে এবং চলতি রাস্তায়, পদব্রজে কত লোক যাইতে লাগিল, তাহার সংখ্যা করা কঠিন। সকলের মুখেই আনন্দের আভা। সকলেই যেন কি একটা মহৎকার্য্যে কৃতকার্য্য হইবে আশয়েই মহাখুশী। সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত। সকলেই যেন জেল হইতে খালাস পাইয়াছে। অবিচারে অত্যাচারে এতদিন জেলখানায় পচিতেছিল। দৈববলে বলীয়ান হইয়া জেল ভাঙ্গিয়া যেন কোন যথার্থ আশ্রয়দাতার পদাশ্রয় লইতে বেগে ছুটিয়াছে! পদ্মা-গৌরী-সংযোগস্থল বড়ই ভয়ানক। পদ্মা পাড়ি না দিলে জিলায় যাইবার উপায় নাই! নৌকাতে পদ্মাপার হইতে হয়। স্থল-পথে বান্দারাস্তা বহিয়া গেলেও কাঁচাদিয়াড়ের ঘাটে পাটনীর নৌকায় খেয়াপার হইতে হয়। পাঠক! চলুন আমরাও পদ্মাপারে যাই।

চতুর্ত্রিংশ তরঙ্গ

দরবার

আজ শনিবার। বঙ্গেশ্বর প্রকাশ্য দরবারে প্রজার দুরবস্থা শুনিবেন। প্রার্থনাপত্র গ্রহণ করিবেন। এই ঘোষণা। জিলাময় লোক। মাঠে, ঘাটে, রাস্তায়, ইছামতী নদীর পূর্ব্ব-পশ্চিম, উভয়তীরে, দালানে, কোঠায়, ঘরে, বোটে, বজরায়, নানাবিধ স্থানে লোক আর ধরে না। লাট দেখিতে, দরবার দেখিতে, মনের বেদনা জানাইতে নীলকরের দৌরাত্ম্য বিষয় বঙ্গেশ্বরের গোচর করিতে

হিন্দু, মুসলমান, কৃষকশ্রেণী, মধ্যশ্রেণী, তালুকদার ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী নানা শ্রেণীর লোক উপস্থিত। নীলকর পক্ষীয়, নীলকর সংশ্রবী, হিতৈষী, ভালবাসার লোকও যে ঐ সকল দলের মধ্যে কেহ কেহ না আছে এরূপও নহে। তাহারা নানাবেশে, নানাভাবে দলমধ্যে গোপনে, প্রকাশ্যে বেড়াইতেছে—সন্ধান লইতেছে। উপস্থিত লোকসমুদ্র মধ্যে কুঠিয়াল-পক্ষীয় লোক বিন্দু-সদৃশ। হঠাৎ কাহারও নজরে পড়িতেছে, আবার কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে, তাহার আর সন্ধানই পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু এত লোকের মধ্যে সে দুস্মন চেহারা যেন মার্কামারা। মুখের দিক নজর পড়িতেই যেন মুখভাবেই স-প্রমাণ করিয়া দিতেছে যে, আমরাই কুঠিয়াল-পক্ষীয়। আমরাই নীলকরের গুপ্তচর ও সন্ধানী। বড় বড় জমিদার বড় বড় বজরায়, বড় বড় নিশান উড়াইয়া, ঘাট-অঘাট আলো করিয়া ইছামতীর বক্ষে ভাসিতেছেন। বায়ু প্রতিঘাতে জল নাচিতেছে। বোট-বজরাও নাচিতেছে। অনেকেই নানাদোলায় দুলিতেছেন। কে কোন পক্ষে থাকিবেন, প্রজার হইয়া দুইটি কথা বলিবেন কি নীলকরের পক্ষ সমর্থন করিবেন। লাটসাহেব আজ আছেন কালই চলিয়া যাইবেন, শেষে—ধরিবে কে? কুঠির নায়েব, পেস্কার দেওয়ানজীবাবুকে কত ডালা, কত ফলফুল, কত চব্য-চষ্য-লেহ্য-পেয় দিয়া একটু অনুগ্রহ পাইয়াছেন। লোকে বলে ভালবাসা হইয়াছেন। তাহার পরেও কত রুধির, কত তৈল উপহার দিয়াছেন। কত আলাপী লোকের নিকট হইতে গ্রিসীয়ান সিলিপর কেহ ঠনঠনের জোগাড করিয়া আমলাদিগের সম্মুখে হাজির করিয়াছেন। তাহাতেই রক্ষা! তাহাতেই আজ বজরার মাস্তলে বড় বড় নিশান। কুঠিয়াল-দিগকে দিয়েথুয়ে যা আছে তাহাতেই কষ্টেসৃষ্টে কোন গতিকে মানসম্ভ্রম বজায় রাখিয়া এতদিন কাটাইয়াছেন। মনের কথা মনেই আছে। মুখ ফুটে প্রকাশ করা জমীদারশ্রেণীর বড়ই কষ্টের কারণ হইয়াছে। পরিণাম ফল প্রতি তাঁহাদের অনেকের লক্ষ্য পড়িয়াছে। প্রজার দিকে থাকিলেই বা কি হয়। নীলকরের পক্ষে তো যে প্রকারেই হউক, প্রকাশ্যেই হউক, মানসম্ভ্রম বজায় রাখিতে গোপ-নেই হউক, একভাবে আছেনই। আর প্রজার পক্ষে যে না আছেন তাহাও নহে। গোপনে গোপনে তাহাদের সহিত বিশেষ যোগ রাখিয়াছেন। আজ পর্য্যন্ত, কোন পক্ষের নিকটেই মনেমুখে, পরিচিত হন নাই যে তিনি কাহার? রামের, না রাবণের? নীলকরের না প্রজার—বড়ই কঠিন সমস্যা উপস্থিত! আর পা দিয়ে

সাপ খেলান চলিল না। দুইমন যোগাইয়া নিরাপদে থাকা আর ভাগ্যে ঘটিল না। মহা-সঙ্কটকাল উপস্থিত! এই শ্রেণীমধ্যে মীরসাহেবও আছেন, সা গোলামও আছেন। কিন্তু পৃথক পৃথকভাবে স্বতন্ত্র নৌকায়। কে কোন পক্ষে আছেন তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই। তবে এটা নিশ্চয় কথা একপ্রকার জানা কথা। মীর-সাহেব যে পক্ষ অবলম্বন করিবেন, সা গোলাম তাহার বিপরীত দিকে—বিপক্ষে নিশ্চয়ই থাকিবেন। মনে সুখ কাহারও নাই। অন্য অন্য জমিদারগণেরও ঐ কথা! মনে নানাকথা। স্বার্থ, লোভ, স্বদেশ, প্রজা, নীলকর গুদাম, শ্যামচাঁদ, নীলহউজ, নীলের নৌকা, গুণ টানা ইত্যাদি। অন্য দিকে লাটদরবার! যা থাকে কপালে ইত্যাদি নানা কথায় নানা চিন্তায় সকলেই চিন্তিত। মনে-সুখ কাহারও নাই। প্রজার মনেও সুখ নাই, নীলকরের মনেও সুখ নাই।

সোনামুখী ইছামতীগর্ভে নানাসাজে সজ্জিত হইয়া উচ্চ-মাস্তলে ব্রিটিস নিশান সদর্পে উড়াইয়া—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর জয়! ঘোষণা, ইছামতীর স্রোতের সহিত একত্র মিশিয়া করিতেছে।

বর্ষাকাল। শহরের প্রায় তিনদিকে ইছামতী পরিখারূপেই স্বাভাবিক বক্রগতিতে পদ্মায় মিশিয়াছে। পরিসর বেশী নহে। এপার-ওপার, কথা। যাওয়া-আসা করিতে পারে। কালগতিকে জলস্থল প্রায় সমান হইয়াছে। নদী কিনা-রের দালান, কোঠা, বড়রাস্তা, বড় বড় গাছ, তাহারপরেই বোট, বজরা, ডিঙ্গি-নৌকা, জল, মাস্তলে নিশান। একটু দূরেই সোনামুখীর সেই মহামাস্তলের মস্ত-কোপরী রাজনিশান অতি গম্ভীরভাবে দুলিয়া দুলিয়া বঙ্গেশ্বরের শুভাগমন চিহ্ন বায়ুকে দেখাইয়া সর্ব্বত্র ঐ আগমন সংবাদ প্রচার জন্য নম্রতার সহিত অনুরোধ করিতেছে। সোনামুখীর পশ্চিম দিয়া চলতি নৌকা, স্রোতসহায়ে মহাবেগে ছুটিয়াছে। ইছামতীর পশ্চিমতীরে লোকের অবধি নাই। কত আসিতেছে, কত সারিবান্দিয়া, দাঁড়াইয়া, জাহাজ, নৌকা, বজরা, বোট, নিশান দেখিতেছে। খেয়ানৌকা ডোব ডোব হইয়া মানুষ পার করিতেছে।

মফস্বলের দরবার! বিশেষ বর্ষাকাল। দরবারে সাজ-সজ্জা, বাহার, জাঁকজমক কিছুই নাই। বৃহৎ সামিয়ানার তলে শতাধিক আসন। তিনখানি বড়চৌকি একত্র করিয়া তাহার উপরে একখানি গদীবসান ভাল চেয়ার। তদুপরি জড়াও চাঁদওয়া। জিলায় হাকিমান, থানাদার, জামাদার, বরকন্দাজ, চৌকিদার

সকলেই হাজির। দুইপ্রহর হইয়া বেলা কিছু গড়িতেই জিলার মান্যগণ্য-সম্ভ্রান্ত মহাশয়গণের দরবারে বার আরম্ভ হইল। চতুর্দ্দিক হইতে সাধারণ প্রজার হরি-বোল এবং আল্লা-ধ্বনিতে জলস্থল কাঁপিতে লাগিল। সময় বুঝিয়াই বঙ্গেশ্বর পারিষদগণসহ দরবারে পদার্পণ করিলেন। সে সময় প্রজাগণ উৎসাহের সহিত দ্বিগুণ রবে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। জলস্থল কাঁপাইয়া, বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া, সে অনন্ত জয়ধ্বনির প্রতিধ্বনি অনন্ত আকাশে হইতে লাগিল। চারিদিক হইতে 'চুপ চুপ' কথা উঠিয়া অতিঅল্প সময় ঐরূপ গোলযোগেই কাটিয়া গেল। শেষে সকলেই নীরব। বঙ্গেশ্বরের পারিষদগণের মধ্য হইতে একজন বাঙ্গালা ভাষায় প্রজাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"বঙ্গাধীপের আজ্ঞাক্রমে আমি তোমাদিগকে বলিতেছি। তোমাদের প্রার্থনাপত্র দাখিল কর, আর মুখে যদি বলিবার থাকে তাহা বল"—মুখের কথা মুখ হইতে না ফুরাইতেই অতিকম হইলেও দশহাজার মুখে একযোগে বলিয়া উঠিল—

"দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমরা মরিলাম। নীলের জুলুমে আমরা মারা গেলাম। আমাদের পেটে ভাত নাই। ধানের জমিতে জবরাণে নীল-বুনিয়া লয়। আমরা কি খাইয়া বাঁচি।"

কথা শেষ হইতে না হইতে প্রার্থনাপত্র সকল হাতে হাতে বঙ্গেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল। এক পারিষদে দরখাস্ত লইয়া কুলাইতে পারিলেন না। শেষ সমুদায় পারিষদ স্বয়ং বঙ্গাধীপ, স্থানীয় হাকিমান প্রভৃতি প্রজার প্রার্থনাপত্র হাতে লইয়া লাটসাহেবের দক্ষিণ-বামে রাখিতে লাগিলেন। পাঠক! একেবারে উপকথা মনে করিবেন না। এত প্রার্থনাপত্র দাখিল হইল যে লাটবাহাদুরের দুই পার্শ্বে দুইটি কাগজের স্তূপ খাড়া হইল। একটি মানুষ সেই স্তূপের পার্শ্বে অনা-য়াসে গা ঢাকা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। তথাচ ইতি নাই, ক্রমেই হাতে আসিতেছে। মাঝে মাঝে প্রজার আর্ত্তনাদ। নীলকরের দৌরাত্ম্য কথা, অত্যা-চারের কথা লাটবাহাদুরের কানে আসিতেছে। মুখে যে কথা প্রার্থনাপত্রেও সেই কথা। তবে বিস্তারিতরূপে লিখা। কিন্তু মূল একই। প্রজার মনের ভাব, প্রার্থনাপত্রের চুম্বকভাব বুঝিতে লাটবাহাদুর কেন, দরবারস্থ যাবতীয় লোকেরই বুঝিতে বাকি রহিল না। নীলকরের অত্যাচার যে প্রজাগণের অসহনীয় তাহাও

বেশ বোঝা গেল। নীলকর পক্ষীয় লোকের এবং দারোগা, জমাদার ও স্থানীয় হাকিমান, জমিদার সকলের সম্মুখে প্রজাগণ কাতরস্বরে দুঃখের অবস্থা কান্দিয়া কান্দিয়া বলিতে লাগিল। মনের কথা প্রাণ খুলিয়া বলিতে লাগিল। হাকিমান লজ্জিত, দারোগা, জমাদারের মাথা হেঁট, নীলকরের মুখে চুনকালি, প্রজার চক্ষে জল। আর বুঝিতে বাকি কি? সকলেই বুঝিলেন, হাকিমান বুঝিলেন, বঙ্গাধীপও বিশেষ করিয়া বুঝিলেন যে যথার্থই নীলকরগণ অত্যাচারী। অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়াই এত উতলা, এত উত্তেজিত, এত একগুঁয়ে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আপাততঃ মিষ্টি কথায় ইহাদিগকে সান্ত্বনা করা কর্ত্তব্য।

বঙ্গাধীপের আদেশে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত পারিষদমহোদয় উচ্চস্বরে স্পষ্টাক্ষরে বলিতে লাগিলেন—

"প্রজাগণ! তোমরা স্থির হও, এত উতলা হইও না। স্থির হইয়া শুন! গোল করিলে তোমাদের কার্য্যেই বিঘ্ন ঘটিবে। স্থির হইয়া কথা শুন।"

প্রজাগণ! তোমরা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রজা। তোমাদের প্রতি সবলেরা কোনপ্রকার অত্যাচার না করে, চোরডাকাতে তোমাদের টাকাকড়ি লুটপাট করিয়া না লয়। জমিদার, নীলকর তোমাদিগকে অন্যায়রূপে কোনপ্রকারে কষ্ট না দেয়, জোর জবরাণ না করিতে পারে তাহার জন্যই অর্থাৎ তোমাদিগকে চিরকাল সুখে রাখিবার জন্যই স্থানে স্থানে থানা, মহকুমা, জিলা বসান হইয়াছে। তোমরা সর্ব্বপ্রকারে সুখে থাক ইহাই আমাদের অভিপ্রায়। নীলকরের অত্যাচারে তোমরা যে কষ্টে আছ তাহা বেশ বোঝা গিয়াছে।

প্রজাগণ মধ্য হইতে একজন বলিতে দশজন বলিয়া উঠিল—"দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমরা একেবারে সারা হইয়াছি। আমাদের জাত, কুল, মান, প্রাণ সকলি গিয়াছে। পেটে ভাত নাই। তাহার উপর আমীন, খালাসীর বেতের ঘা, কপালগুণে কোন কোন দিন শ্যামচাঁদের সঙ্গেও আলাপ। দেখুন! পেটের, পিঠের অবস্থা দেখুন! আর কি বলব।"

পারিষদসাহেব বলিলেন—আর দেখাইতে হইবে না। তোমাদের দুর্দ্দশার বিষয় সকলেই ভালমত বুঝিয়াছেন। শুন—স্থির হইয়া কথা শুন। যাতে তোমাদের ভাল হইবে, তোমরা সুখে থাকিবে তাহাই শুন।

তোমরা জমিদারকে দস্তুরমত জমির খাজানা বিনাওজরে দিবে। নীলকর

কি জমিদার তোমাদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিলে প্রথম থানায় জানাইবে। পরে তাহারা যাহা বলিয়া দেয় অর্থাৎ মাজিষ্টারসাহেবের নিকট জানাইতে বলিলে তাঁহার নিকট জানাইবে। তিনি তোমাদের নালিশ শুনিবেন—তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। তোমরা যাহাতে সুখে থাক তাহার উপায় করিবেন। তোমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক যদি নীলের আবাদ না কর তবে তোমাদিগকে জোর করিয়া কেহই নীল বুনানি করাইতে পারিবে না। যে জোর জবরাণ করিবে সেই শাস্তি পাইবে। বড, ছোট, গরিব, ধনী, কৃষিপ্রজা, জমিদার কি নীলকর বলিয়া বিচারে কোন প্রভেদ বিশেষ নাই। বিচারাদালতে সকলেই সমান। এমন বিচারে আর তোমাদের ভয়ের কারণ কি? মন্দ কাজ করিলে তোমরাও যেমন শাস্তি পাইবে, নীলকর সাহেবও তেমনি শাস্তি পাইবেন। যে অপরাধে তোমরা ফাটক খাটিবে, সেই অপরাধে নীলকর সাহেবও জেলে যাইবেন। বিচারাদালতে কোন প্রভেদ নাই। কোনরূপ খাতির নাই। কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ কোন কাজই করাইতে পারে না। তোমাদের ইচ্ছা হয় তোমরা নীল-বুনিয়া তাহার মজুরী লও। ইচ্ছা না হয় নীল-বুনিও না, মজুরী পাইবে না।

শতমুখে বলিয়া উঠিল—ধর্ম্মাবতার! আমরা মজুরি চাই না। ভিক্ষা করিয়া খাইব তবু নীলের বীজ আর হাতে করিব না। মজুরী আমাদের মাথায়। আমরা কিছুতেই আর নীল বুনিব না।

পারিষদ সাহেব: "শুন! আরও শুন' সে তোমাদের ইচ্ছা। অনিচ্ছায় তোমাদিগের দ্বারা কেহই কিছু করাইতে পারিবে না। আর তোমাদের এই সকল দরখাস্তের বিচার কলিকাতায় গিয়া হইবে। তোমরা ইহার খবর সত্বরেই জিলার হাকিমান সাহেবগণের মুখে শুনিতে পাইবে। আর তোমাদিগকে আভাষ বলিতেছি, শালঘর মধুয়ার কুঠির নিকটে শীঘ্রই এক নূতন মহকুমা খোলা হইবে। পদ্মাপারের প্রজাকে পদ্মাপার হইয়া আর পাবনায় আসিতে হইবে না।

প্রজাগণ অন্তরের অন্তঃস্থান হইতে মহারাণীর জয়! জয় মা ভারতেশ্বরীর জয়! ঘোষণা করিতে করিতে আনন্দে নাচিয়া উঠিল। দুই হাত তুলিয়া লাটবাহাদুরকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। এত দুঃখের পর, এত যন্ত্রনা এত ক্লেশের পর প্রধান রাজপুরুষের মুখে এইরূপ আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়া আনন্দে-বিহ্বল প্রায় হইল। দারোগা, জমাদার, প্রহরী, সান্ত্রী কেহই আর সে গোলযোগ নিবারণ

করিতে পারিল না। পুনঃ পুনঃ জয় ঘোষণা, পুনঃ পুনঃ আশীর্ব্বাদ—হৃদয়ের গভীর স্থান হইতে আশীর্ব্বাদ। অতি কম হইলেও কুড়ি হাজার কণ্ঠ হইতে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর জয়ধ্বনি হইতে লাগিল—সেপাই, সান্ত্রী, প্রহরী, দারোগা, জমাদার স্বয়ং মাজিষ্টার সে গোলযোগ নিবারণ জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেহই কিছু করিতে পারিলেন না। প্রজার আনন্দ যেন আর ধরে না। জবরানে কেহ নীল-বুনানি করিতে পারিবে না। এই মহামূল্য কথায় প্রজার আনন্দ আজ হৃদয়ে ধরে না। দুহাত তুলিয়া নাচিয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। সে জয়ঘোষণা—সে আশীর্ব্বাদে বাধা দেয় কার সাধ্য! ঘোর উন্মত্ত। কে কাহার কথা শুনে, কে আজ কাহাকে মান্য করে! কার কথায়, কার নিবারণে সে মত্ততা হইতে ক্ষান্ত হয়? মনে অন্য কোন কথা নাই, ভবিষ্যত ভাবনার দিকে কাহারও মন নাই, গ্রামে ফিরিয়া গেলে নীলকরের হাতে জাতি, মান, প্রাণ বজায় থাকিবে কিনা? যেটুকু আছে—যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা থাকিবে কিনা? বাড়ি গিয়া স্ত্রী-পরিবার, সন্তানসন্ততি, ভাই, বন্ধু, পরিজনের মুখ দেখিতে পাইবে কিনা? আজিকার এ ঘটনার পরিণাম ফল কি? ইহার সীমা কোথায়? সে সকল কথার দিকে কাহারও মন নাই। জয়রবে উন্মত্ত। আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে কণ্ঠ শুষ্ক। স্থানীয় হাকিমান, শান্তিরক্ষক মহোদয়গণ, এই উত্তপ্ত স্বর্ণ-মাখা, রাজবচনাবলী তাঁহাদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা হইবে কি-না? তাঁহারা রক্ষা করিবেন কি-না? রক্ষা করিতে পারিবেন কি-না? নিরীহ প্রজার প্রাণ, নীলকর রাক্ষসের বিষময় বিশালদণ্ড হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন কি-না? অসীম সুখসাগরে ভাসিয়া আবার বিষাদতরঙ্গে হাবুডুবু খাইয়া একেবারে ডুবিতে হইবে কি-না? ক্রমে নবজীবন স্থায়িত্ব হইবে কি-না? হইবার আশা আছে কি-না? সে বিষয় কাহারও মনে নাই। আনন্দে বিভোর, জয়রবে বিহ্বল, জয়রবে মত্ত, কার কথা কে শুনে? সুতরাং সভা ভঙ্গ—বঙ্গেশ্বর পারিষদসহ সোনামুখীতে উঠিলেন। স্থানীয় জমিদার, নীলকর, মহাজন, সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণের আহ্বান হইল। ক্রমে সকলেই সোনামুখীতে যাইয়া লাটবাহাদুর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়া সেলাম বাজাইয়া বিদায় হইতে লাগিলেন।

চলুন আমরা প্রজাগণের সঙ্গে সঙ্গে পদ্মাপার হই। আর তাহারা আজ যে মহামূল্য রত্ন লাভ করিয়া চলিল; চলুন! তাহাদের মনের ভাবটা ভাল করিয়া

শুনিয়া লই। বড়কঠিন স্থানে আসা হইয়াছে। মানবজীবনে—নবজীবন। বড়ই কঠিন ব্যাপার। কি যে ঘটিবে, প্রজার ভাগ্যে কি ঘটিবে, তাহা সেই অন্তর্যামী ভগবানই জানেন।

বঙ্গেশ্বর অদ্যই পাবনা ছাড়িবেন। পাবনার বর্ত্তমান-শ্রী সোনামুখীর ধুম উদ্গীরণ সহিত একেবারে বিশ্রী হইয়া যাইবে। আর কেন? আগমনে যোগ আনন্দকর—বিদায়ে যোগ বড়ই দুঃখকর—চলুন! আর এখানে থাকা নয়।

পঞ্চত্রিংশ তরঙ্গ

মনের কথা

পাঠক! আমিও বলিতেছি মনের কথা—আপনারাও শুনিতেছেন উদাসীন পথিকের মনের কথা। এখন প্রাণ ভরিয়া একবার প্রজার কথা শুনুন। এ কয়েকদিন তাহারা কি বুঝিল, কি পাইল, ঐ শুনুন অকপটে মনের কথা প্রকাশ করিতেছে। কান পাতিয়া শুনিতে শুনিতে উহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলুন। অধমও সঙ্গেই আছে।

প্রথম প্রজা: ভালই হল! পদ্মাপাড়ি দেওয়ার দায় হইতে রক্ষা পেলেম। বাঁচা গেল। কুঠির নিকটেই মহকুমা হবে। হাকিম থাকবে। যখন যাহা হবে তখনি হাকিমকে জানাইতে পারিব। প্রাণটি হাতে করে পদ্মাপাড়ি দেওয়ার দায় হইতে তো বাঁচা যাবে।

দ্বিতীয় প্রজা: হলে তো ভালই হয়! ভায়া! না হলে আর বিশ্বাস নাই।

প্রথম: ভায়া! তা কি আর না হয়ে যায়? একি তোমার আমার কথা না—বড়লোকের কথা? ভায়া! এ সাহেব-সুবোর কথা। এ-কথার মার নাই।

দ্বিতীয়: তাতো বটে। তোমার আমার কথাটা যেন ভাল করে না বুঝেই বল্লেন যে বুঝেছি। আর ভায়া! কষ্টের জীবনে, অনাটনের সংসারে, স্বার্থের প্রয়োজনে, বিশেষ কন্যাদায়ে এবং অন্নচিন্তায় আমাদের কথা ঠিক থাকে না। থাকিতে পারে না, আমরাও কথা ঠিক রাখিতে পারি না—তা ঠিক। কিন্তু বড়লোকের কথাটা কি রকম?

প্রথম: ভায়া হে! রকম আর কিছু নয়। বড়লোকের সকলই বড়, দান বড়, কৃপণতা বড়, মান বড়, অপমান বড়, গলাও বড়, কথাও বড়। যেখানে বড় কথা, সেইখানেই গোলের কথা। ওকথাও বড়লোকেরই কথা। কিন্তু সে মুখ

ভিন্ন—সে কথাও ভিন্ন। সে কথার মূল্য অনেক। ভায়া! ইংরেজের যে কথা সেই কাজ।

দ্বিতীয় : আচ্ছা! আর একটা কথা। আমরা এতদিন না বুঝে কত বোঝাই যে মাথায় বয়েছি, কত ভূতেরই যে বেগার খেটেছি, কতজনেরই যে বিনামা সোজা করেছি। না বুঝে কার না পায় ধরেছি। কত কষ্টই ভোগ করেছি। তার আর ইতি নাই।

প্রথম : ভায়া! যা হবার হয়েছে। এখন দেখেশুনে. ভুগে পাকা না হয়ে থাকি, এটুকু যেন শক্ত হয়েছি। আর এ-কয়েকদিনে দেখলেম অনেক শুনলেমও অনেক। ধাঁধা কেটে গিয়েছে। নীলকর সাহেবরা যে আমাদের রাজা নয় সে জ্ঞানটা ভালই জন্মেছে। ভায়া! বাজার ভাবই ভিন্ন। দেখলে না লাটসাহেবের কাছে জজ, মাজিষ্টার যেন কিছুই নহে। চুপ চাপ কথাটি মুখে নাই। মাছিটি পর্য্যন্ত নড়ে না। সকলেই যেন ভয়ে ভয়ে পা ফেলে, ভয়ে ভয়ে তাকায়, ভয়ে ভয়ে কথা কয়। নীলকর সাহেবরা কে কোথায় পড়ে রইল, ভায়া! দেখেছ তো? লাটসাহেব তাহাদিগকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করলে না। খাতির তওয়াজার নামও করলে না। যেমন আমরা তেমন তাহারা। মফস্বলে দারোগা, জমাদারদের লাফানি ঝাপানি দেখে কে? বাপরে! বরকন্দাজের তেড়িমেরী কথাই বা কত! আজ কেমন দুরস্ত? লাটসাহেবের কাছে কেমন সোজা যোড়হাত—এক হাত দু-হাত নয়, ভায়া! একেবারে পঞ্চাশ হাত তফাৎ! খাড়া পাহারা। বাপরে বাপ! বড় বড় হাকিম, বড় বড় জ্যান্ত-বাঘ! আজ লাটের সম্মুখে যেন বিড়াল। চুঁ শব্দটি মুখে নাই।

দ্বিতীয় : ভায়া! সত্যি সত্যি কি আর নীল হবে না?

প্রথম ; ভায়া! শুনলে কি নীল আর হবেই না। আমরা যদি ইচ্ছা করে বুনি তবে হবে। নীলকর সাহেবরা জবরান করে আর বুনিতে পারিবেন না। আমাদের ধানের জমিতে আর জবরানে মার্কা দিয়া নীলজমির সামিল করিতে পারিবে না। যে জবরাণ করতে খাড়া হবে সেই মারা যাবে। ভায়া! সে কি যে সে মুখের কথা নিশ্চয় যেন, যে অত্যাচার করবে সেই জেলে যাবে।

দ্বিতীয় : জেলে তো যাবে! ধরে নিয়ে গিয়ে যদি আগেই কাজ ঠাণ্ডা করে দিলে তখন জেলে গেলেই কি, আর ফাঁসিতে ঝুলালেই আমাদের লাভ কি? আমরা তো সারা হলেম!

প্রথম : নাহে—না ! ঈশ্বর আছেন। আর সারা হতে হবে না। আমরা তো আর স্ব-ইচ্ছায় নীল বুনিব না। আর কার সাধ্য আমাদের জমিতে জবরানে নীল-বোনে। সকলে একজোট থাকলে আর ভয় কি ভায়া ? যে ব্যাটা আমাদের জমিতে নীল-বুনতে কি চাষ দিতে আসবে ; সে বেটার মাথা আগে ভাঙ্গবো। প্রাণ দিব তবু নীল-বুনিব না। নীল-বুনিতে জমিও দিব না। চল ! শীঘ্র শীঘ্র চল ! পদ্মাপাড়ি দিয়া ওপারে যেতে পারলে বাঁচি। লাটসাহেবের মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। আব যেন আমাদিগকে পদ্মা পারে না আসিতে হয়।

নানপথে, নানাকথা তুলিয়া প্রজাগণ হাসিখুশীতে যাইতেছে। কেহ নীল-করেব পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ করিতেছে। কেহ মাজায় কাপড় বান্দিয়া বাহাদুরি জানাইয়া "নীল আর হবে না নীল আর হবে না" এই কথা চিৎকার করিয়া কহিতে কহিতে যাইতেছে। কথায় কথায় লাটসাহেবের খোসনাম গান গাই-তেছে। সোনামুখীরই বা কত সুখ্যাতি করিতেছে।

ষটত্রিংশ তরঙ্গ

বৈঠক

প্রজাগণ মনেব আনন্দে হাসিখুশী করিতে করিতে গ্রামে আসিল। যাহারা বাড়িতে ছিল তাহারা এই সুখবর শুনিয়া মৃত শরীরে যেন জীবন সঞ্চার হইল। দুই হাত তুলিয়া লাটবাহাদুরের দীর্ঘজীবন ঈশ্বরের নিকট কামনা করিতে লাগিল। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর মঙ্গল কামনা করিয়া ঈশ্বরের নিকট কামনা করিতে লাগিল। মেয়েমহলেও হুলস্থূল পড়িয়া গেল। উলুউলু ধ্বনিতে গ্রাম, পল্লী, পাড়া জাগিয়া উঠিল। "নীল আর হইবে না" এই কথা শুনিতেই বৃদ্ধা, যুবতী, এমনকি বালিকার প্রাণ পর্য্যন্ত আহ্লাদে আটখানা হইয়া গলিয়া পড়িল। আমীন, তাগাদগীর, পাইক-প্যাদার ভয়, স্ত্রীলোকদিগের মন হইতে অনেক তফাৎ হইল। কেনীর নামে প্রাণ কাঁপিত—শবীর রোমাঞ্চিত হইত, আজ যেন আর সেরূপ হইল না। কুঠির নামে মুখ, বুক শুকাইয়া হৃদয়ের রক্ত জল হইয়া যাইত, প্রাণ ধরফড় করিত, তাহাও যেন আর হইল না। লাটবাহাদুরের হুকুম, নীল আর হইবে না। মুখে মুখে কথা সংক্ষেপ—ক্রমেই সংক্ষেপ—শেষে এই পর্যন্ত দাঁড়াইল যে লাটবাহাদুরের হুকুম, "নীল আর হবে না"।

নূতন কথা, নূতন ঘটনা, মানুষের মুখে নূতন নূতন খুব চর্চা হয়। বিশেষ মহাস্বার্থের আভাস থাকিলে দিনরাত্রে সহস্রবার মুখে আওড়াইলেও মনে সুখ জন্মে না। প্রজামহলে দিবারাত্রি ঐ কথা। কুঠির কথা—কেনীর কথা, সর্দ্দার, লাঠিয়ালের কথা, আমীন, তাগাদগীরের কথা,—জুলুম, বদিয়তের কথা সর্ব্বদা তোলপাড় হইতে লাগিল। কিন্তু আগে যেমন নামেই আতঙ্ক নামেই হৃৎকম্প, নামেই অজ্ঞান, তাহা যেন আর এখন নাই। সকলে একজোট, এক পরামর্শ থাকিলে একা কেনী কি করিবে? নীলকর আমাদের রাজা নহে। তাহারাও প্রজা, আমরাও প্রজা,—রাজার চক্ষে সকলেই সমান তখন আর ভয় কি? এই কথা কয়েকটি প্রজার অন্তরের অন্তঃস্থান প্রবেশ করাতেই ভাবের ভিন্ন, সাহসের সঞ্চার, সুদিনের লক্ষণ—তাহাতেই পথিক বলিতেছে প্রজার নবজীবন লাভ। অথবা চিরবন্দীর—হঠাৎ মুক্তিলাভ।

কয়েকদিন এইরূপ মনের আনন্দেই কাটিয়া গেল। গ্রামের মাথাল মাথাল, পরামাণিক (প্রধান) দুই-চারজন একত্র হইয়া মাঝে মাঝে অতি চুপে চুপে পরামর্শ করে। কি পরামর্শ তাহারাই জানে। একদিন শুনা গেল যে একজন কাড়াদার গ্রামে গ্রামে কাড়া মারিয়া উচ্চস্বরে বলিয়া যাইতেছে, 'ভাই সকল! কাল বেলা দুই প্রহরের সময় সা গোলাম সাহেবের বাটিতে এই অঞ্চলের সমুদায় প্রজার এক বৈঠক হইবে। এইদেশ হইতে যাতে নীল একেবারে উঠিয়া যায় সেইজন্য বৈঠক হইবে। সকলেই বৈঠকে যাইও। দেশের ভালর জন্যই বৈঠক, সকলেরই যাওয়া দরকার।'

দশজনে একত্র হইয়া কার্য্য করিলে যে লাভ আছে, তাহা প্রজাগণ তখন বেশ বুঝিয়াছিল। পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে, ছেলের-বুড়োয়, হিন্দু-মুসলমানে একত্রে সা গোলামের বাড়িতে উপস্থিত হইল, দেশহিতকর বৈঠকে যোগ দিল। চারদিক হইতে প্রজাগণ আসিতে আরম্ভ করিল। উপরে আঙ্গিনাজোড়া সামিয়ানার নিচে শতরঞ্জীর বিছানা। অতিঅল্প সময় মধ্যে বৈঠকপ্রাঙ্গণ পুরিয়া আঙ্গিনার দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বে সামিয়ানার বাহিরে উলঙ্গ শিরে মনের আনন্দে দাঁড়াইয়া গেল। বর্ষাকালের সেই উত্তপ্ত সূর্য্যতাপ, ভ্রূক্ষেপ নাই, অনায়াসে সহিয়া বৈঠকে যোগ দিল। এবং মনসংযোগে কথাসকল শুনিতে লাগিল।

বৈঠকের প্রধানকর্ত্তা দুইটি জমিদার। একজন হিন্দু, একজন মুসলমান। বলা বাহুল্য মুসলমানটি সা গোলাম। হিন্দু জমিদারটির এই মাত্র পরিচয় যে তিনি

দেশের মধ্যে সর্ব্বসাধারণের নিকট মহামাননীয়। সকলেই তাঁহার কথায় বিশ্বাস করে, সকলেই তাঁহার কথা শুনে।

সেই সর্ব্বজনপূজিত মহামহিম মহোদয় দণ্ডায়মান হইয়া মৃদুস্বরে অতিমিষ্ট-ভাবে বলিতে লাগিলেন:

"সভাস্থ হিন্দু-মুসলমান মহোদয়গণ। নীলকরের অত্যাচারে আমরা সকলে অস্থির হইয়াছি। জমিদার, তালুকদার, মহাজন, জোতদার, কৃষক, মধ্যশ্রেণী, ধর্ম্মযাজক, গুরুদেব, গোসাঁই, পীর, ফকির, এমন কি মুটেমজুর পর্য্যন্ত কেনীর অত্যাচারে অস্থির। তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই উপস্থিত বৈঠকে অনুমান পাঁচহাজার লোক উপস্থিত আছেন। বোধহয় এই পাঁচহাজার লোকের মনেই কেনীর অত্যাচার-কাহিনী সর্ব্বদা জাগ্রতভাবে, জলন্ত আকারে গাঁথা রহিয়াছে। সেসকল কথা, সেসকল অত্যাচারের কথা বিস্তারিত বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। কে-না ভুগিতেছে, কে-না জ্বলিতেছে, কে-না কেনীর অত্যাচার আগুনে পুড়িতেছে? এতদিন আমরা জানিতে পারি নাই। আমাদের মূর্খতাহেতু আমরা বুঝিতে পারি নাই যে, আমাদের প্রতিপালক এবং সর্ব্বরক্ষক রাজা নীলকর নহে। নীলকর আমাদের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা নহে। ভ্রমেই আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। ভ্রমেই আমাদের এতো কষ্ট উপভোগ করাইয়াছে। পাবনার দরবারে আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে আমাদের রাজার দয়ার পার নাই। গুণের সীমা নাই। নীলকরই হউন, আর বিলাতবাসী অন্য কেহই হউন, অত্যাচারী হইলে, আমাদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার-অবিচার করিলে, রাজহস্ত হইতে তাহার নিস্তার নাই। রাজ-বিচার হইতে কিছুতেই অত্যাচারীর অব্যাহতি নাই। রাজচক্ষে তাহারা এবং আমরা উভয়ই সমান। এই কথার প্রমাণও ঐ দরবারেই পাওয়া গিয়াছে। এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? কেনীর হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি? সে কি সহজে ছাড়িবে? সে নর-ব্যাঘ্র এতদিন যে রসে রসনা পরিতৃপ্ত করিয়াছে, উদর পরিপোষণ করিয়াছে, তাহার স্বাদ কি সে হঠাৎ ভুলিয়া যাইবে, না ভুলিতে পারিবে? তাহার অনায়াস লাভের আশা হইতে সে কি সহজেই হস্ত সঙ্কোচিত করিবে, না মন ফিরাইবে? কখনই নহে। অতি কম হইলেও বার্ষিক পাঁচলক্ষ টাকা আয়ের পথ সে কি লড়িয়া ভিড়িয়া না দেখিয়া অমনি বন্ধ করিবে? কখনই নহে। পূর্ব্ব হইতে আমাদের সতর্ক হওয়া আবশ্যক, পূর্ব্ব হইতেই রক্ষার পথ পরি-

স্কার করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। ভাইসকল! মনযোগ করিয়া শুনিতে থাক! লাট-সাহেব বাহাদুর আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের করা কর্তব্য ও সকলেরই তাহা শিরোধার্য্য। কেনী জবরান করিয়া নীল-বুনানি করিতে পারিবে না—রাজার আজ্ঞা, কিন্তু ভাবি অত্যাচার নিবারণের কোন নির্দ্দিষ্ট উপায় রাজ-আজ্ঞায় নাই। ঘটনা হইলে, প্রমাণ গ্রহণ—পরে বিচার। আমরা নীল বুনিতে, কি নীলজমির চাষ করিতে, অথবা নীলকরের সঙ্গে কোনরূপ সংশ্রব রাখিতে ইচ্ছা করিব না। সেও ছাড়িবে না। কেনী যথাসাধ্য বলপ্রকাশে আমাদিগকে নির্য্যাতন করিয়া তাহার জেদ বজায় রাখিতে, প্রচলিত প্রথা রক্ষা করিতে, নীলের আয় হইতে বঞ্চিত না হইতে, তাহার গোচর্ম্মনির্ম্মিত শ্যামচাঁদ সকলের মাথার উপর ঘুরাইতে বিশেষ চেষ্টা করিবে—প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। জোর-জবরদস্তি, মার-ধর, লুটপাট এখন যাহা আছে, তাহার চেয়ে দশগুণ বেশী করিবে। মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইয়া, মিথ্যা প্রমাণ জোটাইয়া ফাটকে আটক করিবার জন্যও বিশেষ যত্ন করিবে। যাতে হয়, যে উপায়ে আমরা তাহার পদানত হই, তাহা করিতে আর এদিক-ওদিক তাকাইবে না। ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, ন্যায়-অন্যায় এ-সকলের প্রতি লক্ষ্য থাকিবার তো কথাই নাই। আমরা নিজেরা নিজেকে রক্ষা করিতে পারিব না। তবে এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য? পশুরাও নিজেরা নিজেকে রক্ষা করিতে সমর্থ—রক্ষা করিয়া থাকে। আমরা নিজেকে নিজে রক্ষা করা দূরের কথা, একদল, একজাতি, একগ্রাম, একদেশ একত্র হইলেও রক্ষা করিতে পারে কিনা সন্দেহ। নিজেরা অশক্ত হইলে রাজদ্বার খোলা আছে, তখন রাজার আশ্রয় লইব, দেশের হাকিমের নিকট জানাইব— 'রক্ষা কর' বলিয়া গলবস্ত্রে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইব।"

"নিজেরা নিজেকে রক্ষা করিতে না পারিলাম, কেনীর দুর্দ্দান্ত প্রবলপ্রতাপ এবং বিষম আক্রমণ হইতে নিজেরা নিজেকে রক্ষা করিতে না পারিলাম, কিন্তু সকলে একজোট, একমন, একমত হইয়া থাকিলে বোধহয় কোন কোন বিষয় রক্ষা করিতে পারিব। যাহা না পারিব, পারিলাম না দেখিলাম—নিজেরা রক্ষা করিতে পারিলাম না, শেষ পক্ষে সর্ব্বরক্ষক হর্ত্তাকর্ত্তা বিচারকর্তা, রাজপ্রতিনিধি, রাজ-সংশ্রবী যাহাকে যেখানে পাইব, রক্ষা হেতু সবিনয়ে প্রার্থনা করিব।"

"আমি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছি—কুড়ি পঁচিশ জন কুঠির সর্দ্দার লাঠিয়াল

গ্রামের কোন প্রজাকে ধরিয়া লইতে আসিল। সে কুড়ি পঁচিশ জন সর্দ্দারের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া একা একজনের সাধ্য নহে। আত্মীয়স্বজন, ভাই-বেরাদর কতই আছে যে, তাহারা সকলে একত্র হইয়া সে দুরন্ত ডাকাতদিগের হস্ত হইতে বাড়ির কর্ত্তাকে রক্ষা করে। পাড়া প্রতিবেশী, আবশ্যক বোধ করিলে—গ্রামের লোক চেষ্টা করিলে, কথার কথা—রামনাথ মণ্ডলকে রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু রামনাথ একা কিছুই করিতে পারে না। খুব বিবেচনা কর, দেখ, নীলকর কসাইয়ের হস্ত হইতে বাংলার গরুগুলা রক্ষা করিতে হইলে একা একজনে কিছুতেই আটিয়া উঠিতে পারিবে না। তাহাতেই বলিতেছি আমরা নিজেরা নিজেকে রক্ষা করিতে অক্ষম। কাজেই সকলকে, সকলের আপদবিপদে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। একজনের প্রতি নীলবানরে লঙ্কা পোড়াইবার উপক্রম করিলে—আর কিছু নয় শুধু থুথু দিয়া সে আগুন নিবাইয়া দেওয়া সকলের উচিত। যে বিপদই কেন হউক না, একের মাথায় ষোল আনা ভর পড়িলে সে কিছুতেই বাঁচিবে না। মাজা দমিয়া যাইবে, হয়ত একেবারে সারা হইতে পারে। আর সেই বিপদভার আমরা সকলে যদি তিল তিল করিয়া বাঁটিয়া লই তাহা হইলে কি হয়? ভাইসকল! বল দেখি তাহাতে কি আমরা মারা পড়ি? আমাদের কিছুই হয় না। বিপদ বলিয়া একটি কথা ঘুর্ণাক্ষরেও মনে ধারণা হয় না। শত্রুর মুখেও ছাই পড়ে। কারণ যত বিপদ চাপাইবে ঈশ্বর ইচ্ছায় তিল তিল হইয়া কোথায় উড়িয়া যাইবে। কোন পরমাণুর সঙ্গে মিশিয়া কোথায় সংযোগ হইবে, তাহার সন্ধানই থাকিবে না। পরাস্তই বলক্ষয়। এইরূপ ক্রমে বলক্ষয় হইলে কেনী কয়দিন নীলকার্য্য চালাইবে, কয়দিন শালঘর মধুয়ায় বসিয়া রাজত্ব করিতে পারিবে? লজ্জায়, অপমানে, দায়ে শেষে আমাদের সহিত আপস-মীমাংসা করিয়া যাহাতে উভয়কুল রক্ষা পায় তাহার কোন উপায় অবশ্যই করিবে, আমরাও তাহাতে সম্মত হইব। আমি এক্ষণে আমার মনের কথা বলিতেছি যে, ঐ উচ্চ বেদীর উপরে পৃথক পৃথক স্থানে তামা, তুলসী, এবং কোরাণ রাখা হইয়াছে, যাহাতে যাঁহার ভক্তি তিনি আপন আপন বিশ্বাস ও ধর্ম্মতঃ ঐ সকল পবিত্র জিনিসকে সরলচিত্তে মহাপবিত্র জ্ঞান করিয়া ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক অকপটচিত্তে একথা বলুন যে, আমরা আপদে বিপদে সকলকে সাহায্য করিব। একের বিপদ অন্যে আপন বিপদ জ্ঞান করিয়া মাথায় করিয়া লইব। নিজ বিপদ জ্ঞানে যথাসাধ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিব। অপারগ হইলে সকলে একত্রে রাজদ্বারে প্রার্থনা করিব।"

মুহূর্ত্ত পরে বৈঠকের প্রায় বার আনা কণ্ঠ হইতে "হরিবোল" "হরিবোল" ধ্বনি উত্থিত হইয়া বায়ুবিমান এবং সামান্য আবরন চন্দ্রাতাপ ভেদ করিয়া অনন্ত-ক্ষেত্রে অনন্তনামের সহিত মিশাইয়া গেল। মিশাইতে মিশাইতে অবশিষ্ট কণ্ঠ হইতে "আল্লাহ আল্লাহ" রবে চারিদিক কাঁপাইয়া তুলিল। সে রবের প্রতিধ্বনি সহস্র চপলায় চালিত হইতে হইতে স্থিরবায়ু ভেদ করিয়া—ঈশ্বরের আসন স্থান "তাহ্-তাস্ সারা" চিন্তার অগম্যস্থান পর্য্যন্ত প্রবেশ করিল। ঈশ্বরে সাক্ষি করিয়া, পবিত্র জিনিষ সম্মুখে রাখিয়া মনের বেগে অনেকেই স্পষ্ট করিয়া প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইল। সকলের মনেই নতুনভাব, এ যে কি ভাব তাহা সেই অনন্ত ভাবময়-ভূত-ভাবন ভিন্ন মহাভাবুক ও ভবভাবনা সংযুক্ত সহস্র সহস্র মহানুভবেরও বুঝিবার সাধ্য হইল না। সকলে পরস্পর বুকে বুক মিশাইয়া আলিঙ্গন আরম্ভ করিল। সে পবিত্র ভাবময় আলিঙ্গন, ভাবের মনমত তুলি ধরিয়া যথা যথা আঁকিয়া দেখাইতে পথিক অক্ষম। তবে সে সময়ের হাবভাবে যে ভাবটুকু সামান্যভাবে অনুভব হইয়াছে, আকারে, ইঙ্গিতে, আভাষে, আলিঙ্গনের ভাবাভাবে বোঝা গেল যে সকলেই সকলকে কি যেন দিল। সকলেই যেন তাহা মনের আনন্দে গ্রহণ করিল। অথচ কাহারও কোন বিষয়ে অভাব হইল না। দাতা গ্রহীতায় সমান আনন্দ, সমান ভাব, সমান প্রণয়। প্রতিদানের যথার্থ প্রমাণই মন খুলিয়া হৃদয়ের সহিত আলিঙ্গন। বুকে বুক মিশাইয়া পরস্পরের মিলন। সে অপূর্ব্ব পবিত্র ভাব চন্দ্রা-তপতলে কত-ক্ষণ বিরাজ করিয়া সূর্য্যতাপে তাপিত, দগ্ধিভূত হৃদয় শীতল করিতে চন্দ্রাতপ বাহিরে নানা দিকে ছড়াইয়া পড়িল। এদিকে সা গোলাম ধীর এবং গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন যে, প্রতি গ্রামেই এই বৈঠকের একটি শাখা বৈঠক হউক। শাখাবৈঠকে গ্রামের হিত-অহিত, ভাল-মন্দ বিষয় প্রতি সন্ধ্যায় আলোচিত হউক। কোন কথার মীমাংসা আবশ্যক হইলে সেই স্থানেই উপস্থিত বৈঠকে মীমাংসা হউক। এক বৈঠকে না মিটে পরদিন বৈঠকে আবার সে বিষয়ে আলো-চনা হউক। তাহাতেও যদি মীমাংসা না হয়, সন্দেহ থাকে, আমাদের সাপ্তাহিক বৈঠকের সময় গ্রামে গ্রামে বৈঠকের প্রধানের মধ্যে যিনি আসিয়া যোগ দেবেন, শাখা বৈঠকে মীমাংসা না হওয়া প্রস্তাব সদরবৈঠকে তিনিই মীমাংসার জন্য প্রস্তাব করিবেন। সকলের বিবেচনায় যাহা সাব্যস্ত হয় তাহাই বলবত থাকিবে।

কেনীর টাকা কম নাই। দশ বৎসর প্রজার সহিত লড়িলেও সে পিছু

পশ্চাৎপদ হইবে না। টাকার অভাবে বিবাদে ক্ষান্ত হইবে না। নীলের কারবার সহজে ছাড়িয়া দিবে না। আমাদের দশজনের কাজ—সে দশজনও দশ জায়গায়। সময় অসময় টাকার দরকার হইবে। উপস্থিত সময়ে দশ-জনকে এক করিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে করিতে তদ্বিরে বিলম্বহেতু কার্য্যে বহু বিঘ্ন যে না হইতে পারে এমন কথা নহে। টাকার অনাটনে ভাল কার্য্য না হয়, তাহাও নহে। বাঘের সঙ্গে ছাগলের বিবাদ। নানা প্রকার বলের আবশ্যক। রক্ষা পাওয়াই কঠিন! তাহাতে টাকা অভাবে মারা গেলে বড়ই বিষম কথা। তাহাতেই আমি বলি—গ্রামে গ্রামে যে শাখাবৈঠক হইবে, সেই বৈঠকের প্রতি টাকা সংগ্রহ করার ভার দেওয়া আবশ্যক। সপ্তাহ অন্তে তহ-বিলের অর্দ্ধেক পরিমাণ টাকা সদরবৈঠকের তহবিলে দাখিল করিতে হইবে। থানায়, মহকুমায়, জিলায় আমাদের পক্ষের ভাল লোক, বিশেষ জিলায়, মহকুমায় বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান উকিল-মোক্তার রাখিতে হইবে। কেনী সহজে কখনই ছাড়িবে না। নানা প্রকার মিথ্যা প্রবঞ্চনা, জাল জালিয়ত মকদ্দমা সাজাইয়া আমাদিগকে ফাটকে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবে। ভাল লোক না রাখিলে, ভাল বুদ্ধি, ভাল পরামর্শ, ভাল উপদেশ না পাইলে রক্ষা পাওয়া ভার হইবে।

আপন আপন গ্রামে আপন আপন বাড়ি, আপন আপন পরিবার রক্ষা করিতে সর্ব্বদা সকলে প্রস্তুত থাকিবে। কোন সময়, কোন পথে, কোন সুযোগে কেনী কাহার কপালে কি ঘটায়, তাহা কে বলিতে পারে?

আমাদের দেশের লোক যাহারা কেনীর পক্ষে থাকিবে, কেনীর সাহায্য করিবে, তাহাদিগকে আমাদের দলভুক্ত করিতে অনুনয়-বিনয় যাহাতে হয় তাহা করিতে হইবে।

গ্রামে গ্রামে শাখাবৈঠকের অধীন এক একটি ডঙ্কা থাকিবে। সকলের মত হইলে ভিন্ন গ্রামের লোক ডাকিতে হইলে ডঙ্কাধ্বনি করিতে হইবে। যিনি যে অবস্থায় থাকিবেন, তাহাকে সেই অবস্থায় ডঙ্কাধ্বনি-স্থানে উপস্থিত হইতে হইবে।

যে উপায়ে হউক, শত্রুকে জব্দ করাই আমার মত। যাহাতে শত্রুর ক্ষতি হয় সে পথ অগ্রে অন্বেষণ করাই আমার ইচ্ছা। তাহাতেই বলিতেছি, কেনীর নিজ আবাদে কি প্রজার আবাদে যে গ্রামে যত নীল আছে, তাহা সমুদায়

কাটিয়া পদ্মা, গৌরী, কালীগঙ্গা এই তিন নদীর জলে ভাসাইয়া দেওয়া যাউক। আমরাই বুনিয়াছি, আমরাই কাটিব, আমরাই জলে ভাসাইব। এতদিন আমরা চক্ষের জলে ভাসিয়াছি। কেনীর চক্ষের জল পড়িবে কি না জানি না। পাকা-নীল জলে ভাসাইয়া অতি অল্প সময়ের জন্য আমরা গাত্রের জ্বালাটুকু একটু ঠাণ্ডা করি।

প্রায় দশহাজার মুখে উচ্চারিত হইল, "ভাল কথা বেশ বলিয়াছেন, গায়ের জ্বালা একটু ঠাণ্ডা করি।

প্রজাগণ তখনি উঠিল। ছাতি, লাঠি, গামছা লইয়া একে বলিতে দশজনে খাড়া হইল। দলে দলে সভাস্থল হইতে বাহির হইতে লাগিল—সভা ভঙ্গ হইল।

সপ্তত্রিংশ তরঙ্গ

বিপরীত যুদ্ধ

মরণকালে বিপরীত যুদ্ধ। কেনীর সুখসূর্য্য অবসান হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই। তার সৌভাগ্য-শশীর চতুর্দ্দশীর ভোগ উত্তীর্ণ হইয়া প্রতিপদে, কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদের ভোগ উপস্থিত হইয়াছে। বিপরীত বুদ্ধিতে বিপরীত বুঝিয়া মহা-বিপদে পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। সায়ংকাল। কুঠির সম্মুখস্থ কালীগঙ্গা তীরস্থ ফুলবাগান মধ্যে কেনী, গঙ্গা সম্মুখে করিয়া চেয়ারে বসিয়াছেন। হরনাথ, শম্ভু এবং অন্য অন্য প্রধান আমলা, নীলকুঠির প্রধান প্রধান দেওয়ান, প্রধান প্রধান আমীন, প্রধান প্রধান খালাসী, তাগাদগীর সকলেই উপস্থিত। এখন কি হইবে? কি উপায়ে নীলকার্য্য চলিবে, কুঠি চলিবে—কি শুধু জমিদারিই চলিবে, তাহারই মন্ত্রণা। পাবনার ঘটনা, জোট তাহার পর সাঁওতার বৈঠক। সকল সময়েই তাঁহারা সাবধান থাকিয়া সন্ধান লইয়াছেন। বিশেষ করিয়া বোধহয় কিছু বাড়া-ইয়াই মনিবসাহেবের নিকট দেশের অবস্থা, প্রজার ভাব জানাইয়াছেন। পাবনা গমনে প্রজাদিগকে বাধা দিতে গিয়া যাহা ঘটিয়াছিল, কার্য্যকারকগণ তাহার অনেকাংশ গোপন করিলেও কেনীর কানে সম্পূর্ণ যাইতে বাকি ছিল না। গুপ্ত সন্ধানীরা সমুদায় কথা গোপনে কেনীর নিকট প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।

কেনী বলিতে লাগিলেন—প্রজা ইচ্ছা করিয়া নীল-বুনানি না করিলে জব-রানে বুনাইতে পারিবে না। এ কথায় আর নূতন কি আছে। কোন নীল-কর প্রজার দ্বারা নীল-বুনানি করে! দাদন লইয়া চুক্তিপত্র দিয়া প্রজা নীল-বুনিতে

বাধ্য, নীলকরও আপন মাল বুঝিয়া লইতে বাধ্য। এই কথা লইয়া প্রথমতঃ কিছু গোলযোগ হইবে বুঝিতেছি। বিচার আদালতে যখন আমরা প্রজাদত্ত-চুক্তিপত্র দাখিল করিব, তখন আর ওকথা থাকিবে না। তোমরা আগেই সাবধান হইবে। যখন সে চুক্তিপত্রের দরকার হয়, তাহা যেন পাওয়া যায়। তবে প্রজারা যে জোট-বদ্ধ হইয়াছে। আমি বাঙ্গালাদেশে অনেক দিন কাটাইলাম, বাঙ্গালার খবর জানিতে আমার বাকি নাই। তোমাদের কথা, তোমাদের প্রতিজ্ঞা, তোমাদের দশ জনের এক হওয়া আমি সকলি জানি। আপন দেশের প্রতি তোমাদের যত মায়া, তাহাও আমার বিলক্ষণ জানা আছে। সকলে এক পরামর্শ, এক প্রাণ হইয়া কার্য্য করার ক্ষমতা তোমাদেব যত আছে তাহা কেনীর জানিতে বাকি নাই। দিন দুই হৈ হৈ! তাহাব পর যে সেই। হয়ত দুহাত নীচেই নামিতে হইবে। ও সকল জোট ও সকল বৈঠক অনেক দেখিয়াছি—আমার কিছুই হইবে না। তাহাদের কিছু না হইলেও মাঝখানে কতকগুলি লোকের এই সুযোগে বেশ দশ টাকা লাভ হইবে। তোমরা দেখ' ঐ সকল টাকাকড়ি লইয়াই উহাদের আপসে আপসে ঝগড়া, মারামাবি নিশ্চয়ই হইবে। শেষ ফল আদালত পর্য্যন্ত গড়াইবে। গায়ে পড়িয়া এক দল আমার আশ্রয় লইবে। দাদনেব টাকা না লইয়া চুক্তিপত্র লিখিয়া দিবে।

আমি যথার্থ বলিতেছি, তোমরা নিজেরা নিজকে যতদিন বিশ্বাস না করিবে ততদিন তোমবা কিছুই কবিতে পারিবে না। তোমরা কার্য্যেব শেষ চিন্তা করিতে অবসর পাও না। পরিণাম ফলেব দিকে দৃষ্টি করিতে নিতান্তই নাবাজ! সকল কাজেই ব্যস্ততা, হৃদয়েও বল বেশি নাই। নিজের ঘর সামাল না করিয়া পরের ঘরে আগুন দিতে খুব পটু। ধবিতে গেলে কোন শক্তিই তোমাদের নাই। কিন্তু লম্ফেঝম্পে খুব মজবুত। আমি স্পষ্ট বলিতেছি, সকলে এক জোটবদ্ধ হইয়া নীল উঠাইয়া দেয়, আমার দুঃখ নাই। এদেশে ইংরেজদিগেরই যে নীলকুঠি আছে, দেশীয় লোকের নাই ইহাও নহে! আমার নীল যদি উঠিয়া যায় তাহা হইলে রতন-বাবুর কুঠিও মারা যাইবে। ঠাকুরবাবুর কুঠিই কি থাকিবে? মীবমহাম্মদ আলীর কুঠিই কি চলিবে? এই প্রকার যত বাঙালী জমিদারের কুঠি, যেখানে যাহা আছে তাহাও থাকিবে না। আমার জমিদারি কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবে না। ও সকল কথা কিছুই নহে। তোমরা সাবেক-বদস্তর কার্য্য চালাইতে থাক। এবারে

যে পরিমাণ নীলের এষ্টিমিট পাইয়াছি তাহাতে গত সন অপেক্ষা ত্রিগুণ পরিমাণ বেশী নীল এই কুঠিতেই পাওয়া যাইবে। অন্য অন্য কুঠির খবর এ-পর্য্যন্ত পাই নাই। এবারে বেশী পরিমাণ জমিতে নীল-বুনানি করা আমার ইচ্ছা।

কোন আমলা কেনীর কথার প্রতিবাদে কোন কথা কহিতে সাহসী হইল না।

হরনাথ মৃদু মৃদু স্বরে বলিতে লাগিল হুজুর! প্রজায় যদি আমাদের নীল-জমি আবাদ না করে তাহা হইলে নিজ-আবাদে কুঠির নির্দ্দিষ্ট জমি আবাদ করাই কঠিন হইয়া উঠিবে।

কেনী রক্তআঁখি তিনবার হরনাথের দিকে ঘুরাইয়া বলিতে লাগিলেন—কোন প্রজায় নীল বুনিবে না? নীল না বুনিয়া আমার এলাকায় বাস করিবে? একটু সামলাইয়া কেনী মনে মনে কি ভাবিয়া হঠাৎ রাগ—একটু সামলাইয়া বলিলেন—

"আচ্ছা—প্রজারা আমার নীল বুনিবে না, আমিও তাহাদের সাহায্য লইব না। অথচ নীলের আবাদ বেশী করিয়া করিব। আমার দেশ, তোমার মত নয়। এক প্রকার মূর্খের দেশ নয়। বিনা গরুতে আমার দেশে জমি আবাদ হয়। তুমি দেখ আমি বিলাত হইতে কলের লাঙ্গল আনিয়া জমি আবাদ করিব। আর কি চাও।"

হরনাথ মৃদু মৃদু হাসিয়া নতশিরে বলিলেন "তাহা হইলে আর আমাদের চিন্তা কি।"

কেনী চেয়ার হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন চিন্তার মধ্যে একটি কথাই বেশী চিন্তার—আমি দেখিতেছি সেইটিই শক্ত কথা—কুঠির নিকট মহকুমা হওয়া না হওয়ার পক্ষে যতদূর পারি চেষ্টা করিব। পারিব এমন ভরসা নাই। এই বলিয়া ক্রমে নদীতীরে যাইতে আরম্ভ করিলেন। আমলাগণও মনিবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মৃদুমন্দ গতিতে কালীগঙ্গার দিকে চলিলেন। জলের দিকে দৃষ্টি পড়িতে সকলের চক্ষেই পড়িল যে বোঝা বোঝা নীল—গঙ্গাস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। কেনী স্থিরভাবে দণ্ডায়মান—নিরব! স্থির দৃষ্টিতে চক্ষু জলস্রোতে—আমলাগণ মহাব্যস্ত। ব্যস্ততার সহিত কথা, কি সর্ব্বনাশ! একি কাণ্ড! এত নীল কোথা হইতে ভাসিয়া আসিল? কে ভাসাইল? এক, দুই, তিন, চার, করিয়া গণনা করিয়া শেষে আর গণনায় কুলাইল না। নদীর জল ঢাকিয়া খণ্ড খণ্ড নীলক্ষেত

সকল যেন জলে ভাসিয়া আসিতেছে। কে জানে কতক্ষণ হইতে ভাসিয়া যাইতেছে? কে জানে গৌরীজলে ভাসিতেছে কি না? পদ্মার খরতর স্রোতে পদ্মার প্রশস্ত চরের অপর্যাপ্ত নীল, পর্ব্বতাকারে ভাসিয়া যাইতেছে কি না তাহা কে জানে? কুঠিময় সোর পড়িয়া গেল যে, নীল ভাসিয়া যাইতেছে। কতলোক বড় বড় বাঁশ, বড় বড় লগি হাতে করিয়া বিনা উদ্দেশ্যে নদীর কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইল। বাঁশ ফেলিল, লগি জলে ভাসাইল, ভাসমান নীল বোঝা আটকাইবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিল, একটিও আটকাইতে পারিল না। কেন আটকায়? দুই এক বোঝা আটকাইলে কি হইবে? আর সমুদায় আটকাইয়া কি বা হইবে? ইহাতে কোন রূপ সার অংশ নাই, সমুদায় জলে ধুইয়া গিয়াছে। বিশেষ এত নীল একদিনে জাঁতদিয়া মাল বাহির করিবার সাধ্যও কাহার নাই। বোঝার সঙ্গে সঙ্গে দুই একখানি নৌকা দেখা দিল। স্রোতগতিতে নৌকা ভাসিয়া আসিতেছে। ডিহির আমীন, তাগাদগীর, সাহেবের চাকরগণ চিৎকার করিয়া বলিতেছে—হুজুর! সর্ব্বনাশ হইয়াছে। পদ্মা, গৌরী, কালীগঙ্গা এই তিননদী হইয়া এই প্রকার নীল ভাসিয়া যাইতেছে। প্রজাগণ রাতারাতি নীল কাটিয়া ভাসাইয়া দিয়াছে। যাহা বাকি আছে, তাহাও আজ রাত্রে আর রাখিবে না আমাদিগকে শাসাইয়া, ভয় দেখাইয়া বলিয়াছে যে, "কুঠিতে খবর দিতে যাইতেছ ফিরিয়া আসিয়া আর বাড়ি, ঘর, দোর, পরিবারের মুখ দেখিতে হইবে না। যাও জন্মের মত নীলের পাছে পাছে ভাসিয়া যাও।"

কেনী স্বচক্ষে নীলের এই দুরবস্থা দেখিয়া মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই। দশ বছর নীল না হইলে কি কেনী মারা যাইবে আর এই সকল নীল, যাহারা কাটিয়া গাঙ্গে ভাসাইয়াছে তাহারা কি অমনি বাঁচিয়া যাইবে? এখনই রওয়ানা হও। এক এক দলে পঞ্চাশ ষাট জন লাঠিয়াল সর্দ্দার লইয়া রওয়ানা হও। যে গ্রামে নীল আছে সে গ্রামের লোককে কিছু বলিও না। যে গ্রামে দেখিবে নীল নাই, সে গ্রাম আর রাখিবে না। বাড়ি, ঘরদোর, গাছপালা ভাঙ্গিয়া, কাটিয়া ঐ প্রকার জলে ভাসাইবে। আমি কাল এই সময় ঐ সকল প্রজার ভাঙ্গাঘর, কাটাগাছ, গরুবাছুর, এই জলে ভাসিয়া যাইতে দেখিতে চাই। যত টাকা লাগে ব্যয় কর। লাঠিয়াল, সর্দ্দার যে যত সংগ্রহ করিতে পার সংগ্রহ করিয়া আন। আর যাহারা এই সকল কার্য্যের গোড়া—

তাহাদিগকে ধর, তাহাদিগের বাড়িঘর আগুনে পোড়াও। আর ছেলেমেয়ে-বুড়ো-বুড়ী যাকে পাও ধরিয়া আমার গারদে পোড। পাবনায় মোক্তার নিকট চিঠি লিখিয়া দেও যে, ডিহিরআমীন, তাগাদগীর যাহার দ্বারা সুবিধা হয়, ফৌজদারিতে নীলখুনি বলিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া দেয়। আসামী করিতে কাহাকেও বাকি রাখিবে না। এদিকে তোমাদের কার্য্য তোমরা করিতে থাক। আর যত সত্বরে হয় নীলকাজ আরম্ভ করিয়া দেও। প্রতি কুঠিতে ডবল—[illegible]নডবল [illegible]লি, চাকর রাখিয়া নীলকার্য্য আরম্ভ করিয়া দাও। খুব সাহসে, খুব বলবিক্রমে—নির্ভয়ে কার্য্য করিতে থাক। মীরসাহেবকে আনিবার জন্য এখনই লোক পাঠাও। চারজন দেশওয়ালী যেন সঙ্গে যায়।"

কেনীর হুকুমে আমলাগণ মনে মনে বড়ই খুসী হইলেন। [illegible]হাতে [illegible]কা লুটিবেন, লাঠিয়াল সর্দ্দারের বেতনে, অন্যপ্রকার খোঁসখুঁসি, ঘুসঘাসে খুব এক হাত মারিবেন, সকলের মনেই এই আশা। সকলেই মাথা নোয়াইয়া সেলাম বাজাইয়া বিদায় লইলেন। কেনী কিছুক্ষণ নদীতীরে ফিরিয়া ঘুরিয়া হাওয়া খাইয়া নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন। সে রাত্রে নিদ্রাদেবী তাহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছিলেন কি না,—তিনিই জানেন

অষ্টত্রিংশ তরঙ্গ

ঘরের কথা

মীরসাহেব পুনরায় সংসারী হইয়াছেন। বিবাহ করিয়াছেন। শ্বশুরের অতুল ঐশ্বর্য্যে মহাসুখে কাল কাটাইতেছেন। ক্রমেই বয়স বেশী হইতেছে, পরমায়ু ক্ষয় হইতেছে, দেহকান্তি, গঠন, শরীরের অবস্থা দিন দিন পরিবর্তন হইতেছে। কিন্তু আমোদ-আহ্লাদ সর্ব্বদা হাঁসিখুসী, রং তামাসা, গানবাজনা ইত্যাদি যেমন তেমনি রহিয়াছে। মনে কি আছে ঈশ্বর জানেন। প্রকাশ্য ভাব, মনের ভাব যেমন পূর্ব্বে ছিল, হাবভাব বোধহয় যেন ঠিক সেইরূপই আছে, সাধারণ চক্ষে, দশ-বছর পূর্ব্বেও যাহা, এখনও তাহা। পূর্ব্বে স্ত্রী, পুত্র বিয়োগের পরে যে ভাব, জামাই কর্ত্তৃক পৈত্রিকসম্পত্তি, দালান, কোঠা, জমিদারি হইতে বঞ্চিত হইয়াও সেই ভাব, বর্ত্তমান সুখসময়েও সেই একই ভাব। মীরসাহেবের মনেরভাব সুখেদুঃখে সকল সময়েই সমান। অতি দুঃখের সময় তাঁহার মুখে হাসিরআভা সর্ব্বদা বিরাজ করিত। সাধারণলোক সেকথা লইয়াও কত সময় কত আন্দোলন করিয়াছে।

মীরসাহেব কি ধাতুর লোক সহজে কাহারও বুঝিবার সাধ্য ছিল না। কারণ সুখে-দুঃখে সমান ভাব। অন্তরের অন্তঃস্থানের ভাব অন্তর্যামী ভগবান ভিন্ন অন্যের জানিবার সাধ্য ছিল না। বসীরুদ্দিন সাঁওতা ছাড়িয়া মীরসাহেবের শ্বশুরবাড়ির অতি নিকটেই সপরিবারে বাস করিতেছেন। পূর্ব্বমত মীরসাহেবের অনুগ্রহ দৃষ্টিতেই চিরআমোদের সহিত সংসারযাত্রা নিশ্চিন্তভাবে নির্ব্বাহ করিতেছেন। খানসামা বিনোদ বিদ্রোহীদলে সেই যে মিশিয়াছে, এখনও মিশিয়াই আছে। কিন্তু পূর্ব্বমত আদর, ভালবাসা আর নাই। সা গোলাম এক্ষণ স্বয়ং মালিক।

মীরসাহেবও স্বয়ং মালিক। মুন্সী জিনাতুল্লার মৃত্যুর পর সমুদায় সম্পত্তি দৌলতননেসা ও তাহার মাতায় বর্ত্তিয়াছে বটে, কিন্তু মীরসাহেবই মালিক। মীর-সাহেবের হস্তেই সম্পত্তি। নামমাত্র তাহাদের।

সা গোলাম এবং মীরসাহেব উভয়ে নিকটেই বাস করেন। সাঁওতা লাহিনীপাড়া এপাড়া ওপাড়া। কিন্তু পরস্পর দেখাশুনা হয় না। দৈবাধীন দেখা হইলেও কথাবার্ত্তা হয় না। উভয়ের চাকরে-চাকরে, প্রজায়-প্রজায়, অনুগত লোকজনের সহিত অনুগত লোকের প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ, বচসা হইয়া থাকে। কখনও লঘু কখনও গুরুতর গোছের হইয়া দাড়ায়। আদালত পর্য্যন্ত খবর হয়। উভয়পক্ষের লোকের, জরিমানা ফাটক হইতেছে, যাইতেছে, মিটিতেছে, আবার বাধিতেছে। কোন বিপদাপন্ন ব্যক্তি মীরসাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাঁহার পরামর্শ মত চলিতে থাকিলে তদ্বিপরীত পক্ষ্য বাধ্য হইয়া সা গোলামের আশ্রয় লইতেছে। সা গোলামও যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছেন। বলাবাহুল্য এখন মীরসাহেব কেনীর পক্ষে। দেশের লোকের বিপক্ষে।

মনের কথার মধ্যে ঘরের কথা। প্রয়োজনীয় এবং আবশ্যকীয় একথা এতদিন চাপা ছিল। আবশ্যক না হইলে, ঘরের কথা পরের কানে দেওয়ার ইচ্ছা পথিকের ছিল না। এখন বাধ্য হইয়া প্রকাশ করিতে হইল। ঘটনাস্রোতে বাধা দিতে কাহারও সাধ্য নাই। মানবীয় কার্য্যের আদিঅন্ত মধ্যে মানুষেরই প্রয়োজন! কিন্তু সূত্রপাত হইতে শেষ পর্য্যন্ত ঘটনার মূলীভূত কারণ কে? তাহা নির্ণয় করা কঠিন। সকলেই বুদ্ধিমান, সকলেই জ্ঞানবান। জ্ঞানবুদ্ধি পরাস্ত করিয়া ঘটনা স্রোতঃ অবলীলাক্রমে কত জীবন ডুবাইয়া কত জীবন ভাসাইয়া কোথা হইতে কোথায় লইয়া যাইতেছে। কোন বিষাদ সমুদ্রে ফেলিতেছে তাহা ভাবিতেও আশঙ্কা হয়।

মীরসাহেব জ্ঞানবান। পারিষদগণও অজ্ঞান নহেন। মাথার মজ্জা, শরীরের রক্ত, কাহারও তরল নহে। কেহই পাতলা লোক নহেন! নূতন সংসারী নহেন, নানা বিষয়ে পরিপক্ব। সকল বিষয়েই পাকা। এত পাকাপাকির মধ্যে এমন একটি কাঁচা কার্য্য হইতেছে যে, তাহার আভাষে ইঙ্গিতে, আকারে প্রকারে প্রকাশ করা ভিন্ন বিস্তারিত প্রকাশ করিতে পথিকের সাহস হইতেছে না! সেই বামা-কণ্ঠই ঘটনার মূল। সেই নূপুর-ধ্বনি সময়ে সময়ে যে দৌলতননেসার কর্ণে প্রবেশ করিত, সেই ধ্বনিই ঘটনার মর্ম্মগত আন্তরিকভাব ও আভাষ। দৌলতননেসা স্বামীসোহাগিনী। বিশেষ সন্তানসন্ততি হইয়া সে সোহাগ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৃদ্ধি হওয়ার কথা। স্ত্রীধনে ধনবান, স্ত্রী কল্যাণে অপরিমিত সুখ ভোগ হইলে, সে স্ত্রীর আদর কোথায় না আছে? স্ত্রীর অকৃত্রিম ভালবাসা আছে বলিয়াই স্ত্রীধনে অধিকার। রূপসীর সহ্য হইল না। রূপসীর চেষ্টা স্বামীস্ত্রীতে মনোমালিন্য ঘটাইয়া নিজে সুখী হয়। বহুদিন হইতে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। মীরসাহেব রূপসীকে ভালবাসেন, যত্ন করেন, আদর করিয়া কাছে বসান, গান শুনেন। এ সকল কথা দৌলতননেসার কানে তুলিয়া দিয়াও তাহার মন, স্বামীপদ হইতে টলাইতে পারিল না। তখন অন্য চাল আরম্ভ করিল। অর্থ সহায়ে সাহায্য-কারীরাও জুটিয়া গেল!

দৌলতননেসা, রূপসীর কথা অনেকের মুখেই শুনিতেন। তাহার সেই পূর্ব্বভাব, পূর্ব্বকথা। রূপসীর মনে এই কথা যে, মীরসাহেব দৌলতননেসার যেরূপ অকৃত্রিম প্রণয়ভাব বর্তমান তাহা ভঙ্গ করা সাধ্য কি—রূপসীর সাধ্য কি—সে দাম্পত্য প্রণয়বন্ধন শিথিল করে। সে পবিত্র প্রণয়ভাবের পরমাণু পরিমাণ অংশ বিনষ্ট করাও রূপসীর সাধ্য নহে। তবে একমাত্র উপায় দৌলতননেসাকে কোন কৌশলে জগৎসংসার হইতে সরাইতে পারিলে আশাবৃক্ষে সুফল ফলিবার কথঞ্চিত পরিমাণ আশা জন্মে। তাহা না পারিলে আর আশা নাই! এতদিন পরিশ্রম করিয়াও যখন কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সে প্রণয়বন্ধন সমূলে বিচ্ছিন্ন করা দূরে থাকুক, সামান্যভাবে বিচ্ছিন্ন করিতেও সাধ্য হয় নাই, তখন ঐ সোজাপথই রূপসীর মনোরথ সিদ্ধির সহজ উপায়। এই সিদ্ধান্তই মনে মনে আঁটিয়া আসরে নামিয়াছেন। সাহায্য জুটিয়াছে। অর্থের অসাধ্য কি আছে, অনুগত এবং ভালবাসার লোকই যে গোপনে গোপনে এই সাংঘাতিক কার্য্যে প্রবৃত্ত

হইয়াছে, ইহা মীরসাহেব স্বপ্নেও কখন চিন্তা করেন নাই। কোনদিন কোন কারণে ওকথা ভাবিবারও কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই। দৌলতননেসারও জানিবার কোন কারণ ঘটে নাই। তিনি অকৃত্রিম ভক্তির সহিত স্বামীর পদসেবা করিয়া জীবন সার্থক মনে করিতেছেন। মীরসাহেব মনের সঙ্গে ভালবাসিয়া, মনে মনে মহাসৌভাগ্য জ্ঞান করিতেছেন।

মানুষের ভাল, মানুষের উন্নতি, মানুষের প্রেম, মানুষের চক্ষে দেখিতে পারে না। প্রণয়ভাব—বিশুদ্ধ প্রেমভাব, পবিত্র লক্ষণ প্রায় লোকেরই চক্ষুশূল। রূপসীরই যে, না হইবে আশ্চর্য্য কি? তাহাতে রূপসী শিক্ষিতা নহে, ধর্ম্মভাবে আকুলা নহে। মহাপাপে ভীতা নহে—ইহকালই সার। ইহকালই সকল। পরকাল পরের কথা। মরিলেই ফুরাইল। হিসাব-নিকাশের ধার কে ধারে। কেই বা অদেখা ঈশ্বরকে ভয় করে। এই তো রূপসীর মত, ইহাতে আর আশা কি।

বসীরুদ্দিন সহচরীর খুব অনুগত। চাকরের মধ্যেও দুই একটি সহচরীর আজ্ঞাবহ। অথচ তাহারা দৌলতননেসার বেতনভোগী, দৌলতননেসার অন্নে প্রতিপালিত। বসীরুদ্দিনের অন্নের সংস্থানও দৌলতননেসার অর্থে—তবে মীর-সাহেবের হস্তে হইতেছে, এই মাত্র প্রভেদ। দৌলতননেসার খাসদাসী, চারজন। তাহার একজনের নাম দুর্গতী, দুর্গতীর মাতার নাম সবজা। দুর্গতী, জুরণ, মুরণ, চম্পা, এই চারজন সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে তাহার সম্মুখে থাকিত। ফায়ফর-মাস ইত্যাদি কার্য্য করিত। দৌলতননেসা ইহাদিগকে অন্য অন্য দাসী অপেক্ষা ভালবাসিতেন। বিশ্বাসও করিতেন। ইহারা চারজন বাড়ীর বাহির হইত না। সবজা বৃদ্ধা, বাহিরে বাটির মধ্যে সকল সময় সর্ব্বস্থানে সমানভাবে যাওয়া আসা করিত। সবজার সহিত রূপসীর খুব আলাপ। রূপসীর সহিত সবজার অনেক সময় দেখা হয়, গোপনে গোপনে কথাবার্তাও হইয়া থাকে। এই সবজাই সহচরীর সাহায্যকারিণী! উপস্থিত এই কথা যে—

টি. আই. কেনী. হস্তী পাঠাইয়া মীরসাহেবকে কুঠিতে লইয়া গিয়াছেন। প্রজাগণ নীল কাটিয়া জলে ভাসাইয়াছে। নীল আর বুনিবে না প্রতিজ্ঞা করি-য়াছে। এই সকল উপস্থিত ঘটনার সুপরামর্শ জন্যই কেনী মীরসাহেবকে লইয়া গিয়াছেন। মীরসাহেব নীলকরের পক্ষ, সা গোলাম প্রজার পক্ষ।

মীরসাহেব শালঘর মধুয়ার কুঠিতে গিয়াছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আসিবার

কথা। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল আসিলেন না। বৈঠকখানায় নিয়মিতরূপে আলো জ্বলিল। বিছানা, বালিশ পরিষ্কার হইল—প্রতিদিন যে যে নিয়মে বৈঠকখানার কার্য্য চাকরেরা করে তাহা করিল। রূপসী ও বসীরুদ্দিন নিযমিত চাকুরী বাজাইতে বৈঠকখানায় আসিযা জুটিল। মীরসাহেব অবশ্যই আসিবেন। যতক্ষণ না আসেন, ততক্ষণ কি করা? গানবাজনা কবিতে সাহস হইল না। উভয়ে তাসখেলা কবিতে বসিলেন। খেলার মধ্যে পান, তামাক, হাসিতামাসা, খোসগল্প চলিতে লাগিল। খেলাটা হইতেছে—রঙ্গমার—দুই জনে খেলা—সেকালে দুইজনে তাসের ঐ খেলাই সর্ব্বত্র চলিত। তিনজন হলে ঐ খেলাই তিনহাতে—চারজন জুটিলে বিবিধবা বেশী সখ হইলে পাঁচইয়াবে গোলামচোর—কিন্তু বিবিধরাটাই সে সময জাঁকাল খেলা। রগডেবও বটে—তিনজনে অভাবপক্ষে দুইজনে বঙ্গমাব—বসীরুদ্দিন হবতনের টেক্কা ফেলিয়া বলিলেন—"তোমার চিন্তা কি?"

রূপসী অতি নম্রভাবে হরতনের দুবি ফেলিয়া একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া বলিলেন—"আমার চিন্তার কথা তুমি কি বুঝিবে, দুবেলা পেটপূজাতো এখানেই হয়। আবশ্যক হইলেই কিছু পাও। কাপডচোপডের ভাবনাও বড় নাই! প্রায়ই ব্যারিংপোষ্টে কাটিয়া যায। হাত বুলাইয়া যাহা বাহির কর, ঘরেরগিন্নির জন্য যা কেনবার দরকার হয় তাই কেন, আর চাই কি? তোমার মত সুখী কে?"

বসীরুদ্দিন পীট উঠাইয়া হরতনের সাহেব ফেলিয়াই বলিলেন—"আচ্ছা এস দেখি!"

রূপসীর হাতে হরতনের বিবি ব্যতীত আর হরতন ছিল না। বাধ্য হইয়া বিবিটি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"দেখ দেখি ঘাডটি ধরিয়া বিবিটি আদায় করিলে, হিসাব থাকিলে এই রূপই হয়। হিসাবমত যদি সাহেব রোখকরে দাঁড়ায়, তবে সাধ্য কি বিবি না পড়িয়া যায়। বেহিসাবী হইলেই বিবি অন্যের সহিত বাহির হইয়া যায়। তা গোলামেই কি, বদপাসের দুরি তিরিই বা কি? সকল কাজেই হিসাব আছে—হিসাবের মার বড় শক্তমার"—

বসীরুদ্দিন তাড়াতাড়ি পীট উঠাইয়া হরতনের গোলাম ফেলিয়া বলিলেন "এবার কি দেবে দেও দেখি।"

রূপসী গোলামপ্রতি নজর করিয়াই বলিলেন—

"এ গোলাম এখন সাহেবের বাবা— রঙ্গেবঞ্চিৎ—করি কি! আর দিবই বা

কি আছেই বা কি ? সকলি তোমাদিগকে দিয়াছি। কিন্তু আমিই কিছু পাই নাই।”

‘কি পাও নাই—সকলি তো পাইয়াছ আর চাই কি ?

আর চাই কি—“তোমার কি চক্ষু নাই ? আমার হাত একেবারে খালি। হাতে কি কিছু আছে যাহা ছিল তাহাও গিয়াছে। এবারে পারিব না। ফিরে বাঁটা যাক।”

তাস রাখিয়া দিলেন, হাতের কাগজ পিঠের কাগজ একত্র করিয়া মিশাইয়া দিলেন। খেলাভঙ্গ হইল। অন্য অন্য কথা চলিল।

মীরসাহেবের আজ এত বিলম্ব হইল কেন ?

বসীরুদ্দিন বলিলেন—‘সাহেবসুবার কথা, বড়মানুষের চালচলন স্বতন্ত্র কথা। আমাদের মত উঠ বল্লেই কাঁধে-বোচকা তাতো নয় ? আবার আজকাল প্রজার যে জোট, চারদিকে গোলযোগ। সেই সকল কথাতেই বিলম্ব হয়েছে। হয়ত নাও আসিতে পারেন’।

“না আসিতে পারেন, না আসিবেন, তাতে আর সন্দেহ নাই। শুধু বসে থাকাও তো মহাদায় ! তুমি একটি গান গাও আমি আস্তে আস্তে সঙ্গত করি।”

“বাবা সে আমার দ্বারা এখন হবে না। মীরসাহেব না আসলে বৈঠকখানায় গানবাজনা করে কার সাধ্য। এতেই সকলে চটা। বাড়িশুদ্ধ লোক আমাকে দেখতে পারে না, কেবল বিবিসাহেবের জন্যই রক্ষা। এমন মেয়ে হয় নাই। একালে কেউ এমন দেখে নাই। বাপরে বাপ ! তারই সকল, তারই বাড়ী, তারই বৈঠকখানা, ভাব দেখি সে কেমন মেয়ে” ?

“ঠিক বলেছ ! এমন নিরাগী কখনও দেখি নাই। শুনিও নাই। আর স্বামীর প্রতি এত ভক্তি, এত ভালবাসা যে তা আর মুখে প্রকাশ করা যায় না। এমন-ভাব কখনও দেখি নাই”।

“সে কি আর বলতে ! আচ্ছা তুমি বস, আমি বাড়ি হতে একবার ঘুরে আসি—”

রূপসী আর বাধা দিলেন না। তাহার ইচ্ছা যেন তিনি একা একাই বৈঠকখানায় থাকেন। বসীরুদ্দিন চলিয়া গেলে, রূপসী তাসগুলি কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া গোছাইয়া রাখিলেন। পরিষ্কার বিছানা। সে সময় কেরসিনতৈলের

ব্যবহার, ল্যাম্প ইত্যাদি বিলাতী আলোর চলন, বাঙ্গালীর ঘরে হয় নাই। সেজ, মোমবাতি, বৈঠকী নারিকেলতৈলের বাতিই চলতি। তাহাই জ্বলিতেছে! বড় একটি বালিশ (গের্দ্দা) ফরাসের উপর পড়িয়া আছে। রূপসী কতক্ষণ এদিকওদিক চাহিয়া বালিশে ঠেসদিয়া গম্ভীরভাবে বসিলেন। কিন্তু কোনপ্রকার শব্দ হইলেই সেইদিকে লক্ষ্য করেন। কান পাতিয়া কি যেন শুনিতে থাকেন। ভাবে বোধ হইতেছে যেন কাহার প্রতীক্ষায় আছেন।

কথা মিথ্যা নহে—প্রতীক্ষায় আছেন। ঐ শুনুন মুখে কি বলিতেছেন। ক্ষণকাল গম্ভীর ভাব, মধ্যে মধ্যে চকিত ভাব, কাহারও আগমন প্রতীক্ষা ভাব। কি বলিতেছেন শুনুন।

কৈ এতকথা—এতকিরে—এত মাথাছোঁয়া, কৈ সকলি মিছে? এমন নির্জ্জন, এমন সুযোগ সহজে পাওয়া যায় না। আর কি করিব। এমন সুযোগ সময়েও যখন আসিল না তখন আর কি করিব। সময়, সুযোগ, অবসর, স্থান এই চারটিই স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশের মূল! রক্ষার মূল। এই কথা কহিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পা ছড়াইয়া বালিশে একটু বেশী পরিমাণ ঠেসদিয়া বৈঠকখানাঘরের, পাশের একটি দ্বারে এক ধ্যান একমনে চাহিয়া রহিলেন। কতক্ষণ পরেই তাহার ভাববদল হইল। আন্তরিক চিন্তারভারে মুখে যে মলিনতাটুকু দেখা দিয়াছিল, তাহা যেন হঠাৎ সরিয়া গেল। মন সুখী না হইলে চক্ষু হাসিবে কেন? মুখে হাসিরআভা দেখা দিবে কেন? পাংশুবর্ণ মুখে, রক্তেরআভা খেলা করিবে কেন? অবশ্যই কারণ আছে। বোধ হয় আশাপূর্ণ। যাহার আসিবার কথা—যাহার জন্য এতব্যস্ত, এতচিন্তা, বোধহয় তাহারই আগমন? উঠিয়া বসিয়া হাততুলিয়া ইঙ্গিতে ডাকিতে লাগিলেন। সে যেন ঘরের মধ্যে আসিতেও নারাজ। তাহাতেই স্বর্ণরজতজড়িত দক্ষিণহস্ত উত্তোলন ও কর-সঞ্চালন—শেষে শয্যাত্যাগ। শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতেই—উঠিলেন না।

বালিশ ছাড়িয়া একটু আগে সরিয়া বসিলেন। কারণ যে ঘরে আসিতে নারাজ ছিল, সে রাজি হইয়া আসিতেছে। পার্শ্বেরদ্বারে উপস্থিত। স্ত্রীমূর্ত্তি দুইএকপায়ে ঘরে প্রবেশ করিল। রূপসী তাড়াতাড়ি যাইয়া দ্বার বন্ধ করিলেন! ফিরিয়া আসিতেই স্ত্রীমূর্ত্তির অঞ্চল ধরিয়া ফরাসের নিকট টানিয়া আনিলেন। স্ত্রীমূর্ত্তিটি বাড়িরলোক, বয়সও বেশী—দৌলতননেসার পরিচারিকা দুর্গতীর মাতা,

নাম সবজা। মুন্সী জেনাতুল্লার খরিদা। সবজা যে সময় খরিদ হইয়াছিল, সে সময় উত্তরঅঞ্চলে দাসী বিকিকিনিতে দোষ ছিল না। বাড়িরদাসী মাত্রেই ঐরূপ খরিদা। তাহাদের পেটে সন্তানসন্ততি হইয়াছে—সবজার পেটের মেয়ে দুর্গতী। দৌলতনেসার চারিজন খাসপরিচারিকার মধ্যে একজন দুর্গতী।:

সবজার বড়ই চুরি করিয়া খাওয়ার অভ্যাস। টাকাপয়সায় তত লোভ নাই। বতলোভ ইলিশমাছে। বাড়ি হইতেও পায়, সময় সময় নিজেও কিনে। আবার মেয়েকে দৌলতনেসার রান্নাব্যন্‌জনও চুরি করিতে সময় সময় বলে! দুর্গতী কিছুতেই স্বীকার হয় নাই। সেজন্য দুর্গতীর উপর ভারিচটা। সবজার বয়সী আর চার পাঁচ জন দাসী ঐ বাড়িতে আছে। তাহাদের পেটের কোনমেয়ে দৌলতনেসার পরিচারিকার মধ্যে নাই। সবজার কন্যা দুর্গতীই একজন খাস-বাঁদী।—তাহাতে সবজার একটু আদরও আছে। মেয়েমহলে সকলে একটু ভয় করে।

ফরাসের নিকট আনিয়াই রূপসীবলিলেন, ' বস, এইখানে বস''—

সবজা বলিল ''—না, না আমি ওখানে বসিব না। আপনার পায়ে ধরি, আমি ওখানে বসিব না।

''তাতে দোষ কি? আমি তো আর তোমার বিবি নয়'' যে একবিছানায় বসিলে দোষ আছে। আমি জানি মানুষ সকলেই সমান। সকলেই খোদার তৈয়ারি।''

''তা হোক আপনি বসুন, আমি বসবো না। বেশীদেরীও করিতে পারিব না। সেদিন কিরেকরে মাথায় হাতদিয়ে বলে গিয়েছিলাম, তাহাতেই আসিয়াছি।'

''এসেছ ভালই করেছ। তোমার কথা তুমি রেখেছ, আমার কথাও আমি রাখি। অঞ্চল হইতে খুলিয়া পাঁচটি টাকা আর রূপার একছড়া গোট রূপসী সবজার হাতে দিয়ে পুনরায় বলিলেন—আমার করার আমি পূর্ণ করিলাম, এখন তোমার ধর্ম্ম, রাখা না রাখা তোমার ইচ্ছা।''

সবজার সঙ্গে আগেই গড়াপেটা পরামর্শ ছিল। সবজা টাকা পাঁচটা ও গলার জিঞ্জিরছড়া কাপড়ে বাঁধিয়া যাই বলিয়া বিদায় হইতেই, রূপসী সবজার হাত ধরিয়া বলিলেন—''তুমি যাহা যাহা চাহিয়াছিলে, আমি তাহা তাহা দিয়াছি! আরও বলি—যদি পার, যে কাজের জন্য দেওয়া, তা যদি করে উঠতে পার, তবে এর উপরে বকশিশ বলে অবশ্যই আরও কিছু আছে। কি কৌশলে, কি উপায়ে খাওয়াইতে হইবে তাহা তো মনে আছে?''

"তা বেশ মনে আছে। শিকড়িটিও একদিনে বেশ শুকাইয়া গিয়াছে। গুঁড়ো করতে আর বেশী মেহনত লাগবে না। দেখ ঐ শিকড়েরগুঁড়ো খাওয়ান ছাড়া আর কিছু পাববো না। আব যা দিয়েছ—তা আমি কখনই খাওয়াতে পারবো না—আমার প্রাণ থাকতে পারবো না।"।

"আচ্ছা, শিকড়টিতো গুঁড়ে করে কোন খাদ্যসামগ্রির মধ্যে মিশিয়ে খাও-য়াতে পারবে ?"

"হাঁ—তা পাববো। —আর যা বলিলে তা কিন্তু দিবে।"

"কি বলিলাম ?"

"ঐ যে, বলিলে আরও কিছু"—

"তোমার মাথায় হাত দিয়ে বলিতেছি—যেদিন শুনিব, বিছানায় শুইযা পড়িয়াছে, পেট চলিযাছে, সেইদিন তোমাকে মনের মত খুসি করবো। বকশিশ তো ধরা রইল।"

"সে তুমি যা দেও—আমি একখানা ভাল কাপড় চাই।"

"আচ্ছা—একখানি কেন, একজোড়া দিব।"

কথা হইতেছে, ইহার মধ্যে বেহারাদিগের চলতিবোল রূপসীর কাণে পড়িল। রূপসী তাড়াতাড়ি উঠিয়া সবজাকে বলিল যে, "মীরসাহেব আসিতে-ছেন, তুমি যাও।"

সবজা উঠিতে পড়িতে সাতপাক খাইয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরের বাহির হইল। রূপসী সবজার পিছনে পিছনে আসিয়া পাশের দ্বারবন্ধ করিয়া করিয়া দিলেন। এবং সম্মুখের একটি দ্বারে খাড়া হইয়া পালকি দেখিতে লাগিলেন।

বেহারার চলতিবোল বসীরুদ্দিনের কাণেও গিয়াছিল। বৈঠকখানার সম্মুখেই পুষ্করিণী, পুষ্করিণীর দক্ষিণপারেই বসীরুদ্দিনের শ্বশুরালয়। সেইখানেই অবস্থিতি! বসীরুদ্দিন তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিলেন।

মীরসাহেবের পালকি রাস্তা ছাড়িয়া প্রবেস দ্বার হইয়া বৈঠকখানার আঙ্গি-নায় আসিল। মীরসাহেব পালকি হইতে নামিয়া বেহারাদিগকে বলিলেন যে, "আবার কাল একপ্রহর পর যাইতে হইবে।"

এই কথা কয়েকটি কহিয়াই বাটির মধ্যে চলিয়া গেলেন। বসীরুদ্দিন

আদাব বাজাইয়া সম্মুখে খাড়া হইয়াছিলেন, কিন্তু মীরসাহেবের সহিত একটি কথাও হইল না। বৈঠকখানার দ্বার অর্দ্ধোদ্ঘাটন হইয়া আলোর সাহায্যে—যাহা দেখাইতেছিল, তাহা মীরসাহেবের নজরে না পড়িয়াছিল তাহা নহে ; কিন্তু তিনি বাটির মধ্যেই চলিয়া গেলেন, ফিরিয়াও তাকাইলেন না। ভাবে বোধ হইল খুব জরুরী কাজ। কাগজপত্রও কতকগুলি হাতে—

বসীরুদ্দিন মাথারচাদর খুলিয়া পুনরায় জড়াইতে জড়াইতে বৈঠকখানাঘরে আসিয়া রূপসীকে বলিলেন—"এর মানে তো কিছু বুঝিতে পাল্লেম না। কাহারও সহিত কোন কথাবার্ত্তা নাই অন্দরে দাখিল"।

রূপসী বলিলেন—'তাই তো—এর মানে কি ?"

"বোধ হয় শরীর অসুখ, না হয় কুঠির সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রয়োজন।"

"শরীর অসুখ ! একথা হতে পারে—কুঠি সম্বন্ধে বিশেষ প্রয়োজনে বাড়ির মধ্যে প্রয়োজন কি ?"

"আছে—বিষয়াদি-সংক্রান্ত-কথা হলেই বাড়ির মধ্যেই দরকার। টাকাকড়ির আবশ্যক হইলেই বাড়ির মধ্যে দরকার। তবে আজিকার মত বিদায় হই। কাল শুনিতেই পাবির। কতকগুলি কাগজ যখন হাতে দেখলেম, কোন লিখাপড়া করার মতলব। হাঁ হাঁ মনে হয়েছে সাহেব কয়েকখানি গ্রাম ইজারা চাহিয়াছিল —কুঠির নিকটের গ্রাম—বোধ হয় তাহাই হইবে। —তাতেই কি হইবে। —প্রজার যে জোট—সাহেবকে আসিতেই দিবে না। যাক সে সকল কথায় আমার দরকার কি, চল্লেম।"

উনত্রিংশ তরঙ্গ

গোলযোগ

কয়েকদিন পর্য্যন্ত কেনীর পাকানীল পদ্মা, গৌরী, কালীগঙ্গা স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। দিবারাত্রি স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। এক শালঘর মধুয়াতেই যে নীলআবাদ, নীলেরকারবার তাহা নহে। যে কুঠির অধীন যত নীল ক্ষেত ছিল, সমুদায় জলে ভাসিয়া যাইতেছে। যাহারা প্রজা দমনে বাহির হইয়াছিলেন, তাহারা গ্রামের ত্রিসীমায় যাইতে সাহসী হইলেন না। যাহারা পাকানীল কাটিয়া জলে ভাসাইতেছে, তাহাদিগকে ধরিয়া কুঠিতে আনিবেন, সমুচিত শাস্তি দিবেন, মনিবের আদেশ মত কার্য্য করিবেন আশা করিয়াই সেলাম ঠুকিয়া দলবলসহকারে

বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু বড়ই গোলযোগ—কিছুই করিতে পারিলেন না। কুঠিতে যাইয়া সাহেবকে অবস্থা জানাইতেও সাহসী হইলেন না। কারণ কুঠির দেওয়ান, আমীন, খালাসী, সর্দ্দার, লাঠিয়াল, সকল দেশেরলোক, বাড়ি, ঘর, জমি কারবার সকলি দেশে। আত্মীস্বজন, কুটুম্ব, সকলি ঐ অঞ্চলে। পুত্র লাঠিয়ালের চাকর, পিতা প্রজার পক্ষে; কনিষ্ঠ কেনীর বেতনভোগী, জ্যেষ্ঠ প্রজার দলে। ইহার পর প্রজার মৌখিক ঘোষণা—এই যে, "যে নীলকরের চাকুরী করিবে, যে ব্যক্তি নীলকরের সাহায্য করিবে তাহার ভালাই নাই।"

স্বার্থের লোভে, অর্থলাভে যিনি প্রজার বিপক্ষে হস্ত প্রসারন করিলেন, দুই একপদ অগ্রসর হইতে না হইতে অমনি সোজা হইয়া প্রজার দলে মিশিলেন। সাধ্য নাই যে নীলকরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া মানমর্য্যাদা বজায় রাখিয়া দেশে বাস করেন। যিনি কুঠি হইতে বাহির হইলেন, তাহার আর প্রবেশের সাধ্য থাকিল না। সপ্তাহ মধ্যে সর্দ্দার, নেগাহবান, আমীন, খালাসী গোমস্তা, প্রভৃতি কুঠি পরিত্যাগ করিল। নীলকরের সংশ্রব ত্যাগ করিল। দোবে, চোবে, সিং ব্যতীত বাঙ্গালী একটি প্রাণীও প্রকাশ্যভাবে নীলকরের চাকুরী করা দূরে থাকুক—সাধ্য হইয়া বিপক্ষে দাঁড়াইতে হইল। দেওয়ান, মুচ্ছুদি বড় বড় আমলা মহাশয়েরা কিছুদিন নিমকের সত্তরক্ষা করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। বাড়ির সংবাদ বড়ই শোচনীয়। দিনেন্দ্রপুরে অত্যাচার, লুটপাট, পরিজনের দুর্দ্দশার একশেষ, কারসাধ্য নীলকরের চাকুরী করে? ক্রমে কুঠিতে লোকশূন্য হইয়া উঠিল। খানসামা বাবুর্চি পর্য্যন্ত কার্য্য ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কষ্টের একশেষ। পক্ষকাল অতীত হইতে না হইতে কেনীর সমুদায় জমিদারিতে, অন্যান্য কুঠিয়ালের জমিদারিতে প্রজাবিদ্রোহের আগুন সতেজে জ্বলিয়া উঠিল। বড়ই গোলযোগ বাধিল। কেনী তো ছাড়িবার পাত্র নহেন—সহজে দমিবার লোক নহেন। তিনিও পুরাদমে বুদ্ধিবল, অর্থবল, প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। হিন্দুস্থানী চাকরের সংখ্যা বিশগুণ বৃদ্ধি করিলেন। কলিকাতা হইতে খানসামা খিদমতগার, বাবুর্চি আনাইয়া নূতনভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দোকানী, পসারী একজোট, কুঠিরলোকের নিকট কেহ কোন জিনিস বিক্রি করিবে না। হাটেঘাটে, বাজারে কুঠিরলোক পাইলে বিধ্বস্ত করিয়া ছাড়িয়া দিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে অশান্তির বাতাস বহিয়া দেশে হুলুস্থুল ব্যাপার পড়িয়া গেল। একটি মুরগীর জন্য কেনী

জ্বালাইত। খাদ্যসামগ্রী জন্য কেনী জ্বালাইত। খাদ্যসাগ্রী জন্য রন্ধনশালা বন্ধ। টাকা থাকিলে কি হইবে? ক্রোড়পতি হইলে কি হইবে? লোকের অভাব—খাদ্যসামগ্রীর অভাব অন্যদিকে প্রাণের আশঙ্কা। চারিদিকেই শঙ্কা, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আতঙ্ক ও ভয়! মহাবিপদ! যে কুঠিতে দিবারাত্র লোকজনের গতিবিধি, কাজকর্ম্মের গোলযোগে সর্ব্বদা গুলজার! সর্ব্বদাই হৈ হৈ ব্যাপার, রৈ রৈ কাণ্ড, আজ সে কুঠিতে জনমানবশূন্য নিস্তব্ধ! অলক্ষীব বাতাস বহিয়া চারিদিকেই যেন হাহাকার! আঙ্গিনা, রাস্তা ঘাট, ঘাসজঙ্গলে একাকার! কেনীর সংবাদ লইতে এক মীরসাহেব ভিন্ন লোক নাই। কিন্তু মীরসাহেবও সর্ব্বদা শশঙ্কিত, সর্ব্বদা ভীত। সা গোলাম সুযোগ পাইয়া আপন অভিষ্ট নানাপ্রকারে সিদ্ধ কবিতে মনস্থ করিয়াও, কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। অনেকের অভিপ্রায় এই যে, মীরসাহেবকে কৌশলে আপন দলভুক্ত করা। একেবাবে নির্ম্মূলকরা কি কোন প্রকারে অত্যাচারকরা, ইচ্ছা নহে। প্রকাশ্যভাবে কেনীর সহিত দেখাসাক্ষাত মীরসাহেবের আর সাধ্য নাই। প্রকাশ্য চিঠিপত্র চালাইতেও আর ক্ষমতা নাই। বিশেষ বিশ্বাসী দুই একটি লোককে ফকির সাজাইয়া ঝোলার মধ্যে চিঠি দিয়া নিশীথ সময়ে অতি সাবধানে খবর আনা-নেওয়া করেন। নিজের লোকজন দ্বারা খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করিয়া, অতি গোপনে শালঘর মধুয়ায় অপথে পাঠাইয়া দেন। কেনীর খাদ্যসামগ্রী সমুদায় কলিকাতা হইতে বিশেষ সাবধানে দোবে—চোবেদিগের সাহায্যে আসিতে আরম্ভ হইল। টাকার অসাধ্য কি আছে? অনেক ভিন্নদেশীয় লোক ক্রমে কুঠিতে আমদানী হইতে লাগিল। আত্মরক্ষা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যেই কেনী অগ্রসর হইতে পারিলেন না। আপাততঃ আত্মরক্ষাই একমাত্র কার্য্য মনে করিয়া তাহারই উপায় করিতে লাগিলেন।

মীরসাহেব যে কষ্টে না পড়িয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহার প্রতি তাঁহার পরিবারপরিজন প্রতিবিদ্রোহীদল কোনরূপ অত্যাচার করিবে না, এ কথা প্রধানবৈঠকে সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে। তবে কৌশলে তাঁহাকে কষ্টে ফেলিয়া আপন দলে আনিবে, ইহার চেষ্টা বিশেষ রূপে হইয়াছে এবং হইতেছে। মীরসাহেবের ধোপা, নাপিত, বেহারা সমুদায় বন্ধ হইয়াছে, চলাচল প্রতিবন্ধক হেতু নৌকাবন্ধ হইয়াছে। অনেক চাকর, চাকুরী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। এই কঠিন সময়ে দৌলতননেসা হঠাৎ পীড়িতা হইয়াছেন, কোন কথা নাই, বার্ত্তা নাই, অনিয়ম নাই, হঠাৎ একদিন তাহার মুখে দুগ্ধবিস্বাদ বোধ হইয়াছিল, তাহার পরদিবস হইতেই পেটেরপীড়া।

এদিকে কেনী অর্থ বলে, ভিন্ন ভিন্ন দেশীয়লোকের সাহায্যে আত্মরক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া প্রজাবিদ্রোহী বিষয়ে ভারতঅধীপ পর্য্যন্ত বোধহয় জ্ঞাপন করিয়াছেন। শান্তি রক্ষার জন্য সৈন্যসামন্তসহ শান্তিরক্ষক কমিশনারবাহাদুর, শালঘর, মধুয়ার কুঠিতে আসিয়া ছাউনি করিয়াছেন। রাজস্ব বন্ধ! প্রজারা নীল তো বুনিবেই না। খাজনা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছে। কথাই আছে যে—"যদি পায় সংল, তো যায় রাজমংল।" নীলও বুনিবে না—খাজনাও দিবে না। অথচ নীলকরে আক্রমণ, নীলকরপক্ষীয় লোকের প্রতি অত্যাচার! ক্রমেই অশান্তি, ক্রমেই বিদ্রোহিতার বৃদ্ধি! সুতরাং রাজার শান্তির আবশ্যক!

কমিশনারবাহাদুর খাজনা আদায় করিবেন। শান্তিরক্ষা করিবেন, এই কথাই রটিয়া গেল। দেশে শান্তির সুবাতাস বহিতে আরম্ভ হইল। অন্যায়-অত্যাচার কমিতে লাগিল। কিন্তু প্রজার জোট যেমন তেমনি রহিয়া গেল। কুঠিরনামে আগুন, নীলের নামে মহাআগুন।

কেনীর মাথায় শক্তিও কম নহে, অর্থের বলও বাঙ্গালীর সমান নহে। সমুদার এলাকার প্রজা একজোট। নীলের নাম তো শুনিতেই পারে না। নেহ্য খাজনা দিতে সম্পূর্ণরূপে বাধ্য; তাহাও দেয় না। বলপ্রয়োগে খাজনা আদায়, প্রজা বশ করার ক্ষমতা একেবারেই রহিত। বাধ্য হইয়া মজুদঅর্থে হাত পড়িয়াছে। নূতন নূতন লোক রাখিতে হইয়াছে। পুরাতন চাকর ক্রমেই দিনের মধ্যে দুই একটি করিয়া দেখা দিতেছে। তাহাদের পূর্ব্বভয় অনেক পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। একগ্রামে ডঙ্কাধ্বনী হইলে শতশত গ্রামের লোক যে যে অবস্থায় থাকিবে সেই অবস্থায় একত্র হইয়া কুঠির পক্ষীয় লোক, যাহারা কথায় বাধ্য না হইত, জোর জবরানে বাধ্য করিয়া চাকরী ছাড়াইত, কুঠিতে যাওয়া-আসা বন্ধ করিত। এখন আর তাহা নাই। এখন সমুদায় আপন ইচ্ছার উপর নির্ভর। রাজশক্তিতে অন্যায় অত্যাচারে বাধা। ইচ্ছার অনুগামী অর্থলোভী দুই একজন ক্রমে পুনর্ব্বার কুঠিতে জুটিতে লাগিল। কিন্তু সেদিন নাই, সে আমল নাই। এখন নিরীহ ভদ্রলোকের প্রতি অত্যাচার, জবরান করার পক্ষেরই আর ক্ষমতা নাই।

কেনী প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, বাঙ্গালীর সাহায্য লইবেন না। বাঙ্গালীর দ্বারা কোন কার্য্য করাইবেন না। খাজনা আদায় ও নীলকার্য্যেও ক্ষান্ত দিবেন না। বিলাত হইতে কলের লাঙ্গল আনিবার জন্য চেষ্টায় আছেন। নীলহউজে নীল-

মাড়াই করার জন্য কলের জোগাড় করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। প্রজাকে ডাকিবেন না, প্রজার নাম শুনিতে আর ইচ্ছা করেন না। রাজশক্তি দ্বারা খাজনা আদায় করিয়া লইবেন, ইহাই তাঁহার স্থির সংকল্প।

শরাসন হইতে শর ছুটিয়া গেলে তাহা নিবারণ করা মানুষের দুঃসাধ্য! ঘটনাস্রোতঃ একবার চলিয়া গেলে তাহা নিবারণ করাও মানুষের অসাধ্য। এই সকল ঘটনার মধ্যে রাজাও রাজশক্তির বিস্তার করিলেন। কুষ্টিয়ায় মহকুমা স্থাপিত হইল। কুষ্টিয়ার থানা গৌরীনদীর উত্তরপার পুরাতন কুষ্টিয়াতে ছিল, তাহা উঠিয়া মহকুমার নিকট আসিল। রেলওয়ের লাইন খুলিবার বন্দোবস্ত হইল। কেনীর প্রজার নিকট বাকি কর আদায় করিতে তিনজন ডেপুটিকালেক্টর নিযুক্ত হইয়া কুষ্টিয়ায় আসিলেন। নূতনভাবে নূতনপ্রকারে নূতনকাণ্ড যেন কুষ্টিয়া অঞ্চলে নূতনজগতের সৃষ্টি হইল! মহকুমা সৃষ্টির পূর্ব্বে নালখনি এবং সমস্ত্রণার মোকদ্দমা পাবনাতে কেনীর পক্ষ হইতে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে কতকগুলি প্রজা ফাটকে আটক পড়িয়াছিল এবং সাগোলাম প্রভৃতি জোতের প্রধানগণের ছয় ছয় মাসের বিনাশ্রমে শাস্তি হইয়াছিল। কিন্তু আপীলে টিকিল না। সকলেই বেকসুর খালাস হইল।

চতুর্দ্দশ তরঙ্গ

হৃদয়ে আঘাত

দৌলতননেসা সেইযে পীড়িত হইয়া শয্যায় পড়িয়াছেন, আর আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। দিন দিন পীড়ার বৃদ্ধি। দিন দিন শরীর ক্ষিণ ও বলহীন হইয়া একেবারে শয্যায় ধরা হইয়াছেন। নানাস্থান হইতে বৈদ্যমতের চিকিৎসক আসিয়া কত ঔষধ, কত প্রকরণ, কত কি করিতেছেন কিছুতেই পীড়ার শান্তি হইতেছে না। তাহার মাতা অন্নজল পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি কন্যার শুশ্রূষায় মন দিয়াছেন। অবসরমতে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, কিছুতেই কিছু হইতেছে না। মুসলমানীধর্ম্ম-মতে কত সিন্নি, কত খয়রাত, কত কোরবানী করিতেছেন, মানত করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। অনেকেই দৌলতননেসার জীবনে নিরাশ হইয়াছেন। একঘরের এক কন্যা,—এক বংশের একটি মাত্র কন্যা! দৌলতননেসা অসময়ে জগৎ ছাড়িয়া, বৃদ্ধমাতার হৃদয়ে আঘাত করিয়া,—স্বামীর মনে ব্যথা দিয়া জনমের মতন চলিয়া যাইবেন, একথা

তাহার মনে একদিনের জন্যেও উঠে নাই। কিন্তু চক্ষের জলে সর্ব্বদাই ভাসিতেছেন! বাড়ির এমন একটি লোক নাই, পাড়ায় এমন একটি প্রাণী নাই, যে দৌলতননেসার এই হঠাৎ পীড়ায় দুঃখিত হয় নাই। সকলের মনেই এই এই কথা যে হায়! কি হইল? একটি বংশ একেবারে লোপ হইল! মুন্সী জিন্নাতুল্লার ঐ এক কন্যা। ঐ এক কন্যাই মাতার সম্বল! হৃদয়ের সার, মহামূল্য রত্ন। সে রত্ন হারাইলে কি আর ফাখেরাখাতুন জীবিত থাকিবে? মীরসাহেব পুরুষ, কিছুদিন স্ত্রীবিয়োগ দুঃখ মনে থাকিতে পারে? কিন্তু মুন্সীর বিবির আর কল্যাণ নাই। ভালই নাই। এমন রোগ কেউ কখনও দেখে নাই। হায়! হায়! ছোটদুটি ছেলেরই বা কি দশা হইবে। হাজার বিষয় থাক, টাকা থাক, কিন্তু মায়ের সমান যত্ন, মায়ের সমান ভালবাসা কি আর হয়?

বাড়ির চাকর-চাকরাণী সকলেই দিবারাত্রি প্রাণপণ করিয়া খাটিতেছে। সকলেই দুঃখিত। সকলেরই চক্ষে জল! সবজার চক্ষুও জলশূন্য নহে। সামান্য অর্থলোভে, সামান্য অলঙ্কার লোভে সে, যে কুকাজ করিয়াছে, দৌলতননেসার উপস্থিত অবস্থা দেখিয়া তাহার অনুতাপ হইয়াছে। মনে মনে মহাযন্ত্রনা ভোগ করিতেছে। রূপসী তাহাকে লোক দ্বারা আরও কয়েকবার ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল। সে আর যায় নাই। রূপসীর সঙ্গে আর দেখা করে নাই। সকলের কান্না, সকলের দুঃখ একপ্রকার, সবজার কান্না, সবজার দুঃখ অন্যপ্রকার! তাহার কর্ত্তৃক যে একটি সোনার প্রতিমা অসময়ে সংসারসাগরের তরঙ্গে ডুবিয়া বিসর্জ্জন হইল তাহা সে বেশ বুঝিয়াছে। সে বিষাক্ত ঔষধ দুগ্ধে মিশাইয়া না দিলে যে এরূপ সাংঘাতিক পীড়ায় দৌলতননেসা আশক্তা হইতেন না, তাহা সে বেশ বুঝিয়াছে। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া সে আর রূপসীর নিকট যায় নাই। ছয়মাস যায়, পীড়ার বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হইল না। আজ আরও বৃদ্ধি। কি ভয়ানক বিষয়! উহু! বলিতে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, অঙ্গ শিহরিয়া যায়, অন্তরের অন্তঃস্থানে পর্য্যন্ত আঘাত লাগে! হায়রে হিংসা! হায়রে আমোদ। নর্ত্তকীসহ একত্রে আমোদ! আজ দৌলতননেসার নাড়ি পচিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ পড়িতেছে। চিকিৎসকগণ নিরাশ হইয়া মলিনবদনে বাহিরে আসিলেন। মীরসাহেব কবিরাজদিগের হাবভাব দেখিয়া অবস্থাবুঝিয়া শুনিয়া সজলনয়নে স্ত্রীর পীড়িত শয্যার এক পার্শ্বে গিয়া বসিলেন। দেখিলেন সে জলন্ত জ্যোতিঃপূর্ণ সুকোমল মুখমণ্ডলে পূর্ব্বভাব পরিবর্ত্তন

হইয়া, গতকল্য যাহা ছিল, তাহাও আজ নাই। সে বিস্ফারিতলোচনে খরতর জ্যোতির অভাব যে পরিমাণ কাল দেখিয়াছিলেন, আজ তাহার কিছুই নাই। সরল নাসিকা বামে কিঞ্চিৎ হেলিয়াছে, চক্ষের জলে চিবুকদ্বয় ভাসিয়া যাইতেছে। জ্যেষ্ঠপুত্র মায়ের পদতলে মাথা রাখিয়া মায়ের পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া কান্দিতেছে। মধ্যম পুত্রের বয়স দশ এগার বৎসর, সেও যে কিছু না বুঝিতেছে তাহা নহে। মায়ের বক্ষে মাথা রাখিয়া সজল নয়নে মায়ের মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে। আর দুটিপুত্র তাহারা অতি শিশু, তাহারা সেখানে নাই। স্থানান্তরে দাসীদিগের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে। কিন্তু সময় সময় তাহাদের কান্নার রবও শুনা যাইতেছে।

মীরসাহেব! অনেকক্ষণ সহধর্ম্মিণীর মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। কেমন বোধ হয়?

দৌলতননেসা কোন উত্তর করিলেন না। দক্ষিণহস্ত উঠাইয়া ঈশ্বর উদ্দেশ্যে মাত্র তর্জ্জনী উত্তোলন করিয়া দেখাইলেন। কোন কথা স্বামীকে বলিলেন না। অধিকন্তু বস্ত্র দ্বারা আপন মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন। স্বামীর পদ দুখানি দুইহাতে ধরিয়া অস্ফুটস্বরে কি বলিলেন, তাহা অপর কেহই বুঝিতে পারিল না। মীরসাহেব কিছুতেই তিষ্ঠিতে পারিলেন না। নীরবে ক্রন্দন করিতে করিতে ঘরের বাহির হইলেন। কোনদিন কোনলোকে যে চক্ষে কখনই কোন কারণে জল দেখে নাই, তাহারা আজ মীরসাহেবের চক্ষে অবিশ্রান্ত জলধারা পতন দেখিল।

ফাখেরাখাতুন অন্য ঘরে মৃত্তিকা শয্যায় অজ্ঞান। কখন সচেতন, কখন দৌড়িয়া কন্যার নিকটে আসিতেছেন। কখনও কন্যার পার্শ্বে কন্যাকে জড়াইয়া ধরিয়া অপরকে বলিতেছেন—হায়! তোমরা এঘর হইতে চলিয়া যাও। আমি মাকে ক্রোড়ে করিয়া থাকিব। দেখিব কে আমার মাকে কোথায় লইয়া যায়? আবার কোল ছাড়িয়া উঠিতেছেন। দৌহিত্রদ্বয়ের মুখপানে চাহিয়া হু হু শব্দে ক্রন্দন করিতে করিতে অচৈতন্য হইতেছেন।

দৌলতননেসা মুখের বস্ত্র সরাইয়া ইঙ্গিতে জ্যেষ্ঠপুত্রকে ডাকিলেন। দুই-হস্তে দুইপুত্রের মুখে, মাথায় হস্তদিয়া অস্ফুটস্বরে কয়েকটি কথা কহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র মায়ের মুখে চামুচে করিয়া সরবত দিতে লাগিলেন। দুই-একঢোক গিলিয়া আর গলাধ হইল না! গণ্ড বাহিয়া সরবত পড়িতে

লাগিল। শ্বাসবৃদ্ধি হইল, চক্ষু বিবর্ণ হইল, তারার কালীমারেখা দেখিতে দেখিতে সরিয়া গেল।

ঈশ্বরের নাম করিতে লাগিলেন। দৌলতননেসা মৃদুস্বরে ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে পুত্রদ্বয়ের মস্তক বক্ষে ধারণ করিয়া, জীবনের শেষ ভালবাসিয়া জগৎ হইতে চলিয়া গেলেন। প্রাণবায়ু কোন পথে কোথায় চলিয়া গেল কেহই কিছু জানিতে পারিল না। সকলেই দেখিল চক্ষেরপাতা বন্ধ হইয়াছে! শ্বাস-প্রশ্বাস আর নাই। ঠোঁট দুইখানি যে নড়িতেছিল, তাহাও আর নাই। দৌলতননেসা নাই—স্পন্দহীনদেহ শয্যায় পড়িয়া আছে। ঘরেরলোক মাথা ভাঙ্গিয়া কান্দিতে কান্দিতে ঘরের বাহির হইলেন। বাড়িময় ক্রন্দনের-রোল উঠিয়া গেল। যে যেখানে ছিল সেখানেই গড়াগড়ি পাড়িয়া মাথায় শত করাঘাত করিয়া কান্দিতে লাগিল।

পুরজনেরা তখনি সৎকারের ব্যবস্থা করিলেন। মীরসাহেবের অভিমতে তাঁহার পিতার সমাধিস্থানের নিকট দৌলতননেসার সমাধিস্থান নির্ণয় হইল। তাহাতে সা গোলাম কোন আপত্তি করিলেন না। সাঁওতার বাড়িঘর, জমিদারি, সে সময় সকলি সা গোলামের। মীরসাহেবের কোন স্বত্ব নাই। কিন্তু দৌলতন-নেসারের সমাধি সাঁওতায় হইতে সা গোলাম কোন আপত্তি করিলেন না।

এতদিনের পর রূপসীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। রূপসীর প্রসঙ্গ পথিক এ কলমে আর আনিবেন না—এইখানেই ইতি করিল। তবে তাহার পরিণামফল, পরিণামফলের সহিত জগৎকে দেখাইতে ইচ্ছা রহিল।

এক চতুর্দ্দশ তরঙ্গ

রূপান্তর

এই পরিশূন্য ঘূর্ণায়মান জগতে রূপান্তর আশ্চর্য্য নহে। যে কাঞ্চনশৃঙ্গ নীলাকাশ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, হয়ত কালের প্রবাহে চূর্ণবিচূর্ণ সমতল-ক্ষেত্রে পরিণত হইতে পারে। মহাসিন্ধুও কালচক্রে পরিশুষ্ক হইয়া বালুকাময় মরুভূমি হইয়া মরীচিকারূপে পথিকের ভ্রম জন্মাইতে পারে। যে স্থানে অতলস্পর্শ বলিয়া প্রবাদ, হয়ত সেই স্থান হইতে ভূধরের অতি উচ্চশিখর দেখা দিয়া জলধির জলরাশি সরাইয়া স্বিয়মস্তক উন্নত করিতে পারে। মহানগরী কলিকাতাও কালের করালগ্রাসে পড়িয়া মহাশ্মশান ক্ষেত্ররূপে দেখা দিতে পারে। নিয়তির

অসাধ্য কিছুই নাই। পরিবর্ত্তন, রূপান্তর, জগতে আশ্চর্য্য নহে। যে রাজ্যে কেনীর নামে দোহাই ফিরিয়াছে, বালকে মায়েরক্রোড়ে আতঙ্কে কাঁপিয়াছে, মহা-শক্তিশালী লক্ষপতির হৃদয় কেনীর নামে দুর দুর করিয়া অস্থির হইয়াছে, শ্যামচাঁদের নামে মানুষের হৃদপিণ্ড পর্য্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে, আজ সেই কেনীর ভাব স্বতন্ত্র, সর্ব্বোতভাবে রূপান্তর।

রাজশক্তিতে দেশের শান্তিবায়ু বহিয়া প্রজা নীলকরকে রক্ষা করিয়াছে। স্বেচ্ছাচার অত্যাচারের দায় হইতে সকলকেই উদ্ধার করিয়াছে। সকলেই এখন বিধির অধীন। রাজবিধির অন্তর্গত সীমার অধীন। নিকটেই মহকুমা। শাসন, রক্ষণ, সমুদায় রাজহস্তে। প্রজার পক্ষে থাকিলেও নীলকরের অত্যাচার নাই। নীলকরের পক্ষে গেলেও প্রজার অত্যাচার নাই। যাহার যে পক্ষ অবলম্বন শ্রেয় বোধ হইতেছে, প্রয়োজন বোধ হইয়াছে, সুসার বোধ হইয়াছে, সে সেই পক্ষে যাইতেছে। মাঝে মাঝে পরিবর্ত্তনও হইতেছে। প্রজায় নীল আর বুনিবে না, কেনীও নীলচাষ ছাড়িবে না। জমিদার—জমির অভাব নাই। চাষকারকিদের জন্যই প্রজার দরকার। বিলাত হইতে কলেরলাঙ্গল আনিবেন, ইনজিনে লাঙ্গল চলিবে। কলেই আবাদ, কলেই বুনানী, কলেই কর্ত্তন। কলেই মাই, কলেই জাঁত; দেশীয়লোকের আর সাহায্য লইবেন না। দেশীয়লোককে আর ডাকিবেন না। খাজনার জন্য তাগাদা করিবেন না। দশ আইন করিয়া রাজসহায়ে খাজনা আদায় করিবেন, ইহাই সংকল্প। এই যুক্তি স্থির করিয়া, আপন কর্ত্তব্যকার্য্যে মন দিয়াছেন। কিন্তু মজুত তহবিলে হাত পড়িয়াছে। আয়ের অঙ্ক প্রায় শূন্য। মজুত তহবিল হইতে অকাতরে ব্যয় করিয়া উদ্দেশ্যসাধনে তৎপর হইয়াছেন। নায়েব, মুচ্ছদি, দেওয়ান, সাহেবের পূর্ব আসথাস অনেকেই আবার আসিয়া জুটিয়াছেন। কিন্তু সকলেই রূপান্তর। পূর্ব্বভাব কাহারও নাই। এখন প্রজা-শাসন আইনের মারপেঁচে বড় বড় মাথাল মাথাল প্রজার নামে সত্যমিথ্যা অনেক নালিশ রুজু করিয়াছেন। উকিল-মোক্তার খুব জুটিয়াছে। কথায় কথায় নালিশ, কথায় কথায় আরজি দাখিল হইতেছে। থানায় এজাহার পড়িতেছে, ম্যাজিষ্ট্রীতে দরখাস্ত দাখিল হইতেছে। বলা বাহুল্য যে, প্রজাগণই আসামী। মন্দ নয় এ দৃশ্য—মন্দ নয়। পাঠক! মনের কথা যদি মনোযোগ করিয়া পাঠ করিয়া থাকেন, তবে এ দৃশ্যে চক্ষু শীতল না হউক আনন্দ জন্মিবে। কোথায় সর্দার লাঠিয়ালের

যমযাতনা, আর কোথায় সমন ওয়ারেন্টে তলবের তাড়না। কোথায় নিজেই হর্ত্তা-কর্ত্তা —বিধাতা, রাখা, মারা আপনহাত, আর কোথায় করজোড়ে বিচারপ্রার্থী হইয়া, সেই অধীনস্থ প্রজার সহিত সমশ্রেণীভাবে বাঙ্গালী বিচারকের নিকট দণ্ডায়মান। কুঠির সীমায় পা রাখিতে যাহাদের প্রাণ কাঁপিয়াছে, এক্ষন রাজ-বিচারগৃহে সেই শ্যামচাঁদ আঘাতি প্রজাগণ উচিত কথা কহিতে একটুকুও ক্রটি করিতেছে না। তিনি জমিদার, তিনি নীলকর, তিনি ইংরেজ, একথা বলিযা একটুকুও খাতির করিতেছে না। বিশ্বাসের পাত্র সকলেই সমান। যে কথায় সামান্য কুলীমজুরকে রাজসমক্ষে শপথ করিতে হয়, মেঃ টি. আই. কেনীকেও তাহাই করিতে হয়। রাজদ্বারে সকলেই সমান! আবার প্রজার ভাবটাও একবার ভাবিয়া দেখুন—দেখুন কি চমৎকাব দৃশ্য! কি চমৎকার পবিবর্তন!

বাকি খাজনার মোকদ্দমা ব্যতীত, প্রজা শাসন, প্রজা সোজাকবার বাবদে যে সকল মোকদ্দমা কেনীরপক্ষ হইতে উপস্থিত হইতে লাগিল, প্রায়ই ডিসমিস। বিচারভ্রমে, কি বিভ্রাট। যে যে মোকদ্দমায় প্রজাগণ শাস্তি পাইল, আপীল-আদালতে পবিপক্ক বিচাবকের নিরপেক্ষ বিচাবে নীলকরের চক্র ছাপা বহিল না। মোকদ্দমাও টিকিল না। আসামীগণ বেকসুর খালাস পাইতে লাগিল।

এদিকে কলেব লাঙ্গল বিলাত হইতে আসিয়া পডিল। নীলমাই জন্য নীলহউজেও বিলাতী কলকৌশল বসান হইল। নীলজমি চাষ, নীলকর্ত্তন, নীল-মাই ইত্যাদি সমুদায় কলের কৌশলে, ইনজিনের বলে সম্পন্ন হইবে, প্রজার সাহায্য কিছুতেই লওয়া হইবে না। ইহাই কেনীর আন্তরিক সঙ্কল্প। করিলেনও তাহাই। কিন্তু তাহাতে আরও বিপরীত ফল ফলিতে লাগিল। নীলবিদ্রোহীর প্রধান পাণ্ডা সা গোলাম। কলের লাঙ্গল প্রথম চালাইবার দিন কেনী সকলকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তোমরা জান, আমি এই লাঙ্গলের নাম সা গোলাম রাখি-লাম। গায়ের জ্বালায়, মনের ক্ষোভে, যাহাই বলুন, কিন্তু কলের লাঙ্গলে ভালরূপ চাষ হইল না। সে লাঙ্গলে দুই এক বিঘা জমি চাষ করা যায় না। এক স্থানে এক শত দুই শত বিঘা সমতল এবং সমশ্রেণীর জমি হইলে চাষ হয় বটে, কিন্তু দেশীয় লাঙ্গল অপেক্ষা অধিক পরিমাণে জমি কাটিয়া নীলবুনানির উপযুক্ত করিতে বড়ই নাজেহাল হইতে হইল। কলে ঢিল ভাঙ্গা হয় না, মই দেওয়া যায় না। মাত্র জমি কাটিয়া মাটি উল্টাইয়া দেয়। ঢিল ভাঙ্গিতে, মাটিবুনানির উপযুক্ত করিতে

দেশীয় লাঙ্গলের বিশেষ আবশ্যক হইল। তখন বাধ্য হইয়া গরু, মহিষ, ক্রয় করিলেন। লাঙ্গল, জোয়াল, বিদে, কাস্তে, কোদালী চাষকার্য্যের যাবতীয় সরঞ্জাম কেনীকে প্রস্তুত করিতে হইল। এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে বুন, বাগদী আনাইয়া মাসিক বেতন ধার্য্যে ঐ সকল কার্য্য করিতে লাগিলেন।

গুদাম ঘরে এখন আর কয়েদী থাকে না, আমলাগণের বাসা হইয়াছে। মার-ধর, ধর-পাকড়—এসকল নামও আর শুনা যায় না। যাহা কিছু সকলি আদালতে। প্রজাকর্তৃক অন্যায়-অত্যাচারের বিচারসমুদায়ই রাজদ্বারে। কিস্তি কিস্তি প্রজার নামে খাজনার নালিশ। একআনা, দুইআনা খাজনার দাবিতেও প্রজার নামে নালিশ হইয়াছে। অবশ্যই ডিক্রিও হইতেছে। কিন্তু খাজনা আদায়ের চেষ্টা হইতেছে না। কেনীর ইচ্ছা যে, কিস্তি কিস্তি নালিশ করিয়া খরচা ইত্যাদিতে প্রজাকে নাজেহাল করা। পরে একত্রে ডিক্রি-জারির টাকা আদায় করিতে বসিবেন। প্রজা মোকদ্দমায় অযথা অর্থব্যয় করিয়া জেরবার হইবে। সেসময় আসল ডিক্রির টাকা দিতে অপারগ হওয়ারই কথা। দায় ঠেকিয়া বিশেষ বাধ্য হইয়া তাহার আনুগত্য স্বীকার করিবে।

যেমন নূতন মহকুমার সৃষ্টি, তেমনি মোকদ্দমার সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি। মহকুমায়, জিলায় কেনীর মোকদ্দমার অন্ত নাই। খরচেরও অন্ত নাই। কিন্তু আয়ের অঙ্ক একেবারেই শূন্য। ইতিপূর্ব্বে নীল-বীজসহিত ছোলা-বুনানি হইত, ছোলা উঠিয়া যাইত নীল বাড়িতে থাকিত। বৎসর সালের ঘোড়া, গরুর দানা সেই উপবিলাতেই চলিত, এক্ষণ ঘোড়ার দানা, চাকরের মাহিয়ানা, মামলা-মোকদ্দমার খরচ সমুদায় মজুদ তহবিল হইতে খরচ হইতে লাগিল। বিশেষ সত্য-মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইয়া উপস্থিত করিতে ন্যায্য ব্যয়ে কখনি পার পায় না। অনেক স্থানে অপব্যয়ে হস্ত প্রসারণ করিতে হয়। থানাদার, জমাদারকে বসে রাখিতে হইলেও ছালায় ছালায় টাকা ঢালিতে হয়। উপস্থিত পরিবর্ত্তনে কেনীর অর্থের শ্রাদ্ধ হইতে লাগিল। কলকারখানায় জমিচাষ ইত্যাদি কার্য্যেও অনেক অর্থ জলে গিয়াছে, লাঙ্গল, গরু, মহিষ করিতেও দশ বার হাজার নামিয়াছে, কিন্তু অত গরুর আহার কোথা হইতে জোগাইবেন। সহজ কথা নহে। ক্রমে অনা-হারে অযত্নে গরুগুলি মারা পড়িতে আরম্ভ করিল। কেনীর রোক কিছুতেই পড়ে না। দশ গরু মারা পড়িল, বিশ গরু খরিদ হইয়া আসিল। দেশওয়ালী,

পাঁড়ে, দোবে অনেক রাখিতে হইয়াছে, আমলা, মোক্তার, উকীল, তদবিরকারক, মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য চাকর, নানা স্থানে রাখিতে হইয়াছে। কেনীর সংসারে পূর্বাপেক্ষা নিয়মিত ব্যয়বৃদ্ধি হইয়া দশ গুণের উপর উঠিয়াছে। ইহার পর খাজানা-আদায় বন্ধ। নীলকার্য্যে লাভ কিছুই নাই। ব্যয়চতুর্গুণ। অধঃপতনের পূর্ব্ব লক্ষণ।

দ্বাচত্বারিংশ তরঙ্গ

শেষ অঙ্ক

কাহার কপালে কে খায়? ঈশ্বর ললাটফলকে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বতোভাবে ফলিয়া থাকে। বিশ্বাসীমাত্রেরই এই বিশ্বাস। কিন্তু এক দৌলতননেসার অভাবে সে পুরী ক্রমে জনশূন্য হইয়া উঠিল। দাসদাসীগণ কিছু-দিন থাকিয়া, আপন আপন পথ দেখিতে লাগিল। খাওয়াপরার কষ্ট না হইলেও নানা কারণে বাড়ি ছাড়িতে বাধ্য হইল। কারণ কু-কথা কয়দিন গোপন থাকে, কানাঘুষায় কথাটা একপ্রকার ফাখেরাখাতুনের কানে গিয়া পড়িল যে, এইসকল দাসীবাঁদীই কৌশল করিয়া কি ঔষধ খাওয়াইয়া দৌলতননেসাকে মারিয়া ফেলি-য়াছে। কে সেই ঔষধ খাওয়াইয়াছে, কি স্বার্থে এমন নেমকহারামী করিয়াছে তাহার কোন সন্ধান হইল না। কিন্তু ফাখেরাখাতুনের অন্তর হইতে দাসদাসীগণ একেবারে সরিয়া গেল। মনিবের আদর, যত্ন, ভালবাসা না পাইলে কয়দিন অধীনস্থ তাবেদার টিকিতে পারে? তিনি কাহাকেও কিছু বলিলেন না, অথচ ক্রমে অনেকে যাইতে আরম্ভ করিল? সর্ব্বপ্রথম সবজা তাহার কন্যা দুর্গতিকে লইয়া বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গেল। দেখাদেখি পর পর অনেকেই যাইতে আরম্ভ করিল। তিনি কাহাকে যাইতে নিষেধ করিলেন না, বা রাখিতে যত্নও করিলেন না। যে চলিয়া গেল কোনদিন তাহার সন্ধানও লইলেন না। দৌলতননেসা চারটি পুত্র রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। মীরসাহেবও স্ত্রীশূন্য শ্বশুরালয়ে সর্ব্বদা বাস করিতে আর ইচ্ছা করিলেন না। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের আদি-বসতিস্থান পদমদী গ্রামে বাসকরাই মনন করিলেন। পুত্রগণ মাতামহীর নিকটেই থাকিবে। মাঝে মাঝে এখানেও আসিবেন, সে বাড়িতেও থাকিবেন। সংসারে সুখ নাই—জীবন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সাংসারিক কার্য্যরও ইতি নাই। প্রধান শত্রু সা গোলাম। অধিকন্তু নীলকর পক্ষে থাকায় দেশের লোকের চক্ষেও

একপ্রকার চক্ষুশূল। মনও ভাল নহে। সাংসারিক কার্য্যেও একপ্রকার উদাসীন।

আর কিছুই ভাল বোধ হয় না, জীবনের অবশিষ্টকাল নির্ব্বিঘ্নে ঈশ্বরের নাম করিবেন স্থির করিয়াই এ স্থান পরিত্যাগ করিবেন মনে মনে স্থির করিয়াছেন। সেও পূর্ব্বপুরুষের বাড়ী। যৎকিঞ্চিৎ বিষয়ও আছে। কোন গোলযোগের মধ্যে না গিয়ে শুধু ঈশ্বরের নাম করিয়া জীবন কাটাইতে আর কষ্ট পাইতে হইবে না। ঘর-সংসার এখন তাঁহার কিছুই নাই বলিলেও হয়। কিন্তু লাহিনীপাড়ায় শ্বশুরালয়ে থাকিলে সর্ব্বদা শাশুড়ীর ক্রন্দন শুনিয়া আরও মন চাঞ্চল্য হইবে, ঘর-সংসার নাই, অথচ কেনীর পক্ষ, প্রজার বিপক্ষ থাকিয়া সংসারচক্রে ঘুরিতে হইবে, এইসকল ভাবিয়া কিছুদিনের জন্য এস্থান পরিত্যাগ করাই মনে মনে স্থির করিলেন। পুত্রগণের জন্যও কোন চিন্তা নাই, কারণ কাখেরাখাতুন বাঁচিয়া থাকিতে তাহাদের কোন বিষয় তাঁহাকে ভাবিতে হইবে না। একখানি বস্ত্রের জন্যও চিন্তা করিতে হইবে না, নাহা তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এই সকল ভাবিয়া-চিন্তিয়াই মীরসাহের শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিলেন। চিরসঙ্গী বসীরুদ্দিন সঙ্গেই চলিল। আর যাহার ইচ্ছা হইল, সেও মীরসাহেবের সঙ্গী হইল। মনের কথায় উদাসীন পথিক মীরসাহেবের জীবনের শেষঅঙ্ক এইখানেই ইতি করিল।

পাঠক। পথিকের মনের কথার আদি আছে, ইতি নাই। স্তরে স্তরে বিচ্ছেদ আছে কিন্তু কথার ইতি নাই। জীবন শেষ হইবে, জীবনলীলা সাঙ্গ হইবে, কিন্তু কথা ফুরাইবে না। মনের কথা মনেই রহিয়া যাইবে। আক্ষেপ ভিন্ন এজীবনে আর আশা কি? জগতের কাণ্ডই এইপ্রকার। এক আসিতেছে আর যাইতেছে। পথিকের কথায় কতজনের সংযোগ হইল, কতজনের সংশ্রব ঘটিল, ঘটনাশেষে কতজনকে পরিত্যাগ করিতে হইল। স্তরের সীমা যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ততই সংশ্রব, সংযোগ কমিয়া আসিতেছে।

সা গোলামের কার্য্যে বাধা দিতে এখন আর কেহই রহিল না। সা গোলাম মনে মনে আর একপ্রকার চালে চলিতে এখন মহাব্যস্ত হইয়াছেন। চিরশত্রু দেশ-ছাড়া হইয়াছে। মীরসাহেবের জীবনের লীলাখেলা এদেশ হইতে একপ্রকার জীবনের মত উঠিয়া গিয়াছে। আর চিন্তার কি? চারিদিকেই মঙ্গল! প্রজার পক্ষে থাকিয়া আশার অতিরিক্ত অর্থের মুখ দেখিতেছেন। দেশের লোকে

সা গোলামের প্রশংসা শতমুখে করিতেছে। বুদ্ধিবিবেচনায় দুশ বাহবা দিতেছে। কেনী আপন জেদ বজায় রাখিতে দিন দিন ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। যাহার ঘৃণাবোধ আছে, সে টাকার মায়া বোঝে না। যে রোগী, সেও টাকার মায়া করে না। যে লাজুক সেও টাকা রাখিতে জানে না। সংসারে যে সত্যবাদী এবং পর-দুঃখে কাতর, তাহার হাতেও টাকা থাকিতে পারে না। কেনী সত্যবাদী না হউক, লাজুক না হউক, দয়াল না হউক, রাগ আছে, ঘৃণাও আছে। লজ্জা যে একেবারেই নাই তাহাও নহে। কাজেই মজুত টাকা ক্রমেই হাতছাড়া হইতে লাগিল। আবার বাতাস উল্টা করিয়া বহাইবেন, আবার প্রজাকে শাসনদণ্ডে পেষণ করিবেন, এই দুশ্চিন্তাতেই সর্ব্বদা অর্থের শ্রাদ্ধ করিতেছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। দিন দিন ভাণ্ডার খালি হইতেছে। কিছুদিন পরেই কথা ছড়াইয়া পড়িল যে, কেনী ঋণী। কলিকাতা কোম্পানীর হৌসে অনেক টাকা ঋণী! প্রজার নামে খাজনার ডিক্রি হইযাছে, আদায় নাই। নিজ আবাদে নীল-বুনানি হইতেছে, আয়ের নামও নাই, ব্যয়ের চতুর্থাংশের এক অংশ ঘরে আসিতেছে না। মনিবের ঋণদায়ের কথা অধীন চাকরগণও জানিতে পারিলেই স্বভাবত ভক্তির হ্রাস হয়, বিশ্বাসেও বাধা জন্মে। মুখে প্রকাশ না হউক মনে মনে নানারূপ সন্দেহের কারণ হইয়া উঠে। অধীন বেতনভোগী আমলা সামান্য চাকর পর্য্যন্ত আপন আপন পাওনা কড়ায়ক্রান্তিতে বুঝিয়া লইতে প্রস্তুত হয়। ঋণদায়, মহাদায়! যে সংসারে ঋণপাপ প্রবেশ করিয়াছে সে-সংসারের কল্যাণ আশা আর নাই। তবে পুণ্যের জোর বেশী থাকিলে পাপ কাটিয়া যাইয়া আবার ভাল সময়ের মুখ দেখা—সে সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ঘর-কন্না বিষয়-সম্পত্তির বিসর্জ্জনেরই সুপ্রশস্ত পথ ঋণদায়। কেনীর ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। লাখে লাখে টাকা কোন পথে কোথায় উড়িয়া যাইতে লাগিল, কেহ চক্ষেও দেখিল না। আসিবার সময় অনেকেই দেখে, কিন্তু যাইবার সময়, কোন পথে সরিয়া যায়, বহু অন্বেষণেও সে পথের সন্ধান হয় না। অর্থ-চিন্তার ন্যায় মহাচিন্তা জগতে আর কিছুই নাই। অতিবিচক্ষণ পণ্ডিত সে চিন্তায় বিহ্বল —মহাজ্ঞানী হতজ্ঞান। মহাবলশালী মহাবীর ম্রিয়মাণ। বুদ্ধির বিপর্য্যয় দেখিলে, আত্মবিস্মৃতির লক্ষণ বুঝিলে সর্ব্বদা অন্যমনস্কের ভাব থকিলে যাহা থাকিবার তাহাও থাকে না। কেহ রাখেও না। যে যে পথে সুবিধা পায় দু'হাতে লুটিতে থাকে। দায়ীকের হঠাৎ অধঃপতনের অর্থই অর্থচিন্তা ও দুশ্চিন্তা—

কেনী পীড়িত হইলেন। মলত্যাগদ্বারের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে, পুরুষ-শরীরের কিঞ্চিৎ নিম্নে অতিকোমল স্থানে বৃহৎ একটি স্ফোটক হইয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিল। তিনি বাধ্য হইয়া চিকিৎসার্থে কলিকাতায় গমন করিলেন। মিসেস কেনী কুঠিতেই রহিলেন। স্বামীর দুরবস্থা হইলে স্ত্রীর মনেও যে কিছু না হয় তাহা নহে। কেহ মনের কথা মনেই রাখে, কেহ উদাসীন পথিকের ন্যায় মনের কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলে। হায় রে জগৎ! যদিচ কেনী ঋণী, কিন্তু তাহার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি পূর্ব্বেও যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে, নাই কেবল টাকা। সোনারূপার অলঙ্কার তাহার আলমারীপোরা। পাঠক! ভুলিয়াছেন? না মনে আছে? ঐসকল অলঙ্কার কি কেনী নিজে প্রস্তুত করাইয়াছিলেন? তাহা নহে—মনে হয় কি? ঐসকল সেই অলঙ্কার নিরীহ কৃষক-প্রজার পরিবারের ব্যবহার্য্য অলঙ্কার—লুটের মাল। মিসেস কেনী অনেক সরাইলেন। আমলাগণও হক না হক খরচ লিখিয়া আপন আপন জমাখরচ দুরস্ত করিলেন। সে সকল খাজানার ডিক্রি প্রজার বিরুদ্ধে করিয়াছিলেন, প্রজার নিকট কিছু কিছু সেলামী লইয়া কতক চাপা দিলেন, কতক তামাদী করিলেন, কতক বাড়ি চুরি, বাসা চুরির ভান করিয়া, কেহ আচ্ছা একহাত মারিয়া আপন জিনিসপত্র সরাইয়া বাসায় আগুন জ্বালিয়া দিলেন। ছারপোকা-মশার বংশ একেবারে শেষ হইল। আর যাহা পুড়িবার পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। অর্দ্ধ-পোড়া কুড়ি পঁচিশ বস্তা বাকী খাজনার ফয়সালা সাধারণকে দেখাইয়া একবারেই শেষ করিয়া ফেলা হইল। কেনী পীড়িত, এখনও জীবিত। তাহাতেই এই দশা। আমলা, নেগাহবান, কার্য্যকারক, বিষয়সম্পত্তি, দালানকোঠা সকলি আছে। শরীরের অর্দ্ধাংশ যে স্ত্রী তিনিও বাঁচিয়া আছেন, তত্রাচ এই দশা। জগতের কাণ্ডই এইরূপ।

কেনী আরোগ্য হইলেন। ভালমতে আরোগ্য হইয়া কুঠিতে আসিলেন। আবার কাজকর্ম্ম চলিতে লাগিল। কিন্তু ঋণের ভাগ ক্রমেই বেশী হইতে চলিল। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় শেষদীপ্তি দেখাইয়া চির নির্ব্বাণোন্মুখ রূপ ধারণ করিল।

স্রোতস্বতীর খরতর গতি আর ঘটনাস্রোতের অবিশ্রান্ত গতি রোধ করিতে কাহারই সাধ্য নাই। ঈশ্বরের নিয়োজিত কার্য্যে বিপর্য্যয় ঘটাইতেও কাহারও ক্ষমতা নাই। কেনী আবার পীড়িত হইলেন। জননেন্দ্রিয়ের নিম্নে যেস্থানে

স্ফোটক হইয়াছিল, কলিকাতা হইতে ভালমত আরাম হইয়া আসিয়াছিলেন। হঠাৎ সেই স্থান হইতে রক্তপাত হইল। শেষে দেখা গেল যে, সংযোগস্থানের জোড়া খসিয়া গিয়াছে। যেস্থানে ঘা শুকাইয়া, জোড়া লাগিয়া উপরের চামড়া পর্য্যন্ত হইয়াছিল, সেই স্থান ফাটিয়া গিয়াছে। রক্ত পড়িতেছে। কেনী তখনি কলিকাতা যাইতে প্রস্তুত হইলেন। যত শীঘ্র শীঘ্র পারিলেন কলিকাতা রওয়ানা হইলেন। কুষ্টিয়া মহকুমা স্থাপনের পর—বেলওয়ে লাইন খুলিয়াছে। কলিকাতা যাওয়া-আসা যতদূর সহজ হইতে হয় হইয়াছে। কোনরূপ খেজালত নাই। কেনী বেলওযেযোগে প্রভাত হইতে না হইতে কলিকাতা পঁহুছিলেন। সঙ্গে মিসেস কেনী আর সোনাউল্লা খানসামা।

কেনী গতবারে পীড়িত হইয়া দাতব্য চিকিৎসালয়ে ছিলেন, এবারেও কলিকাতার সেই প্রধান দাতব্য চিকিৎসালয়ে স্থান লইলেন।

কতদিন পরে কুষ্টিয়া অঞ্চলে একটি কথা প্রকাশ হইল। সকলেরই শুনা কথা, নির্দ্দিষ্ট খবর কেহই বলিতে পারে না। মুখে মুখে কথাটা এতদূর ছড়াইয়া পড়িল যে, কুষ্টিয়া অঞ্চলে সকলের মুখেই সেই কথা। "কেনী নাই"। দাতব্য চিকিৎসালয়ে কেনীর জীবনপ্রদীপ ইহজীবনের মত নির্বাণ হইয়া গিয়াছে। আশা-ভরসা, শত্রুদমন, পুনরায় নীলকার্যের প্রচলন, প্রজাশাসন ইত্যাদির সমুদায় কার্য্য পড়িয়া রহিল। মনের আশা মনেই রাখিয়া গেল। কেনীর সংস্রবে যতপ্রকার মোকদ্দমা বিচারালয়ে উপস্থিত ছিল সমুদায় মুলতবী হইল। কয়েকদিন পরে নীট খবর পাওয়া গেল যে, "কেনী যাথার্থই নাই।" মরণের কিছু পূর্বে একখানি উইলপত্র লিখিয়া সমুদায় সম্পত্তি রিসিভারের জিম্মা করিয়া গিয়াছেন। দেনা পাঁচলক্ষ টাকা। সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া পাওনাদারগণ টাকা পাইবেন। দেশের লোক যেন মহাকালের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইল। মাথার উপর হইতে ভারি একটা বোঝা সরিয়া গেল। সকলের শরীরই যেন পাতলা পাতলা বোধ হইতে লাগিল। কেনীর দৌরাত্ম্য, কেনীর অত্যাচার, কেনীর কথা মনে হইলে সত্য সত্যই চঞ্চল। কিন্তু কিছুদিন কাহারও বিশ্বাসই হইল না যে কেনী ইহসংসার ছাড়িয়া গিয়াছে। হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, মায়ামমতা, আশা-ভরসার হাত হইতে ছুটিয়া শান্তিধামের অধিবাসী হইবে। খবর নিশ্চয় আদালতের ঘর পার্যন্ত খবর, পাকা খবর কেনীর ষ্টেটের কার্য্যকর্ম-সমুদায় হাইকোর্টের অর্ডার অনুসারে বন্ধ। তত্রাচ বিশ্বাস নাই।

বুঝি মরে নাই। কোন সময় হুটপাট করিয়া আসিয়া পড়িবে। সাধারণের মনেও এই বিশ্বাস। কেনীর জীবন-অন্তের পর অনেকেই কেনীর সেই দুর্দ্দান্ত চেহারা, শরীরের ভীষণ গঠন স্বপ্নাবেশে মানসচক্ষে দেখিয়া—যথার্থ ই দেখিয়া যেন আতঙ্কে চমকিয়া উঠিয়াছিলেন।

মিসেস কেনী কুঠিতে আসিলেন। আপন জিনিসপত্র যাহা ছিল, তাহা লইয়া পুনরায় কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। বিসিভারকর্ত্তৃক কেনীর সমুদায় ষ্টেট নীলাম হইল। কিন্তু নিলাম ডাকিবার লোক নাই বলিলেই হয়। চারলক্ষ টাকা মূল্যে অন্য আর এক কোম্পানী খরিদ করিলেন। তিনিও বেশীদিন রাখিতে পারিলেন না। অন্য আর এক কোম্পানীর নিকট বিক্রয় করিলেন। তিনিও সম্পত্তি শাসন করিয়া কর-আদায়ে সমর্থ হইলেন না। বাধ্য হইয়া দেশীয় লোকের নিকট খণ্ড খণ্ড করিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। দেশের লোকেই ভাগবণ্টন করিয়া কেনীর সাবতীয় সম্পত্তি খরিদ করিয়া লইল। নীলকরের নাম দেশ হইতে একেবারে লোপ হইয়া গেল।

পরিণাম

কেনীর জমীদারি খণ্ড খণ্ড হইয়া বাঙ্গালীর দখলে। শালঘর মধুয়ার কুঠি একজন বাঙ্গালী ক্রয় করিলেন। আঙ্গিনা, প্রাঙ্গণ, উদ্যান আর রহিল না। পাটের আবাদ, ধানের আবাদ আরম্ভ হইল। যে কুঠির সীমায় জমিদার, তালুকদার লক্ষপতি মহাজনের পা ধরিতে গা কাঁপিয়াছে, ঘটনাস্রোতে, নিয়তির বিধানে, সেই সুরম্য দ্বিতল বাসগৃহের চতুষ্পার্শ্বে সাধারণ প্রজার কোষ্ঠার আবাদ, সিঁড়ি পর্য্যন্ত কোষ্ঠার আবাদ, ধানের আবাদ আরম্ভ হইল। যাহারা খরিদ করিয়াছেন, তাহাদের বাসের জন্য, সময় সময় বসিবার জন্য ঘর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অন্য অন্য দালানকোঠা পড়িয়া রহিয়াছে। চর্ম্মচটিকা, আরশুলা, ইঁদুর, শৃগাল ইত্যাদি মনের আনন্দে দিবারাত্র খেলা করিতেছে—ছুটাছুটি করিতেছে। এখন তাহারাই কেনীর সুরম্য বাসগৃহের অধিকারী—আপিস দালানের অধিকারী।

কিছুদিন পর গোয়ালন্দ লাইন খুলিল। গোয়ালন্দ ষ্টেশন এবং কোম্পানীর বাজার রক্ষার জন্য স্রোতস্বতী পদ্মার সহিত রেলওয়ে কোম্পানীর বিশেষ লড়াই বাধিল। তাহাদের ইচ্ছা যে, পদ্মারস্রোতের বেগ অন্য পথে ফিরাইয়া ষ্টেশন, বাজার,

ষ্টিমার-ঘাট তাহার গ্রাস হইতে রক্ষা করেন। বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার, বড় বড় বুদ্ধিমান কর্ম্মচারী চিন্তা করিয়া সাব্যস্ত করিলেন যে, বুদ্ধির অসাধ্য কি আছে, একটি নদীর স্রোতই যদি বুদ্ধিকৌশলে দশহাত তফাত দিয়া ফিরাইয়া না দেওয়া যায়, তবে বিলাতী-গৌরব কি? স্টেশন, বাজার, ষ্টিমারঘাটই যদি পদ্মার স্রোতবেগ হইতে রক্ষা না করা যায়, তবে আর রেল কোম্পানীর ক্ষমতা কি? বাঙ্গালাদেশের নদীর সহিত যদি বিলাতী বিজ্ঞান পরাস্ত হয়, তবে এ লজ্জা রাখিবার স্থান কোথায়? হয় এসপার নয় ওসপার। পদ্মার স্রোত ফিরাইয়া দিতে হইবে। দেও আড়াআড়ি বাঁধ! ফেল ইটপাথর, দেখি পদ্মার জোর কত? দেখি পদ্মার স্রোতের তেজ, তরঙ্গের আঘাত? বাঁধ আরম্ভ হইল। তাহার নাম হইল 'স্পার'। বিলাতী বুদ্ধির আশ্চর্য্য ক্ষমতা, 'স্পার' প্রস্তুত হইল। একটি পাকা রাস্তা গোয়ালন্দের ঘাট হইতে পাকারূপে পদ্মার বুকের উপর চড়িয়া বসিল। স্রোতের গতি ফিরিয়া গেল! শীতকাল, পদ্মা নীরব। যেপ্রকারে ইচ্ছা সেইপ্রকারে বড় বড় বাহাদুরী পুড়িয়া স্পারের মাথা ঠিক রাখা হইল। স্পারের উপর রেললাইন পর্য্যন্ত বসান হইল। আশ্চর্য্য দৃশ্য! নদীর সিকিভাগ পর্য্যন্ত পাকা রাস্তার দক্ষিণ-বামে স্রোতবেগ কমিয়া গিয়া স্পারের মাথা ঘেঁষিয়া স্রোত চলিতে লাগিল। ধন্য বিলাতী বুদ্ধি! স্টেশন, ষ্টিমার-ঘাট, বাজার সকলি রক্ষা হইল। কোম্পানীর আনন্দের সীমা নাই। কালস্রোতে বর্ষাস্রোত আসিয়া উপস্থিত। পদ্মার শ্রী অন্যরূপ। স্রোতের বেগ ঘণ্টায় ঘণ্টায় বৃদ্ধি—ভীষণ কলকল রব চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল। স্পার আর টেঁকে না, প্রায় তিনলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া যে বাঁধ বাঁধা হইয়াছে, তাহাই একেবারে জলে ভাসিয়া যায়, ডুবিয়া যায়, ভাঙ্গিয়া যায় বড়ই লজ্জার কথা। স্পার রক্ষা করাই কোম্পানীর মত হইল। আরও দুইলাখ টাকার বরাদ্দ হইল। যে উপায়ে হয় স্পার রক্ষা করিতেই হইবে। কোম্পানীর ইটপাথর যেখানে যাহা ছিল সমুদায় ট্রেনে আসিয়া স্পারে ঢালিতে লাগিল। কিছুতেই আর টেঁকে না। পদ্মা বিষম বিক্রম প্রকাশ করিয়া ভীষণরবে ছুটিয়াছে। কার সাধ্য বাঁধ বাঁধিয়া আটকায়? বিলাতী ক্ষমতাও কম নহে। দিবারাত্র ইটপাথর ফেলিয়া স্পারের আয়তন বৃদ্ধি করা হইতেছে। যেখানে একটু দমিয়া যাইতেছে, মুহূর্ত মধ্যে ইটপাথর ফেলিয়া পূর্ণ করিয়া দিতেছে। চব্বিশ ঘণ্টা অনবরত লোক খাটিতেছে। কোম্পানীর ইটপাথর যাহা যেখানে ছিল সমুদায় স্পারের কল্যাণে পদ্মার জলে নিক্ষিপ্ত হইল। এখন আর রক্ষার উপায় নাই! ইটপাথরের জোগাড় করিতে পারিলেও-বা আশা ছিল।

টাকার অসাধ্য কি আছে? রেলওয়েলাইনের নিকট পুরাতন বাড়ি, নীলের কুঠি হাউজ, জাঁতঘর যেখানে যাহা ছিল, দ্বিগুণ চতুর্গুণ মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া ভাঙ্গিয়া যতসত্বর সম্ভব হইল পদ্মার বুকে ফেলিয়া স্পারের আয়তন বৃদ্ধি করা হইল। ঈশ্বরের মহিমা বুঝিতে সাধ্য কার! কেনীর বাসগৃহ, কুঠি; ইমারতসমুদায় রেল কোম্পানীর দ্বারা আনীত হইয়া পদ্মাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল, কিন্তু স্পার টিকিল না। স্রোতে কোথায় উড়িয়া গেল তাহা ভাবিয়া নির্দিষ্ট করিতেও ক্ষমতা রহিল না। কেনীর দালানের ইট পর্য্যন্ত জগতের চক্ষে থাকিল না, যে স্পারে প্রায় সাত আট লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, সে স্পারসমেত পদ্মার স্রোতে উড়িয়া গেল।

পথিকের মনের কথার প্রথম স্তর কেনীর প্রসঙ্গ-পরিণাম-ফলের সহিত শেষ হইয়া সমাপ্ত হইল।

—সমাপ্ত—

বসন্তকুমারী নাটক

নাটকোক্ত নর-নারীগণ

পুরুষ

বীরেন্দ্র সিংহ	—	—	ইন্দ্রপুরের রাজা
নরেন্দ্র সিংহ	—	—	রাজপুত্র
বৈশম্পায়ন	—	—	রাজমন্ত্রী
প্রিয়ংবদ	—	—	বিদূষক
শরৎকুমার	—	—	রাজপুত্রের সহচর
বিজয় সিংহ	—	—	ভোজ পুরাধিপতি

স্বয়ম্বরসভায় মিলিত রাজগণ, কঞ্চুকী, প্রতিহারী, নগরপাল,
প্রজাগণ, ভৃত্য প্রভৃতি।

রমণী

রেবতী	—	—	ইন্দ্রপুরের রাণী
বসন্তকুমারী	—	—	ভোজপুরের রাজকন্যা
বিমলা } সরলা }	—	—	প্রতিবেশিনীদ্বয়
মেঘমালা	—	—	বসন্তকুমারীর সহচর
মালতী	—	—	রেবতীর সহচর

বসন্তকুমারী নাটক

প্রস্তাবনা

(নটের প্রবেশ)

নট—(স্বগত) আহা ! কি অপূর্ব্ব সভা ! এ সভাব শোভা নয়নগোচব কোরে আমার অন্তঃরাত্মা যেন সন্তোষ—সাগবে সন্তবণ দিচ্ছে। অদ্য আমার জনম সফল হলো। নয়ন চরিতার্থ হলো। এই ক্ষুদ্রায়তন স্থানে বহুগুণ-সম্পন্ন-গণনীয় মহোদয়গণের আগমনে কি অপূর্ব্ব শোভাই হয়েছে, স্থানটি কি মনোহব রূপই ধারণ কবেছে। চমৎকাব শ্রেণীবদ্ধ দীপমালা যেন অসংখ্য তাবকামালাব ন্যায় শূন্য থেকেই সভাতলস্থ অন্ধকার একেবারে হরণ কবেছে। কিন্তু এক-চন্দ্রের নিকট যখন গগনস্থ অগণনীয় তারকাশ্রেণী দীপ্তি পায় না, তখন দীপমালা যে, এই উপস্থিত মহাত্মাগণের মুখচন্দ্রমাব কাছে মলিনভাব ধাবণ করবে, এতে আব আশ্চর্য্য কি ? তবে প্রেয়সীকে ডেকে দেখি, যদি কিছু উজ্জ্বল কবতে পারি। (নেপথ্যাভিমুখে) প্রিয়ে ! যদি বেশ-বিন্যাস হয়ে থাকে, তবে একবাব এদিকে সভাতল সমুজ্জ্বল কর।

(নটীর প্রবেশ)

নটী নাথ ! আমারে আবার কেন ডাকলেন ?

নট—প্রিয়ে ! দেখদেখি, কেমন চমৎকার সভা হয়েছে. ইন্দ্ররাজেব দেব-সভার শোভাও এ সভার শোভায় পরাজয় হয়েছে। তবে অনর্থক বাকচাতুরীতে সময় নষ্ট নাকোরে কোনপ্রকার আমোদ-প্রমোদ দ্বারা উপস্থিত মহোদয়-গণের চিত্তরঞ্জন কর।

নটী—নাথ ! আপনিও আমোদ-প্রমোদ নিয়েই আছেন। তা যাহোক আমায় কি করতে হবে, আজ্ঞা করুন।

নট—আজকাল ভদ্রসমাজে নাটকের অভিনয়ই প্রধান আমোদ বলে গণ্য হয়েছে। অতএব প্রিয়ে ! তোমায় আজ একটি নূতন নাট্যাভিনয় করতে হবে।

নটী—আজকাল নব্য-সমাজে নাটকের সমাদর হয়েছে বটে, কিন্তু এই সকল বিজ্ঞ-জন-মণ্ডিত-সভায় নাট্যাভিনয় করা সহজ নয়।

নট—তাতে ভয় কি ? গুণীগণ কি মূর্খজনের দোষ গ্রহণ করেন ? তোমার এত

ভয় কি? তুমি একখানা নাটক মনোনীত কর, আমরা অভিনয়ে প্রবৃত্ত হই।

নটী— নাথ! আপনিই মনোনীত করুন। আপনি উপস্থিত থাকতে কি আমি অগ্রে কোন কথা বলতে পারি?

নট—(কিঞ্চিত নিস্তব্ধ থাকিয়া) কিছুদিন হলো শুনছি বসন্তকুমারী নামে একখানি নাটক প্রকাশ হয়েছে, অদ্য তারই অভিনয় করা যাক।

নটী—বসন্তকুমারী! কার রচিত?

নট—কুষ্টিয়া নিবাসী মীর মশার্‌রফ হোসেন রচিত।

নটী—ছি ছি! এমন সভায় মুসলমানের লিখিত নাটকের নাম কললেন।

নট—কেন? মুসলমান বলে কি একেবারে অপদস্ত হলো?

নটী—তা নয়, এই সভায় কি সেই নাটকের অভিনয় ভাল হয়? হাজার হোক মুসলমান!

নট—অমন কথা মুখে আনিও না। ঐ সর্ব্বনেশে কথাতেই ভারতের সর্ব্বনাশ হচ্ছে।

নটী—নাথ! ক্ষমা করবেন। আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। কিন্তু বসন্তকুমারী নাটকের অভিনয় কোরে শেষে মনস্তাপ পাবেন, গঞ্জনার ভাগী হবেন। সভাস্থ মহোদয়গণের মনোরঞ্জন করা দূরে থাক বরং তাঁদের বিরক্তিই হবে।

নট—প্রিয়ে মনোরঞ্জন না করতে পারি, রহস্য তো হবে? সে-ও-এক আমোদ। তুমি আর বিলম্ব করনা। একটি গান গেয়ে অভিনয় আরম্ভ কোরে দাও।

নটী—সে কি নাথ! আমি স্ত্রীলোক, এই সভার মাঝখানে গান গাবো?

নট—তাতে লজ্জা কি?

নটী—আপনি তা বলবেন বটে, কিন্তু, আমি তা পারি না, আমার ভারি লজ্জা।

নট—(হাস্য করিয়া) দেখ প্রিয়ে! এটি তোমাদের স্বভাব। পারো সব, করো সব, কেবল লোকে বললেই লজ্জা জানাও।

নটী—(ঈষৎ হাস্যমুখে লজ্জিতভাবে) আচ্ছা আপনি বলছেন তবে গাই।

গীত

বসন্ত বাহার—আড়া।

ফুটিল বসন্তফুল মোহনকাননে। (সই)

দাহিছে বিরহী-প্রাণ বিচ্ছেদ দহনে ॥
পিক বঁধু শাখী পরে,
কুহকে পঞ্চম স্বরে,
শুনে প্রাণ হু-হু করে,
বিয়োগী মরে জীবনে।
ফুলশরে ফুলবান,
হাসিতেছে পঞ্চবাণ,
ঋতুরাজ বধে প্রাণ,
প্রমোদিত উপবনে।
এ বসন্তে কান্তাহারা,
আঁখি ঝরে তারা কারা,
কোথারে নয়নতারা,
সতত বলে বদনে ॥

নট—বেশ! বেশ! প্রিয়ে তোমার স্থকণ্ঠ বিনির্গত তান-লয় যুক্ত সঙ্গীত শ্রবণে বোধহয়, সকলেই মোহিত হয়েছেন। (নেপথ্যে সভাভঙ্গ বাদ্য)

প্রিয়ে—শুনছ! রাজা বীরেন্দ্র সিংহের সভাভঙ্গ হলো। চল আমরা যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম রঙ্গভূমি

(ইন্দ্রপুর; রাজা বীরেন্দ্র সিংহের বহিস্থ শয়ন মন্দির—রাজা আসীন)

রাজা—(স্বগত) মনটা বড়ই চঞ্চল হয়েছে, কিছুই ভাল লাগছেনা, মন্ত্রীই বা এখনো কেন আসছেন না, প্রতিহারীও তো অনেকক্ষণ গিয়েছে। (চতুর্দিকে অবলোকন করিয়া নিকটস্থ পালঙ্কে শয়ন ও বিবিধ চিন্তা) (প্রিয়ংবদের প্রবেশ)

প্রিয়—(গ্রীবাউন্নত করিয়া মহারাজের আপাদ-মস্তক দৃষ্টি এবং স্বগত) মহারাজ তো ঘুমিয়েছেন, এই অবসরে রাজ-বিছানায় বসে মনের সাধটা মিটিয়ে নিই। অহংকারের সহিত উপবেশন) বা! বা! কি নরম! বালিসে

ঠেক দিলে, মন আর কিছুই চায় না; কি সুখ! (দক্ষিণ-বামে ফিরিয়া) উহু কি মজা! সাধে কি বড়লোকে বালিস নিয়ে গড়াগড়ি যায়। রাজ-তক্তে বসিলে মনের গতিও ফিরে যায়। এখন দেই হুকুম। মারি গর্দ্দান! না না এই সোনার নলে টান দিয়ে বরাদ্দটা বুঝি ডাবা, ফরসী, গুড়-গুড়ি, সেতো আছেই এর ভিতরের মারপেঁচটা কি? মরি আর বাঁচি, সোনার হুঁকোয় একটান দিবই দিব। (নল হাতে করিয়া টানিতেই)।

রাজা—বয়স্য! ও কি কর?

প্রিয়—(চমকিত হইয়া বিছানা ছাড়িয়া গড়াইয়া দূরে যাইয়া যোড়হাতে) না মহারাজ! বিছানায় কেমন সোনারূপার কাজ, তাই দেখছিলুম।

রাজা—ওহে! আজকাল চলছে কেমন?

প্রিয়—(একটু সরিয়া গিয়া) চলবে কি? বলব কি? মহারাজ! করব কি? যে তাই। সেই ফাঁক-ফাঁক। তবে আপনি যদি পুনরায় বিবাহ করতেন, তাহলে একরকম,—জানতেই পাচ্ছেন, আপনি তো আর সে নামটিও করবেন না। দেখুন, কেমন সুখ। এই তো, বিছানায় একা শুয়ে কেবল মনে মনে সাত সাগরের ঢেউ গুণছেন। আমার যদি ক্ষমতা থাকতো, তবে দেখতেন, শর্ম্মারাম কখনো গৃহশূন্য হতো না—কখনই হতেন না—মুহূর্তকালের জন্যও ঘরখালি থাকতো না। এক যেতে আর এক আসতো। মহারাজ! যে ঘরে স্ত্রীলোক নাই, সে ঘরে লক্ষ্মী নাই: সে ঘর নরক বললেও হয়, শ্মশান বললেও হয়। (পশ্চাৎ দৃষ্টিপাত করিয়া) মহারাজ! চললেম, আর বসা হলো না।

রাজা—কেন? এত ব্যস্ত কেন? কথা শেষ হলোনা যে?

প্রিয়—(গাত্রোত্থান করিয়া বিরক্তিভাবে) আর থাকতে পাল্লেতো শেষ হবে? ঐ দেখুন, ও বেটার মুখ দেখলেই আমার প্রাণ উড়ে যায়। যাই মহারাজ!

(বেগে প্রস্থান)

(মন্ত্রী বৈশম্পায়ন এবং প্রতিহারীর প্রবেশ ও অভিবাদন)

বৈশ—(করযোড়ে দণ্ডায়মান)

রাজা—মন্ত্রীবর! রাজ্যের সমস্ত কুশল তো?

বৈশ—মহারাজ! সর্ব্বাংশেই মঙ্গল। জয়পুর অধিপতি বৃথাগর্ব্বে গর্ব্বিত হয়ে যে

মস্তক-উত্তোলন করেছিলেন, তিনিও এক্ষণে যোড়করে কর প্রদানে বাধ্য হয়েছেন। অন্য রাজারা বিনাযুদ্ধে অধীনতা স্বীকার করেছেন। প্রজারাও মহাসুখে আছে। মহামারি, জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ এ সকল নামও শুনা যায় না। সুবৃষ্টি হওয়ায় শস্যও অপর্য্যাপ্ত জন্মেছে, প্রজাদের পরস্পর দ্বেষ, হিংসা-বিবাদ, বিসম্বাদ কিছুই নাই, দস্যুদল আর হিংস্র জন্তুগণ রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, প্রজাগণ এখন নিশাকালেও নির্ভয়ে বিমুক্তদ্বারে সুখে নিদ্রা যাচ্ছে; কোন বিষয়েই রাজ্যের বিশৃঙ্খলতা নাই।

রাজা—রাজ্যের শুভ-সমাচার শুনে বড়ই সন্তুষ্ট হলেম। মন্ত্রীবর! আমি মনে মনে একটি সঙ্কল্প করেছি, এতে আপনার কি অভিপ্রায় দেখুন, আমার তো এই শেষ দশা, ভগবান কোনসময় কি ঘটান কে বলতে পারে? রাণীর লোকান্তর হওয়াবধি সর্ব্বদাই দুঃখিত মনে কাল কাটাচ্ছি, বলতে কি তিলার্দ্ধকালের জন্যও আমি সুখী নই। বল, বীর্য্য, সাহস অনেক লাঘব হয়েছে, দিন দিন যেন ক্ষীণ ও বলহীন হয়ে আসছি। কুমার নরেন্দ্র এক্ষণে পূর্ণ বয়স্ক, বিদ্যাবুদ্ধিতেও বিশারদ হয়েছেন। আমার ইচ্ছা যে তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্তকরে আমি রাজকার্য্য থেকে একেবারে অবসর লই এতে আপনার মত কি?

মন্ত্রী—(যোড় করে) মহারাজ! এ অতি সৎপরামর্শ! যুবরাজ নরেন্দ্রকুমার যেমন শান্ত প্রকৃতি তেমনি দয়ার্দ্রচিত্ত, বিদ্যাবুদ্ধিতেও বিচক্ষণ, বল-বীর্য্য, সাহস, পরাক্রমেও অদ্বিতীয়, স্বধর্ম্মেও অচলা ভক্তি। তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হন, এটি আমার একান্ত মত। প্রজারাও তাতে সুখী হবে। যুবরাজ প্রজারঞ্জন করে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করবেন, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু, যৌবনকাল অতি ভয়ানক কাল। আমি মনেও করি না যে, দুর্জ্জয় রিপুদল তাঁকে পরাজয় করবে, তবু কি জানি এই বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে চাটুকারদলের কুমন্ত্রণায় কোন অসঙ্গত-কার্য্যে প্রবৃত্ত হলে পরিণামে কলঙ্কের ভাজন হতে পারেন, তখন আপনিও অনুতাপ করবেন, তিনিও দুর্নামের ভাগী হবেন। আমি জানি, বটে, অন্য অন্য কার্য্যে চাটুকারদল তাঁর সৎ-প্রবৃত্তিকে কোনমতেই অসৎ—পথের অনুবর্ত্তী করতে পারবে না, কিন্তু, ভূপতিগণের—ভূপতিগণের কেন,

মনুষ্য মাত্রেরই প্রধান শত্রু কামরিপু। ঐ ভয়ানক শত্রুর দ্বারা জগতে কেন, সুরলোকেও কত কত কাণ্ড সংঘটন হযেছে। দেখুন, সে ভয়ানক শত্রুদমনে অক্ষম হয়ে সুরপতি ইন্দ্র গুরুপত্নী হরণ করে কেমন দুর্দ্দশায় পতিত হয়েছিলেন।—কেবল এই অদমনীয রিপুর ছলনায় লঙ্কাধিপতি দশানন সবংশে বিনাশ হয়েছেন। এ সকল তো মহারাজের অবিদিত নাই।

রাজা—আপনি কি বিবেচনা করেন?

বৈশ—মহারাজ! অগ্রে যুবরাজকে উপযুক্ত পাত্রীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করুন, শেষে রাজ্যাভিষিক্ত করবেন।

রাজা—উত্তম যুক্তি বটে। অগ্রে বিবাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য। কুমার এক্ষণে কোথায়?

বৈশ—দ্রাবিড় থেকে যে বিচক্ষণ পণ্ডিত রাজধানীতে আগমন করেছেন, তারই সঙ্গে শাস্ত্রের তর্ক-বিতর্ক করছেন; দেখে এসেছি। (যুবরাজের প্রবেশ)

নরেন্দ্র—(প্রণাম করিযা যোড়করে) পিতঃ! আজ আমার মৃগয়ায় যেতে বাসনা হয়েছে,—অনুমতি হলে মন্দুরা থেকে অশ্ব আর জনকতক পদাতিক সৈন্য-লয়ে মৃগয়ায় গমন করি।

রাজা—বৎস! তুমি মৃগয়ায় যাবে মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, সৈন্যসামন্ত অস্ত্রশস্ত্র যা ইচ্ছা লয়ে যাও, এতে আমার আদেশের অপেক্ষা কি? (যুবরাজ প্রণাম করিয়া প্রস্থান)

মন্ত্রী—মহারাজ! তবে রাজকুমারের বিবাহের নিমিত্ত পাত্রী অন্বেষণে ভাট পাঠানো কর্তব্য।

রাজা—তা তো পাঠাবেই। আর আজ থেকে বিবাহের আয়াজনও কর। (রাজা মন্ত্রী এবং তৎপশ্চাৎ প্রতিহারীব প্রস্থান)

দ্বিতীয় রঙ্গভূমি

পুষ্পোদ্যান

(রাজা ও প্রিয়ংবদের প্রবেশ)

প্রিয়—মহারাজ আপনি যে শত শত টাকা ব্যয় করে এই সকল ফুলগাছ ভিন্ন-দেশ থেকে এনে নন্দনকাননের চেয়েও সাজিয়েছেন, এতে লাভ কি?

রাজা—এতে কি লাভ, তা তুমি বুঝবে কি? মনোরম পুষ্পে নয়নের প্রীতি-সাধন,

চিত্তের সন্তোষ-সাধন, আর সুবাসে হৃদয়ে আনন্দ জন্মে। এর চেয়ে লাভ আর কি আছে?

প্রিয়—(পদচারণ করিতে করিতে মাথা নাড়িয়া) মহারাজ! ও কথা শুনলেম না, ও কোন কথাই নয়। ও শুনবার যোগ্য কথা নয়। ফুল দেখলে মন খুসী হয় এও কি একটি কথা! কোথায় ফুল আর কোথায় মন! সম্বন্ধও ভারি। কি মজার কথা, ছোব না, দেখেই খুসী এমন মনকে আর কি বলবো, মহারাজ! মহারাজ! পেটভরে আহারটি না করলে হাজার শোঁক হাজার দেখো, কিছুতেই মন খুসী নন। (উদরে হাত দিয়া) দেখুন, এই উদর এই অর্থভাণ্ডার, ইনি পূর্ণ থাকলে ফুল না শুঁকলেও মন খুসী হয়, চক্ষুর প্রীতি—জন্মে তবে রাজারাজড়ার মন কেমন বলতে পারি না। তা যাই বলুন মহারাজ! ও সকল ফলগাছের চেয়ে আম, কাঁঠাল, নারিকেল, জাম, জামরুল, পিচ, লিচু আর সাককচুর গাছ হলে, বড় আনন্দের বিষয় হত। আহা! যদি এই সকল গাছই থাকতো তাহলে কি শর্মারাম কক্ষপেটে খালিহাতে ফিরে যান? (দীর্ঘ নিশ্বাস)।

রাজা—ওহে সে সকল গাছও তো আছে।

প্রিয়—আছে তো বটে, কিন্তু কাজে পাই কই এ বাগানে যেমন প্রত্যহই সন্ধ্যার সময় এসে পড়েন, সেও তো আপনারই বাগান, কই জন্মাবচ্ছিন্নে তো এক-দিনও পদার্পণ করতে দেখলুম না। তা সেখানে যাবেন কেন, ফুলগাছই যে আপনারে খেয়েছে।

রাজা—বয়স্য! দেখ দেখি, এই বসন্তকালে উদ্যানস্থ সরোবরে কমলমালা কেমন ভঙ্গিতে প্রস্ফুটিত হয়ে নয়নের প্রীতি সাধন করছে। পুষ্পের মধুগন্ধে উদ্যান কেমন আমোদিত হয়েছে। (নিকটস্থ শিমুল বৃক্ষ হইতে কোকিলের স্বর)

প্রিয়—(চমকিত) ও কি ডাকে? মহারাজ! ও কি?—

রাজা—(ঈষৎ হাস্য করিয়া) আরে ভয় কি? ও যে কোকিল। বসন্তকালের কোকিলের ডাক শুন নাই?

প্রিয়—(নিতান্ত আগ্রহে) মহারাজ! অনুগ্রহ করে যে গাছে ডাকছে, সেই গাছটি আর পাখিটি আমায় চিনিয়ে দিন।

রাজা—(অঙ্গুলির দ্বারা দর্শান) ঐ দেখ, শিমুলবৃক্ষ দেখেছ, যার পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হয়ে লোহিতবর্ণ সূর্য্যকেও লজ্জা দিচ্ছে ; সেই বৃক্ষের দক্ষিণ-শাখায় বসে পাখিটি ডাকছে। দেখেছ ?

প্রিয়—(আনন্দে রাজাকে জড়াইয়া ধরিয়া)—দেখেচি দেখেচি, ও তো দেশী-কাক মহারাজ !

রাজা—(ঈষৎ হাস্য করিয়া) কাকই বটে ! তোমাকে সাক্ষাৎ বাচস্পতি বললেই হয়। যাহোক ফলফুলে সমস্ত বৃক্ষ কেমন মানিয়েছে। বসন্তকালটি কি মনোহর !

প্রিয়—মহারাজ। এইসব দেখে আমারও মন যেন খুসী হলো। আমি আর থাকতে পারি না অনুমতি করেন তো একটা গান গাই।

রাজা—আচ্ছা। তাতে আর আপত্তি কি ?

প্রিয়—(গানারম্ভ)

রাগিনী জংলা—তালজৎ

কোথায় রহিল আমার যতনের ধনরে।

যার লাগি ঘর ছাড়ি—

যার লাগি ঘর ছাড়ি—

তারে নারে নারে রে !

মনে হলো না। পেটে কিছু নাই ছাই মনে হবে কি ?

—সে যতনের ধনরে।

যার লাগি ঘর ছাড়ি,—

রাজা—হে নটবর ! ব্যাপার কি ?

প্রিয়—কই কিছুই নয়।—

যার লাগি ঘর ছাড়ি কোথায় না যাইরে।

হেরিয়ে কুসুমবন, মন হল উচাটন,

কোকিলের স্বরে প্রাণ, আর—

মহারাজ ! অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উদর খালি রয়েছেন, এতে কি আর গান মনে হয়, ক্ষুধা হলে কথা আড়িয়ে যায় তার আবার গান—

রাজা—না—না বেশ হয়েছে। অতি উত্তম হয়েছে। চমৎকার গেয়েছ।

প্রিয়—আমিও ভালই গেয়েছি। আপনি এর অর্থ বুঝেছেন ?

রাজা—বুঝবো না কেন ?

প্রিয়—না, আপনি কখনই বুঝতে পাবেন নি, যদি এর অর্থ বুঝতেন তাহলে কি আর এই সুখসময়ে স্ত্রী-বিহীন হয়ে একা থাকতেন ? আমি বৎসরাবধি বলছি যে, মহারাজ বিয়ে করুন—বিয়ে করুন। আপনিও সুখী হবেন, শর্ম্মাও পেটটি পুরে আহারটি করবেন !

রাজা—তুমি পাগল হয়েছ। আমাব কি আর বিবাহের সময় আছে। নরেন্দ্র পূর্ণ-বয়স্ক হয়েছেন, তারই বিবাহ দিতে মনস্থ করেছি। এতেই তো তোমার আহারেব যোগাড় হচ্ছে।

প্রিয়—সে তো গড়ানই রয়েছে। ছেলে থাকলেই বিয়ে দিতে হয়। দশজনার আশীর্ব্বাদও লইতে হয়। আপনি বিয়ে কললে ছাই মনেও হয় না। একেবারে ছক্কাপাঞ্জা মেরে নিতুম। রাজ বিয়ে খেতে খেতেই যুবরাজের বিয়েব পালা আসতো।

রাজা—না হে ! আব বিবাহ করতে বাসনা নাই। এ বয়সে বিবাহ কবলে দেশ-শুদ্ধ লোকে আমায় নিন্দা কববে।

প্রিয়—ফেলে রাখুন নিন্দে কার নিন্দা কাব কাছে। আপনি বাঁচলে—বাপমায়ের নাম—লোকেব নিন্দায় কি হয়। নিন্দুকেব মুখ বন্ধ করতে কতক্ষণ লাগে। আজকাল যথার্থবাদী উচিত বক্তা কে আছে মহারাজ ? যিনি একটু মাথা তুলবেন, রাজবিধি খাটাতে হবেনা, শাসনদণ্ডেব সাহায্য লইতে হবে না। সেই খেউ খেউ, হেউ হেউ ববের সঙ্গে সঙ্গে কিছু বসাল গোচের (দক্ষিণ চক্ষু বুজিয়া) ফেলে দিলেই মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। সে ভার এ-শর্ম্মার।

রাজা—তাতো মানলেম। বয়সের কি ? এ বয়েসে কি আব বিবাহ সাজে ?

প্রিয়—সে কি মহারাজ ? বলেন কি ? কিসের বয়েস ! আপনার চুল পেকেছে ? কই ? আমি তো একটিও পাকা দেখতে পাই না। একটিও তো কাল হয় নাই। যেমন সাদা, তেমনি ধব ধব করছে। তবে আপনি বিয়ে করবেন না কেন ? কিসেব বয়েস ? আপনার যে বয়েস এর চেয়ে কত অধিক বয়েসে কতশত লোক বিয়ে করে বংশরক্ষা করছে। সামান্য কথায় বলে থাকে যে, স্ত্রীমলে ঘরশূন্য হয। আপনার কোটাঘর বলে কি আর শূন্য

হবে না? আমি যোড়হাতে বলছি মহারাজ বিয়ে করুন। আপনিও সুখী হবেন, গরীব বামুনের ছেলেও পেটভরে খেতে পাবে।

রাজা—(কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) ওহে, মনে কর যেন আমার বিবাহ করতে ইচ্ছাই হলো, উপযুক্ত পাত্রী কোথা পাবো?

প্রিয়—মহারাজ কি কথাই বললেন, হাসী রাখবার স্থান আর নাই। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে না থাকলে বুদ্ধির স্থির থাকে না। মহারাজ যত্ন করলে কিনা হয়? যত্ন করে লোকে সাগর থেকেও মণিমুক্তা তোলে, আর একটা মেয়ে পাওয়া যাবে না? এতো তুচ্ছ-কথা। আর মহারাজ! চিরকালটা রাজা-রাজড়ার সহবাসেই কাটালেম, আগাগোড়া বেঁধে বড়লোকের কাছে কথা বলতে হয়, তা আমি বেশ জানি। শর্ম্মা কি তার যোগাড় না করে প্রকাশ করেছেন?

রাজা—কি রকম যোগাড়?

প্রিয়—মহারাজ! অভাব কি? আপনার যে রাণী মরে গেছেন অবিকল সেই রকম মেয়ে পাওয়া গেছে বরং তার চেয়ে সরস বই নিরস হবে না।

রাজা—তবু কোথায়?

প্রিয়—মহারাজ! মনে পড়ে? সেই আপনি একদিন নগর ভ্রমণে আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন, স্মরণ হয়? আমি কত-কৌশলে আপনারে দেখিয়েছিলুম। আপনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্থিরভাবে দেখতে দেখতে বললেন, এই কমলটি প্রস্ফুটিত হযে যে মহাত্মার হস্তে পড়বে, তিনিই জগত সুখী, তারই জীবন সার্থক। মনে পড়ে?—ঐ যে—

রাজা—হাঁ হাঁ মনে হয়েছে। সে কি রকমে হবে?

প্রিয়—হা! হা! কি রকমে হবে এই বুদ্ধিটুকু এখন রাজ-রাজেশ্বরের মাথায় নাই। হায়রে গৃহলক্ষ্মী, মহারাজ! আপনি অনুমতি কললে আবার হবে না, অধীনে থেকে তার এত ক্ষমতা যে মহারাজের সঙ্গে বিয়ে দেবে না?

রাজা—মহারাজ হলে কি হবে? তার বয়স অতি অল্প, তার মা, বাপ স্বীকার হবে কেন?

প্রিয়—মহারাজ বুঝেছি। আর বলতে হবে না, মাতৃ-পিতৃ-বিয়োগে আজীবন দুর্দশা—রাজ-মস্তক স্ত্রী-বিয়োগ ভারে অবনত। বুদ্ধির বিপর্য্যয়। হায়রে

লক্ষ্মী। হায়রে গৃহলক্ষ্মী! গৃহভূষণ। কি পরিতাপ, কি পরিতাপ, রাজা বীরেন্দ্র সিংহের মতিভ্রম মহারাজ। আপনার সঙ্গে বিয়ে দেবে না বলেন কি? প্রস্তাব মাত্র সম্মত। যদি না হয় তবে এ গলার এ সাদাস্বত আর গলায় রাখবো না ছিঁড়ে অগ্নিদেবে উপহার দিয়া যা ইচ্ছা তাই করবো।

রাজা—তবে তুমিই কেন ঘটকালি কর না? ঘটকালি পাবে।

প্রিয়—(হাস্য মুখে) মহারাজ। আমি কিছুই চাই না। আমি আপনার (পেটে হাত দিয়া) এই হলেই হয়।

রাজা—আচ্ছা তাই হবে।

প্রিয়—তবে শম্মা বায় চল্লেন। প্রস্থান।

রাজা—(স্বগত) যুবরাজের বিবাহের আয়োজন হচ্ছে। এ দিকে প্রিয়ংবদও আয়োজনে প্রবৃত্ত হল। কি কবি প্রিয়ংবদ কৃতকার্য্যই হয়; তবে বিশেষ গোপনে এ কার্য্য সম্পন্ন করা চাই এ বয়সে আর লোক জানাজানি করে আবশ্যক নাই। যুবরাজের বিবাহের আয়োজন হতে হতে যদি এ দিকে ঘটে যায়, তাতেই বা এমন ক্ষতি কি? দেখি কোথাকার জল কোথায় গড়ায়, কার মেয়ে তার জীবনের ভার হয়েছে যে দেখে শুনে আমার সঙ্গে বিয়ে দেবে। কপালে কি আছে বলা যায় না। (প্রস্থান)

তৃতীয় রঙ্গভূমি

(ভোজপুর; বসন্তকুমারীর—বাসগৃহ)

বসন্তকুমারী—(শয্যা হইতে উঠিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে) হায়! কোথা গেল? এত কথা, এত ভালবাসা, এত প্রেম, শেষে সকলি ফাঁকি। শুধু ফাঁকি নয় --প্রাণ মারিয়া ফাঁকি! কি নিষ্ঠুর। কি নিষ্ঠুর। না—না তাই বা বলি কিসে? ধর্ম্ম সাক্ষী করে কণ্ঠহার বদল হয়েছে, (হারের প্রতি চাহিয়া) একি? কি সর্ব্বনাশ! এ কার হার? এ হার কার? এ যে আমারই হার। কথা কি? হায়! হায়! এর অর্থ কি? না না আমি দেখলাম কি? একি স্বপ্ন? না না তাই বা কি করে হয়। আমি স্বহস্তে তাঁর গলায় হার পরাইয়াছি। তিনি ও তাঁর গলার হার খুলে আমার গলায় পরিয়েছেন। সে হার কই? এ যে আমারই হার। (কণ্ঠ হইতে হার খুলিয়া) এই যে

আমারই হার আমার গলায় এ হার কেন ? তবে কি যথার্থ ই স্বপ্ন না চিত্ত-বিকার। অসম্ভব! সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমি তখন নিদ্রিত ছিলাম না। আমার চক্ষুও বন্ধ ছিল না। আমি স্পষ্ট দেখেছি, কথা বলেছি, কথা শুনেছি; কাছে বসেছি. স্বপ্নে কি এত কথা হয়, এত ভালবাসা জন্মে, আর এত ভাল দেখায়। হা! নাথ! কোথা গেলে?

(বসন্তকুমারীর পশ্চাদদিকের দ্বার দিয়া মালার প্রবেশ এবং নিঃশব্দে দণ্ডায়মান)

হায় হায়! এত কথা সকলি মিছে হলো। সত্য সত্যই কি স্বপ্ন? (কণ্ঠ-হার দূরে নিক্ষেপ) এ হার আর গলায় পরবো না, না তা হবে না, হার আমার যতনের, এ হার আমার আদরের, যে পবিত্র গলায় উঠেছিল, স্পর্শ-গুণে হারও পবিত্র হয়েছে, এ হার আজীবন আদরে গলায় রাখব। (হার আনিয়া পুনরায় কণ্ঠে ধারণ এবং পূর্ব্ববৎ উপবেশন) আমার একি হলো! আর সহ্য হয় না। কেন হৃদয়ে আঘাত লাগে? কেন প্রাণ কাঁদিয়া উঠে! একি জ্বালা! হায়! হায়! কেন চক্ষু—(অধোবদনে চিন্তা এবং মেঘমালা অতি সাবধানে বসন্তকুমারীর পশ্চাদ হইতে যাইয়া দুই হস্তে চক্ষু আবরণ)

বসন্ত—(চমকিত ভাবে) আর কেন জ্বালাও দু-খানি পায় ধরি, অবলা বালা, অন্তরে আর আঘাত দিও না! —নাথ! আমি বালিকা এ চাতুরীর মর্ম্ম কি বুঝবো। (মেঘমালা বসন্তকুমারীর চক্ষু ছাড়িয়া সম্মুখে আগমন বসন্তকুমারীর—রোষ, ক্রোধ, অভিমান, দুঃখ-লজ্জায় অধোবদনে চিন্তা)

মেঘমালা—(নিকটে বসিয়া)

ও সখি কেন কেন অধোবদনে।
কি কথা হল কারই সনে॥
ছল ছল দুটি আঁখি,
ভাবিছ কি বিধুমুখী,
বল, বল, প্রাণসখী।
কি আছে মনে॥

(চিবুক ধরিয়া) ও সখি! কেন অধোবদনে, কি হয়েছে? সই! তোমার দু-খানি পায় ধরি, বল কি হয়েছে। (পায়ে ধরিতে উদ্যত)

বসন্ত—আমার কিছু হয় নাই; আমি তোমার পায় ধরি, তুমি আমার মাথা

যাও, আমাকে বিরক্ত করো না।

মেঘ—কি বিরক্ত করলুম ভাই ? বিরক্তের মধ্যে একটি সামান্য গান গেয়েছি। আর এই কাছে বসে জিজ্ঞাসা করছি কি হয়েছে ? এতেই কি বিরক্ত করা হলো ?

বসন্ত—(বিরক্তির সহিত) আমি তোমার গান শুনতে ইচ্ছা করি না। কথা শুনতে ভালবাসি না। তোমার পায় ধরি তুমি আমাকে ক্ষমা কর—রক্ষা কর।

(পুর-রক্ষিণীর প্রবেশ এবং রাজকুমারীকে অভিবাদন করিয়া যোড়করে)

পুররক্ষিণী—মহারাজ আপনাকে দেখতে আসছেন।

বসন্ত—আসছেন ভালই। (রাজা বিজয় সিংহের প্রবেশ ও পুর-রক্ষিণীর প্রস্থান। বসন্তকুমারী, মেঘমালা উভয়ে শশব্যস্তে উঠিয়া রাজচরণ বন্দন এবং নত-শিরে দণ্ডায়মান)

রাজা—(বসন্তকুমারীর প্রতি) মা ! আমি তোমার দাসীর মুখে শুনলেম, কি অসুখ হয়েছে মা ?

বসন্ত—(মৃদুস্বরে) আমার কোন অসুখ হয় নাই।

মেঘমালা—(নম্রভাবে) অসুখ হয় নাই কি কথা ? যা কখনও দেখি নাই তাই দেখছি, একি অসুখ নয় ?

রাজা—(মেঘমালার প্রতি চাহিয়া) মা কি দেখেছ ? অসুখের কি লক্ষণ দেখলে মা ?

মেঘমালা—আপনি শরীর, মুখের ভাব, কথার আভাষ, চক্ষের চাউনি দেখে কি বুঝতে পাচ্ছেন না। আমার কথায় বিরক্ত, আমাকে মনের বলি ? একি দেখতে অনিচ্ছা—ইহাতে কি বলি ? একি মনের বিকার নয় ? একি অসুখের লক্ষণ নয় ? বিপদের আশঙ্কা নয় ?

রাজা—(বসন্তকুমারীর আপাদ-মস্তক দৃষ্টি করিয়া স্নেহ-সহকারে বলিলেন) মা তুমি আমার সর্ব্বস্ব ভোজপুর রাজ-বংশে তুমিই একমাত্র মণি, মা ! যথার্থ কথা বলো তোমার কি অসুখ হয়েছে ?

বসন্ত—(মহারাজের পায় ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে) পিতঃ। আমার কোন অসুখ হয় নাই।

রাজা—কোন অসুখ হয় নাই, তবে একি মা? তোমার চক্ষে জল কেন? তোমার মুখ মলিন কেন? তোমার সেই একপ্রকার চঞ্চল ভাব, অস্থির-মন কেন মা? তোমার অভাব কি? তুমি আমার একমাত্র কন্যা, এ-রাজ্য, ধন, সকলি তোমার। তোমার মনে কোন দুঃখের কারণ না হইলে চক্ষে জল আসবে কেন মা! আমার যে একটু সন্দেহ ছিল তা মেঘমালার কথায় আর নাই। মা! তোমার মনের কথা বলো। কোন দাসী কি অন্য কেহ তোমাকে কিছু বলে থাকে, কি তোমার অবাধ্য হয়ে থাকে, তোমাকে অবজ্ঞা করে থাকে, বল। এখনই তার সমুচিত শাস্তি বিধান করছি।

বসন্ত—(কান্দিতে কান্দিতে) পিতঃ! আমার কোন অসুখ হয় নাই। আমাকে কেউ কোন কথা বলে নাই। কোন কথায় অবজ্ঞা করে নাই। আমার মনেও কোন কষ্ট হয় নাই। (ক্রন্দন)।

রাজা—মা! বৃদ্ধ বয়সে আর আমার অন্তরে ব্যথা দিও না। মা! তুমি তোমার মনের কথা স্পষ্টভাবে বল। যে প্রকার অসুখই হয়ে থাকে গোপন করো না। মা! আমি তোমার পিতা. আমার কাছে মিথ্যা বলিলে মহাপাপ। তুমি অবোধ নও, মনের কথা বল। বৈদ্য, গণক, রাজপুরীতে সকলি উপস্থিত আছেন। কোনপ্রকার লোকের অভাব নাই এই মুহূর্তেই তাহাদিগকে আনিয়ে তোমার চিকিৎসায় নিযুক্ত করিতেছি।

বসন্ত—পিতঃ! আমার কোন পীড়া হয় নাই। বৈদ্য, চিকিৎসক, গণকের কোন আবশ্যক নাই। আমার কোনপ্রকার ঔষধের প্রয়োজন নাই। আমি— (ক্রন্দন)

রাজা—(সজল নয়নে) হা! এ পুরীর আর মঙ্গল নাই। রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে সকলি চলিয়া গিয়াছে; (মেঘমালাকে সঙ্কেতে ডাকিয়া মৃদু মৃদু স্বরে) বসন্তের হাবভাব দেখে আমার বড়ই সন্দেহ হচ্ছে, উন্মাদের পূর্ব্ব-লক্ষণ।

মেঘ—আমি ভেবে কিছুই স্থির করতে পাচ্ছিনা।

রাজা—মা তুমি বসন্তের কাছ ছাড়া হয়োনা। আমি মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করে বৈদ্য, জ্যোতির্ব্বিদ, রোজা সংগ্রহ করে এখনি আসছি। সাবধান বসন্তের কাছছাড়া হয়োনা। মা! আমার বসন্তের কেউ নাই। (রাজার প্রস্থান)

মেঘ—সই! সেধে সেধে গান শুনেছ। কত মাথার কিরে দিয়ে কথা বলি-

য়েছ। আজ আমি মিনতি করে তোমায় শুনাতে চাচ্ছি তুমি শুনবে না! একি কথা? আর সখী! আমি তোমার বাল্যকালের সখী, আমার কাছে এত গোপন কেন? কি হয়েছে?—কার জন্যে এত,—

বসন্ত—দেখ ভাই! আমার মন ভাল নাই তুমি আমায় ক্ষমা করো। কোন-কথা আমার ভাল বোধ হচ্ছে না।

মেঘ—আর একটি গান করছি।—

বসন্ত—না সখী! আমি বিনয় করে বলছি। তোমার গানে আমার মন আরো—

(হাসিতে হাসিতে বসন্তকুমারীর দাসীর প্রবেশ)

মেঘ—ওলো! তোর আবার কি হলো! এত হাসি কেন? হতভাগিনী স্থির হয়ে কথা বল, কথা নাই বার্ত্তা নাই শুধুই হাসি। কথাটি কি।

দাসী—(পুনরায় হাসি)

মেঘ—(দাসীর হাত ধরিয়া) খেপি! আবার হাসবি তো মার খাবি। রাজ-কুমারীর অসুখ, তোর হাসি ধবে না।

দাসী—(হাসিতে হাসিতে) ঐ অসুখের জন্যই তো গণকঠাকুর গণে বলেছে। রাজদরবারে কি কমলোক জুটেছে? রাজা অস্থির হয়ে গিয়েছিলেন, মন্ত্রীর মুখে কথা ছিল না। এখন সকলেই হাসিখুসিতে আছেন।

মেঘ—আরে! ভেঙ্গে বলনা আমিও একটু সুস্থির হই। সখীকেও সুস্থির করি।

দাসী—(হাসিতে হাসিতে) না না আমি বলতে পারবো না।

মেঘ—(কৃত্রিম-রোষে) তোকে বলতেই হবে। বলবি না?

দাসী—কিন্তু কানে কানে অথচ একটু সরে গিয়ে।

(মেঘমালার কানে প্রকাশ এবং হাসিতে হাসিতে বেগে প্রস্থান)

মেঘ—সখী! জ্যোতিষ-শাস্ত্র বড় কঠিন! কোনকথা গোপন রাখবার ক্ষমতা নাই। সাতপুরু চর্ম্ম-মাংস-অস্থির মাঝের কথা জ্যোতিষে প্রকাশ করে। ধরা পড়েছো, আর বলব কি? মনের কথা আমাকে বললে না। এখন রাজসভায় কথা ভাঙ্গচুর হচ্ছে।

বসন্ত—(মৃদুস্বরে) কি কথা সখী? কি কথার ভাঙ্গচুর হচ্ছে বল!

মেঘ—তুমি বললে না! আমি বলব কেন?

বসন্ত—তখনও পায়ে ধরেছি, এখনও পায় ধরছি বল ?

মেঘ—তুমি আমার সখী! প্রাণের সখী বলছি। ভেঙ্গেচুরে বলছি কিন্তু একটু বিলম্বে।

বসন্ত—না—না বিলম্ব সহ্য হয় না—এখনি বল !

মেঘ—আর কি "ফুল ফুটিল" !

বসন্ত—ও কি কথা ? যাও ! আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না। কিসের ফুল ফুটিল ?

মেঘ—যে ফুল কুঁড়ি ছিল তাই ফোটা-ফোটা হয়েছে শীঘ্রই ফুটবে চিন্তা নাই ; ও দিকে আয়োজনের আদেশ হয়েছে।

বসন্ত—তুমি যা ইচ্ছা বলে যাও আমি শুনব না।

মেঘ—আর বাকি রাখলে কি ? আচ্ছা আমি চললেম। (যাইতেই বসন্তকুমারী মেঘমালার বস্ত্র ধারণ আর সর্বাধিক কেন গণকে গুণে বলেছে স্বয়ম্বর সভার ঘোষণা দেওয়া সাব্যস্ত হয়েছে এখনও মন ভাল হয় নি—(মেঘমালা যাইতে উদ্যত বসন্তকুমারী মেঘমালার বস্ত্র ধরিয়া উভয়ে প্রস্থান)

পটক্ষেপণ

চতুর্থ রঙ্গভূমি

প্রথমধ্যা

(জল-কলস কক্ষে সরমা এবং অন্যদিক হইতে বিমলার প্রবেশ)

সরমা—দিদি ! ভাল আছিস তো ? আজ যে ভারি ফিটফাট ! সেজেগুজে কোথা গিয়েছিলে ? আবার কি দিন ফিরেছে ?

বিমলা—(হাস্যমুখে) তুই যে অবাক কললি। দিনকাল নেই বলে কি সাধ নাই ? দাঁত পড়ে, চুল পাকে কত লোকের, প্রাণ যেমন, তেমনই থাকে। লোকে নিন্দা করবে বলে বুড়িরা ছুঁড়িদের মত সাজগোজ করে না বটে, কিন্তু আশাটুকু সমানই আছে।

সরমা—দিদি ! কাঞ্চনের তো কিছু হয় নাই ?

বিমলা—(মস্তক বক্র করিয়া) হয়েছে।

সরমা—ক-মাস হলো ?

বিমলা—এই সেদিনে সাধ খেয়েছে।

সরমা—ও মা ! সেদিনের মেয়ে, দেখতে দেখতে ছেলের মা হতে গেল !

বিমলা—এ কালে ছুঁড়ি-বুড়ি কিছুই চেনা যায় না। আর এক কথা শুনেছ ?

সরমা—কি কথা দিদি ?

বিমলা—বলবো কি কিছু, কিছুদিন হলো, শুনেছিলেম যে, যুবরাজ নরেন্দ্রের বিয়ের আয়োজন হচ্চে, মহারাজ স্থানে স্থানে ঘটক পাঠিয়েছেন।

সরমা—হাঁ, আমিও শুনেছিলেম ; দিদি ! যুবরাজ নরেন্দ্রের মতন আর ছেলে নাই। রাজারাজড়ার ঘরের ছেলে যে এমন লাজুক হয় তা কোন কখনও শুনিনি। পাড়াপড়সীর মেয়েছেলে নজরে পড়লে অমনি মাথাটি হেঁট করে চলে যান। এত বড় হয়েছেন, তবু উঁচু-নজরে কারো পানে চান না।

বিমলা—সে যাহাহোক, আমরা পাড়ায় পাড়ায় যুবরাজের বিয়ের কথাই বলাবলি করতুম, সকলেই আশা করে রয়েছি যে যুবরাজের বিয়ে দেখবো। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন শুনলেম, মহারাজ আপনিই বিয়ে করেছেন।

সরমা—(আশ্চর্য্য হইয়া অবাক) বলিস কিরে ! (জল-কলস কক্ষ হইতে নামাইয়া) দিদি ! বলিস কি ?—মাইরি ? বুড়ো রাজার বিয়ে হয়েছে ?

বিমলা—আমি কি মিছে কথা বলছি ?

সরমা—মাগো কোথা যাব ! আমরা তো কিছুই টের পাইনি। যুবরাজের বিয়ে হবে তাই জানি। এর মধ্যে বুড়োর বিয়ে হয়ে গেল। দিদি ! তুই যা বললি যথার্থ ! একালে বুড়োও চেনা যায় না, ছেলেও চেনা যায় না ; কই, রাজবাড়িতেও তো কোন ধুমধাম হয়নি !

বিমলা—এ কাজটি চুপেচুপে সারা হয়েছে। ধুমধামে বিয়ে করতে অবশ্যই কিছু লজ্জা হয়, সেই বিবেচনা করেই বোধহয় কাকেও জানান নি।

সরমা—(মুখভঙ্গী করিয়া) কি লজ্জা ! আরে আমার লজ্জা ! বিয়ে করে ঘরে আনতে পারলেন, তাতে লজ্জা হলো না, লোক জানলেই লজ্জা হতো ; এ-কথা গোপন থাকবে কিনা ? ছি ছি ! মহারাজ বড় অন্যায় কাজ করেছেন। এই বয়সে লজ্জার মাথাখেয়ে বর সাজলেন কি করে ? চুলে, গোঁফে বুঝি কলপ দিয়েছিলেন ? ছি ছি ! বড় লজ্জার কথা !

বিমলা—আরো শোন ! আরো মজা আছে। সেইদিন শুনে নতুন রাজরানী দেখতে বড় সাধ গেল, তাই আজ দেখতে গিয়ে একেবারে অবাক হয়েছি।

দেখতে বড় সুন্দরী. এলোচুলে বসে সখীদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, চুলগুলি পিঠের উপর দে পড়ে মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে, সে দিকে তাকাচ্ছেনও না। নাক, কান আর সেই জোড়াভুরুতে মুখখানি চতুর্দ্দশীর চাঁদের মত দবদব করছে। ঠিক ভুরুর মাঝখানে একটি ছোট টিপ কেটেছেন থেকে থেকে চাঁদের আলো ফুটে সেইটি যেন তারার ন্যায় টিপটিপ করছে। চক্ষের ভাবভঙ্গি আর থেকে থেকে মুচকে মুচকে হাসি দেখে আমি একেবারে অজ্ঞান হয়েছি। ঠোঁট দুখানি জবাফুলের মত লাল, দাঁতগুলি বড় পরিপাটি, কথাও বড় মিষ্টি বয়স অতি অল্প,—এখনও চোদ্দ পেরোয়নি। রাজার সঙ্গে ছাইও মানায় নি। যদি যুবরাজের সঙ্গে এই বিবাহটি হতো, তা হলে সুখের সীমা থাকতো না। যেমন বর, ঠিক তেমনি কনে মিলে যেতো।

সরমা—ছি ছি! রাজাকে বিয়ে করতে কে পরামর্শ দিয়েছিল?

বিমলা—রাজার সঙ্গে সঙ্গে যে একটা পাগলা গোছের বামুন থাকে, সেই নাকি এর ঘটক।

সরমা—তার কি? সে পেটপুরে খেতে পেলেই বড় খুশী। রাজার তো চোখ ছিল?

বিমলা—চোখ থাকলে কি হবে? মন যে এখনও হামাগুড়ি দেয়; তা তো আগেই বলেছি।

সরমা—দিদি! রাজার বিয়ে করতে যদি এত সাধই হয়েছিল, কিছুদিন খুঁজে একটি বড়মেয়ে দেখে কেন বিয়ে কললেন না? এ বিয়ে তাঁর মনস্তাপের কারণ হবে। বুড়ো বয়সে অমন মেয়েকে বশে রাখা বড় ছোটকথা নয়। শত শত জায়গায় দেখতে পাচ্ছি, বয়সের মিল না হলে কোনকালেই মনের মিল হয় না। তুমি দেখো! রাজা আমাদের নতুন বৌয়ের মন যোগাতে যোগাতে একেবারে নাজেহাল হবেন। তবুও তার মন উঠবে না। রাজাই হন, আর প্রজাই হন, যুবতী নারী ঘরে পুরে মুখফুটে বলতে পারবেন না যে, আমার স্ত্রী আমাকে বড় ভালবাসে। যিনি একথা বলেন, তিনি পাগল।

বিমলা—সত্যি কথা, বুড়ো বয়সে কখনই সোমত্ত মেয়ের ভালবাসা পাওয়া যায় না। বুড়োরা কত করে মন যোগায়, তাতে কি সে ভোলে? শুধু কথায় কি হয়! পোড়া কপাল! কথা বলতেও থুথু পড়ে।

(দূরে যুবরাজ নরেন্দ্র ও শরৎকুমারের প্রবেশ)

সরমা—চুপ কর দিদি ! চুপ কর ! ঐ যুবরাজ আসছেন। মন্ত্রীপুত্র শরৎকুমারও সঙ্গে আছেন। আমরা যে সকল কথা বলাবলি করেছি, বোধহয় আড়াল থেকে ওরা সকলই শুনতে পেয়েছেন।

বিমলা—(পশ্চাৎদিকে দৃষ্টি করিয়া জিহ্বা দংশন এবং ঘোমটা দিয়ে বেগে প্রস্থান, সরমাও জল-কলস লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন)

শরৎ—যুবরাজ ! শুনলেন তো। পাড়ার মেয়ে দুটি কি বলে গেল। শুধু আমিই যে বলি, তা নয়, মেয়েরাও মহারাজকে ধিক্কার দিচ্ছে। রাজ্যের অপর-সাধারণ সকলেই মহারাজের নিন্দা করছে।

নরেন্দ্র—মিত্র ! গুরুজনের কথায় কথা কওয়া আমাদের ভাল দেখায় না, পিতা অবশ্যই অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করেই পুনর্বার দারপরিগ্রহ করেছেন। সামান্যলোকে তার ভাব কি বুঝবে ? আর আমরাই বা কি বুঝতে পারি ?

শরৎ—না—না—আমি যে কেবল বিবাহের জন্যেই বলছি তা নয়। দেখুন ! অমাত্যগণ, সভাসদগণ, প্রজাগণ, সকলেই মহারাজের প্রতি অসন্তুষ্ট, মহারাজ মাসাবধি রাজকার্য একেবারে পরিত্যাগ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তো সাক্ষাৎ পর্যন্ত হয় না। সিংহাসন শূন্য থাকলে যে রাজ্যের কি দশা ঘটে, তা বুঝতেই পাচ্ছেন, দুর্জনেরা নিরীহ প্রজাগণের প্রতি দৌরাত্ম্য করে তাদের সর্ব্বস্বান্ত করছে। কর্ম্মচারীরা খোলা মহল পেয়ে, দেদার লুট আরম্ভ করছে। প্রভুত্ব প্রকাশ করতে কেহই ক্রটি করছে না। প্রজাগণ কাতর হয়ে, বিচারের প্রার্থনায় রাজবাটীতে প্রত্যহই আসছে ; সমস্তদিন অনাহারে থেকে ম্লানমুখে সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। বিশেষ অনুসন্ধানে জেনেছি, বিপক্ষ রাজারা যুদ্ধসজ্জার উপক্রম করছেন। 'রাজা সর্ব্বদাই অন্তঃপুরে নববিবাহিতা রাণীর মন্দিরে থাকেন, রাজকার্যে মনযোগ নাই ; দেশে দেশে এই ঘোষণা হয়েছে। অন্য অন্য রাজারা মহারাজের রহস্য নিয়েই আমোদ করছেন।

নরেন্দ্র—মিত্র ! এতদূর হয়েছে ? —আমি এর কিছুই শুনতে পাইনি। শুনবোই বা কি করে ? আমি তো প্রায় মাসাবধি রাজধানীতে ছিলেম না।

শরৎ—বড়ই অন্যায় হয়েছে।

নরেন্দ্র—প্রধানমন্ত্রীবর কেন এ সকল বিষয় রাজাকে জানান না ?

শরৎ—মহারাজ সর্ব্বদাই অন্তঃপুরে থাকেন, তাঁর নিকটে যেতে কারও অনুমতি নাই।

নরেন্দ্র—তবেই তো বিভ্রাট। (কয়েকজন প্রজার প্রবেশ)

প্রথম প্রজা—বলি ও বেয়াই ! রাজাবেটা বুড়োকালে বিয়ে করে একেবারে যাচ্ছে-তাই হয়ে গেছে। রাতদিন অন্তঃপুরেই থাকে, আর কাদন আসবো, প্রত্যহই আসছি যাচ্ছি, একদিনও বেরোয় না, না বিচার করবে কি ? যেতে আসতে পায়ের নলা ছিঁড়ে গেল। প্রত্যহ দিনেরবেলা না খেয়ে থাকতে হয়, আর বাঁচি না। বেটা উচ্ছন্নে যাক, এমন মাগী-পাগলা রাজার রাজ্যে কি থাকতে আছে ? যে মানুষ মেয়েমানুষের গোলাম, সে কি মানুষ ?

দ্বিতীয় প্রজা—ওহে ! তুমি বুঝতে পারো নি, রাজা কি সাধে ও রকম হয়েছেন ? রাজা বুড়ো, রাণী কাঁচা, একেবারে ভেড়া বানিয়ে দিয়েছে, কাজেই পাগল হয়েছেন। বুড়ো বয়সে বিয়ে করলে সকলেরই ঐ দশা হয়। তুমিও তো কিছু কিছু বোঝ ?

প্রথম প্রজা—এতনা !

দ্বিতীয় প্রজা—বড়লোকে আর ছোটলোকে অনেক তফাৎ !

প্রথম প্রজা—আরে ভাই থাম আমরা রাজার মত পাগল নই। সোনার চাঁদ ছেলে থাকতে নিজে বিয়ে করে বসলো। পাগলেও এমন করে না। বড়মানুষের দোষ নাই, আমাদের ছোটলোকের ঘরে হলে ঢাকঢোলে কাঠি বাজতো !

দ্বিতীয় প্রজা—ঐ জন্যেই তো বলছি, বড়লোকে যা করে, তাই শোভা পায়। (রাজপুত্রকে দেখিয়া) বেয়াই ! এইবারেই গেছি ; আমরা যা যা বলেছি সকলই রাজার ছেলে শুনতে পেয়েছে। (সভয়ে কম্পিত কলেবরে সকলের প্রণাম)

নরেন্দ্র—বাপুসকল ! তোমরা কোথা গিয়েছিলে ?

প্রথম প্রজা—কর্তা ! আমরা রাজার-দরবারে নালিশ করেছি, কারও এক মাস, কারও দু'মাস যায়, তবুও বিচার হয় না। শুনতে পাই যে তিনি অন্দরে আছেন। রোজ রোজ হাঁটাহাঁটি করে আমরা সারা হলেম। সারাদিন না খেয়ে এই সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে যাচ্ছি, আমাদের দুঃখের সীমা নাই। আপনি রাজা হলে আমরা বাঁচি।

নরেন্দ্র—বাপুসকল! (হস্ত বাড়াইয়া) আমি এই কয়েকটি টাকা দিচ্ছি, তোমরা জল খাওগে!

প্রজা—(হস্ত বাড়াইয়া টাকা গ্রহণ) যুবরাজের জয় হউক—যুবরাজের জয় হউক!

(যুবরাজ নরেন্দ্রকুমার ও শরৎকুমারের প্রস্থান। এবং প্রজাগণ প্রত্যেকে আপন আপন টাকা কাপড়ে বান্ধিতে বান্ধিতে গান)

এমন বিচারক রাজার রাজ্যে মরি অবিচারে।
আমাদের ভাই সাধ্য নাই,
আমরা রাজার কাছে যাই,
বলি সব মনের কথা দুটি পায় ধরে॥
বিড়াল, কুকুর, শৃগাল মত, বধে প্রাণ বলব কত,
জোরে ধরে নিয়ে কার সর্ব্বনাশ করে॥
আমাদের রক্ষা হেতু, আছে যত ধূমকেতু
মন যোগালে মনের মত পেলে তারা সকলি পারে।
যার যা ইচ্ছা সে তাই করে,
ওরে! রাজা থাকতে প্রজা মরে, হায়! হায়!
এ দুঃখের কথা আমরা বলি কারে॥

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম রঙ্গভূমি

ইন্দ্রপুর; রেবতীর শয়ন-মন্দির

(রেবতী ও মালতী আসীনা)

রেবতী—(হস্তে দর্পণ লইয়া) মালতী! দেখ দেখি, আজ কেমন বেশ করেছি। ভাল হয় নি?

মালতী—বেশ হয়েছে! রাজা একেই পাগল হয়েছেন, আবার এই নূতন সাজ-গোজ দেখলে ঘর থেকে আর নড়বেন না। বাছা! তুমি আচ্ছা মেয়ে জন্মেছিলে। রাজা বীরেন্দ্রের নাম শুনলে ভয়ে মাটি কেঁপে উঠে, সে বীরকে একেবারে মাটি করে ফেলেছ। সাবাস মেয়ে জন্মেছিলে!

রেবতী—(দর্পণ ফেলিয়া) রাজা আমায় দেখে একেবারে ভুলে গেছেন, কিন্তু আমায় ভুলাতে পারেন নি। তিনি আমায় না দেখে এক নিমিষ স্থির থাকতে পারেন না, কিন্তু আমার তা নয়, সে মুখ নজরে পড়লেই যেন গায়ে ঝঁটার-বাড়ি পড়ে। মন যারে ভালবাসে না, চোখ তারে ভালবাসবে কেন? এ তো আমারি চোখ।

মালতী—এদিকে তো বড় মিল দেখা যায়।

রেবতী—তুই যেমন মিল দেখতে পাস, কিসের মিল? হেসে হেসে দুটো মিষ্টিকথা বলি, তাতেই কি মিল হলো? মুখে মিল থাকলে কি হয়, মনে যে মেলে না।

মালতী—মিল করতে কতক্ষণ লাগে? কললেই পাবো?

রেবতী—পোড়া কপালি! তুই কিছুই বুঝিস নে, মিল কি কথায় হয়? মনে মনে মিললেই তবে মিল হয়। বলতে হাসিও আসে, কান্নাও পায়, তার সঙ্গে আমার মনের মিল কেন হবে? তার যৌবন-অবস্থা মধ্যম-অবস্থা গিয়ে এখন শেষ অবস্থারও শেষে ঠেকেছে ; আমার অবস্থা, তো দেখতেই পাচ্ছ। এতে মনের মিল হবে কেন? আমিই বা তাকে ভালবাসবো কেন? মণিমুক্তা আর ভাল ভাল গয়না, ভাল ভাল কাপড় দিলেই যে ভালবাসা হয়, তা নয়, ভালবাসার অঙ্গ অনেক। তবে মা বাপে জোর করে ধরে রাজরাণী করে দিয়েছেন, ভেবেছেন আমি সুখী হলে তাঁরা সুখে থাকবেন, তাঁরা ভাগ্যবন্ত হবেন, রাজার কুটুম্ব বলে সমাজে আদর পাবেন, বাবা মহারাজের শ্বশুর, নিজ-ক্ষমতাতেই উচ্চাসনে বসে চারপাশে নজর করবেন, মনে ভাববেন যে, সকলেই আমাকে নজর করে। মা তো একেবারে আহ্লাদে আটখানা হয়েছেন, রাজার শাশুড়ী হয়েছি, আর ভাবনা কি? সকলেই সুখের ভাগী হলেন, হতভাগিনীই কেবল চিরদুঃখিনী হলো! (দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) মালতী! আমি যে যাতনা ভোগ করছি, তা সেই ভগবানই জানেন? অদৃষ্টে বিধাতা যাহা লিখেছিলেন তাই হয়েছে, তা বলে আর দুঃখ কললে কি হবে?

মালতী—রাজমহিষী! আর দুঃখ করো না! কেবল আঁপনারই যে ওরকম

হয়েছে, তাও নয়, অনেকেরি এই দশা ?

রেবতী—না—না—আমার মত হতভাগিনী আর কেউ নাই। আমি যেমন জলছি, শত্রুও যেন এমন না জ্বলে।

মালতী—তা যাই বল, রাজা কিন্তু তোমায় বড় ভালবাসেন, প্রাণের সঙ্গে ভাল-বাসেন। শুনেছিলাম, যুবরাজকে এক মুহূর্তও চক্ষের আড়াল কর্‌তেন না, তোমায় বিয়ে করে অবধি তাঁকে মনেও করেন না, একটিবার নামও করেন না।

রেবতী—(ব্যস্তভাবে চতুর্দিক অবলোকন করিয়া) মালতী! ভালকথা মনে করেছিস। নরেন্দ্রকে যেকথা বলতে বলেছিলুম, বলছিলি তো ?

মালতী—তুমি যে কথা বলতে বলেছিলে, আমি তার দশগুণ বাড়িয়ে বলেছি, তিনি শুনে দুটি চক্ষু পাকল করে আমার পানে চেয়ে রইলেন। আমি সেই-ভাব, ভঙ্গি দেখেই পালিয়ে প্রাণরক্ষা কললেম। মাগো! ও আমার কাজ নয়।

রেবতী—(চক্ষু হইতে জল পতন) এখন চক্ষে জল পড়ছে, যখন যুবরাজকে এক-দৃষ্টে দেখেছিলি, তখন আগপাছ ছিল না। মালতী! যুবরাজকে সেই অবধি দেখে আহারনিদ্রা কিছুতেই সুখ নাই। সর্ব্বদাই যেন সেই কথা মনে পড়ে; তুই আজ আবার যা, আমার এই যেন সেইকথা মনে পড়ে তুই আজ আবার যা, আমার এই সব দুঃখের কথা ভাল করে বোলগে ?

মালতী—না—না আমি আর যেতে পারবো না। আমায় ওসব কথা বলো না। রাজকুমারের চোখ দেখলেই ভয়ে আমার গা কাঁপতে থাকে। আমি কি আর তাঁর কাছে যাই ? গেলেই বা কি হবে ? তিনি তোমার নামও শুনতে পারেন না।

রেবতী—(দুঃখিত স্বরে) আমিই যেন তারে দেখে একেবারে পাগল হয়েছি, তিনি তো আমায় দেখেন নি, চার চোখ একত্র হলে তবে বোঝা যাবে। মনের কি ভাব, তাও জানা যাবে। হায়! পিতামাতার যথার্থই চক্ষু ছিল না। রাজাকে চোখে দেখতে পেলেন, আর যুবরাজকে চোখে দেখতে পেলেন না। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) যুবরাজ! তুমিই আমার হয়েছিলে! যুবরাজ! তুমিই আমার—

(রাজার প্রবেশ)

রেবতী—(ত্রস্তভাবে চক্ষের জল মুছিয়া হাস্যমুখে) এই যেতে যেতেই যে ফিরেছেন ?

বীরেন্দ্র—কেন ?

রেবতী—আবার কেন ? মাসান্তরে যদি বা দরবারে গিয়েছিলেন, মুহূর্ত্তকাল অতীত না হতেই আবার এলেন ?

বীরেন্দ্র—প্রিয়ে ! কেন যে এলেম,—শেষে বলবো। আজ যে চমৎকার রূপ দেখতে পাচ্ছি ? আজ অমানিশা, আকাশে চন্দ্র নাই, কিন্তু আমার গৃহে একেবারে অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের উদয়। আমি যথার্থই আজ তোমায় যেন পূর্ণ-চন্দ্র দেখছি। বেশ মানিয়েছে।

রেবতী—মানিয়েছে, ভাল হয়েছে। তোমায় আর ঠাট্টা করতে হবে না ! আমি একটা মানুষ, আমায় আবার মানিয়েছে, ওসব পুরনো কথা ভাল লাগে না, যেতে যেতে ফিরে এলে কেন, তাই বলো।

বীরেন্দ্র—তুমি কি পাগল হয়েছ ? দেহ কি কখনো আত্মা ছেড়ে থাকতে পারে ? না ছায়াই কখনও কায়ার অন্তর হতে পারে ? অলি কি কখন নবকলি ফেলে থাকতে পারে ? দেখ প্রিয়ে ! চকোর কি করে সুধাকরের পূর্ণ কলেবর হেরে সুধাপানে বঞ্চিত থাকবে ? তুমি জেনেও আজ ভুলছো। আর কেই বা না জানে যে বারি বিহনে যেমন মীন বাঁচে না, তেমনি তোমা বিহনে আমি বাঁচি না। আর এও কি কখনও হয় যে, সর্ব্বস্ব-ধন রেবতী, বীরেন্দ্র তারে নয়নের অন্তরাল করে দরবারে বসে থাকবে ?

রেবতী—যাও যাও, আর বাড়িও না, মাথা খাও, আর জ্বালিও না। (মৃদু হাস্যে) ও মুখে অত ভাল লাগে না। মিনতি করে বলছি, দরবারে যাও।

বীরেন্দ্র—আজ আবার দরবার ? যে দরবার পেয়েছি, এর কাছে আবার দরবার ?

রেবতী—তুমি যাই কেন বল না, দেশশুদ্ধ লোক আমারই নিন্দা করে। তারা এই কথা বলে, রাজা নতুন রাণীর কাছে একেবারে চাকরের মতন রয়েছেন রাণী যা বলেন, তাই করেন। ক্ষণকালও রাণীকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। রাজকার্য নাই, কারো সঙ্গে আলাপ নাই, দেখা নাই, দিবারাত্রি অন্তঃপুরেই রাণীর চরণ সেবা কচ্ছেন ! ছি ছি ! বড় লজ্জার কথা।

বীরেন্দ্র—এতে আবার তোমার লজ্জা কি? এ লজ্জা একপ্রকার আমাকেই অর্শে। যাহোক, তাতেই বা ক্ষতি কি? এমন রূপবতী সতী যার ঘরে, তার চিন্তা কি? ছাই রাজ্য থাক বা যাক তাতেই বা ক্ষতি কি? তাদের কি চক্ষু নাই, তাদের কি কর্ণও নাই,—কখন কার মুখে শুনেও নাই যে, তৃতীয়ার চন্দ্র তার ললাটের সমতুল হতে পারেনা আর অনেকেই বলে থাকে যে, স্ত্রী জাতির ভ্রু-ভঙ্গী দেখেই ইন্দ্রধনুঃ গগনাশ্রয় করেছে, তা আমিও স্বীকার করি। এখনও যে, বৃষ্টিজলে সূর্যকিরণ পড়লেই সুখময় ইন্দ্রধনুঃ দেখা পাওয়া যায়, সেটিও যথার্থ। কিন্তু বিনা মেঘে বিনা সূর্য্যে তৃতীয়ার চন্দ্রকিরণে একেবারে যে যুগল-কামধনু সর্ব্বদা বিরাজ কচ্ছে, তা কি তারা শুনেও নাই? (রেবতীর নয়নের নিকট হস্ত লইয়া) এই নয়নের ঈর্ষাতে কুরঙ্গিনী যে বনবাসিনী হয়েছে, তা কে না জানে? এই দন্তের আভা দেখে যে দামিনী অভিমানিনী হয়ে কাদম্বিনীর আশ্রয় লয়েছে, তবু তোমার মৃদুহাসিতে দন্তরাজি ক্ষণে ক্ষণে দেখে সময় সময় ক্ষণপ্রভা রূপে দেখা দিচ্ছে, দেখা দিয়েও তো স্থির নাই। তারা যাই কেন বলুক না, আমি এ মুখে এ নাসার তুলনা তিলফুলের সঙ্গে দিব না—হা! সকলেই কি অন্ধ হয়েছে? যার চিকুরের শোভা দেখে কাদম্বিনী ভয়ে যে, কোথায় পালাবে, তারই স্থান উদ্দেশ্যে একবার পূর্ব্বে, একবার উত্তরে, একবার পশ্চিমে, শেষে নিরুপায় বৃষ্টিচ্ছলে আনন্দ, শিলাচ্ছলে অঙ্গ-বিসর্জ্জন করছে; যথার্থই তারা অন্ধ। যার কটির শোভায় পশুরাজ হরি মানভয়ে কোনস্থানে আশ্রয়স্থান না পেয়ে শেষে যে পদের আশ্রয় নিলে কাহারও ভয় থাকে না, একেবারে সেই অভয়ার পদাশ্রয় গ্রহণ করেছে। আমার গৃহে এরূপ রূপ-মাধুরী রমণী থাকতে কি প্রকারে তার চক্ষের আড়াল হতে পারি? ক্ষণকাল আমার নয়নের অন্তর-হলে চতুর্দ্দিকে যেন অন্ধকার বোধহয়। কাজেই প্রিয়ে। তোমায় সম্মুখে তোমারি ঐ লোহিতবর্ণ ওষ্ঠ দুখানির প্রতি চেয়ে থাকি। পূর্ব্বে নরেন্দ্র ক্ষণকাল চক্ষের আড়াল হলে যেমন কষ্ট বোধ হতো, তুমি চক্ষের আড়াল, হলে, তার চেয়ে এখন শতগুণ কষ্ট বোধহয়।

রেবতী—(অবগুণ্ঠন খুলিয়া) নাথ! তোমার বিবেচনা নাই। দেখ দেখি! আমি তোমায় কদিন বলছি যে, যুবরাজ নরেন্দ্রকুমারের মুখখানি দেখতে বড়ই

সাধ গেছে। আমার গর্ভজাতই না হলো, আপনার সন্তান তো, তা মহারাজ! আমাকেও আপনার মত দেখতে হয়। একটিবার কি দেখা দিতে নাই? আমারও সাধ আছে তো?

বীরেন্দ্র—প্রিয়ে! তুমি নরেন্দ্রকে দেখবে, তাতে আমার অনুমতি কি? তার মা নাই, তুমি আপন পুত্রের ন্যায় স্নেহ কর, তাহলে নরেন্দ্রও তোমায় যথেষ্ট ভক্তি করবে, দেশশুদ্ধ লোকেও তোমার সুখ্যাতি করবে। সকলের মনে বিশ্বাস আছে যে, নারীজাতি সপত্নী-পুত্রের পরম শত্রু, তাকে একেবারে চক্ষুঃশূল-জ্ঞান করে, তুমি যদি নরেন্দ্রের প্রতি জননীর ন্যায় ব্যবহার কর, তা হলে লোকের মনে কোন সন্দেহ থাকবে না।

রেবতী—মহারাজ! আমি বুঝি! —ছেলেবেলা থেকে অনেক বই পড়েছি, তাতে হিতকথাও অনেক দেখেছি, যে যেমন পাত্র, তারে তেমনি আদর করতেও শিখেছি। আপনার পুত্র তো, আমার গর্ভেই না হলো, তাইতে কি আমি তার স্নেহ করবো না, ভালবাসবো না? —কেমন কথা বলছেন?

রাজা—(ব্যস্ত হইয়া) না—না—আমি তোমায় বলছি না, তবে যুগ-যুগান্তরে এইরূপ হয়।

রেবতী—মহারাজ! আপনি একবার যুবরাজকে অন্তঃপুরে ডেকে পাঠান।

রাজা—কিন্তু এখানে প্রতিহারী তো কেউ নাই।

রেবতী—মালতীই আজ আপনার প্রতিহারী।

রাজা—আচ্ছা, মালতী! নরেন্দ্রকে একবার ডাক তো? (মালতীর প্রস্থান)

রেবতী—মহারাজ দেখুন! এখনও একটু বেলা আছে, কিন্তু রোদ নাই। সময়টি অতি মনোহর, বসন্তকালের এই সময়টি সকলের পক্ষেই মনোহর, এই সময় একবার প্রমোদবনে গেলে হয় না?

রাজা—না প্রিয়ে! নরেন্দ্রকে আসতে বলা হলো, হয়তো এখনই আসবেন, এখন আর প্রমোদউদ্যানে গিয়ে কাজ নাই। চল, প্রদোষগৃহে গিয়ে বসা যাক। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

ষষ্ঠ রঙ্গভূমি

(নরেন্দ্রকুমারের বিশ্রামগৃহ—যুবরাজ ও শরৎকুমার আসীন)

নরেন্দ্র—(সংস্কৃত কাদম্বরী হস্তে অন্যমনস্ক)

শরৎ—পড় ! —তারপর কি হলো ?

নরেন্দ্র—(সমভাবে অন্যমনস্ক)

শরৎ—কি যুবরাজ ! হঠাৎ এমন হলে যে ? ওখানে এমন কি কথা আছে ?

নরেন্দ্র—(সচকিতে) কথা এমন কিছুই নাই, তবে এইটি ভাবছি, সংস্কৃত কবিদের কতদূর ক্ষমতা !

শরৎ—না,—শুধু তা নয়, তুমি তাই ভাবছো না,—ভিতরে কিছু কথা আছে। কবির ক্ষমতা আর মনের ক্ষমতা কে কেমন করে ভাবে, তা লক্ষণ দেখে স্পষ্টই জানা যায়। তুমি আমার কাছে গোপন করো না, আমি কতক বুঝতেও পেরেছি। কাদম্বরীর বিরহদশা আর চন্দ্রপীড়ের সেই লজ্জা,—কেমন এই নয় ?

নরেন্দ্র—হাঁ ! এক রকমই বটে, বলছি যে, সংস্কৃত কবিদের কি আশ্চর্য ক্ষমতা ! দেখ ! কাদম্বরীর এখন যে অবস্থা, তা দেখ, যে কিছুই জানে না, সে ব্যক্তিও রাজপুত্র চন্দ্রপীড়ের স্মরদশা অবশ্যই বুঝতে পাচ্চে। কবির এমনি কৌশল, লজ্জায় মুখফুটে কাউকে কিছু বলতে দিচ্চেন না। কাদম্বরী এখানে নাই, চন্দ্রপীড় এখানে নাই,—সে লতামণ্ডপও নাই,—তার ছবিও নাই,—তবু রচনাকৌশলে সকলেই যেন ঠিক চক্ষের উপর বিরাজ করছে। আহা ! গন্ধর্ব্বকুমারী কাদম্বরী কি লজ্জাশীলা।

শরৎ—এই এতক্ষণের পর ঠিক হলো। আচ্ছা বলুন দেখি, যদি কোন কুলবালা ঠিক অমনি করে আপনার কাছে প্রণয়ভাব জানায়, আর মুখে কিছু না বলে তাহলে আপনি কি করেন ? একথা কি বলতে পারেন যে, প্রেয়সী ! তুমি আমার প্রতি বড় অনুরাগিণী, আমি তোমার প্রতি বড় অনুরক্ত এখনই আমায় বিয়ে কর ! একথা কি বলতে পারেন ? আর সেই কামিণীই কি পারে ?

নরেন্দ্র—বয়স্য ! এই তোমার রহস্য করবার সময় ? (দীর্ঘনিঃশ্বাস)

শরৎ—রহস্য কচ্ছি না। মহাকবি বাণভট্ট যথার্থ প্রণয়ের লক্ষণ কাদম্বরীর ঐ স্থানে বর্ণন করেছেন কেন, অঙ্গুলি দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। স্বভাব যেন চক্ষের উপর নৃত্য করছে। এই আপনিই তো বললেন, কাদম্বরী নাই, চন্দ্রপীড়

নাই, লতামণ্ডপ নাই, অথচ যেন সকলই চক্ষের উপর দেখতে পাচ্ছি। কবিদের ঐ তো প্রশংসা।

নরেন্দ্র—(পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া স্থিরনেত্রে দীর্ঘনিঃশ্বাস)

শরৎ—আবার কি ভাবছেন, যুবরাজ! বুঝেছি আপনার মন অস্থির হয়েছে। আচ্ছা, ও সকল কথার আন্দোলন ছেড়ে দিন। এখন একটি গান গান।

নরেন্দ্র—নূতন রকম আমোদ হলে এসব কথা ঢাকা পড়ে বটে, কিন্তু আমার তো ভাই সে-অভ্যাস নাই। তুমিই একটি গাও।

শরৎ—আচ্ছা, তবে গাই।

রাগিণী-মল্লার :—তাল একতাল।

রমণী রতনে, বিধি সযতনে,
নিরজনে গড়িয়াছে।
নাই যত ধনি, হয়ে অভিমানী,
মানের গুমানে এত বাড়িয়াছে।
মুনি, ঋষি বত যে শিবসাধনে,
তিনিও আশ্রিত রমণীচরণে,
ব্রজে কেলেসোনা, নিকুঞ্জকাননে,
রমণীর পায়ে পড়িয়াছে।
ধিক্‌রে শরৎ, ধিক্কার জীবন,
এহেন রতনে কর অযতন,
সাধনের ধন, সংসার রতন,
সোয়াতী জীবনরথে চড়িয়াছে॥

নরেন্দ্র—না বয়স্য! আজ কিছুই ভাল লাগছে না।

শরৎ—(তানপুরা রাখিয়া) তবে অন্য আলাপ করা যাক। ভালকথা মনে হলো। মহারাজ যে আপনার বিবাহের জন্য স্থানে স্থানে ঘটক পাঠিয়েছিলেন, তার কি হলো?

নরেন্দ্র—ঘটক পাঠিয়েছেন এইমাত্র জানি, কি হয়েছে কিছুই জানি না।

শরৎ—যতদিন আপনার বিবাহ না হচ্ছে, ততদিন কিন্তু রাজকার্যের শৃঙ্খলা হচ্ছে না।

নরেন্দ্র—বিলক্ষণ ! আমার বিবাহ হলে রাজ্যের শৃঙ্খলা কি হবে ?

শরৎ—(সভয়ে) তার মানে আছে। আগে মহারাজ আপনার বিবাহ না দিয়ে রাজ্যে অভিষিক্ত করবেন না। স্ত্রীলাভ না হলে রাজ্যলাভ হবেনা। আপনি রাজা হলে সকলদিকেই মঙ্গল হয়। প্রজারাও সুখী হবে, আমরাও মনের আমোদে থাকবো।

নরেন্দ্র—সখে ! রাজদণ্ড ধারণ করা সহজ ব্যাপার নয়। বিবাহটিও কম কথা নয়। লোকে লৌহশৃঙ্খল ভগ্ন করতে পারে, কিন্তু প্রণয়শৃঙ্খল ভগ্ন করা নিতান্ত অসাধ্য। সাধ্বী স্ত্রীকে শাস্ত্রে রত্ন বলে, রত্ন সাগর ছেঁচে তুলতে হয়, তুলে আবার বেছে নিতে হয়। যে জীবনের সঙ্গিনী, সুখ-দুঃখের ভাগিনী, প্রথমেই তার গুণাগুণ পরীক্ষা করা উচিত। নারী অতি অভিমানী। যেমনই কেন হোকনা, আমি বড় সুন্দরী, আমার মত কেউ নাই, এইটি নারী-জাতির স্বভাবসিদ্ধ গর্ব্ব। সে গর্ব্ব নাই, এমন স্ত্রীরত্ন যদি মিলে, তবে বিবাহে সুখ আছে। নইলে নয়।

শরৎ—এত খুঁজতে হলে আর বিবাহ হয় না। এও কি কোন কাজের কথা ?

নরেন্দ্র—সখে ! তুমি যাই বল, অমন গুণবতী রমণী যদি হয় তবে তার পাণিগ্রহণ করবো, নচেৎ যেভাবে আছি, চিরজীবন সেইভাবেই থাকবো।

শরৎ—তবে আর বিবাহই করবেন না ?

নরেন্দ্র—কেন করবোনা ? উপযুক্ত পাত্রী পেলেই বিবাহ করবো। সখে ! তোমাকে তাও বলি, তুমিও শুনেছ, রাজা বিজয় সিংহের কন্যা বসন্তকুমারী রমণী-কলের ঈশ্বরী। অবলাজাতির যতগুণ থাকা আবশ্যক, বিধাতা সে সকলই বসন্তকুমারীকে অর্পণ করেছেন। তাঁর পাণিগ্রহণ করাই আমার নিতান্ত বাসনা। এইটি আমার মনের কথা। (মালতীর প্রবেশ)

মালতী—(করযোড়ে) যুবরাজ ! মহারাজ আপনারে ডাকছেন।

নরেন্দ্র—(সরোষ নয়নে) রাজা কোথায় ?

মালতী—মহারাজ অন্তঃপুরেই আছেন।

নরেন্দ্র—আচ্ছা ! তুমি যাও, আমি যাচ্ছি। [মালতীর প্রস্থান]

(স্বগত) রাজা আজ আমায় হঠাৎ অন্তঃপুরে ডাকলেন কেন ? (শরৎ-কুমারের প্রতি) সখে ! মহারাজ যখন আমায় যে আজ্ঞা করে থাকেন,

সে তো সভার মধ্যেই প্রকাশ করেন। জননীর মৃত্যু অবধি আর অন্তঃপুরে ডাকেন না, আজ হঠাৎ কেন ডাকলেন ?

শরৎ—পিতা ডেকেছেন তাতে আব কেন ডাকলেন, কি বৃত্তান্ত, তার তর্কবিতর্ক কেন ? বোধহয় কোন আবশ্যক আছে।

নরেন্দ্র—তবে তুমি এখন বিদায় হও, আমি অন্তঃপুর থেকে একবার আসি।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় রঙ্গভূমি

রাজার প্রদোষগৃহ

(বীরেন্দ্র, নরেন্দ্র, রেবতী ও মালতী আসীন)

রাজা—বৎস ! এতক্ষণ পর্যন্ত যে সব কথা বললেম, তাতে কখনই উপেক্ষা করনা। তুমি বিবিধ শাস্ত্রে সুশিক্ষিত হয়েছ, তোমায় আর কি উপদেশ দিব, চতুর্দ্দিকে তোমার যশোখ্যাতি-ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। অপরের মুখে তোমার সুখ্যাতি শ্রবন করে আহ্লাদে আমার চিত্ত নৃত্য করচে। রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র যেমন বংশ উজ্জ্বল করেছিলেন, তেমনি তুমি আমার কুলতিলক। তিনি যেমন কৈকেয়ীর আজ্ঞা প্রতিপালন করে জগতে চিরস্মরণীয় হয়েছেন। বাপু ! তুমিও তোমার বিমাতার আদেশ প্রতিপালন করে ভূমণ্ডলে সেইরূপ কীর্তি স্থাপন কর। মধ্যে মধ্যে অন্তঃপুরে এসে রাণীকে মা বলে সম্বোধন করে তাঁর আজ্ঞা প্রতিপালন কর, সন্তানের কর্ত্তব্য-কার্যে যেন কোন অংশে ক্রটি না হয়।

রেবতী—মহারাজ ! আমি বিমাতা বটে, কিন্তু আমার মন তেমন নয়। ভগবান আমায়—করেছেন, কাজেই নরেন্দ্রের মুখপানে চেয়ে থাকতে হয়। মহারাজ ! যুবরাজ আমায় ভালবাসুন আর না বাসুন, আমি তাঁকে আপনার প্রাণের চেয়েও ভালবাসি।

মালতী—(করযোড়ে) মহারাজ ! মন্ত্রী বৈশম্পায়ন কতকগুলি কাগজপত্র নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন।

বীরেন্দ্র—কি আপদ ! যদি ক্ষণকাল অন্তঃপুরে এসেছি, এখানেও প্রধানমন্ত্রী ! ক্ষণকাল স্থির থাকতে দেননা। ওঁরাই আমারে পাগল করলেন।

রেবতী—এ কেমন কথা। কাজ থাকলে আসবেন না। মন্ত্রীবর যখন অন্তঃপুর পর্য্যন্ত এসেছেন, তখন বিশেষ কোন দরকার না থাকলে কখনই আসতেন না। আপনি না যেতে পারেন, মন্ত্রীবরকে আসতে অনুমতি করুন।

বীরেন্দ্র—(আগ্রহপূর্ব্বক) মালতী। তবে মন্ত্রীকে ডাক।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

বৈশ—(করযোড়ে) রাজা বিজয় সিংহ দূতের দ্বারা মহারাজের কাছে এই পত্র পাঠিয়েছেন।

বীরেন্দ্র—পত্র শেষে শোনা যাবে. দূত মুখে কি বললে ?

বৈশ—বিজয় সিংহের কন্যা বসন্তকুমারী—(নরেন্দ্র মন্ত্রীর মুখপানে দৃষ্টি করলেন) স্বয়ম্বরা হবেন, অন্য দেশীয় রাজপুত্রগণ সেই সভায় আহূত হবেন, বিজয়-সিংহ বসন্তকুমারীর একখানি ছবি আর এই পত্র মহারাজের নিকট পাঠিয়েছেন।

বীরেন্দ্র—আচ্ছা, পত্র পড়।

বৈশ—(পত্র পাঠারম্ভ) প্রিয়তম রাজন !

আমার প্রাণাধিকা দুহিতা বসন্তকুমারীর স্বয়ম্বরসভা। কন্যা আপনার ইচ্ছানুসারে স্বয়ম্বরা হইয়াছেন। অতএব তাঁহার চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি আপনার সমীপে প্রেরণ করিতেছি, অধীনস্থ রাজকুমারগণকে স্বয়ম্বরসভায় প্রেরণ-পূর্ব্বক বাধিত করিবেন। আর প্রাণাধিক কুমার নরেন্দ্র এবং আপনিও সভাস্থ হন, এই আমার নিতান্ত অভিলাষ।

একান্তই আপনার
বিজয় সিংহ।

বীরেন্দ্র—ভোজপুর অধিপতি এইবারে অতি সুবিবেচনার কার্য্য করেছেন, এতে কোনপক্ষেরই আপত্তি থাকবে না। মন্ত্রীবর ! আমার শরীর তো সর্ব্বদাই অসুস্থ ; তুমি লোকজন সঙ্গে দিয়ে নরেন্দ্রকে ভোজপুরে প্রেরণ কর। (কুমারের প্রতি) বৎস নরেন্দ্র ! সকলি তো শুনলে, ভোজপুর অধিপতির কন্যা স্বয়ম্বরা হয়েছেন।

(নরেন্দ্র পিতৃচরণে প্রণাম করিয়া অধোবদনে প্রস্থান)

বীরেন্দ্র—তবে এক্ষণে চলুন, সভায় গিয়ে সভাস্থ সভ্যগণ সহিত অন্য বিষয়ের

পরামর্শ করা যাক। নরেন্দ্রকুমারকে বিশেষ জাঁক-জমকের সহিত ভোজ-পুরে পাঠাতে হবে। (রাজার গাত্রোত্থান—মন্ত্রীর দিকে ফিরিয়া) মন্ত্রীবর! চিত্রপটখানি কুমার নরেন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দেও।

রেবতী—না না মহারাজ! তা হবে না, পটখানি আমার কাছেই থাক। যদি বিধাতা এঁকেই (পটের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া) আমাদের পুত্রবধূ করেন, তাহলে আমি সেই চাঁদমুখ দেখে আগেই সাধ মিটিয়ে নিই। পটখানি আমার কাছেই থাক, আমি যত্ন করে তুলে রাখব। আর মাঝে মাঝে বুকে রেখে প্রাণ জুড়াব।

বীরেন্দ্র—আচ্ছা! তবে তোমার কাছেই থাক, কিন্তু নরেন্দ্রকে একবার দেখালে আমি বোধকরি ভাল হত।

রেবতী—না মহারাজ! দেখালে ভাল হত না, শুনেই ভাল হবে।

বীরেন্দ্র—আচ্ছা মন্ত্রীবর! কুমারকে গিয়ে বল, রাজকুমারী বসন্তকুমারী অতি সুন্দরী, তাঁর স্বয়ম্বরসভায় অবশ্যই যেন যাওয়া হয়।

রেবতী—(মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রীবর! ও কথা বলো না। কেবল এইকথা বল, ভোজ-পুরের রাজা নিমন্ত্রণ করেছেন, তোমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে হবে।

বীরেন্দ্র—মন্ত্রীবর! তবে চল আমরা যাই। [রাজা ও মন্ত্রীর প্রস্থান]

রেবতী—বাঁচলুম, আপদ গেল! রাজা যে ক্ষণকালও চক্ষের আড়াল করতে চান না, সে যে ভারি বিপদ। কেবল কথায় ভুলাতে চান, এও কি কখনো হয়। আমি কি কথায় ভুলি। মুখের কথাতে কিবা হয় অবলা-সরলা কোথা, শুধু কথায় ভুলে রয়।

মালতী—রাজমহিষী! একটু সুর করে বলো।

রেবতী—হতভাগী! এখন কি আমার সুরের সময় আছে। সুর করে বলতে আমার লজ্জা করে।

মালতী—বলই না কেন, এখানে আর তো কেউ নাই, আর কেই বা কি বলবে?

রেবতী—তবে বলি, কিন্তু সেও না বলার মত।

রাগিনী সুরট—তাল কাওয়ালী।

সজনী লো মুখের কথাতে কিবা হয়।
প্রাণে আর কত সয়, অবলা-সরলা কোথা
শুধু কথায় ভুলে রয়॥

নবীনা যুবতী আমি,
অস্তু, দন্ত-হারা স্বামী,
অন্ত জানেন অন্তর্যামী,
মধু প্রেম বিসময় ॥
মনো যাহে নাহি চায়,
বিধি মিলাইল তায়,
করি সাথী কি উপায়,
প্রেমানলে প্রাণ দয় ॥

মালতী—(গালে হাত দিয়া অধোবদনে) হাঁ, তাই তো। (চিন্তা)

রেবতী—তুই আবার ভাবছিস কি ? (বসন্তকুমারীর পট লইয়া) দেখ দেখি, এ পটখানি কেমন ?

মালতী—এ কার ছবি ? তোমার ছবি ?

রেবতী—দূর হতভাগী ! এতক্ষণ কি শুনলি ?

মালতী—আমি কিছুই শুনতে পাইনি। আবার যাও শুনেছি, দোহাই ধর্মের, কিছুই বুঝতে পারিনি। মাইরি ! পারিনি।

রেবতী—(হাস্য করিয়া) কিছুই বুঝতে পারিস নি ? ও আমার দশা ! কিছুই বোধশোধ নেই ! তোর সম্মুখে এতকথা হলো, কিছুই বুঝতে পারলিনে। মরণ আর কি

মালতী—ঠাকরুণ ! তোমার পায়ে ধরি, এ ছবিটি কার বল।

রেবতী—ভোজপুরের রাজা বিজয় সিংহের মেয়ের ছবি।

মালতী—বল কি ? আঁ ! —মানুষে কি অমন সুশ্রী হতে পারে ? আমার তো বিশ্বাস হয় না। তুমি যাই বল, আমি বলছি, এ ছবিটি ঠিক নয়। লোকের মন ভুলাবার জন্যে মিছে করে এঁকেছে। যদি সত্য হয় তবে সে মেয়ে কখনই মানুষ নয়, কখনই না, নিশ্চয় দেবকন্যা। তা যাহোক মহারাজ তোমায় এ ছবিখানি কেন দিলেন ?

রেবতী—দিলেন সাধে ? সহজে দিয়েছেন ? আমি জোর করে রেখেছি। রাজা বিজয় সিংহের ইচ্ছা মেয়েটি নরেন্দ্রকেই দেন। ঠিক জানি না ; ভাবে বুঝতে পারছি, আর আমাদের রাজারও যেন ইচ্ছা তাই। সেইজন্যে

ছবিখানি নরেন্দ্রের কাছে পাঠাচ্ছিলেন। আমি দেখি, বিষম বিভ্রাট; নরেন্দ্রের বিয়ে হলে সে এই রাজ্যের রাজা হবে, তাহলে আর আমার মান, গৌরব কিছুই থাকবেনা, আর যা হবে, বুঝতেই পারছ।

মালতী—কেন থাকবেনা মহিষী? কুমার তোমায় যে রকম মান্য করেন তাতে তিনি বিয়ে করলেই যে একেবারে দয়া, মায়া কাটাবেন, এ তো আমার কখনই বিশ্বাস হয় না।

রেবতী—তুই যা বলিস মালতী! কিন্তু আমার তো সন্দেহ ঘুচ্ছে না।

মালতী—এত সন্দেহ কি তোমার?

রেবতী—সে আমার আত্মাই জানে, আর আমিই জানি।

মালতী—রাজমহিষী! তাতেই বা বিশ্বাস কি? বসন্তকুমারী স্বয়ম্বরা হয়ে কার গলায় মালা দেবে, তা কে জানে? সেজন্যে তোমার এত সন্দেহ কেন? হাঁ, তবে যদি জানতেম, সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে, যুবরাজই বর হয়েছে, এ বিয়ে হবেই হবে, তবেই যা হোক। এ তো তা নয়! এটি বারোয়ারি বিয়ে, কার কপালে কি আছে, বসন্তকুমারী যে কার হবে, আমি আন্দাজ করি বসন্তকুমারীও তা জানে না। এর জন্যে তোমার এত ভাবনা কেন? এখনই কি?

রেবতী—তুই বলিস কিরে! শত শত রাজপুত্রের মধ্যে নরেন্দ্রকুমার যদি অতি মলিনবেশেও সভায় একপাশে বসে থাকেন, আর এই মেয়েটি যদি (পটের প্রতি নির্দেশ করিয়া) যথার্থই রমণীকুলে জন্মগ্রহণ করে থাকে, মুনিকন্যাই হোক, আর দেবকন্যাই হোক, বিধি যদি উপযুক্ত নয়ন দিয়ে থাকেন, তাহলে সভা মধ্যে নরেন্দ্রকুমার ভিন্ন আর কাউকেই চক্ষে দেখবে না; যুবরাজকে মালা পরাতে হবে। পটে যে রূপ দেখা যাচ্ছে, এর চেয়েও যদি সে শতগুণে রূপবতী হয়; নরেন্দ্রকুমারের মুখপানে একবার নয়ন পড়লে যে ফিরে উলটে পলক ফেলবে, সে পথ আর থাকবে না। যতই কেন লজ্জাশীলা হোক না, একদৃষ্টে সেই মুখপানে চেয়ে থাকতেই হবে।

মালতী—দেখবো যুবরাজ তো ভোজপুরে যাবেন, কি করে আসেন, শেষেই দেখো —এখন আর কিছুই বলবনা, দুদিনের চাঁদ হলে ঘরে বসেই দেখতে পাব।

রেবতী—চুপ কর, ও কোন কাজের কথা নয়, তুই দেখিস! যদি নরেন্দ্রকুমার ভোজপুরে যান, তবে সে বসন্তকুমারীর ক্ষমতা কি যে, নরেন্দ্রকে ফেলে অন্য পুরুষের গলায় মালা পরাতে পারে, ওলো! তুই দেখিস, দেখিস! যদি নরেন্দ্রকুমার ভোজপুরে যায়. (দীর্ঘঃনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হা! আমি ধর্ম্মের দিকে ফিরেও চাইলেম না? লজ্জার মাথা খেয়ে সতীত্বকে বিসর্জন দিয়ে, কলঙ্কভার মাথায় বহন করতে হবে, লোকের গঞ্জনা সইতে হবে, অধর্ম্মে নরকে পুড়তে হবে। এ সকল ভেবেও রাজকুমারের প্রতি মন সমর্পণ করলেম, কিন্তু তিনি আমার পানে একবারও চাইলেন না। আমার সমুখে যতক্ষণ ছিলেন, আমি একবারও চক্ষের পলক উলটাতে পারিনি, কিন্তু তিনি তো মুখ তুলেও চাইলেন না। ধিক আমার জীবনে। যদি এই রমণী (পটের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া) তাঁর প্রণয়িনী হয়, তাহলে আমার আশা পূর্ণ করা দূরে থাক ফিরেও চাইবেন না। দিনান্তে কি মাসান্তে আমার কথা মনে আর করবেন না। হা! সকল আশাই নিরাশ হল। মালতী! এর উপায়? আমি তো আর বাঁচিনা।

মালতী—উপায় আর কি? একেবারে ক্ষান্ত দেওয়াই উপায়। কেন দুদিনের তরে গঞ্জনার ভাগিনী, পাপের ভাগিনী, কলঙ্কের ভাগিনী হতে চান; মলেও যে এ কলঙ্ক যাবে, তা মনে করোনা, বেহ্মাণ্ড যতদিন থাকবে, ততদিন এ কলঙ্ক যাবার নয়।

রেবতী—তুই যা বলিস, প্রাণ কোনমতে ধৈর্য্য মানে না। ভাগ্যে যাই থাক, যুবরাজকে পত্র লিখে মনের ভাব জানাব, এতে বিধি কপালে যা ঘটান, তাই স্বীকার—ভয় কি? একদিন তো মরতেই হবে, তাতে আর এত ভয় কি?

মালতী—কি বলে পত্র লিখবে?

রেবতী—যা মনে হয়, তাই লিখবো। তুই শীঘ্র আমার লিখনের উপকরণ নিয়ে আয়। (মালতীর প্রস্থান এবং কিঞ্চিৎ পরে লিখনের সমস্ত উপকরণ লইয়া উপস্থিতি)

মালতী—এই নিন। (রেবতী পত্র লিখিতে আরম্ভ)

রেবতী—(স্বগত) কি লিখি? (কালি লইয়া লেখনী কাগজে স্পর্শ) যা মনে হয়েছে, তাই লিখি। (লেখনী দন্তে স্পর্শ করিয়া চিন্তা) লিখবই,

অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে, (লিখিতে আরম্ভ—তিন-চারছত্র লিখিয়া কাগজদ্বিখণ্ড করে মুচড়ে নিক্ষেপ এবং পুনরায় লিখিতে আরম্ভ)

মালতী—(হেঁচে বাধা দিল)

রেবতী—দূর হতভাগী ! সব নষ্ট করলি। বাধা মানাই চাই। (কিঞ্চিৎ পরে লিখিতে আরম্ভ, দুই-তিনছত্র লিখিতেই লেখনী ভাঙ্গিয়া গেল, লেখনীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া) তুই আজ ভেঙ্গে গেলি ? (সক্রোধে লেখনী দুই খণ্ড করিয়া নিক্ষেপ) আর লিখব না. এত বাধা পড়ছে আর লিখব না। (দণ্ডায়মান) মালতী ! এ সব কাগজপত্র নিয়ে যা, আজ আর লিখব না। কি জানি—

মালতী—(লিখনের উপকরণ লইতে অগ্রসর)

রেবতী—রাখ ! রাখ ! (উপবেশন, পুনরায় কাগজ লইয়া লিখিতে আরম্ভ, ক্ষনকাল পরে পত্রলেখা শেষ হইল) দেখি কোন পথে।

মালতী—কি লিখলেন, আমায় একটু শুনান।

রেবতী—শুনবি ! তবে শোন।

(পত্র পাঠারম্ভ)

যুবরাজ ! চিনিতে কি পারিবে আমায়।
যেদিন প্রমোদবনে দেখেছি তোমায় ॥
শরতকুমার সনে গলাগলি করি।
বেড়াইতেছিলে করে হাত-ধরাধরি ॥
সেদিন নয়নকোণে হেরিয়ে তোমায়।
একেবারে মজিয়াছি প্রণয়-মায়ায় ॥
পার কি না পার তুমি চিনিতে এখন।
মনে মনে জানি আমি তুমি প্রাণধন ॥
মোহন নয়নবাণে বিঁধিয়ে নয়ন।
কোথা লুকাইয়া গেলে নাহি দরশন ॥
এঁকেছি হৃদয়পটে প্রতিমা তোমার।
ভুলিবনা কভু তাহা ভুলিবনা আর ॥
সে রূপমাধুরী প্রাণ ভুলিতে কি পারি

লহরী খেলিছে যেন সাগরের বারি
দূরে যায় ফিরে আসে লহরী যেমন
তেমনি তোমায় আমি জানি প্রাণধন ॥
বলে কি জানান যায় মনের বেদন।
যে ভুগেছে সেই জানে যাতনা কেমন ॥
তদবধি ভুগিতেছি আমি অভাগিনী।
খেতে শুতে সুখ নাই দিবস যামিনী ॥
হেরিয়ে মোহনরূপ ভুলিয়াছে মন।
হৃদয়ে রয়েছে গাঁথা মুরতিমোহন ॥
ভুলেছ, কটাক্ষশরে হরে নিয়ে মন।
মনে মনে জানি আমি তুমি প্রাণধন ॥
বিরহিণী একাকিনী ছিলাম কাননে।
যে দিন ভ্রামতেছিলে শরতের সনে ॥
মালতী আমার সনে ছিল সে সময়।
সাক্ষী দিবে কটাক্ষের মিথ্যাকথা নয় ॥
চুরি করিয়াছ মন হইয়াছ চোর।
তদবধি মনচুরি হইয়াছে মোর ॥
জপিতেছি কতদিনে হইবে মিলন।
বাঁচাও বাঁচাও প্রাণ প্রিয় প্রাণধন ॥

তোমারই প্রেমভিলাষিণী
রেবতী।

মালতী—বেশ হয়েছে। এখন দেখব যুবরাজ আমার উপর কেমন করে চোখ রাঙান। (রাজার প্রবেশ)

মালতী—(নিঃশব্দে দূরে দণ্ডায়মান)

বীরেন্দ্র—(রেবতীর হস্তে পত্র দেখিয়া) প্রিয়ে ! কোথায় পত্র লিখছ ?

রেবতী—(সক্রোধে) সে কথায় তোমার কাজ কি ?

বীরেন্দ্র—বল না কোথায় লিখছ, বল, আমার মাথা খাও বল। কোথায় লিখছ ?

রেবতী—আমি বলবনা, যাও আমি বলব না, যে কথা বলবনা, সে কথায় তোমার আবার কথা কেন, আর মাথা খাওয়াই বা কেন ?

বীরেন্দ্র—(হঠাৎ রেবতীর হস্ত হইতে পত্র গ্রহণ) কেমন এইতো নিয়েছি।

রেবতী—(ম্লান মুখে রাজার মুখ দর্শন)

বীরেন্দ্র—(ভয়ে) প্রিয়ে ! বিরক্ত হলে ?

রেবতী—(দুঃখিত স্বরে) বিরক্ত হব কেন ? হাত থেকে পত্রখানা কেড়ে নিলেন আপনি চাইলে আর আমি দিতুম না ! (অশ্রুপতন)

বীরেন্দ্র—বড় অন্যায় করেছি। তোমার অসম্মতিতে পত্রখানা হাতে থেকে কেড়ে নেওয়া বড়ই অন্যায় হয়েছে। প্রিয়ে ! ক্ষমা কর, পত্র নেও। (পত্র দিতে হস্ত অগ্রসর)

রেবতী—(সক্রোধে রাজার হাতে আঘাত করিয়া) আমি পত্র চাইনে। আপনি আমার হাত থেকে পত্র কেড়ে নিয়েছেন, ঐ পত্র আবার আমি হাতে কবব ?

বীরেন্দ্র—তোমার পায়ে ধরি। পত্র ধর, আমার অপরাধ হয়েছে। (পত্র রেবতীর সম্মুখে লইয়া) ক্ষমা কর, আর কোনদিন এমন হবে না। প্রিয়ে ! মার্জনা কর।

রেবতী—(পত্র লইয়া দূরে নিক্ষেপ) আমি আবার—কখনই—

বীরেন্দ্র—(অতিত্রস্তে পত্র আনিয়া রেবতীর পদধারণ) প্রিয়ে ! তোমার পায় ধরি, ক্ষমা কর, আমি যদি আগে জানতুম যে, এতদূর পর্য্যন্ত যাবে, তা হলে পত্র নেওয়া দূরে থাক ছুঁতুমও না। পায় ধরি—নেও, আর মনে ব্যথা দিও না।

রেবতী—(রাজার হস্ত হইতে পত্র গ্রহণ)

বীরেন্দ্র—তোমার পায়ে শত নমস্কার, বাপরে ! একমুহূর্ত্ত মধ্যে আমায় একেবারে ত্রিভুবন দেখিয়েছ।

রেবতী—(হাস্য মুখে) পত্রের কথা শুনবে।

বীরেন্দ্র—না না, আমি আর শুনতে চাইনে। তোমার পায়ে ধরি গো আর শুনতে চাইনে।

রেবতী—না না শুনুন। আপনি মনে মনে দুঃখিত হবেন, তা আর কাজ কি, শুনুন !

বীরেন্দ্র—তোমার ইচ্ছা হয়, ক্ষতি নাই ; কিন্তু আমি আর কিছু বলব না।

রেবতী—আমার যে ছোট ভগ্নী আছে তা আপনি জানেন তো?

বীরেন্দ্র—জানব না কেন?

রেবতী—আমার বিবাহ হওয়াবধি তার সঙ্গে আর দেখা নাই। অনেকদিন হলো, কোন সংবাদও পাই নাই, মনটা আজকে বড়-অস্থির হয়েছিল, তাকেই এই পত্র লিখেছি।

বীরেন্দ্র—প্রিয়ে! তুমি যদি বিরক্ত না হও, তবে আর একটি কথা বলি।

রেবতী—বলুন।

বীরেন্দ্র—তোমার ঐ কমল-কর-বিনির্গত পত্রখানি পাঠ করে আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রীতি সাধন কর।

রেবতী—তা আর হানি কি? আপনি শুনবেন, তাতে ক্ষতি কি? আপনার কাছে আমার গোপনীয় কিছু নহে। শুনুন। (মনঃকল্পিত রূপে হস্তস্থিত পত্র পাঠারম্ভ)

প্রিয় ভগিনী,

দীর্ঘকাল তোমার কুশল সমাচার অ-প্রাপ্তে যারপর নাই দুঃখ ভোগ করিতেছি। আমি পরাধিনী। রাজার বিনানুমতিতে পদ সঞ্চালনেরও ক্ষমতা নাই। তুমি অবশ্যই মনে করেছ যে, দিদি রাজরাণী হয়ে সুখে কাল কাটাচ্ছেন! সে কথা মনেও করো না। আমি সুখী হই নাই। কারণ তুমি যদি আমার নিকটে থাকতে তা হলে যথার্থ সুখভোগিনী হতেম। ভগিনী! সেই যখন আমার বিবাহ হয় নাই, দুজনে একত্রে কত খেলা করিয়াছি। পুতুল বিয়ে দিয়ে তুমি আমি কত সম্বন্ধ পেতেছি, সেই সকল পূর্ব্বকথা মনে হলে কিছুতেই সুখবোধ হয় না। এ অতুল্য সুখও যেন সে সময় বিষময় বোধহয়, রাজভোগ তখন আমার বিষবৎ বোধহয়। রাজা অত্যন্ত ভালবাসেন বলেই কিঞ্চিৎ সুস্থ আছি। নচেৎ আমার যে কি দশা হত, তা বিধাতাই জানেন। যত শীঘ্র শীঘ্র পার, তোমার শুভ সংবাদ লিখিয়া আমায় সুখী করিবে।

তোমারই—রেবতী।

বীরেন্দ্র—বেশ লিখেছ! থাসা কেন হবে না? প্রিয়ে! তুমি যে এমন লিখতে পার আমি স্বপ্নেও জানতেম না। যাহোক, শুনে বড় সুখী হলেম। তুমি

বস আমি আসছি। [প্রস্থান]

মালতী—প্রণাম করি! তোমার পায় দণ্ডবৎ হই! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। রাজা যখন তোমার হাত থেকে পত্র কেড়ে নিলেন, আমার প্রাণ তখনই উড়ে গিয়েছিল—মনে করলেম আজ সর্ব্বনাশ হলো।

রেবতী—ওলো! (হাসিতে হাসিতে) সেকেলে বুড়োরা কি একেলে মেয়েদের চাতুরী বুঝতে পাবে? দেখলি তো রাজাকে কেমন জব্দ করেছি, কেমন ঠকিয়েছি? তা যা-হোক, পত্রখানা আজকেই যুবরাজকে দিবি। মালতী! সাবধান! একটি প্রাণীও যেন টের না পায়। তাহলে তোমারই মাথা আগে কাটা যাবে। (শিরোনামা দিয়ে মালতীর হস্তে প্রদান)

পটক্ষেপণ।

(নেপথ্যে গীত)

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালী

যুবরাজ দেখা দিয়ে রাখ মোর প্রাণ।
যায় যায়, যায় প্রাণ।
সহেনা সহেনা আর তব অদর্শন বাণ ॥
হেরিয়ে প্রমোদবনে,
মরিতেছি মনোগুণে.
মনে করি ত্বরা আসি, কর প্রেম বারি দান।
তোমারি মিলন আশে
সুখ নীরে প্রাণ ভাসে,
ভাসায়োনা দুঃখ নীরে, দুঃখিনী রেবতীর প্রাণ ॥

তৃতীয় রঙ্গভূমি

ভোজপুর—রাজা বিজয় সিংহের বাটি

বসন্তকুমারীর শয়নমন্দির—বসন্তকুমারী আসীনা

বসন্ত—(স্বগত) আজকেই আমার জীবনের শেষ। আজই আমায়—ভগবান! তুমিই রক্ষাকর্তা! তুমিই অবলার আশ্রয়! সতীত্ব রক্ষার তুমিই একমাত্র উপায়। নাথ! তুমি কৃপানেত্রে অবলোকন না করলে দাসীর আর উপায়

নাই। যাঁরে স্বপ্নে দেখেছি, তাঁরে সভায় যদি দেখতে না পাই, তবে এ প্রাণ আব রাখবো না। (মেঘমালাব প্রবেশ)

মেঘ—তুমি একলা বসে কি ভাবছ? চুপেচুপে কি বলছ? এখানে তো কেউ নেই। কাকে কি বল? তোমার রকম সকম দেখে আমি অবাক হয়েছি, ছি! তুমি তো আর অবোধ নও। আজ তোমার বিয়ে, তোমার এ দশা কেন? বলতো তোমার এ বেশ কেন? ছি ছি! বড় ঘৃণার কথা! বেশ করে সাজগোজ করবে, সর্ব্বদাই হাসিমুখে আমাদের সঙ্গে মন খুলে মনের আমোদে কথা কইবে; হাসিখুশী করে ক্রমে দিন কাটাবে। তা নয়, আজ যেন চিরদুঃখিনী, বিবহিণী সেজেছ।

বসন্ত—সখী! আমি সাধে এরূপ হয়েছি আমার আহার নাই, নিদ্রা নাই, মনে সুখ নাই, কেবল দিবানিশি চিন্তা সাগরেই ডুবে রয়েছি। 'দেখনা ভাবতে ভাবতে আমি একেবারে সারা হলেম। আমি কি আর আমাতে আছি।

মেঘ—এতও জান! তোমার কিসের চিন্তা? আর ভাবছই বা কি? তোমার রঙ্গ দেখে আব বাঁচিনে বিয়ের মুখ দেখতে না দেখতে আগেই চিন্তাসাগরে ডুব দিলে?

বসন্ত—(দুঃখিত স্বরে) বিবাহই আমাব কাল হয়েছে বিবেচনা কব, আমি স্বপ্নে যারে বরণ করেছি, কণ্ঠহার গলায় পরিয়েছি, তাঁর দাসী হব, তাঁর চরণ সেবা করবো, এই বলে এতকাল পর্য্যন্ত দেবতার আরাধনা করছি, এই পোড়া চক্ষেব আড়াল হবে বলে প্রেম-তুলিকায় চিত্তপটে লিখে রেখেছি, সেই জীবন-সর্ব্বস্ব পতিভ্রমে যদি অন্য পুরুষের গলে মালা অর্পণ করি, তবে তো সতীত্ব-গৌরব একেবারে গেল! সখী! তুমি নিশ্চয় জেন, যদি আমার সেই চিত্ত-অঙ্কিত-রূপ সভায় নয়নগোচর না হয়, তবে সেই-খানেই আমি প্রাণ পরিত্যাগ করব। জীবন থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল।

মেঘ—তুমিও যেমন পাগল হয়েছ! কাকে কবে স্বপ্ন দেখেছিলে, না জেনে না শুনে তাকে মন দিয়ে বসে রয়েছ। স্বপ্নও কি কখন সত্য হয়? স্বপ্নে কণ্ঠহার বদল করেও কি কেউ বিয়ে করে? এও কি একটা কথার মত কথা? ওসব কথা ছেড়ে দেও, আমার কথা শুন ও চিন্তা দূর কর, কত

রাজপুত্র সভায় উপস্থিত থাকবেন, যাঁকে তোমার চক্ষে দেখতে ভাল বোধ-হয়, তাঁর গলে মালা দিও। এ তো আর কেউ ধরে বেঁধে দিয়ে বিয়ে দিচ্ছে না, তোমারই হাত, তোমারই চক্ষে যাকে ভাল দেখায় তারই গলে মালা দিও।

বসন্ত—(বিরক্তভাবে) যাও। ও সকল কথা মুখে এনো না, ও কথায় আমি বড় ব্যথা পাই। আমি যার দাসী, তাঁরি গলায় মালা দিয়েছি। তিনিই আমার প্রাণ তিনিই আমার জীবন যৌবনের অধিকারী, তিনিই আমার প্রাণের ঈশ্বর, তিনিই আমার সর্ব্বস্ব, তাঁর করে জীবন সমর্পণ করেছি। তা নেয় স্বপ্নেই বা হলো, তাতে ক্ষতি কি? তাঁরেই আমি পতি বলে সম্বোধন করেছি যদি তাঁকে সভায় না দেখতে পাই, যা মনে আছে তাই করবো।

মেঘ—দেখব! দেখব! বলতে সহজ গড়ে উঠা কঠিন। আচ্ছা! তুমি যে স্বপ্নে কণ্ঠহার গলে পরিয়েছ করস্পর্শ করেছ, পতি বলে সম্বোধন করেছ, তোমায় কিছু পরিচয় দেন নাই?

বসন্ত—কেন দিবেন না? অবশ্যই পরিচয় দিয়েছেন তুমি শুনতে চাও, আমি এত-কাল পর্য্যন্ত সে নাম কারো কাছে ফুটিনি মনের কথা মনেই আছে, আজ নাচারে পড়ে তোমার কাছে ভাঙছি। সখী! আমি যেমন যত্নে রেখেছি, তুমিও আমার হয়ে প্রাণনাথের নাম সযত্নে হৃদয় ভাণ্ডারে রাখবে।

মেঘ—তুমি এত সন্দেহ করছ কেন? আমি কোনদিন কোন কথা জিহ্বাতেও আনব না। যদি ভগবান তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, তখন প্রকাশ করব।

বসন্ত—সখী! আমার জীবন-সর্ব্বস্ব এইপ্রকারে পরিচয় দিয়েছেন। সত্য-মিথ্যা তিনিই জানেন। রাজা বীরেন্দ্র সিংহের পুত্র, নাম নরেন্দ্রকুমার। (অশ্রুপতন)

মেঘ—এও তো ভারি জ্বালা। আমি কেন নাম জিজ্ঞাসা করে তোমায় কাঁদালেম। এ কি! নাম বললেই কাঁদছ কেন? আজ আনন্দাশ্রু নির্গত হবে, না অনি-বার দুঃখের বারি দর দর করে পড়ছে। এ বড় দুঃখের কথা! আমি মিনতি করে বলছি, তুমি আর কেঁদনা। (অঞ্চল দ্বারা বসন্তকুমারীর চক্ষু মার্জ্জন)

বসন্ত—বলব কি সখী। প্রাণনাথের নাম মনে পড়লে কোথা থেকে হু-হু শব্দে চক্ষে জল এসে পড়ে। কত্তরূপে নিবারণ চেষ্টা করি, সকলই বিফল

হয়! (বিজয় সিংহের প্রবেশ)

(বসন্তকুমারী পিতৃচরণে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান)

বিজয়—এ কি! আজ তোমার মলিন বেশ কেন! আজ তোমার মলিন বদন দেখে মনে বড়ই বেদনা হচ্ছে। আজ তুমি স্বয়ম্বর গ্রহণ করবে, তোমায় কি এই বেশে থাকতে হয়? অপর সাধারণ তোমার জন্য সন্তোষ হৃদয়ে উত্তম উত্তম বেশভূষা করছে, মা তুমি কেন ম্লানমুখে মলিন বেশে রয়েছ? তোমার কিসের দুঃখ মা! আজ তুমি ভাল কাপড় পরবে, মণিময় অলঙ্কারে ভূষিতা হবে, কেশ বিন্যাস করবে না—তোমার সকলি বিপরীত দেখতে পাই। সহচরীরা! তোরা কোথায়? আমার বসন্তকুমারীকে সাজিয়ে দে। এই সমস্ত কারুকার্য খচিত বসন, এই সমস্ত মণিময়-অলঙ্কার এনেছি, তোরা সকলে মনের মত করে আমার বসন্তকে সাজিয়ে দে।

বসন্ত—পিতঃ! ও সকল বসন-ভূষণে আমার কাজ নাই। কৃত্রিম-রূপ অপেক্ষা ঈশ্বর-দত্ত-রূপই প্রশংসনীয়। শত খণ্ড হীরা মাথায় দিলেই যে গৌরবিণী হলো তা নয়, নারীজাতির সতীত্বই যথার্থ গৌরব, পতি ভক্তি ভূষণই রমণীর প্রধান ভূষণ। মণিমুক্তা, অলঙ্কারে সুরূপাকেই অধিক সুন্দরী দেখায়, কিন্তু পতি ভক্তি অমূল্য-ভূষণে সুরূপা—কুরূপা উভয়েই সুন্দরী। যে অলঙ্কারে কুরূপাকেও সুরূপার সমান করে, সেই অলঙ্কারই অলঙ্কার। দেশীয় রমণীগণ যে কেন স্বর্ণ-অলঙ্কারকে এত আদর করে, তার ভাব আমি কিছুই জানি না। পিতঃ! লজ্জাই অবলার অমূল্য-বসন। এ সকল জেনেও যে, রমণীগণ কারুকার্য খচিত বসনে অবগুণ্ঠন দ্বারা লজ্জা প্রকাশ করেন. এ বড় লজ্জার কথা। আমার অপরাধ মার্জনা করুন। আমি ও সকল অহঙ্কারপূর্ণ বসন—ভূষণ অঙ্গে ধারণ করে গৌরবিণী হতে বাসনা করি না। মিষ্টভাষিণী, নম্রস্বভাবা, সত্যবাদিনী, ধীরা এবং স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হলেই যখন তাঁর প্রণয়িনী হওয়া যায়, তখন কৃত্রিম-বেশভূষা স্বামীর ভালবাসা হতে ভালবাসি না।

বিজয়—বাছা বসন্ত! তোমার এই মধুমাখা কথা শুনে আমার শ্রবণেন্দ্রিয় জুড়াল। প্রাণাধিকা হেমন্তকুমারীর আর রাণীর মরণ হঠাৎ মনে পড়েছিল, তোমার এই সুশ্রাব্য কথাকটি শুনে এতদূর সুখী হয়েছি যে, সে সকল কথা কিছুই

মনে নাই। মা! তুমি আমার কুলের গৌরবিণী কন্যা, তুমি আমার বংশের উজ্জ্বল-মণি, মা! তুমি আমার শতপুত্রসম এক কন্যা জন্মেছ। তোমা হতে বিজয় সিংহের বংশ দ্বিগুণ উজ্জ্বল হবে। দেখ মা! আমি তোমার পিতা, আমার কথাও তো রক্ষা করতে হয়। মা! আমি বারে বারে বলছি, তুমি বেশভূষা কর। সখীরা! তোরা কোথায়? বসন্তকে সাজিয়ে দে।

[প্রস্থান]

মেঘ—রাজকুমারী! অলঙ্কার তো পরতে হলো? আর না বলতে পারবে না।

বসন্ত—কি করি, পিতার আজ্ঞা।

পটক্ষেপণ

চতুর্থ রঙ্গভূমি

ভোজপুর রাজপ্রাসাদ, আহুত যুবরাজগণ এবং কাশ্মীর

নর্ত্তকী-দ্বয়ের নৃত্য ও হিন্দি গান

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী—(কিঞ্চিত উচ্চস্বরে)

জয় হোক মহারাজ ইন্দ্রপুর পতি
ভুবনে বিখ্যাত বীর-বীরেন্দ্র কেশরী!
তোমারি শোভনে আজ শোভে রাজসভা—
অপূর্ব্ব শোভার হার শোভে যথা নভে।
দেবরাজ পুরন্দর স্বর সিংহাসনে
রাজিছে রাজন তব ভাতি মনোহর,
এ মহীমণ্ডলে আজি, রতন যেমতী
বাজে রত্নাকর-করে, বিপিন মাঝারে।
অপূর্ব্ব শোভায় শোভে মরকত মণি!
রহ রহ রাজগণ রহ ক্ষণতরে,
ভঙ্গদেহ প্রেমানন্দে আজিকার মত।
অয়ি! সুরঙ্গিনীবালা নাচিও না আর,
বাজনা বিরাম দেও রাজ-বাদ্যকর,
আসিছেন রাজবালা সভা মধ্যখানে।

সহচরীদ্বয় জগতমোহিনী,
যেমন বিদ্যুৎ লতা বাসন্তী গগনে !
সাজায়ে বরণ ডালা অগুরু চন্দন,
মনোহর ফুলমালা স্ববাসিত জল,
দু'ধারী চামর সেবি, সহাস্য আনন।
ওই দেখ আসিছেন বসন্তকুমারী।
নয়ন খেলিছে যেন যুগল খঞ্জন,
নীল শতদলে যথা যুগল ভ্রমর,
তেমনি শোভিছে তার মুখ শতদল।
আমারি, আমারি যেন প্রকৃতি আপনি
জগতের যত শোভা একঠাঁই করি
এনেছেন শোভিবারে রাজ তনয়ায়।
নবীন যৌবন বালা বসন্তকুমারী।
রহ রহ রাজগণ দেখ নেহারিয়া,
আসিছেন রাজকন্যা বিকাশি-বদন,
অকলঙ্ক চাঁদ যেন উদয় মহীতে
হইল, মোহিতে আজ তোমা সবাকার।

[প্রস্থান]

(সহচরীদ্বয় সঙ্গে বসন্তকুমারীর সভায় প্রবেশ—প্রথমে মলিন বদনে চতুস্পার্শ্বে দৃষ্টি—হঠাৎ নরেন্দ্রকে নয়নগোচর করিয়া পূর্ণানন্দে নরেন্দ্রকুমারের গলায় মাল্যদান—এবং সভাস্থ সকলের সন্তোষ-সূচক করতালি) (বিজয় সিংহের প্রবেশ)

বিজয়—মা! আমি মহা সুখী হলেম। উপযুক্ত পাত্রের গলাতেই মাল্য অর্পণ করেছ। আজ আমার আশা পূর্ণ হল। বৎস নরেন্দ্র! (সরোদনে) আমার সর্ব্বস্ব-ধন, আমার যত্নের রত্ন, বসন্তকে তোমার হস্তে সমর্পণ করলেম। আমার বসন্ত—(বসন্তকুমারীর হস্ত ধরিয়া নরেন্দ্রের হস্তে দান, সভাস্থ সকলে সহর্ষে করতালি এবং নেপথ্যে বিবিধ বাদ্য ও উলুধ্বনি)

পটক্ষেপণ

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম রঙ্গভূমি।

ইন্দ্রপুর; রাজবাটি—রেবতীর শয়ন মন্দির;

(রেবতী ও মালতী দাসী আসীনা)

রেবতী—মালতী! মনে পড়ে? কেমন, হয়েছে তো? আমি যা বলেছিলুম তাই হয়েছে কি-না?

মালতী—হয়েছে। আপনি যা বলেছিলেন, ঠিক তাই হয়েছে। পটে যে রূপ দেখেছিলেম, এখন তার চেয়ে শতগুণ সুন্দরী দেখতে পাচ্ছি। বেশ হয়েছে, যেমন যুবরাজ, তেমনি বসন্তকুমারী। যথার্থ রাজমহিষী! বেশ মিলেছে। মহারাজ এই বিবাহে বড়ই খুশী হয়েছেন। আবার শুনলুম যুবরাজকে রাজা করবেন। তাই নিয়ে পাড়ার মেয়েরাশুদ্ধ আমোদ করছে। যুবরাজ রাজা শুনে আরও খুশী হয়েছে। সকলেই বলাবলি করছে, কাল আমাদের যুবরাজ নরেন্দ্রকুমার রাজা হবে।

রেবতী—তুই বসন্তকুমারীকে ভালকরে দেখেছিস তো?

মালতী—দেখছি, অমন সুন্দর মেয়ে আর কখনও দেখি নাই। পাড়ার মেয়েরা তো বসন্তকুমারীকে দেখে আহ্লাদে গলে গলে পড়ছে। মহিষী! তোমায় কেন এমন দুঃখিত দেখছি? তোমার কিসের দুঃখ? তুমি রাজরাণী, তোমার কিসের দুঃখ?

রেবতী—মালতী! তুই আমার মনের ভাব জেনেও যে অমন কথা বলছিস? আমার প্রাণে আর সয়না। নরেন্দ্র বিবাহ করে এসে মনের আনন্দে নবযুবতীর সঙ্গে সুখভোগ করবেন, আর আমি তাই দেখব, আমার প্রাণে তাই সহ্য হবে, আমি মনে মনে পুড়ে মরব? এ কখনই হবেনা। (নিস্তব্ধ হইয়া ক্ষণকাল পরে) আমি আজ এর একখানা করবই করব। যুবরাজ রাজা হলে আর কোন উপায় থাকবেনা। যে আমার হল না তার উপর এত মায়া কেন? তার জন্য এত দুঃখই বা কেন? বসন্তকুমারী, তুই আমার সুখতরী ডুবালি। আচ্ছা, তোমার এ সুখের বাসা আজই ভাঙব,—ভাঙইব—ভাঙব। তখন দেখবে, রেবতী কেমন মেয়ে। যুবরাজ, তুমি আমার শত্রু, আজ তুমি আমার শত্রু! (বলিতে বলিতে অঙ্গের আভরণ ত্যাগ

এবং আলুলায়িত কেশে ধুলিশয্যায় শয়ন।

মালতী—এ কি ? এ কি কর ? ওমা ! তুমি এ কি কর ? কথা বলতে বলতে এ আবার কি ?

রেবতী—তুই চুপ করে থাক। তোর এত কথায় কাজ কি ?

মালতী—না, না, না, তুমি উঠ, মহারাজের অন্তপুরে আসবার সময় হয়েছে, তুমি উঠ।

রেবতী—না, আমি উঠবনা, তুই চুপ করে থাক। রাজা এলে কোন কথা বলিস নে, যা বলতে হয়, আমিই বলব। (রাজা বীরেন্দ্রের প্রবেশ)

মালতী—(সভয়ে দূরে দণ্ডায়মান)

বীরেন্দ্র—এ কি ? (কিঞ্চিৎকাল নিস্তব্ধে) বলি এ কি ? মালতী ! এ কেমন ? (নিকটে যাইয়া) প্রিয়ে ! তোমার কি হলো, তোমার এ দশা কেন ? আমার প্রাণ ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে, আমি এখনও দাঁড়িয়ে আছি ! কোন পীড়া হয়েছে ? না, না, তা নয়, অঙ্গের আভরণ যখন মাটিতে পড়ে আছে, তখন এ দুঃখের চিহ্ন ? তোমাকে কি কেউ মন্দ বলেছে ? না তাই বা কি করে হবে, কার জীবন ভার হয়েছে, বাঁচবার সাধ নাই যে, তোমায় মন্দ বলেছে। আমি তো কিছু বলি নাই। আর কারই বা এমন সাধ্য যে রেবতীকে কটু উক্তি করে বেঁচে যাবে। যথার্থই কি তার প্রাণের মায়া নাই ? এমন সাধ্য কার ? প্রেয়সী ! উঠ, তুমি আমার—(নিকটে যাইয়া) প্রিয়ে ! (হস্ত ধরিয়া) ছি ! এখনও চক্ষের জলে মাটি ভিজে যাচ্ছে। বীরেন্দ্র সিংহ বর্ত্তমান থাকতে তোমার চক্ষের জল পড়ছে ? বীরেন্দ্র সিংহের মহিষীর চক্ষে জল পড়ছে ? যদি যথার্থই তোমার কেউ কোন কথা বলে থাকে, তবে তুমি তার কেবল নামটি মাত্র বল। দেখ, তোমার সম্মুখেই এই দণ্ডেই এই অসি দ্বারা সে দুরাত্মার, শিরচ্ছেদন করব। প্রিয়ে ! উঠ, আর আমায় কষ্ট দিও না।

রেবতী—(ক্রন্দন করিতে করিতে) আমি দেহে আর প্রাণ রাখব না। তুমি দেখ, তোমার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করছি, দাঁড়াও ! তোমার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করি।

বীরেন্দ্র—তোমার পায় ধরি, তোমার জীবনে এত ঘৃণা কিসে হল ? স্পষ্ট করে

বল। আমি বীরেন্দ্র যদি তার কোন প্রতিফল না করতে পারি, তবে তুমি একা মরবে কেন, আমিও তোমার সহগামী হব। তুমি আমার—তুমি মরবে কেন ?

রেবতী—মহারাজ ! সে বড ভয়ানক কথা। আমি সে কথা মুখে আনতে পারিনা। আমার মরণই ভাল। পুত্রের এই কাজ ! আমি নয় বিমাতাই হলমে ! তাইবলে কি তিনি আমায় কোন মন্দ কথা বলতে পারেন ? এই কি ধর্ম্ম ? তুমি কোথায় ! আমি এ প্রাণ রাখবনা। পুত্র হয়ে আমায় এমন কথা বলতে পারে ? ছি ছি প্রাণে ধিক ! নারীকুলে ধিক ! তোমার মত রাজার শত ধিক ! আমি তোমার রাণী হয়ে আবার তোমারই পুত্র মুখে—শুনতে হল ; হায় ! হায় ! প্রাণ বের ও, আর কষ্ট দিওনা। নরেন্দ্রের দুষ্ট-অভিসন্ধির কথার ভাব শুনেও কি তোমার ঘৃণা হয় নাই ? তোমায় শত ধিক। তুমি এতক্ষণ যে দেহে আছ সে দেহকেও ধিক !

বীরেন্দ্র—প্রিয়ে ! আর বলনা। আর বলতে হবেনা। আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। এখনই চক্ষে দেখতে পাবে, বীরেন্দ্রের ক্ষমতা আছে কি না ? তুমি স্থির হও। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, এই অসি দ্বারা তোমার সম্মুখেই দুর্ব্বৃত্ত কুলাঙ্গারকে এখনই দুই খণ্ড করব। বড় লজ্জার কথা ! পুত্রের এই কাজ ? (ক্রোধ স্বরে) নগরপাল। নগরপাল !

রেবতী—মহারাজ ! অন্তঃপুর মধ্যে নগরপাল কোথায় ?

বীরেন্দ্র—আমি হতজ্ঞান হয়েছি ! মালতী ! তুমি শীঘ্রই নগরপালকে ডেকে আন।

(মালতীর প্রস্থান)

রেবতী—হায় হায় ! আমার অদৃষ্টে এই ছিল। রাজরাণী হয়ে এই হল। সকলের কাছে মাননীয়া হব, লোকের নিকট আদরিণী হব, সুখে থাকব বলেই পিতামাতা রাজরাণী করে দিয়েছিলেন, হায় হায় ! শেষে অদৃষ্টে এই হল। মহারাজ ! (রোদন-স্বরে) আমার বাঁচবার আর সাধ নাই।

বীরেন্দ্র—কেন এত দুঃখ করছ। দেখ ! তোমার সম্মুখেই দুরাত্মার উচিত শাস্তি করছি। আর কেঁদনা, আমার মাথা খাও, আর কেঁদনা। তোমার চক্ষের জল আমি আর দেখতে পারিনা।

রেবতী—(কিঞ্চিৎ উচ্চস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে) মহারাজ ! ছি ছি ! বড় ঘৃণার কথা ! আপনার কোন অপরাধ নাই, আমার মাথা আমিই খেয়েছি !

নরেন্দ্রকে অন্তঃপুরে ডেকে এনে শেষে এই ফল হল! মহারাজ! ও দুরাচা-
রের মাথা কেটে তুমি তোমার হাত অপবিত্র করনা, কখনই করনা, আমি
বলছি. আমার সম্মুখে কুলাঙ্গারকে জলন্ত-অনলে প্রবেশের অনুমতি কর।
ওর মৃতদেহ যেন আর চক্ষে দেখতে না হয়। যদি আপনার আজ্ঞা অবহেলা
করে, তবে হাত-পা বেঁধে আগুনে ফেলে দেও, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত অস্ত্রে
হবেনা, জলে হবেনা, কিছুতেই হবেনা, অনলই এর যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত। এই
যদি পারেন, তবে আমায় পাবেন, নচেৎ আমার মায়া ত্যাগ করুন।

বীরেন্দ্র—ছি! তুমি একথা মুখেও এনো না, তুমি আমার প্রাণ, তোমার মায়া
ত্যাগ করলে আমার শূন্যদেহে ফল কি? আর আমিই বা কি করে বাঁচব?
তুমি কখনও অমন কথা মুখে এনোনা। অমন দুরাচার কু-সন্তানের মুখ
দেখতে আছে? আমি কি পুনরায় ওকে পুত্র বলে সম্বোধন করব? স্পষ্টই
বলছি, যাতে তোমার দুঃখ নিবারণ হয়, আমি তাইই করব।

(নগরপালের সহিত মালতীর পুনঃ প্রবেশ)

মালতী—(করযোড়ে কাঁপিতে কাঁপিতে) মহারাজ! নগরপাল উপস্থিত।

বীরেন্দ্র—(ক্রোধযুক্ত স্বরে) নগরপাল! নরেন্দ্রকুমারকে যে অবস্থায় দেখবে, সেই
অবস্থাতেই হস্তপদ-বন্ধন করে আমার কাছে নিয়ে এস। [নগরপালের
প্রস্থান]

পটক্ষেপণ

দ্বিতীয় রঙ্গভূমি

ইন্দ্রপুর; যুবরাজ নরেন্দ্র ও বসন্তকুমারীর শয়ন ঘর; —যুবরাজ ও
বসন্তকুমারী আসীন।

নরেন্দ্র—প্রিয়ে! তুমি যে বাসর-গৃহে বলেছিলে মনের কথা বলব, কই আর কিছুই
বললে না? এখনও কি সময় হয় নাই?

বসন্ত—নাথ! আমি যে বলবো বলেছি, সে তো বলবই; আপনাকেও একটি কথা
বলতে হবে। আপনি না বললে আমি বলব না। কখনও বলব না।

নরেন্দ্র—প্রিয়ে! দেখ দেখি, এ কেমন কথা; তোমার কাছে কোন কথা আমার
চাপা আছে? মনের কথা এমন কি আছে যে, তোমায় গোপন করব?

বসন্ত—কি জানি, পুরুষের মন।

নরেন্দ্র—আমি তেমন পুরুষ নই যে, উপযুক্ত স্ত্রীর নিকট কোন কথা গোপন রাখব।

বসন্ত—বলবে তো সত্য কললে? বলি, এই যে পত্রখানি আমি তোমার বাক্সে পেয়েছি, এখানি কার লেখা? সই দেখছি রেবতী; সে কোন রেবতী যুবরাজ? লেখার ভাবে বোধ হচ্ছে সে রমণী আমা হতেও আপনার যত্ন করে—মনের সহিত ভালবাসে। আপনি যে দিন যার হাতে পত্রখানি পেয়েছেন, তাও লিখে রেখেছেন। (নরেন্দ্র মস্তক হেঁট করণ) মাথা হেঁট কললে যে? বলোনা, সত্য করেছ; সে কোন রেবতী? আর কোন মালতী।

নরেন্দ্র—আমি মিনতি করছি ও কথা তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করো না, আর অন্য যা জিজ্ঞাসা করবে তাই বলব।

বসন্ত—না না, তা হবে না; আপনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, বলুন, না বলে কি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবেন?

নরেন্দ্র—যথার্থই শুনবে।

বসন্ত—শুনবই, না শুনলে ছাডবনা।

নরেন্দ্র—আর কোন রেবতী, বুঝতেই পারছ! মালতী দাসীকেও চিনেছ, আর বেশী বলতে পারিনা।

বসন্ত—(আশ্চর্য্য হইয়া) সে কি? কি কথা! এমন! ছি ছি! নারীকুলে এখনও এমন আছে? ধিক নারীর জীবনে! (গালে হাত, নিস্তব্ধ)

নরেন্দ্র—প্রিয়ে! পত্রখানা খণ্ডখণ্ড করে ভস্মসাৎ করে দেও, কি জানি, দৈবাৎ আর কারো হাতে পড়লে একেবারে জীবন্মৃত হতে হবে। পত্রখান দেও। আমি পুড়িয়ে ফেলি।

বসন্ত—(প্রদান) পত্র নিন কিন্তু পুড়িয়ে ফেলবেন না। ছিড়েও ফেলবেন না। আমার কথা রাখুন, পত্রখানা বাক্সের মধ্যে পুরে রেখে দিন, কি জানি—কি হবে।

নরেন্দ্র—আচ্ছা! তবে তোমার কথাই শুনলেম এখন থাক, পরে সাবধানে রাখব। প্রিয়ে! এখন তুমি তোমার কথা বল।

বসন্ত—আমার আরো কথা আছে। আমি অবাক হয়েছি।

বসন্ত—বাসরঘরের যে পর্য্যন্ত বলেছি, তা বেশ মনে আছে?

নরেন্দ্র—যাও! ওসকল কথা মুখে এনো না. আর মনেও করো না, তুমি কি বলছিলে তাই বল।

নরেন্দ্র—সে কি আর ভুলি?—অন্তরে গেঁথে রেখেছি।

বসন্ত—তারপর মনে এই স্থির কল্লেম, যদি আমার চিত্ত-অঙ্কিত রূপ সভায় নয়নগোচর না হয়, তবে সেইখানেই আত্মহত্যার দ্বারা প্রাণত্যাগ করব। এদিকে বিবাহের দিন উপস্থিত হলো। আমি ভাবতে ভাবতে একেবারে সারা হলেম। সখীরা, প্রতিবেশীরা, শেষে পিতা এসে কতমতে প্রবোধ দিলেন, বসন ভূষণ পরতে অনুরোধ কল্লেন আমার যে কেন বিরসভাব, কেন যে দুঃখিত মনে আছি, তা তো কেউ জানতেন না। মনের কথা কেবল মনেই জানে। বেশভূষা করতে আমার ইচ্ছা মাত্র ছিল না—পিতার অনুরোধে বেশভূষা করে সভায় যেতে হলো. কিন্তু আমি তখন যে কি অবস্থায় ছিলাম, তা কিছু মনে নাই; কে আমায় সঙ্গে করে যে কোন পথে উপস্থিত করেছিল তাও জানি না, পরে যখন আপনার প্রতি দৃষ্টি পড়েছে, (মুখপানে চাহিয়া) এই বদনকমল দর্শন করেছি, আহ্লাদে সে সময় যে, কি করি, কিছুই ভেবে উঠতে পারি নাই।

নরেন্দ্র—তারপর?

বসন্ত—তারপর, এখন বলতে হাসি পাচ্ছে, তখন কেঁদেছি। শেষে আর অপেক্ষা না করে কণ্ঠহার—(নগরপালের প্রবেশ,—যুবরাজকে বন্ধন)

বসন্ত—নাথ!—নাথ! আমার প্রাণনা—(মূর্চ্ছা)

নরেন্দ্র (কাতর স্বরে) নগরপাল! এ কি? কি করে মলেম!—প্রাণ গেল!

নগর—চোপরাও! মহারাজকা হুকুম।

নরেন্দ্র—উহু! উহু! আর সয় না—বন্ধন জ্বালা আর সয় না। নগরপাল!—পিতা কি অপরাধে আমার প্রতি এমন নিষ্ঠুরতা কল্লেন! প্রাণ যে গেল! বন্ধন খুলে দেও, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। আমি পালাব না। যাতনা আর সহ্য হয় না।

নগর—(ক্রোধযুক্ত স্বরে) মহারাজকা হোকুম, তোমাকে বাঁধকে লে যাগা।

নরেন্দ্র—(কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া বসন্তকুমারীর প্রতি) প্রিয়ে! সর্ব্বনাশ হয়েছে।

আমার অদৃষ্টে কি আছে—বলতে পারি না। কি জানি. যদি আর দেখা না হয়। একবার ওঠো।

বসন্ত—(নেত্র উন্মীলন করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে) নাথ! তোমার এ-দুর্দ্দশা কেন? তোমায় কে বেঁধেছে? (নগরপালের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পুনর্ব্বার মূর্চ্ছা)

নরেন্দ্র—হায় হায়! এ দুর্দ্দশা আর প্রাণে সয় না। নগরপাল! আমি মিনতি করছি ক্ষণকাল-জন্য বন্ধন মুক্ত কর—আমি বসন্তকুমারীকে সান্ত্বনা করি। বসন্তকুমারীর দশা আমার আর সহ্য হয় না।

নগর—(কর্কশ স্বরে) সো হোগা নেই।

নরেন্দ্র—(দণ্ডায়মান হইয়া বসন্তকুমারীর প্রতি) প্রিয়ে। তবে আমি বিদায় হই।

বসন্ত—(ক্ষণকাল পরে) মনে করি, এইবার দেখলে বুঝি আর রোদন-বদনও দেখব না -বন্ধন দশাও দেখব না। নাথ! —সেই আশায় কতবার চোখ বুজলেম —চাইলেম, তবু বন্ধনদশা!—সেই রোদন-বদন! বলো তো তুমি কি অপরাধে অপরাধী? হে রাজপুত্র! তুমি কার কি মন্দ করেছ? তুমি কার কি ধন চুরি করেছ? তোমারে চোরের চেয়েও যে. কঠিন বেঁধেছে! (উপবেশন) সত্যি সত্যি যদি কোন অপরাধে অপরাধী হয়ে থাক, তবে তার প্রতিশোধ কি ধনে হয় না? তোমার পায় ধরি খুলে বল। তার প্রতিশোধ কি হবে না। আমার সমস্ত অলঙ্কার দিচ্ছি, বহুমূল্য পট্টবসন দিচ্ছি. আমার যে সম্পত্তি আছে, তাও দিচ্ছি, তাতেও যদি শোধ না হয়, আমার প্রাণ দিচ্ছি, তোমায় কেউ যেন কিছু বলে না। (নগরপালের প্রতি) তোমার কি কিছুমাত্র দয়া নাই? যার নয়নজল পড়লে হৃদয় বিদীর্ণ হয় —পাষাণও গলে যায় তোমার প্রাণ কি পাষাণের চেয়েও কঠিন? রক্ত-মাংসের শরীর যে এমন এ আমি কখন দেখি নাই। কারো মুখেও শুনি নাই। হঠাৎ বন্ধনে নাথের বিরস-বদন দেখেও কি তোমার অন্তরে দয়া হল না? ঐ মুখের কাতর স্বর শুনেও কি তোমার মন যেমন তেমনি থাকল? কিছুই মায়া হলো না? ঐ চক্ষের জল দেখে এখনও যে বিশাল-নয়নে চেয়ে রয়েছ, ধন্য তোমার কঠিন প্রাণ! (রোদন)

নরেন্দ্র—রাজার আজ্ঞা, নগরপাল কি করবে?

বসন্ত—কি ? —রাজার আজ্ঞা ! তুমি এমনই কি অপরাধ করেছ যে, পিতা হয়ে পুত্রের প্রতি এমন নিষ্ঠুর আজ্ঞা করলেন ?

নগর—(হস্ত-স্থিত রজ্জু ধরিয়া যুবরাজকে আকর্ষণ) আর দেরি করণে নেহি সাকতা।

বসন্ত—হায় হায় ! প্রাণ যে গেল নগরপাল ! তোমার পায়ে ধরি। আর অমন করে টেন না। এই কণ্ঠহার তোমায় দিচ্ছি, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর আমিও নাথের সঙ্গে যাব। (হার প্রদান)

নগর—মহারাজ কা হুকুম, ক্যা করেগা, (হার গ্রহণ, যুবরাজের বন্ধন মোচন)

নরেন্দ্র—না—না, তুমি আমার সঙ্গে যেওনা, এ হতভাগার সঙ্গে গিয়ে তুমি কেন অপমানা হবে ! আমার অদৃষ্টে যা থাকে, তাই হবে। তুমি ঘরে থাক।

বসন্ত—তোমার এই দশা দেখে আমি ঘরে থাকব ? তোমার মান চেয়েও কি আমার মান অধিক ? তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব। আমাদের দুজনকে দেখেও কি মহারাজের মনে একটু দয়া হবে না ?

নরেন্দ্র—(কাতর স্বরে) তুমি রাজার নিকটে যেওনা, আমিই একা যাই।

বসন্ত—মিনতি করে বলছি, এই দুটি চরণ ধরে প্রার্থনা করছি, (পদধারণ) আমায় নিয়ে চলুন।

নরেন্দ্র—যদি একান্তই যাবে, তবে চল। [সকলের প্রস্থান]

(নেপথ্যে গান)

রাগিনী বেহাগ—তাল আড়া।

মিছে কেন মিছে ভবে এত অহঙ্কার।
ভাবিতে কি হবে ভবে হেন সাধ্য কার॥
ছিলাম রমণী সনে,
প্রেমরসে আলাপনে,
মিছে প্রণয় বন্ধনে,
করি হাহাকার।
মনে ছিল যত আশা,
সকলি হলো নিরাশা,
ভাঙ্গিল আশার বাসা,

হেরি অন্ধকার।
আমার যুগল করে,
কঠিন বন্ধন করে,
পরান কেমন করে,
বাঁচিনে যে আর॥

তৃতীয় রঙ্গভূমি

ইন্দ্রপুর, রেবতার শয়নমন্দির।—রেবতী, মালতী, বীরেন্দ্র সিংহ, বৈশম্পায়ন, নরেন্দ্র, বসন্তকুমারী, নগরপাল, প্রতিহারী প্রভৃতি উপস্থিত।

বীরেন্দ্র—(ক্রোধযুক্ত স্বরে) রে দুরাত্মা! রে কুলাঙ্গার! তুই এখনও আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছিস? তুই না পণ্ডিত হয়েছিলি? নানা শাস্ত্রে বিশারদ হয়েছিলি? তার ফল বুঝি এই ফললো? তোর এতবড় আস্পর্দ্ধা, ধর্ম্ম বলেও তোর ভয় হলো না? রে পাপাত্মা। তোর মুখ দেখলেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। এই অসি দ্বারা (অসি প্রদর্শন) স্বহস্তেই তোর মস্তক ছেদন করতেম, তা করবো না। তুই যে পাপ করেছিস, তোর মাথা কেটে কি পবিত্র হস্তকে অপবিত্র করবো? তোর শোণিতাক্ত শির মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হয়ে কি ইন্দ্রপুরের গৌরব লোপ করবো? বীরেন্দ্র সিংহের রাজপুরীয় মহত্ত্ব যাবে? তোর পক্ষে এই দণ্ডাজ্ঞা যে, ঐ প্রজ্বলিত অনলে প্রবেশ করে আত্মবিসর্জ্জন কর। যদি আমার আজ্ঞা অবহেলা করিস, তবে এই দণ্ডেই তোর হস্তপদ বন্ধন করে এই জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করবো।

নরেন্দ্র—পিতঃ! আমার হস্তপদ বন্ধন করে আগুনে ফেলতে হবে না। আপনি যখন আজ্ঞা করেছেন; তখন সে আজ্ঞা শিরোধার্য। তবে আসন্নকালে এই নিবেদন, আমি কি অপরাধে অপরাধী, সেইটি শুনতে চাই! যদি কোন অপরাধও না করে থাকি, আর আপনি ইচ্ছা করে আমায় অনলে আত্মসমর্পণ করতে অনুমতি করছেন, তাও বলুন। আমি সন্তোষ হৃদয়ে আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করে পুত্রের কাজ করছি।

বৈশ—যুবরাজ! আপনি রাজমহিষীর পবিত্র সতীত্বের নিকট অপরাধী, সুতরাং আপনি দণ্ডনীয়! মহারাজ রাণীর নিকট প্রতিজ্ঞা করেছেন, অদ্যই আপনার প্রাণবিনাশ করে সমুচিত দণ্ডবিধান করবেন।

নরেন্দ্র—(নিস্তব্ধ) হা ভগবান! (বসন্তকুমারীর প্রতি) প্রিয়ে ? আর কেঁদো না। এ কাঁদবার সময় নয়। কাঁদলে আর কি হবে পিতার আজ্ঞা! তুমি আমায় জন্মশোধ বিদায় দেও। পিতঃ! আমি বিদায় হলেম! —মা রেবতী! আমারে জন্মের মতন বিদায় দিন!

বসন্ত—(সরোদনে) নাথ! আমি যে চিরসঙ্গিনী, যেখানে যাবেন আমিও সেখানে যাব! (রোদন)

নরেন্দ্র—প্রিয়ে! সে কি কথা? তুমি এখনও বুঝতে পার নাই? আমি জন্মের মত বিদায় হচ্ছি।

বসন্ত (উচ্চরোদনে) তা কখনই হবে না। —বসন্তকুমারী তোমারে কখনই প্রাণ থাকতে অসহায় হয়ে অনলে প্রবেশ করতে দেখবে না। আগে আমিই আগুনে ঝাঁপ দিব। এও কি কখনও হয়, যে, পতির মরণ স্বচক্ষে দেখে সতী-স্ত্রী জীবনধারণ করে থাকে? নাথ! এই দেখুন সেই বিবাহের রাত্রের অলঙ্কার অঙ্গেই আছে, পায়ের আলতা পায়েই আছে, সিঁতার সিঁদুরও মলিন হয়নি, এই বেশেই পতির সঙ্গে অনলে প্রবেশ করবো। মিনতি করে বলছি চিরসঙ্গিনী অভাগিনীর চক্ষের পথে একবার দাঁড়াও, আমি তোমার সম্মুখে ঐ জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করি।

নরেন্দ্র—তবে প্রস্তুত হও।

বসন্ত—আমি প্রস্তুত আছি। কেবল আজ্ঞার অপেক্ষা!

নরেন্দ্র—(পিতৃচরণে প্রণাম করিতে উদ্যত) পিতঃ! বিদায় হলেম।

বীরেন্দ্র—পামর! তুই আমায় স্পর্শ করিস না। কখনই করিস না!

নরেন্দ্র—(ম্লান মুখে) মন্ত্রীবর! নরেন্দ্র অদ্য জন্মের মত বিদায় প্রার্থনা করছে। মন্ত্রীবর! আপনি শৈশবকাল হতে আমায় যে এত স্নেহ করেছেন, হতভাগা দ্বারা তার প্রতিশোধ কিছুই হলো না। সমস্ত অপরাধ মার্জনা করবেন, আর প্রিয়বন্ধু শরৎকুমারকে বলবেন, নরেন্দ্র পিতৃআজ্ঞা পালনে অনলে আত্মবিসর্জন করেছে। (শরৎকে উদ্দেশে) প্রিয়মিত্র শরৎ! মরণ সময় তোমার সঙ্গে দেখা হলো না? মনের কথাও বলতে পারলেম না। মিত্র! অজ্ঞাতে যদি কোন অপরাধ করে থাকি, মার্জনা করো। বন্ধু ভেবে কোনদিন যদি কিছু রূঢ় কথা বলে থাকি, মার্জনা করো। পুরবাসিগণ!

জননী মৃত্যু সময় তোমাদের হাতেই আমায় সঁপে দিয়ে গিয়েছিলেন, আমি তোমাদের কিছুই উপকার করতে পারলেম না মার্জনা করো! মা রেবতী! বিদায় হই! জন্মের মত বিদায় হই। পিতঃ! মাতৃহীন নরেন্দ্র আজ জন্মশোধ বিদায় হলো। (পদদ্বয় গমন এবং পুনরায় পশ্চাৎদিকে ফিরিয়া রাজার প্রতি) পিতঃ! —(বসন হইতে পত্র লইয়া) এই পত্রখানা একবার পাঠ করবেন। পত্র দান বসন্তকুমারীর হস্ত ধরিয়া উভয়ে অনলে প্রবেশ)

বীরেন্দ্র—(পত্র হস্তে করিয়া) নরাধমের পত্র পড়ব? না, পড়ব না। ও পাপাত্মার পত্র হাতে করাই অন্যায় হয়েছে। (ছিন্ন করিতে উদ্যত)

বৈশ—(করযোড়ে) মহারাজ! পত্রখানা নষ্ট করবেন না। যুবরাজ আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করে অনলে আত্মসমর্পণ কললেন। তাঁর প্রতি আর কোপ কেন? তাঁর পত্র পড়তে হানি কি? একবার দৃষ্টি করুন। অবশ্যই কোন কারণ থাকতে পারে।

বীরেন্দ্র—(পত্র খুলিয়া মনে মনে পাঠান্তে মালতীর প্রতি দৃষ্টিপাত) মালতী।

মালতী—(ক্রন্দন করিতে করিতে রাজার পদধারণ) দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমি কিছু জানি না। আমার কোন অপরাধ নাই। রাণী এই পত্র লিখে যুবরাজের হাতে আমায় দিতে বলেছিলেন, তাই আমি দিয়েছি। দোহাই ধর্ম্মের! আমি আর কিছু জানি না। যে দিন রাণী পত্র লেখেন, সেই দিন আপনি এই পত্র রাণীর থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন। আবার আপনি ফিরিয়ে দিলেন। আমি আর কিছু জানি না। আজ যুবরাজ রাণীর সঙ্গে কোন কথা কওয়া দূরে থাক, অন্তঃপুরেই আসেন নাই। মিছামিছি একটা ছল করে গায়ের গহনা খুলে মাটিতে পড়ে ছিলেন।

রাজা—(আর্তস্বরে) নরেন্দ্র! —আমার নরেন্দ্র! —বিনা অপরাধে! —আমার নরেন্দ্র! নরেন্দ্রের কোন অপরাধ নাই! হায়! হায়! দুশ্চারিণী রেবতীর ছলনায় আমার নরেন্দ্রকে! —প্রাণের নরেন্দ্র! —ওরে পাপীয়সি! রে পিশাচী!—তোর শাস্তি—(সজোরে তরবারি আঘাত)

রেবতী—(ভূতলে পতিত হইয়া) যুবরাজ! আমিই তোমার জীবন-নাশের মূল। আমার সমুচিত শাস্তি হয়েছে!—হ-য়ে-ছে—যু-ব-রা-জ! (প্রাণত্যাগ)

বীরেন্দ্র—(সরোদনে) মন্ত্রীবর! পিশাচীর শাস্তি হয়েছে! হায় হায়! আমার কি হলো! আমি কোথা যাব! আমার নরেন্দ্র! নরেন্দ্র! আমি তাকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছি হায় হায়! কি অধর্ম্মের কাজ করেছি! বিনা-অপরাধে, বিনাদোষে আমার কুলতিলককে,—আমার বংশের শিরোমণিকে, আগুনে পুড়ে মারলেম! হায় হায়! আমি কি পাষণ্ড,—কি নিষ্ঠুর,—প্রাণাধিকা বসন্তকুমারীর প্রতি ফিরেও চাইলাম না। মা আমার নরেন্দ্রের সঙ্গেই অনলে প্রবেশ করলেন। আমি সেদিকে ফিরেও চাইলাম না। ধিক আমার জীবনে! (মন্ত্রীর হস্ত ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে) মন্ত্রীবর! আমার কি হবে? আমি কোথা যাব? আমি দুর্ম্মতি রেবতীর কথায় ভুলে প্রাণাধিক সন্তানের প্রতি এমন নিষ্ঠুর আচরণ করলেম। মায়াবিনীর মায়ায় ভুলে পুত্রের মায়া বিসর্জন করলেম! হায় হায়! দুশ্চারিণীর হাত থেকে পত্রখানা কেড়ে নিয়ে পড়ি নাই, আমার মত নরাধম নির্ব্বোধ আর কে আছে? আমার মত পামরের মুখ দেখতে নাই। মন্ত্রীবর! আমার নরেন্দ্র কি যথার্থই আগুনে পুড়েছে! নরেন্দ্র! (পতন ও মূর্চ্ছা)

মন্ত্রী—(জল সেচন) এখন দুঃখ করলে আর কি হবে?

বীরেন্দ্র—(কিঞ্চিৎপরে চেতন পাইয়া) হা! আমার প্রাণ এখনও পাপদেহে রয়েছে! নরেন্দ্রই যদি প্রাণত্যাগ করলে, তবে আমার জীবনের ফল কি? এ পাপাত্মার জীবনে ফল কি? হায় হায়! কি বলেই বা দুঃখ করি! কোন মুখেই বা নরেন্দ্রের নাম উচ্চারণ করি! মন্ত্রীবর! যথার্থই কি আমার নরেন্দ্র জীবিত নাই! সত্য সত্যই কি আগুনে পুড়ে মরেছে! আমি সেই আগুন দেখব! আর সহ্য হয় না! (শিরে করাঘাত করিতে করিতে গমন) হায়! হায়! এই আগুনে পুড়ে আমার নরেন্দ্র মরেছে! (অগ্নির দিকে দৃষ্টি-পাত করিয়া উচ্চস্বরে) অগ্নিদেব! আমার নরেন্দ্র দাও! —প্রাণাধিক নরেন্দ্র! —নিরপরাধী শিশু! —আমার নরেন্দ্রকে ফিরিয়ে দাও! নরেন্দ্র প্রাণের নরেন্দ্র! বিনাদোষে বিনা-অপরাধে প্রাণের নরেন্দ্রকে আগুনে—হায়! হায়! প্রাণের সন্তানকে আগুনে পুড়িয়ে মারলেম! উহু! কি নিদারুণ কথা!—দুশ্চারিণীর পত্রখানা হাতে করেও সে সময় পড়ি নাই, কি কুহক—সত্যই কুহকিনী আমাকে কুহকজালে আবদ্ধ করেছিল! ধিক

আমাকে! ধিক আমাকে! বাছা নরেন্দ্র। কোলে আয়! আর সহ্য হয় না, বাপ! কোলে আয়! (অগ্নিতে প্রবেশ)।

মন্ত্রী—হায়! হায়! একি হইল। সর্ব্বনাশ হইল (শিরে করাঘাত করিতে করিতে) হায়! "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা" "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা" শিরে করাঘাত করিতে সকলের প্রস্থান।

সম্পূর্ণ।

গো-জীবন

প্রথম প্রস্তাব

গো-কুল নির্ম্মূলে আশঙ্কা

ভারতের অনেক স্থানে গোবধ লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইতেছে। সভা সমিতি বসিতেছে, বক্তৃতার স্রোত বহিতেছে, ইংরেজী বাঙ্গলা সংবাদ পত্রিকায় হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধসকল প্রকাশ হইতেছে, কোন কোন স্থানে হিন্দু মুসলমান একত্রে, একপ্রাণে, একযোগে গোবংশ রক্ষার উপায় উদভাবন করিতেছেন। কোন কোন ইংরেজী পত্রিকায় আবার প্রতিবাদও চলিতেছে। এ সময় আর নিরব থাকা উচিত মনে করিলাম না।

আমি মোসলমান—গোজাতির পরম শত্রু। আমি গো-মাংস হজম করিতে পারি। পালিয়া, পুষিয়া বড় বলদটির গলায় ছুরি বসাইতে পারি। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া দুগ্ধবতী গাভী, দুগ্ধপায়ী গো বৎসের প্রাণসংহার করিয়া পোড়া উদর পরিপোষণ করিতে পারি, কিন্তু ন্যায় চক্ষে যাহা দেখিতেছি যুক্তি ও কারণে যাহা পাইতেছি, তাহা কোথায় ঢাকিব? স্বাভাবিক ভাব কোন ভাব বশে গোপন করিব? মনে এক মুখে আর হইল না। প্রিয় মৌলবী সাহেব! মার্জনা করিবেন। মুন্সী সাহেব। ক্ষমা করিবেন। সুফি সাহেব! কিছু মনে করিবেন না। কি করি, জগত পরাধীন—কিন্তু মন স্বাধীন। যদি কোন মোসলমান ভ্রাতা এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ করিয়া আহমদী পত্রিকায় প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

আমাদের মধ্যে "হালাল" এবং "হারাম" দুইটি কথা আছে। হালাল গ্রহণীয়, হারাম পরিত্যাজ্য। এ কথাও স্বীকার্য্য যে—গোমাংস হালাল, খাইতে বাধা নাই। অশ্বমাংস ও অন্যমতে (সাফি) হালাল। আমার মতে (হানিফি) হালালও বলিতে পারি না, স্পষ্ট হারামও বলিতে পারি না। মাঝামাঝি একটা নামও আছে (মকরুহ) আবার ঐ সাফি মতে জলজন্তু মাত্রই হালাল। দৃষ্টান্তচ্ছলে একথা বলিতে পারি যে বক্কের পদ যতটুকু জলের মধ্যে বদ্ধ থৌত সময়

ডুবিয়া থাকে সাফি মতের দায় দিয়া সে মনুষ্য পদটুকুও জল মধ্য হইতে কাটিয়া লইয়া কালসা, পোড়া, সিদ্ধ, সুরুয়া যাহার যেরূপ অভিরুচি হয় করিয়া উদরে ফেল, কোন চিন্তা নাই, কখনই পরের খাতায় নাম উঠিবে না।—ইহাও শাস্ত্রের কথা। কিন্তু শাস্ত্রে একথা লিখা নাই যে গোহাড় কামড়াতেই হইবে, গোমাংস গলাধ করিতেই হইবে, না করিলে নরকে পচিতে হইবে। বরং যাহা অখাদ্য—যথা বরাহ সে বিষয় পবিত্র কোরান শরিফে স্পষ্টভাবে বরাহ নাম উল্লেখে "খাইওনা" (হারাম) লিখা আছে। খাইলে প্রধান নরক "জাহান্নাম", তাহাতেই চিরবাস করিতে হইবে, আর নিস্তার নাই। খাদ্য সম্বন্ধে বিধি আছে যে খাওয়া যাইতে পারে, খাইলেই হইবে, গোমাংস না খাইলে মোসলমানি থাকিবে না, মহাপাপী হইয়া নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে—এ কথাও কোথাও লিখা নাই।

খাইবার অনেক আছে। ঘোড়া খাইতে পারি;--খাইনা। ফড়িং ধরিয়া ঘৃতে ভাজিয়া টপাটপ্ গিলিতে পারি—শাস্ত্রের কথা,—গিলি না। গোসাপ উদরসাৎ করিতে পারি—বিধি আছে, ভয়ে তাহার নিকটেও যাই না। ছাগলের মধ্যে পাঁঠাও খাদ্য, সে পাঁঠার দিকে ততো ঘেঁষিনা, যে ছাগিতে দুগ্ধ দেয় তাহাকেই "আল্লাহ আকবর" শুনাই। পাঁঠার সঙ্গে একেবারেই যে সম্বন্ধ নাই তাহা বলিতে পারি না। রসনা পরিতৃপ্ত আশ্রয়ে তাহার বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা রহিত করিয়া দিয়া দিব্বি মোটাগোটা চর্ব্বিদার জিনিস বানাইয়া কোরমা, কালিয়া, কাবাবে পেট পুরিয়া থাকি। উট এদেশে নাই, থাকিলেও তাহার কাছে যাওয়া যাইত না। কারণ শরীরের গঠন দেখিয়াই পাকস্থলী ঠাণ্ডা হয়। মহিষ খাদ্য, তাহার কাছে ছুরি হাতে করিয়া যায় কে? কাজেই নিরীহ গোজাতির গলায় ছুরি বসাইতে আর এদিক ওদিক চাহি না। এত খাদ্য থাকিতেও কি গো-মাংস না খাইলেই চলে না? ঘোড়া, মহিষ, বনগরু, মেষ, ছাগল, মৃগ, খরগোস সকলি তো চলিতে পারে? এ সকল খাইলেও তো ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়। এত থাকিতে গরুর মাংসে জিহ্বার জল পড়ে কেন? ইহার উত্তর কে দিবে?

গো দুগ্ধেই আমাদের জীবন। দশ মাস মায়ের উদরে বাস করিয়া জগতের মুখ দেখিতেই যেমন ক্ষুধায় কাতর হইয়া কাঁদিতে থাকি, সে সময়,—হায়! অমন কঠিন সময়ে কিসে আমাদের প্রাণরক্ষা হয়? মনে মনে একটা কথা উঠিতেছে—মায়ের তো দুগ্ধ আছে? আছে। কিন্তু গোদুগ্ধ মায়ের উদরে না গেলে মায়ের

স্তনে দুগ্ধ পাই কই ? মায়ের স্তনে দুগ্ধ থাকা সত্ত্বেও অনেকেই গোরসে জীবন রক্ষা করিয়াছে। মিষ্টান্নে, পক্কান্নে সদ্যজাত নব শিশুর প্রাণরক্ষা হয় না. দুগ্ধই জীবের জীবন। জগতে দুগ্ধ ছাড়া এমন কোন একটি খাদ্য নির্দিষ্ট নাই যে শুধু সেই খাদ্যটি খাইয়া জীবনধারণ করা যায়।

গোরসই বঙ্গের উপাদেয় খাদ্য। শুধু অসুস্থ শরীরে, এমন কি প্রাণসঞ্চার হইতে বিয়োগ পর্য্যন্ত দুগ্ধের প্রয়োজন; সেই দুগ্ধের মূল গোধনকে উদরসাৎ করিয়া ফেলিলে আর কি রক্ষা আছে! কালের মাহাত্ম্য যদি দুগ্ধের উপকারিতা অস্বীকার করি, মাংস খাইতে শিখিয়াছি বলিয়া যদি দুগ্ধের কথা মনে না করি, তত্রাচ উপকারী পশুর প্রতি সদয়ভাবে সদ্ব্যবহার করিয়া তাহাদের জীবনরক্ষা করিবার চেষ্টা করিলে তাহাতে ক্ষতি কি ? বড় হইয়াছি আর দুগ্ধের ধার কে ধারে ? কিন্তু এদেশে গো জাতির সাহায্য ব্যতীত বলুন তো কোনরূপ খাদ্য প্রস্তুত হইতে পারে ? কখনি না। যে খাদ্যই প্রস্তুত করিবে গো জাতির উপাসনা করিতেই হইবে। এদেশে অন্য কোন পশুর দ্বারা ভূমি কর্ষণের প্রথা প্রচলিত নাই। কাজেই বলদের দরকার। প্রথম কর্ষণ, কারাকিত, মাড়াই করিতে কাহার সাহায্য আবশ্যক ? এহেন গোরত্নকে মারিয়া, কাটিয়া, গলায় ছুরি বসাইয়া উদরসাৎ করিলে অন্য খাদ্যের আশা আর থাকে কোথা ? মানিলাম—বুদ্ধি খাটাইয়া বিনা বলদে ভূমি আবাদ করিতেও ক্ষমতা আছে--কল কৌশল খাটাইয়া খাদ্যাদি প্রস্তুত করারও উপায় আছে. কিন্তু একাধারে এত গুণ আর কাহার ? সে অপরিসীম গুণ সকল কি করিয়া ভুলিয়া যাই। কোন গুণে মুগ্ধ হইয়া গোজাতির অসীম গুণ ভুলিব। ভ্রাতাগণ! আমি তো কিছুই দেখিতে পাই না। ভ্রাতঃ! জগতে কাহার বিষ্ঠার কে কবে আদর করিয়াছে ? আমরা গোবিষ্ঠা অপবিত্র মনে করি কিন্তু যথার্থ হিন্দুগণ ঐ বিষ্ঠারই বা কত আদর করেন। শুষ্ক বিষ্ঠা কি আর আমাদের আদরের নহে ? গোমূত্রেও উৎকট ব্যাধি আরোগ্য হয়। পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা-ভগ্নীর সহিত জীবনেই সম্বন্ধ। যত উপকার, যত সাহায্য, যত লাভ, দেহে প্রাণ থাকিতেই সম্ভবে,—মানব জীবনে আশাও তাহাই। কিন্তু ভাই! গোজাতি মরিয়াও আমাদের উপকার সাধন করিতেছে। আহা! প্রথম দুগ্ধ দিয়া প্রাণ বাঁচাইল, পরে শরীর খাটাইয়া তোমার সংসার চালাইল, মরিয়াও তোমার সহস্র প্রকার উপকার করিল,—গায়ের চামড়া দিয়া তোমার পদসেবা করিল—আর

চাও কি ? তাহার শরীরের শিরাই কি ফেলিবার জিনিস। অস্থির দ্বারা তোমারই প্রয়োজন সাধিত হইতেছে। অকর্ম্মা অস্থিগুলির কথাই কি ভুলা যায়। নিজে চূর্ণিত হইয়া চিনি, লবণ পরিষ্কার করিয়া তোমারই খাদ্যের সুবিধা করিতেছে। এত উপকারী যে তার গলায় ছুরি দিতে মনে কি একটুকুও দয়ার সঞ্চার হয় না ? উদর পরিপূর্ণ করিবার বিস্তর জিনিস আছে। নানাবিধ মাংস আছে, মৎস্য আছে, যত ইচ্ছা তত খাও, কিন্তু উপকারী পশুর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিও না। ভাইরে ! তাহার জীবনের কন্টক হইও না।

আর একটি কথা। এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই প্রধান। পরস্পর এমন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যে, ধর্ম্মে ভিন্ন, কিন্তু মর্ম্মে এবং কর্ম্মে এক—সংসার কার্য্যে ভাই না বলিয়া আর থাকিতে পারি না। আপদে বিপদে, সুখে দুঃখে, সম্পদে পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন উদ্ধার নাই। সুখ নাই, শেষ নাই, রক্ষার উপায় নাই। এমন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যাহাদের সঙ্গে এমন চিরসঙ্গি যাহারা, তাহাদের মনে ব্যথা দিয়া লাভ কি ?

ধর্ম্মে আঘাত লাগে না, গোমাংস পরিত্যাগ করিলে ঘরকন্নারও ব্যাঘাত জন্মে না। উন্নতির পথেও কাঁটা পড়ে না। প্রাণের হানিও বোধহয়—হয় না। এ অবস্থায় গো হিংসা পরিত্যাগ করিলে হানি কি ? পরিত্যাগে নিজের কোন ক্ষতি নাই, অথচ চির সহযোগী ভ্রাতার মনরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা, আর যাহা রক্ষা, তাহা বার বার বলিব না। যাহাতে সকল দিক রক্ষা হয় সে ত্যাগে ক্ষতি কি ? ভাইরে ! এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দুর সহিত বাস না হইয়া যদি খৃষ্টানের সহিত বসবাস হইত আর তাহাদের প্রতি ঘরে ঘরে—আমোদে, আহ্লাদে, বিবাহে, শ্রাদ্ধে, পথে-ঘাটে, মাঠে, বাজারে—প্রকাশ্য স্থানে শূকর বধ হইত, তাহা হইলে আমাদের দশা কি ঘটিত ? ঐ মহানগর কলিকাতায় নিউমার্কেটে এখন যে প্রকার গোমাংস বিক্রয় হয়, ঐরূপ যদি শূকর মাংস বিক্রয়ের দোকান খুলিত তবে আমাদের মনে কি ভাব হইত ? কি কথা মনে উঠিত ! তাহা কি ভাবা যায়,—না মুখে বলা যায়। তবে রাজবিধিতে সকলের মাথাই নওয়াইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু মনের আগুন মনেই জ্বলিতেছে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি জগত পরাধীন—মন স্বাধীন। আমাদের রাজার চক্ষে শূকর গরু উভয়েই সমান। কাজেই তাঁহাদের মনে হিন্দু মোসলমানের মর্ম্মাহত কোন বিষয় ধারণা নাও হইতে পারে। তাই বলিয়া কি

আমরা বুকের ছাতি ফুলাইয়া রাজবিধিতে বারণ নাই—গোবধে দণ্ড নাই বলিয়া ভ্রাতার মনে মর্ম্মান্তিক আঘাত করিব? আমার মতে একথা কথাই নহে। কাল আমরা রাজাকে পরিত্যাগ করিতে পারি। রাজাও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু হিন্দু মোসলমানে কেহই কাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। —পরস্পর কেহই কাহাকে ছাড়িতে পারে না। জগত যত দিন—সম্বন্ধও ততদিন। এমন গুরুতর সম্বন্ধ যাঁহাদের সঙ্গে তাঁহাদের মনে ব্যথা দিতে আমাদের মনে কি একটুক ব্যথা লাগে না।

প্রস্তাব উপসংহার কালে আর একটা কথা মনে পড়িল। তাহার মীমাংসা না করিয়া কিছুতেই এ প্রস্তাব শেষ করিতে পারিলাম না। মোসলমান ভ্রাতাগণ যদি বলেন, উপকারীজনের উপকার মনে করিয়া, কি হিন্দু ভ্রাতাগণের মর্ম্মাঘাতের কথা স্মরণ করিয়া গোবধ যেন বন্ধ করিলাম, কিন্তু জগতের একমাত্র সহায় বল, আশ্রয় যাহা কিছু বল—সকলি ধর্ম্ম। ধর্ম্ম সার - ধর্ম্মই মূল। সেই ধর্ম, সেই এসলাম ধর্ম্মে বলিতেছে কোরবানি কর। মানিলাম বিধি আছে, সে বিধি লঙ্ঘনের উপায় নাই—তাহা যথার্থ। কিন্তু ভাই। সে তো বৎসরের মধ্যে একদিন মাত্র। তাহা হইলেও অনেক মঙ্গল। অতি কম হইলেও সমগ্র ভারতে প্রতিদিন পঞ্চাশ হাজার গোধন পাকস্থলিতে মজিয়া যাইতেছে। অতি কম হইলেও হাজার গোবৎস কেবল সুরুযায় উড়িয়া যাইতেছে, এগুলি তো রক্ষা পাইবে। অনুমানের কথা নহে, কল্পনারও চিত্র নহে, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি নির্দ্দয় কসাইগণ যে সময় সেই এক পক্ষ, কি মাসেক বয়সের গোবৎসগণের পা বান্ধিয়া ঝাঁকায় তুলিয়া মাথায় করিয়া বধ্যভূমিতে লইয়া যায়, তখন মানুষ মাত্রেরই চক্ষে জল আইসে, হৃদয়ে ভয়ানক আঘাত লাগে। আহা! গোবৎসগুলির সেই সময়ের কাতর রব শুনিলে মনে যে কত কথারই উদয় হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সাধ্য নাই, ক্ষমতা নাই—কি করি! যাক সে চিন্তা, সে কথা বৃথা! যে কথা বলিতেছিলাম, বৎসরে একদিন কোরবানি না দিলেই নহে। ইহা স্বীকার্য্য। মোসলমান মাত্রেরই একথা স্বীকার্য্য। কিন্তু কোরবানির কারণ কি? কেন কোরবানি (বলি) প্রথা প্রচলিত হইল, ইহার গূঢ়তত্ত্ব প্রতি আমাদের অর্থাৎ ভারতীয় মোসলমান সমাজের একেবারে দৃষ্টি করা আবশ্যক। সাধারণে জানে যে 'ইদজ্জহায়' গরু কোরবানি না করিলে ধর্ম্ম বজায় থাকে না, মোসলমানিত্ব রক্ষা পায় না—এটি সম্পূর্ণ ভুল।

আমি শাস্ত্র দ্বারা দেখাইব, প্রমাণ করিব যে, গরু কোরবানি না দিয়াও ধর্ম রক্ষা হইতে পারে। মোসলমানিত্ব অটলভাবে থাকিতে পারে।

অতি প্রাচীনকালে হজরত এবরাহিম খলিলল্লাহ এক রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে, স্বয়ং ঈশ্বর আদেশ করিতেছেন 'এবরাহিম! আমার নামে বলি দাও'—প্রাতে এবরাহিম একশত উট বলি দিলেন। রাত্রে পুনরায় স্বপ্ন দেখিলেন যে, ঈশ্বর বলিতেছেন, এবরাহিম! তোমার বলি গ্রহণ করি নাই। বলি দও। পরদিন মহাঋষি এবরাহিম পুনরায় শত উট বলি দিলেন। বিধাতার লীলা বুঝিতে সাধ্য কার? তৃতীয় রাত্রে পুনরায় স্বপ্ন দেখিলেন ঈশ্বর বলিতেছেন, এবরাহিম তোমার বলি গ্রহণ হয় নাই; বলি দেও। ঘোর তপস্বী এবং ঈশ্বর ভক্ত এবরাহিম স্বপ্নাবেশেই মহাভীত হইয়া বলিলেন, প্রভো! এ দাস আজ্ঞার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতেছে না। তিনদিনে তিনশত উট বলি দিয়াছি, গ্রহণ হইল না। এইক্ষণে আমি কি বলি দিয়া আজ্ঞা প্রতিপালন করি। বলির উপযুক্ত আমার আর কি আছে? উত্তর হইল, এবরাহিম! তোমার বিশেষ ভালবাসা যে, তাহাকে বলি দাও, অর্থাৎ তোমার সন্তানকে বলি দাও। চিরভক্ত এবরাহিম প্রাতে উঠিয়া প্রথম স্ত্রীর নিকট, শেষে ইসমাইলের (পুত্র) নিকট ঈশ্বরের আদেশ প্রকাশ করিতেই তাঁহারা মহানন্দে ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালনে সম্মত হইলেন। তখনি এবরাহিম ইসমাইলকে স্নান করাইয়া ধৌতবস্ত্র পরাইয়া গায় সুগন্ধি দ্রব্য লেপন করিয়া এক সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা হস্তে পুত্রসহ কোরবানি ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। এবং পুত্রের গলায় ছুরি বসাইতেই দৈববাণী হইল, এবরাহিম! তুমি ধন্য—তুমি যথার্থ ভক্ত। কিন্তু এবরাহিম! জগত বড় কঠিন স্থান, মায়া বসে সকলেই মোহিত। পুত্রের গলদেশ বিনির্গত রক্তের ধারা দেখিয়া—সে বদনমণ্ডলের বিকৃতভাব চক্ষে দেখিয়া তোমার মনে অন্য কোন ভাবের উদয় হইলেও হইতে পারে। তোমার অটল ভক্তির কথঞ্চিত পরিমাণ টলিলেও টলিতে পারে। তাহাতেই আদেশ হইতেছে যে, তুমি বস্ত্র দিয়া চক্ষু ঢাকিয়া আমার আদেশ প্রতিপালন কর। তোমার এ কীর্তি জগতে অক্ষয়কীর্তি স্বরূপ জ্বলন্তভাবে চিরকাল দেদিপ্যমান থাকিবে। এবরাহিম তাহাই করিলেন বলির পর দেখিলেন যে, ইসমাইল মহাজ্যোতি স্বরূপ পার্শ্বে দণ্ডায়মান, সম্মুখে একটি "দোম্বা" পড়িয়া আছে, রক্তের ধার ছুটিয়াছে। সেইদিন হইতে কোরবানির সৃষ্টি। এ পর্য্যন্ত মোসলমান জগতে প্রচলিত, ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ, সুতরাং কর্ত্তব্যমধ্যে পরিগণিত।

ঘটনা স্থান 'মক্কা' হজরত মহম্মদের জন্মের পূর্ব্বে। এখন কথা এই যে প্রথম কোরবানি দোম্বা। আরবদেশে আজ পর্য্যন্ত দোম্বাই অধিক পরিমাণে বলি হয়, উটও বলি হইয়া থাকে। আরবে কেহই গরু কোরবানি করে না। ধর্ম্মের গতি বড় চমৎকার। পাহাড়, পর্ব্বত, মরুভূমি, সমুদ্র, নদনদী ছাড়াইয়া মোসলমান ধর্ম্ম ভারতে আসিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে কোরবানিও আসিয়াছে। এদেশে দোম্বা নাই—দোম্বার পরিবর্ত্তে ছাগল, উটের পরিবর্ত্তে গো, এই হইল শাস্ত্রকারদিগের ব্যবস্থা। এখন বুঝিলেন পাঠকগণ! বুঝিলেন কেন এ কথাটা এই প্রস্তাবে সংযোগ করিলাম। গরু কোরবানি না হইয়া ছাগলও কোরবানি হইতে পারে। তাহাতেও ধর্ম্ম রক্ষা হয়। ইহার পরেও একটি কথা আছে যে, এক গরুতে সাতটি লোকের কোরবানি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, একটি ছাগ একজন ভিন্ন দুইজন নিষেধ। কাজেই ব্যয় লাঘবে গরুই অগ্রগণ্য। কিন্তু ভাই! এ কথার আপত্তি তুলিয়া আমার মুখবন্ধ করিতে পারিবেন না। কোরবানির গরুর সম্বন্ধে শাস্ত্রে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সে প্রকার একটি গরুর মূল্যে ২৫টি ছাগল পাওয়া যাইতে পারে। তুমি বৎসর বৎসর ২। ৩ টাকার মধ্যেই সারিয়া থাক। আবার সে ২। ৩ টাকার ক্ষতি চামড়া বিক্রয় করিয়াই পূরণ কর। বিনাব্যয়ে ধর্ম্ম রক্ষা। লাভের লাভ তণ্ডুলাভ মাংস। একযাত্রায় তিন লাভ—ধর্ম্ম রক্ষা, অর্থ রক্ষা, উদর রক্ষা। যাহা হউক, আর বেশী বলিতে ইচ্ছা করি না; সকাতরে প্রার্থনা যে, গোকুল বিনাশক, এবং গো খাদক নামে যেন আর আমরা অভিহিত না হই। চেষ্টা করিলে উভয়-কূলই রক্ষা হইতে পারে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

গোধন কি সামান্য ধন?

গোধন কি সামান্য ধন? চতুষ্পদ শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত বলিয়া কি গোজাতিকে সামান্য পশু বলিয়া মনে করিব? অকর্ম্মন্য পশুগুলিকে যে চক্ষে দেখিয়া থাকি, সেই চক্ষে কি গোজাতিকে দেখিব? মনে কি বলে? মোসলমান ভ্রাতাগণ! মনের দ্বার খুলিয়া নিরপেক্ষভাবে বলুনতো—মনে কি বলে? দোহাই আপনাদের পিতা মাতার, মনে এক, মুখে আর বলিয়া স্ব-স্বমতের পোষকতা করিবেন না। চর্ম্ম চক্ষে যাহা দেখিতেছেন, গোজাতির দ্বারা যত প্রকার উপকার পাইতেছেন, একে একে সেই কথাগুলি মনে করিয়া মনের কথা বলুনতো, গোধন কি সামান্য ধন? গোজাতি কি সাধারণ পশুর মধ্যে পরিগণিত। আমাদের শাস্ত্রে

গোজাতির গুণের কোন কথা উল্লেখ নাই। অন্যান্য "হালাল" পশু শ্রেণী মধ্যে কেবল নাম মাত্র রহিয়াছে। শাস্ত্রে গোজাতির গুণাগুণ বর্ণন নাই বলিয়া কি সামান্য পশু ছাগল, ভেড়ার সহিত গোধনের তুলনা করিব। হরি! হরি! সেই দীর্ঘকায় উটের সহিত কি ইহার সামনজস্য দেখাইব? যদি ইসলাম ধর্ম্ম রবি প্রথমে ভারতেই উদয় হইত, যদি মোসলমান ধর্ম্ম জ্যোতিঃ প্রথমে বঙ্গেই প্রকাশ হইত, যদি নূরনবী হজরত মহম্মদ মুস্তফার অভ্যুদয় ভারতের কোন অংশে হইত, তবে বোধহয় গোজাতি সামান্য পশু শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইত না। তিনি বিড়ালকে আদর করিয়া গিয়াছেন. আজ পর্য্যন্ত মোসলমান সমাজে সেই আদর অতি আদরের সহিত রহিয়াছে। কুকুরকে ঘৃণা করিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত কুকুর ঘৃণিতই রহিয়াছে। আরবে উটের যত আদর ভারতেও গোকুল সেই প্রকার আদরের ও যত্নের বলিয়া বর্ণিত হইত; —পবিত্র কথাটাও সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। কে ভাবিয়াছিল লোহিত-সাগর পার হইয়া ভারত গগনে মোসলমান ধর্ম্ম-পতাকা অক্ষয় রূপে উড়িতে থাকিবে? কে ভাবিয়াছিল যে মোসলমান ধর্ম্ম সমস্ত ভারতে বিস্ফারিত হইয়া পড়িবে? কে ভাবিয়াছিল যে মোসলমান জাতি ভারতের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় হিন্দুর সহিত একত্রে বাস করিবে? —পরস্পর আত্মীয়তা ঘটিবে? —একের মুখাপেক্ষী হইয়া অন্যকে থাকিতে হইবে? একাত্মা এক প্রাণ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে? বিশ্রামদায়িনী নিশার অবসান হইলেই পরস্পর দেখাশুনা ঘটিবে? তাহা হইলে বিধি হইত, ব্যবস্থা হইত, গোজাতির উপকার বিষয় বর্ণিত হইত। দেশভেদে শাস্ত্রের প্রভেদ, জল-বায়ুর গুণাগুণে আহারবিহার পরিচ্ছদের বিভেদ, যদিও ইহা শাস্ত্রের কথা নহে। কিন্তু যুক্তির আয়ত্ত এবং কারণের অন্তঃভুক্ত, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। শাস্ত্রে যেমন গোজাতির বিষয় বিশেষ রূপে কোন কথা লিখা নাই, অন্যান্য পশু সম্বন্ধেও লিখা নাই; —আছে কেবল উট আর দোম্বার কথা যাহা ভারতের নিষ্প্রয়োজন, যাহা বঙ্গের অপুচ্ছ ও তুচ্ছ। ইহাতেই উপলব্ধি হইতেছে, সহজ জ্ঞানে ইহাতেই তো বুঝা যাইতেছে, প্রয়োজনানুসারে বর্ণনা, আবশ্যকানুসারেই পবিত্রতা।

দৃষ্টান্তস্থলে আরও কিছু বলিব। শাস্ত্রে কোন কথা নাই, বর্ণনা নাই, নামটিও নাই, করিলে শাস্ত্রমতে বোধহয় পাপও নাই এমন শাস্ত্র বহির্ভূত কার্য্য কি আমরা করি না? সকলই করিয়া থাকি। খাদ্যাদি সম্বন্ধে তো প্রথম প্রস্তাবেই

বলা হইয়াছে. দ্বিতীয় বার বলা নিষ্প্রয়োজন। পাঠক ! অন্য বিষয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখাইতেছি, ভ্রাতা মোসলমানগণ ! বলুন তো মোসলমান হইয়া ধুতি চাদর ব্যবহার করা কোন হাদিসে আছে ? একি দেশ প্রথা নহে ? গুড়গুড়ি কি পেঁচাও-নলেব বাহাব দিয়া সুগন্ধিযুক্ত তামাকের ধূমপান করা কোন বিধি সঙ্গত ? লাল রঙ্গের নাগবা জুতা কি কাল রঙ্গের চড়াতোলা জুতা ব্যবহার করা এটা কি ? বাষ্পীয় শকটে, বাষ্পীয় পোতে গমনাগমন করার বিষয় কি শাস্ত্রে উল্লেখ আছে ? টেলিগ্রামে, টেলিফোনে সংবাদ আদান-প্রদান করা কি শাস্ত্রের বাহিরের কার্য্য নয় ? বিলাতি দেশলাই বুঝি কোন মোসলমান ভ্রাতা ব্যবহার করেন না ? কি পরিতাপ ! হায় ! হায় ! কি দুঃখের কথা ! মানচেষ্টারেব বস্ত্র দ্বারা লজ্জা নিবারণ করিতে হইবে একথা কি শাস্ত্রে লিখা আছে ? কেবল শাস্ত্রে গোজাতির কোন প্রকার উপকারেব কথা লিখা নাই বলিয়া কি তাহার উপকারিতার বিষয় স্বীকার কবিব না ? যাহা পুরুষ, পুরুষানুক্রমে ভোগ কবিতেছি, চক্ষে যাহা দেখিতেছি. অন্তরের শিবায় শিবায় যাহার প্রমাণ পাইতেছি, প্রতি শোণিত বিন্দুতে যাহাব সাক্ষ্য দিতেছে, তত্রাচ বলিব যে গোজাতির বিষয় শাস্ত্রে কোন গুণের কথা লিখা নাই। গরুর গুণ কেন স্বীকার করিব ? কেন গোবধে ক্ষান্ত হইব ? আমাদের পক্ষে, গো, বৃষ, ছাগ, মেষ, হরিণ, সকলি সমান। কি ঘৃণা। কি লজ্জা ! আমি শাস্ত্র বহির্ভূত কোন কার্য্য করিতে বলিব না। —বলিতে সাধ্যও নাই। শাস্ত্র রক্ষা করিয়া উপকারীজনের প্রত্যুপকার করা মনুষ্যেরই কার্য্য। পশুরাই প্রত্যুপকাব করিতে সহজে স্বীকার হয় না। হিংস্রক জন্তুরাই প্রত্যুপ-কারেব পক্ষপাতী। মনুষ্যে কেন প্রত্যুপকারের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে ?

নরাধম কসাইগণই গোহত্যা করে। "কাচ্ছাব" শব্দ হইতে কসাই হইয়াছে, কাচ্ছাব শব্দের ভাবার্থ ব্যবসাদার। বেশ তো, কসাইগণ ব্যবসা করে, শাস্ত্রসঙ্গত কার্য্য করে, তবে সে কসাই নামে অভিহিত হয় কেন ? সে কথা আমাদের মনে আঘাত লাগে কেন ? আজ হইতে মনের ভাব ফিরাইতে হইল। কারণ কসাই শাস্ত্র বহির্ভূত কার্য্য করে না, ব্যবসাদার—ভাল কথা, বড় মিষ্টি সম্ভাষণ। পাঠক ! মোসলমান কবিগণ পারস্য ভাষায় কসাইয়ের বর্ণনা কিরূপ করিয়াছেন ? যে গো-হত্যা করে তাহাকেই কি কসাই বলিয়াছেন ? তাহা নহে। যাহার অন্তরে দয়া, মায়া, মমতা, কিছুই নাই, পর দুঃখে যাহার হৃদয় কাতর নহে, ব্যথা বোধ না করে,

তাহাকেই কসাই বলিয়াছেন, সে সঙ্গেই পাপ হৃদয়ের, কসাই হৃদয়ের তুলনা করিয়াছেন। মোসলমান কবিদিগকে সহস্র ধন্যবাদ! শাস্ত্রসঙ্গত কার্য্য বলিয়া তাঁহারা কসাইকে উচ্চাসনে বসাইয়া যান নাই। মহাঋষি, যোগী, ঘোর তপস্বী বলিয়া সম্ভাষণ করেন নাই। কসাই নীচ, অতি জঘন্য, কসাইকে মনুষ্য দলের মধ্যে পরিগণিত করেন নাই। গো-জীবন হত্যা করে বলিয়া এত অপমান, এত শাস্তি আজ পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হইতেছে। কিন্তু গোখাদককে কেহ কিছু বলেন নাই। কি ভ্রম! কি ভ্রম! আহা! কসাই কি নিজ উদর গোমাংস দ্বারা পরিপূর্ণ করিতে গোহত্যা করে? আপন সন্তান-সন্ততী, পরিবারগণের রসনা পরিতৃপ্তি হেতুই কি নিরীহ গোজাতির গলায় ছুরি বসাইয়া থাকে? যাহাদের জিহ্বা গোমাংসের জন্য লালায়িত, যাহারা গরু হজম করিতে পটু, তাহারা কসাইয়ের মুরুব্বদাদা। যদি খাদক না জোটে, তবে খাদ্যের আমদানি কে করে? নিজের খাইবার কে করের মহিষ তাড়ায়! মোসলমান ভ্রাতাগণ! অপরাধ মার্জনা করিবেন, কথাতেই কথা বাড়ে, তর্কস্থলে অনেক কথা আসিয়া পড়ে, এই জন্য এখনি একটি কথা আসিল। যদি মোসলমান কবি কি লিখক মহামতিগণ কসাইকে মনুষ্য প্রকৃতি হইতে দূরীভূত না করিতেন, তবে আজ এই অধমের সামান্য লিখনি গোখাদক ভ্রাতাগণের মস্তকের উপর সঞ্চালিত হইত না। ন্যায্য কথা লিখিয়া স্বজাতীয় ভ্রাতাগণের মনে ব্যথা দিতাম না। তাঁহারা গোমাংস পোড়া উদরের সেবায় না লাগাইলে কসাই মহাশয় কখনি গোহত্যা করিতেন না। কসাই নামেও সম্বোধিত হইতেন না।

পাঠকগণ! মোসলমান শাস্ত্রে গোজাতির গুণের ব্যাখ্যা নাই—সুতরাং সাধারণ পশু মধ্যে পরিগণিত।—উদরে পোষণে দোষ কি? একথাটা আমি হাতগড়া করিয়া উপস্থিত করি নাই। অত্রস্থ কোন মৌলবী মহামতির কথার আভাষে বুঝিয়াছি যে, ঐকথা ভিন্ন আর তাঁহাদের কোন কথা নাই। ঐ কথাটুকু আশ্রয় করিয়াই গোধনের জীবন সংহার করিতে বাধা। ধর্ম্মের দায় দিয়াই গোজাতির সর্ব্বনাশ করিতে অগ্রগণ্য।—প্রতিবাদ করিবেন। ভ্রাতাগণ! আমিও প্রতিবাদ প্রার্থনা করি। কিন্তু ঐরূপ প্রতিবাদ, কি সভা-সমিতির ভয়ে, এ অত্যাচার, অন্যায়াচার, হৃদয় বিদারক, মর্ম্মাহত, ভীষণ— মহাভীষণ ব্যাপারস্বরূপ—গোহত্যা নিবারণ বিষয়, প্রস্তাব লিখিতে অধমের লিখনি ক্ষান্ত হইবে না। সেই কৃপা-

ময ভগবান কৃপায়, গোকুল রক্ষা কবিতে লিখনি যে সঞ্চালিত হইয়াছে যতদিন ইহাব শেষ না হইবে ততদিন সমানভাবে চলিবে। আজ যদি সেই প্রাচীন নগব ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে গোখাদক সম্রাটকে দেখিতে পাইতাম, কাজীসাহেবেব দোররার (চাবুক) ভয় আমার থাকিত তাহা হইলে এ প্রস্তাব জনসাধারণের গোচর করা দূরে থাকুক, মুখে আনিতেও পারিতাম না। এ ব্রিটিশ রাজ্য, ব্রিটিশ-সিংহ ইহাব শাসনকর্তা, ন্যায্য কথা বলিতে কোন বাধা নাই —ভয়েরও কোন কারণ নাই। সুতরাং লিখনি ক্ষান্ত হইবার নহে। আমার বোধ হইতেছে স্থানীয় মোসলমান ভ্রাতাগন ঐ এক কথা বলিয়াই সবিয়া পড়িবেন, আমার প্রস্তাবের সত্যাসত্য বিষয়ে কোনরূপ আলোচনা বোধহয় না কবিলেও করিতে পারেন। যাহা হউক গোজাতির উপকারিতা বিষয় হিন্দুশাস্ত্র সংগত মাত্র দুইটি বচন সহাসে সাধারন সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গলবস্ত্রে এবং করযোড়ে সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি যে, ভ্রাতাগণ আপনারাও কি এ সময় নীরব থাকিবেন ? আমার প্রস্তাবে পোষকতায় লিখনি সঞ্চালন করিবেন না ? অন্যান্য প্রদেশে হিন্দু মোসলমান একত্র হইয়া গোধন রক্ষার জন্য কত কি উপায় করিতেছেন। টাঙ্গাইল মহকুমার হিন্দু ভ্রাতাগণ ! এ বিষয়ে কি একেবারেই নীরব থাকিবেন ? অন্যান্য স্থানে হিন্দু মহোদয়গণই ইহার প্রধান নেতা হইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, টাঙ্গাইলের দুর্ভাগ্যে তাহার বিপরীত। লিখক মোসলমান, পত্রিকাখানিও মোসলমানের, এমন সুযোগ কি আর পাওয়া যাইবে ? হিন্দু ভ্রাতাগণ ! ইহা কি আমার আক্ষেপের বিষয় নহে ? খাদক রক্ষার কান্না কাঁদিতেছে, 'আহমদী' অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে, সোনায় সোহাগা মিশিয়াছে। কিন্তু আপনারা নীরব ! দেখুন তো আপনার শাস্ত্রে কি বলে।

"লোকে হস্মিনমঙ্গলান্যষ্টৌ ব্রাহ্মণো গৌর্হুতাশনঃ
হিরণ্যং সর্পি রাদিত্য আপোরাজা তথাষ্টমঃ॥
এতানি সততং পশ্যেন্নন সোবর্চ্চায় চচয়ং।
প্রদক্ষিণঞ্চ কুর্ব্বীত তথা চায়ুর্ণ হীয়তে॥"

'ব্রাহ্মণে, গো, অগ্নি, স্বর্ণ, ঘৃত, সূর্য্য, জল এবং রাজা—এই অষ্ট প্রকার মঙ্গল পদার্থ সর্ব্বদাই ইহাদিগকে দেখিতে হইবে, নমস্কার করিতে হইবে, অর্চ্চনা করিতে হইবে, আর প্রদক্ষিন করিতে হইবে। সমান যত্ন করিতে হইবে, আদর করিতে হইবে, কেননা সকলেই আমাদের মহোপকারী।"

আবার দেখুন !

"গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং সর্পিদধিরোচনা।
ষড মেতদ্দধি মাঙ্গল্যং পবিত্রং সর্ব্বদা গবাং ॥"

"গোমূত্র, গোময়, গব্যঘৃত, দধি এবং গোচনা এই অষ্ট প্রকার গব্য দ্রব্যই শুভ। হিন্দুর সকল প্রকার শুভকর্ম্মে ইহার প্রয়োজন।"

এইরূপ বচন হিন্দুশাস্ত্রে শত সহস্র রহিয়াছে। সে সমুদায় বিবৃত করা আমার অনধিকার চর্চ্চা। তবে নিতান্তই দুঃখের বিষয় যে, মোসলমান তাহার শাস্ত্র বজায় রাখিয়া গোবধ জন্য চীৎকার করিতেছে, টাঙ্গাইলের হিন্দু ভ্রাতাগণ নীরব ! ভ্রাতাগণ ! জানিবেন ভারতে হিন্দু মোসলমান একত্র হইয়া একযোগে কোন কার্য্য না করিলে কখনই তাহা সিদ্ধ হইবে না। একপক্ষ শতবর্ষ কথা কুটিলেও ঈশ্বর সদয় হইবেন না। অদ্য এই পর্য্যন্ত !

তৃতীয় প্রস্তাব

গোমাংস

খাদ্য অখাদ্য সুখাদ্য। —যাহা সকলেই খায় তাহাই সাধারণ খাদ্য। যাহা কোন মানুষে ভক্ষণ করে না। —তাহাই অখাদ্য। রুচি ভেদে, কাহারও অখাদ্য, কাহারও সুখাদ্য। কুকুর, বিড়াল, শৃগাল, ভেক, ব্যাঘ্র, ছাবপোকা কাহারও সুখাদ্য কাহার অখাদ্য। গরু কাহারও খাদ্য, কাহারও অখাদ্য। ছাগ, মেষ, মহিষ, বরাহ প্রভৃতি কাহারও অখাদ্য আবার কাহার কাহার উপাদেয় খাদ্য। এই সকল গোলযোগে, যাহা সকল মানুষেই খায়, কি খাইতে ঘৃণা না করে, কোন প্রকার অসুখেরও কারণ না হয়, তাহাকেই খাদ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতেছি। অখাদ্য যাহা কোন মানুষে খায় না। সুখাদ্যের কথাতো পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এইক্ষণে কথা এই—দেশ, কাল, পাত্র, বিবেচনা করিয়া খাদ্যের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। পাকস্থলির পেষণশক্তির শক্তি বুঝিয়াই উদর পূর্ণ করা উচিত। আমরা বঙ্গবাসী। আমাদের সাধারণ খাদ্য কি ? দশে পাঁচে একদিন কি কুটুম্ব স্বজন, বন্ধু বান্ধবদিগের আগমন উপলক্ষে আমরা যে খাওয়া-দাওয়া করি তাহাকে সাধারণ খাদ্য বলিতে পারি না। সদা সর্ব্বদা যাহা খাইয়া থাকি, সেই খাদ্যই যথার্থ খাদ্য। বঙ্গের জল, বায়ু, তাপ এবং মৃত্তিকার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথার্থ খাদ্য নির্দ্দেশ করিতে হইলে, স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া খাদ্য নির্ব্বাচন করিতে হইলে, একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলিয়া না উঠিয়া,—গরু খাইতে বারণ

করে, এত বড় কথা? —ইহাতেই আগুন না হইয়া শান্ত এবং [illegible] [illegible] [illegible] কম্ম করিয়া দেখিলাম [illegible] না খাইলে না চলে, আমরা তো খাইয়াই থাকি—আর কথা কি? যাহারা এই বঙ্গরাজ্যে গোমাংস ভক্ষণ করে না, তাহাদের ও আমাদের কোন বিষয়ে যদি তারতম্য কি পার্থক্য থাকে, কি গোমাংস প্রভাবে আমরা তাহাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরিমাণে লাভবান বা বলবান হইয়া থাকি, কি কালে হইতে পারিব, তবে গোমাংস কেন ছাড়িব? এইক্ষণে দেখা আবশ্যক, বর্তমান জলবায়ু, তাপসম্ভূত বঙ্গরাজ্যে আমাদের খাদ্য কি গোমাংস?—না একথা স্বীকার করিতে পারিলাম না। যে মৌলবী সাহেব গোমাংসের জন্য এত লালায়িত, এক টুকরা গোমাংসের জন্য যাহাদের এত জেদ এত প্রতিবাদ, ধর্ম্মত বলুন তো প্রতিদিন দুবেলা কি তাঁহারা তাহা খাইয়া থাকেন? প্রতি সন্ধ্যাই কি গোমাংসে ক্ষুধা নিবৃত্তি করেন? না প্রতি সন্ধ্যাতেই গোমাংস ব্যনজনে অন্ন রনজিত করিয়া থাকেন? না সপ্তাহে দুদিন কি একদিন গোমাংসের স্বাদে রসনা পরিতৃপ্তি করেন? না প্রতি সন্ধ্যা খাইতে ইচ্ছা করেন? ধর্ম্মের দোহাই—মিথ্যা বলিবেন না। প্রতি সন্ধ্যা গোমাংস ব্যনজন পূর্ণ বাটী সম্মুখে দেখিলে মনে কি বলে? চক্ষু কি দেখিতে ইচ্ছা করে? না হাতে তুলিয়া মুখে দিতে ইচ্ছা হয়? প্রতিদিন যে খাদ্য খাইতেছেন, যথা ভাত, ডাইল, তরকারী, দুধ, মৎস্য ইত্যাদি। ইহা তৃপ্তিকর এবং রুচিকর। প্রতি সন্ধ্যা না হয় প্রতিদিন এই সকল খাদ্যে উদর পরিপূর্ণ করিয়া জীবন রক্ষা করিতেছেন। বলুন তো কোনদিন কি ঘৃণা হইয়াছে? না হইবে? যদি গোমাংস খাদ্য হইত, যদি গোমাংসই জীবনোপায়ের একমাত্র উপায় হইত, যদি বঙ্গবাসীর খাদ্য হইত, তবে প্রতিদিন রন্ধনশালায় দেখিতাম, প্রতি সন্ধ্যায় অন্নের সহিত প্রতিযোগিতায় একত্র দেখিতাম, প্রতি গ্রাসে হস্তে দেখিতাম, পাতে দেখিতাম, মুখে দেখিতাম। চক্ষুও জুড়াইত, মনও ভালবাসিত। ইহাতেই তো বলি মন স্বাধীন। সে না লিখকের লিখনিকে ভয় করে, না মৌলবী সাহেবের অযথা ক্রোধে ভয় করে—প্রকৃতি কাহারও নিকট কোন উপদেশ লইয়া কোন কার্য্য করে না। স্বভাবের বৈপরিত্বেও সহজে ঘটে না। জোর জবরাণে ঘটাইবার চেষ্টা করিলেও টেঁকে না? যিনি আহারদাতা, যিনি আমাদের রক্ষাকর্তা, যিনি খাদ্যাখাদ্যের সৃষ্টিকর্তা, তাঁহার বিবেচনায় ভুলভ্রান্তির অতি ক্ষুদ্র অংশের ক্ষুদ্র অংশও যে আছে, আমি একথা বিশ্বাস করি না। মনযোগ

সহকারে একটুকু চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই বোঝা যায়, তাহার অভিপ্রেত ভাব অতি সহজেই জ্ঞানগোচর হই। তিনিই দেশভেদে খাদ্যের প্রভেদ করিয়াছেন। প্রচুর পরিমাণ খাদ্য আমাদিগকে অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার নিয়োজিত খাদ্যই আমাদিগের রুচিকর ও তৃপ্তিকর। গোমাংস খাওয়াই যদি আমাদের কর্তব্য হইত, তবে এত সুস্বাদু ফলমূল শস্যাদি দ্বারা বঙ্গক্ষেত্র পরিপূরিত করিতেন না। —নদী জলেও এত মৎস্য জন্মিত না। যে দেশে যাহা প্রয়োজন, সে দেশের জন্য করুণাময় ভগবান তাহা অপর্যাপ্তরূপে দান করিয়াছেন। বঙ্গে থাকিয়া কি ইউরোপীনের খাদ্যের অনুকরণ করা উচিত? না আরববাসীদিগের আহারের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া উদর পূর্ণ করা বিধেয়? দেশভেদে আহারের প্রভেদ—ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

কাল--অর্থাৎ সময়। বঙ্গবাসী মোসলমানদিগের এমন দুঃসময় কি উপস্থিত হইয়াছে যে, গোমাংস না খাইলে আর জীবন রক্ষা হয় না? এমন কোন সময় কি উপস্থিত হইয়াছে যে, অনাহারে মরি মরি হইয়া, না খাইতে পারিয়া প্রাণপাখি দেহপিনজর হইতে উড়ি উড়ি হইয়া, গোমাংসে শুধু গোমাংসে প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, জীবনীশক্তির শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে? দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে আমরা কিসের অভাব মনে করি? কোন জিনিসের অভাবজনিত আমাদের কষ্ট বোধহয়? অন্নের—না গোমাংসের? বরং কোন কোন সময় দুই একজন অর্থশালী ভোগবিলাসী মহোদয়ের মুখে শুনা যায় যে, এবারে জলে মাছ নাই। ডাঙ্গায় গোমাংস নাই,—একথা বলিয়া কোন মৌলবী সাহেব করে আক্ষেপ করিয়াছেন? কোন ভ্রাতা গোমাংসের অভাবে দুঃখ প্রকাশ করে? রাজদ্বারে সাহায্য প্রার্থনা করেন? ইহাতেও কি বলিব যে গোমাংস আমাদের খাদ্য, এ সময়ে, এ দুঃসময়ে গোমাংসই জীবনের জীবন, শরীর পোষক, এবং দুর্ভিক্ষ নিবারক?

এখন পাত্র হইয়া বড়ই বিপদে পড়িলাম! খাই গঙ্গা, পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, পচা বিল কি পাতকুয়ার জল! বায়ু সেবন করি ঝাড় জঙ্গলের, পাট ক্ষেত্রের, না হয় ধানের মাঠের। থাকি খড়ো ঘরে। চলাফেরা করি সেঁতসেঁতে ভিজেমাটি, জল কাদার উপরে। শরীরের গঠন ও আয়তন তেমনি। অস্থি, পেশীশক্তিও তথৈবচ। সাহসের তো কথাই নাই। পাকযন্ত্রের অগ্নির তেজ, ধারণা ও ক্ষমতার কথা আরকি বলিব। চাল ভাল করিয়া সিদ্ধ না হইলেই মারা গিয়াছি।

—হাতের জল আর শুষ্ক হয় না। দুগ্রাস বেশী গলাধঃ করিলেই পেট ফাঁপিয়া প্রাণ আই-ঢাই করিতে থাকে পাথরচুণীর পাতা আর লবণের দরকার হইয়া পড়ে। ক্ষমতানুসারে হজমিগুলিরও আশ্রয় লইতে হয়। এমন জীর্ণ শক্তি-বিশিষ্ট মহা-পুরুষেরা গোমাংস ভক্ষণের উপযুক্ত পাত্র না হওয়া আর কে হইবে? গোমাংস সহজে পরিপাক হয় না। অল্প জ্বালেও সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধ হইলেও টানিয়া ছেঁড়া যায় না। ছিঁড়িলেও আবার দন্তের এমন শক্তি নাই যে, উপযুক্ত মত পিষিয়া সহজে পরিপাকের উপযুক্ত করিয়া দেয়। পাকযন্ত্রেরও পেষণশক্তি এত প্রবল নহে যে, যথার্থ খাদ্যের ন্যায় উহাকে যথা সময়ে পরিপাক করিয়া ফেলে। গোমাংস খাইলেই পেটের অসুখ, দাঁতের অসুখ, তাহার পর গায়ের জ্বালা, মুখকান্তির, বিকৃতি শরীরের লাবণ্যহীন,—এতো ধরাবাঁধা কথা। তাহার উপর মহাব্যাধি। আর চাই কি? দশটি কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত লোকের পরিচয় লইয়া দেখিবে তাহার মধ্যে কয়জন হিন্দু আর কয়জন মোসলমান? দেখুন দেখি কেমন লাভ। এত উপকার যাহাতে, তাহা কি প্রাণ ধরিয়া ছাড়া যায়? আর একটি কথা বলিয়াই প্রস্তাব উপসংহার করিব। বঙ্গদেশে বাস করি, বঙ্গের চিকিৎসা-শাস্ত্র কাফেরের শাস্ত্র—তাহা তো স্পর্শই করিব না। ডাক্তারি মতও তাহাই! —এপিট আর ওপিট। হাকিমি মতে অবশ্যই ভক্তি আছে। ইউনান (গ্রীস) নিকটে না হউক, জলবায়ুর সহিত সমতা না থাকুক, তত্রাচ আমরা বাদশার জাত বাদশাই দারু, বাদশাই মতের গ্রন্থেই মাননীয়। ভাল কথা—আমিও স্বীকার করি। ইউনানে হাকিমি মতের সৃষ্টি, সুতরাং সেই মতের চিকিৎসা-শাস্ত্রই সর্ব্বাগ্রে গণ্য। মানিলাম তাহাই মানিলাম। ভ্রাতাগণ! সেই হাকিমি মতের বস্তুবিচার গ্রন্থে গোমাংসের গুণাগুণ কিরূপ বর্ণিত হইয়াছে অনুগ্রহ করিয়া একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন। যদি মূর্খতা দোষে সে গ্রন্থ পাঠের শক্তি না থাকে তবে কোন হাকিমকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন, গোমাংসের গুণাগুণ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন তিনি কি বলেন। মলাধারে হারগাঁথা এক প্রকার কৃমি, কোন মাংসে জন্মিয়া থাকে? বাত-রোগের জন্ম কোন মাংসে বেশী হয়? স্বভাবে বাধা দিতেছে, রসনা অরুচির কথা কহিতেছে, মহাপ্রাণী অস্বীকার করিতেছে, চক্ষু দেখিতে বিরক্ত হইতেছে, দন্ত-ব্যাধিগ্রস্থ হইতেছে, পাকস্থলি পরিপাকে অশক্ত হইতেছে। —মনের বিকারেই ভগবানের আভাস পাওয়া যাইতেছে। তবু বলিব? তবু স্বীকার করিব যে

গোমাংস বঙ্গ সার খাদ্য ? ভুগিতেছি, মরিতেছি, স্বচক্ষে ফলাফল দেখিতেছি, গোমাংস ভক্ষণের বিষময় ফল প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছি, তবু গোমাংস জন্য যে জিহ্বা লক লক করে, যে জিহ্বায় রস পড়ে, ধিক তাহাকে ! শতধিক !

আবার আমার কয়েকটি কথা

বিগত পৌষ মাসের আখ্‌বারে এস্‌লামীয়া পত্রিকায় "গোমাংস" প্রস্তাবের যে প্রতিবাদ প্রকাশ হইয়াছে তাহা গো-জীবনে গৃহীত হইল। সমুদায় প্রস্তাব ও প্রতিবাদ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইবে। ন্যায়-অন্যায় সাব্যস্তে বিচারের ভার পাঠকগণের হস্তে। লিখকের নাম, ধাম, পরিচয়ের জন্য কেহ ব্যস্ত হইবেন না। শীঘ্রই স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইবেন।

যে প্রতিবাদে হিংসার আভাস, দ্বেষের অপছায়া, অপকথার স্পষ্ট আভা দেখা যায়, সেখানে লিখক নীরব। কিন্তু এক্ষেত্রে নহে। প্রতিবাদের প্রতি কথার উত্তর পাইবেন। ঈশ্বর ইচ্ছায় প্রতি ছত্রে ছত্রে নক্ষত্র দেখিবেন। এ ব্রিটিশ রাজ্য, ব্রিটিশ বিচার, ধর্ম্মাসনে ন্যায়দণ্ডের নিরপেক্ষ, প্রতিভা প্রভাবে প্রমত্ত কুঞ্জরকেও ক্ষুদ্রপ্রাণী মশার হস্তে পরাস্ত হইতে দেখা যায়। কে বলিতে পারে কাহার ভাগ্যে কি আছে। ঈশ্বর সহায়, এলাহী ভরসা, ভগবান রক্ষক।

গো দুগ্ধ

দুগ্ধ জীবের জীবন। বিশেষ মানব জীবনের জীবনীশক্তির উপকরণ। দুগ্ধের সহিত মানুষের এমনি সম্বন্ধ যে দুগ্ধ নামেই ভক্তির উদয়—দুগ্ধ নামেই মহা-প্রাণী শীতল। দুগ্ধই যেন প্রাণ, দুগ্ধই যেন জীবনের জীবন,—ভারতবাসীর স্বর্গীয় সুধা। কোন কোন দেশে ছাগ, গর্দ্দভ, মহিষ, উষ্ট্র, প্রভৃতির দুগ্ধও উদরে স্থান পায়, কিন্তু গো দুগ্ধ আমাদের যত প্রযোজন, যত প্রকার সুখাদ্যের স্থল ও মূল উপকরণ, অন্য দুগ্ধ সে প্রকার নহে। বিশেষ গর্দ্দভ দুগ্ধ সর্ব্বজন মুখপ্রিয়, কি সর্ব্ববাদী সম্মত নহে। কোন কোন পীড়ার মহৌষধ হইলেও শাস্ত্র বর্জিত। সুতরাং গো দুগ্ধই সর্ব্বাগ্রগণ্য। যে দিন ভারতসন্তান জননীর উদর হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে, সেইদিনে, সেই সদ্যপ্রসূত সন্তানের জীবনীশক্তির বৃদ্ধি-হেতু গো দুগ্ধেরই আশ্রয় লইতে হইয়াছে। জীবন পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিন প্রতি সন্ধ্যা আহারের উপাদেয় উপকরণ হইয়া, নানা আকারে, নানা প্রকারে অথবা কাহার সঙ্গে মিশিয়া আত্মার বল, হৃদয়ের বল, শরীরের বল, মস্তিষ্কের বল, সবল-

রূপে পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। রাজাধিরাজ মহারাজের সুবর্নভূষিত রন্ধনশালা হইতে, দরিদ্রের পর্ণ কুটিরস্থ ক্ষুদ্র পাকপাত্র পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকারে, গো দুগ্ধ প্রবেশ করিতেছে। ইহার নিকট জাতিভেদ পরাস্ত, ঘৃণা অ-রুচি লজ্জিত, হিন্দু মোসলমানের নিকট সমভাবে সমাদৃত। সম্প্রদায় প্রভেদে ভারতে খাদ্যাদির বিশেষ বিভেদ আছে, কিন্তু দুগ্ধের নিকট বিধানকর্তার হস্ত সঙ্কোচিত, মস্তিষ্ক অবনত। যে হিন্দু গোমাংসের কথা শুনিলে কর্ণে হাত দিতেছেন, তিনি গোরসে মত্ত। আবার যে মোসলমান গোমাংস জন্য জিহ্বার জল ফোঁটায় ফেলিতেছেন, তিনিও গোরসে লালায়িত। দয়াময় ভগবান সার অংশ, তৈল অংশ, মধুর অংশ এবং জল অংশ—এই কয়েক অংশ দ্বারা দুগ্ধের সমষ্টি করিয়া অপার লীলা দেখাইয়াছেন। শুধু মাংস আহার করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। এমন কোন খাদ্য নাই যে সেই একমাত্র খাদ্য গলাধ করিয়া শরীর রক্ষা হইতে পারে, প্রাণ বাঁচাইতে পারে। সে গুণ, সে ক্ষমতা কেবল একমাত্র দুগ্ধের। পবিত্রতার গুণই বা কত বলিব, —কাফেরের হস্ত হইতে মৌলবী গ্রহণ করিতেছেন, চণ্ডালের হস্ত হইতে ব্রাহ্মণে লইতেছেন। কাহারও মনে দ্বিধা নাই, কোনরূপ ঘৃণার কথা মুখে নাই। গোমাংস যেমন, সম্প্রদায় বিভেদে ঘৃণার্হ, তেমনি গোদুগ্ধ মনুষ্য মাত্রেই আদরের। ভারতের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত যাও, খাদ্যাখাদ্যের বিভিন্নতা অর্থাৎ গ্রহণ বর্জ্জন এবং রুচি-অরুচি, সকলি দেখিতে পাইবে, কিন্তু দুগ্ধ সম্বন্ধে সেই এককথা, সেই একমত, সেই একভাব। কেহই দুগ্ধের বিরোধী নহে, কোন সম্প্রদায়েরই পরিত্যাজ্য নহে। স্বাস্থ্যে অস্বাস্থ্যে, শীত গ্রীষ্মে, সর্ব্বকালে সেই স্বর্গীয় সুধা রুচিকর ও তৃপ্তিকর। যে সকল সাহেবগণ গোকুল নির্ম্মূল করিতে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা হস্তে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাঁহারাও দুগ্ধকে পবিত্র খাদ্য মনে করিয়া সাদরে গ্রহণ করিতেছেন, অন্তরাত্মা শীতল হইতেছে। শাস্ত্রের দায়দিয়া দুগ্ধের বাটীটি পর্য্যন্ত ধুইয়া উদরে ঢালা হইতেছে। শাস্ত্রে আছে—সে সময় "হজরত নুরনবী মোহাম্মদ মুস্তফা" সেই অনন্তকৌশলীর অনন্তলীলায় মর্ত হইতে সপ্ততল বিমান অতিবাহিত করিয়া পবিত্র অনন্তধামে দয়াময়ের দরবারে স্ব-শরীরে বিঘোর নিশীথ সময়ে "বোরাক আরোহণে" (স্বর্গীয় বাহন) অতি মুহূর্ত্তে নীত হইয়াছিলেন—বলিতেও অঙ্গ শিহরিয়া উঠে —সে মহাপবিত্র পূণ্যধামেও দুগ্ধেরই প্রাধান্যের কথা শুনা যায়। প্রিয় প্রণয়ীর অভ্যর্থনা হেতু পাত্র পূর্ণ দুগ্ধই সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। আশ্চর্য্য! স্বর্গেমর্ত্তে সমান আদর? ধন্য ভগবানের লীলা ও মহিমা!

গো-খাদক কসাইগণ, গোমাংস পূর্ণ বাটী প্রতিদিন অন্নের সহিত দেখিতে নারাজ। আবার কিন্তু দুগ্ধ পূর্ণ বাটী প্রতি সন্ধ্যা আহারের সময় সম্মুখে পাইলে আর রক্ষা নাই—বাটী ধৌত জল পর্য্যন্ত উদরে স্থান পায় ও মহা-পবিত্রতার জন্মে। শয্যাধারী জ্বররোগীর যেমন দুগ্ধের প্রয়োজন, বলবীর্য্যশালী রণমত্ত বীরপুরুষেরও সেইরূপ আবশ্যক। প্রতিদিন এক ব্যনজন, এক মাংস, এক ডাইল, এক তরকারী একই খাদ্য দ্বারা জীবাত্মার কখনই সন্তোষ জন্মে না,—কিন্তু দুগ্ধ তাহার বিপরীত। অনেক মহোদয়কেই এক সন্ধ্যা দুগ্ধের অভাবে দুঃখ প্রকাশ করিতে দেখা যায়, গোরস উদরে না গেলে অপকারের কথাও সময় সময় শুনা যায়। সামান্য কথায় বলে যে, সাত সন্ধ্যা দুগ্ধ বা দুগ্ধ সংযুক্ত কোন দ্রব্য না খাইলে চক্ষের জ্যোতিঃ হ্রাস এবং উদরতন্ত্রী শুনীরন্ধ্র ছিদ্রে পরিণত হয়। উদর সেবায়, বন্ধু সেবায়, দেব সেবায় সর্ব্ব সেবাতেই গব্য রসের আয়োজন ও প্রয়োজন। রোগী রোগশয্যায় শায়িত, মুহূর্ত্ত মধ্যেই ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবে, যমদূত দণ্ডায়মান।—চক্ষু জ্যোতিঃহীন।—তারায় নীলিমা রেখা,—জিহ্বা জড়, হস্তপদ অবশ, নিঃশ্বাসেই আশা,—পরিজন শিয়রে এবং পার্শ্বে ম্লানমুখে। ঔষধে ক্ষান্ত। যম তাড়নায় অস্থির। হৃদয় শুষ্ক, কণ্ঠ নীরস।—হায়রে! সে সময়েও দুগ্ধ স্বাদ গ্রহণে ইচ্ছুক। জগত ছাড়িয়া যাইতেছে, প্রাণবিহঙ্গ দেহপিঞ্জর হইতে উড়িয়া পালাইতেছে, প্রাচীনেরা ঈশ্বরের নাম করিতেছে, আত্মীয়-স্বজনেরা সে নিদারুণ সময়েও রোগীর মুখে দুগ্ধপাত্র ধরিতেছে। গলাধঃ করিবার শক্তি নাই, গণ্ড বহিয়া পড়িতেছে। বাটি বাটী গোমাংস ঘরে থাকা সত্বেও চেতনা শূন্য শয্যা ধরা, প্রায় মরা রোগীর মুখে কেহই এক টুকরা গোমাংস তুলিয়া দিতেছে না। গোরসই ধারক, বিবেচক এবং শেষ তৃষ্ণা নিবারক। ভ্রাতাগণ! বলুন তো মূলে কুঠারাঘাত করিলে কি আর ফল লাভের আশা থাকে? গোকুল নির্মূল করিলে কি আর দুগ্ধের দ্বারা জীবনের শেষ তৃষ্ণা নিবারণের উপায় থাকে?

আখবারে এসলামীয়া—মাসিক পত্রিকা। টাঙ্গাইলের অন্তঃর্গত করটীয়া আহমদীয়া প্রেস হইতে প্রকাশিত। প্রিন্টার মীর আতাহার আলী, সম্পাদক মৌলবী নইমদ্দীন। ১২৯৫ সনের শ্রাবণ মাসের পঞ্চম ভাগ চতুর্থ সংখ্যায় নিম্নলিখিত প্রতিবাদ প্রকাশ হইয়াছে

গোকুল নির্ম্মূল আশঙ্কা প্রবন্ধের প্রতিবাদ

আহমদীতে গোকুল নির্ম্মূল সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়িয়া আমরা নীরব থাকিতে পারিলাম না। আল্লা চাহে এ সম্বন্ধে পৃথকরূপে কিছু লিখিব, এবার এস্লামীয়ার একটি প্রিয়বন্ধুর প্রেরিত প্রবন্ধটি প্রকাশ করিলাম।

সম্পাদক মহাশয়।

গোবধ সম্বন্ধে ভারতের নানা স্থানে বাস্তবিকই আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতে আপনি বলেন 'কোন সম্প্রদায়ের মর্ম্মের সহিত সংযোগ সুতরাং আমি নীরব' কেবল আহমদীর কোন প্রিয়বন্ধুর অনুরোধে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেছেন। গোবংশ-রক্ষক মহাশয় যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত তাহা আপনি বিশেষ অবগত আছেন। যদি তিনি খ্রীষ্টিয়ান এবং মুসলমান না হন, তবে আমরা তাঁহার প্রবন্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী নহি। যদি বাস্তবিকই তিনি মুসলমান হন তবে তাঁহার প্রত্যেক কথার উত্তর না দিলে আমরা শাস্ত্রানুযায়ী অপরাধী। অতএব তাঁহার প্রত্যেক কথার ক্রমশঃ প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম।

১। গোবংশরক্ষক মহাশয় আদৌ গোকুল নির্ম্মূল আশঙ্কা শীর্ষক স্থলে ব্যবহার করিতে পারেন না। তাঁহার মনে রাখা কর্ত্তব্য যে ভারতবাসীর উপজীবিকা এবং ধনপ্রাণ অধিকাংশ গোজাতির প্রতি নির্ভর, সেই গোজাতিকে সম্প্রদায় বিশেষের যে একেবারে নির্ম্মূল করার ইচ্ছা আছে ইহা কখনও সম্ভবে না। কোন কোন জাতি গোমাংস ভক্ষণ করে বলিয়াই যে গোজাতি সমূলে নির্ম্মূল হইবে তাহার কথা কি? গো নিধন আজকাল নূতন আরম্ভ হয় নাই, বহুকালাবধি গো নিধন চলিয়া এতকাল মধ্যে যখন গোধনের কিছুমাত্র অপচয় হয় নাই তখন তাঁহার আশঙ্কাই বা কেমন? কেহ গোজাতিকে পরম শত্রুজ্ঞানে বংশ নিপাতার্থে বধ করে না। যেমন মাঝে মাঝে গোবধ হইয়া থাকে তেমনই অনবরত গো বর্দ্ধন ও গোজাতির উন্নতির জন্য শত শত চেষ্টাও হইয়া থাকে। একদিকে আংশিক ক্ষয় অপরদিকে প্রচুর বৃদ্ধি।

২। গোবংশরক্ষক মহাশয় যে স্বয়ং মুসলমান নহেন তাহা তাঁহার আপন কথাতেই সপ্রমাণিত হইতেছে। তিনি বলেন, "আমি মুসলমান, গোজাতির পরম শত্রু, গোমাংস হজম করিতে পারি ইত্যাদি" এই ভান করিয়া মহৎ আত্মার পরিচয় দিতেছেন। যিনি মুসলমান হইবেন তিনি কখনও আপন শাস্ত্রানুমোদিত হালাল বস্তুর প্রতি ব্যঙ্গজনক উক্তিতে ঘৃণা ও উপহাস বাক্য প্রয়োগ দ্বারা

জাতিগণ শুনিয়া কাফের শ্রেণীতে গণ্য হইবেন না। অতএব তিনি মুসলমান নহেন।

৩। তিনি বলেন, "পালিয়া পুষিয়া বড় বলদের গলায় ছুরি বসাইতে পারি।" তিনি মুসলমান হইলে অবশ্যই অবগত থাকিতেন যে তাঁহারা কোন প্রকারের বলদের গলায় ছুরি বসাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলিষ্ঠ কার্যাপযোগী বড় বলদের গলায় ছুরি বসান না।

৪। মুসলমানগণ কখনই দুগ্ধবতী গাভী ও দুগ্ধপায়ী বৎস জবাহ করে না, প্রয়োজন মতে তাহারা বন্ধ্যা গাভী অথবা দুগ্ধ দেওয়ার অনুপযুক্ত গাভী জবাহ করিয়া থাকে। গোবংশ রক্ষক মহাশয় যদি মুসলমান হইতেন বা মুসলমানের সন্নিহিত বাস করিতেন তবে গোমাংস ভক্ষণের প্রণালী বিশেষরূপে অবগত থাকিতেন। কোরাণে অনেকস্থলে 'কোরবানি' শব্দ উল্লেখ আছে, তৎপরিবর্ত্তে তিনি 'বলি' শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। বোধকরি আশৈশব তাঁহার বলি এবং কাটাছিড়ার অভ্যাস, অতএব তিনি যে মুসলমান নহেন তাহাতে সংশয় কি?

৫। তিনি বলেন, যাহা ন্যায় চক্ষে দেখিতেছি, যে ব্যক্তি মুসলমান শাস্ত্রে ও ধর্ম্মে দীক্ষিত বলিয়া আপনিই স্বীকার করিতেছেন ও আবার তিনি সেই ধর্ম্ম শাস্ত্রানুমোদিত বিষয় বিশেষের অন্যায় প্রতিবাদে প্রবেশ করিয়াছেন এবং যাঁহার আপন ধর্ম্মের প্রতি আস্থা নাই তাঁহার আবার ন্যায় চক্ষু কোথায় ধর্ম্মের সহিত ন্যায়ের নৈকট্য সম্বন্ধ।

৬। লিখক বলেন, "প্রিয় মৌলবী সাহেব মার্জনা করিবেন।" মৌলবী সাহেব! আমি আপনাকে মার্জনা করিতে পারি না. আপনি যে বিষয়ের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহার সহিত ধর্ম্মের অনেক যোগাযোগ রহিয়াছে। অতএব আপনি সম্পূর্ণ মার্জনার অযোগ্য। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যদি আপনি মুসলমান না হন তাহা হইলে আপনার প্রবন্ধের উত্তর দিতে বাধ্য নই, যদি মুসলমান বলিয়া দাবি করেন তবে আপনার প্রকৃত মুসলমানীয় দাবির কি সত্ত্ব আছে অগ্রে প্রকাশ করিয়া বলুন তাহাতে যদি আপনাকে প্রকৃত মুসলমান বলিয়া প্রতীতি জন্মে তবে এ সম্বন্ধে ফতওয়া (পাতী) প্রদান করিতে বাধ্য নতুবা আমার নিরব থাকাই ভাল। মুন্সীসাহেব যাহা বলিতেছেন তাহাই একটুক মনযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

৭। লিখক বলেন, "প্রিয় মুন্সীসাহেব ক্ষমা করিবেন।" মুন্সীসাহেব! আপনাকে ক্ষমা করা যাইতে পারে না। "আমাদের মধ্যে হালাম হারাম ইত্যাদি"—এ-কথা আপনে ব্যবহার করিতে পারেন না। বোধহয় আপনে গোমাংস ভক্ষণার্থে মুসলমান ধর্ম্ম নূতন গ্রহণ করিয়াছেন এবং কয়েকদিন পর্য্যন্ত গোমাংস ভক্ষণ করিয়া হজম করিতে সাধ্য হয় নাই, তাই বুঝি গোমাংসের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছেন। এমন ব্যক্তিকে কখনই মুসলমান জগৎ প্রতিনিধিত্বে বরণ করেন নাই যে তিনি যাহা বলিবেন তাহাই লোকসমাজে সমস্ত মুসলমান জাতির উক্তি বলিয়া নির্দেশিত হইবে।

৮। গো বংশরক্ষক মহাশয়! আপনে মুসলমান বলিষা দাবি করুন তাহাতে আমার কোন ক্ষোভের কারণ নাই। "রাফিজী" সম্প্রদায়ও মুসলমান বলিয়া দাবি করিয়া থাকে, কিন্তু সাফি, হানিফি শব্দ উল্লেখ হালাল হারামের বিচারের প্রয়াস পাওয়া আপনাব ন্যায় লোকের পক্ষে শোভা পায় না।

৯। "সাফি মতে জলজন্তু মাত্রেই হালাল"—এই শাস্ত্র আপনে কোথায় পাইলেন আমাকে দেখাইয়া দেউন। অনেক শ্রেণীস্থ জলজন্তু সাফি মতেও হারাম। বোধকবি আপনিই প্রথম মাংস ভক্ষণ আরম্ভ করিয়া যখন যে জন্তু সম্মুখে পাইতেন তাই ভক্ষণ করিয়া তাহার বিষময় ফলও ভোগ করিয়া থাকিবেন। শেষ বজকের পায় পড়িয়াছেন।

১০। "সাফি মতে বজকের পদ যতটুকু জলে থাকে কাটিয়া লইয়া ইত্যাদি."—এমন কথা কোরাণ হাদিস এবং মহাম্মদীয় কোন ধর্ম্মগ্রন্থে নাই। আপনে কোথা হইতে আনিয়া যোগ কবিতেছেন বুঝিতে পাবি না। কোরাণ হাদিস এবং মহাম্মদী ধর্ম্মগ্রন্থে যে বিষয় নাই সেই সব বিষয় আছে বলিয়া যাঁহারা প্রচাব করেন তাঁহারা কোরাণের আয়েত অনুসারে ফাছেক, জালেম, কাফের এবং মহাম্মদীয় ধর্ম্ম হইতে বর্জিত বলিয়া নির্দ্দেশিত। বোধকরি আপনিই কখন সাফি মতের দায় দিয়া রজকের পায়ের সিদ্ধ পোড়া শুরওযা, ঝলসা প্রভৃতি পাক আহার করিয়া স্বাদ পরিগ্রহ করিয়া থাকিবেন।

১১। "শাস্ত্রে একথা লিখা নাই যে গোহাড় কামড়াইতেই হইবে, গোমাংস গলাধ না করিলে নরকে পচিতে হইবে, বরং যাহা অখাদ্য তাহার নাম উল্লেখ স্পষ্ট নিষেধ বাক্য, খাইও না, লিখা আছে!" —শাস্ত্রে লিখা আছে কি না তাহা

আপনার ন্যায় লোকে কিসে জানিবে ? আমাদের জন্য গোমাংস হালালই আছে, আমরা তাহাই আহার করিয়া রসনা পরিতৃপ্ত করিতে পারি। আপনার ভাগ্যে ঘটে না বিধায় বুঝি আপনে যে স্থানে যে হাড় পান তাহাই চিবাইয়া দন্ত পরিতৃপ্ত করেন। বিশেষ কোন কারণানুসারে কোরাণে তীব্রভাবে গোবধের আদেশ আছে। আপনার তদ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য থাকিলে বারান্তে জানাইব। গোজাতি পরম উপকারী জন্তু বলিয়া ভক্ষণ নিষেধ হইলে কোরাণে ও হাদিসে তাহার স্পষ্ট নিষেধ আজ্ঞা থাকিত। বিশেস সম্মানি জন্তু মধ্যে গণ্য হইলে কোরাণে উটের ন্যায় উহারও প্রশংসা থাকিত।

১২। "খাইবার অনেক আছে খাইতে পারি খাইনা।" —খান না কেন ? আপনাকে কে নিষেধ করিতেছে ? আপনার মন তো স্বাধীন, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন: আপনাকে আমরা হাত ধরিয়া নিষেধ করিতেছি না। আপনার ন্যায় দুই একজন আজকাল হিন্দুসমাজ হইতেও বাহির হইতেছেন, তাঁহাদের যাহা অভিপ্রায় তাহাই করেন। সমাজের তাঁহারা বড় একটা ধার ধারেন না।

১৩। আপনার বিদ্যা এবং শাস্ত্রজ্ঞানের বুঝি এই পর্য্যন্ত দৌড় "ফড়িং ধরিয়া ঘৃতে ভাজিয়া টপাটপ গিলিতে পারি।" এই বুঝি শাস্ত্রের কথা ? শাস্ত্রে টিড্ডি খাওয়াও বিধান আছে. আপনে টিড্ডি ভ্রমে ফড়িং ব্যবহার করিয়া শাস্ত্রের প্রতি দোষারোপ করিতেছেন। শাস্ত্রই দোষী না আপনিই দোষী ? যখন আপনার ঘোড়া এবং ভেড়া, ফড়িং এবং টিড্ডি, পর্ব্বত এবং সমভূমিতে যে কি বিভিন্ন তাহার জ্ঞান নাই তখন আপনে কোন মুখে মহাম্মদী শাস্ত্র সমালোচনা করিতে অগ্রসর হইতেছেন ?

১৪। "গোসাপ উদরস্থ্যাং করিতে পারি, ভয়ে তাহার নিকটেও যাইনা।" পয়গম্বর সাহেব স্বয়ং কখন গোসাপ খান নাই এবং তাঁহার বংশাবলীর মধ্যেও কেহ কখন ব্যবহার করেন নাই, তাঁহার সময়ে আরবের কোন সম্প্রদায় গোসাপ আহার করিত, পয়গম্বর সাহেব তাহাদিগকে প্রচলিত পথ অনুসারে গোসাপ ভক্ষণ নিষেধ করেন নাই এবং কোথাও স্পষ্ট আদেশ প্রচার করেন নাই।

১৫। গোকুল ছাড়িয়া যে আবার ছাগল লইয়া বসিলেন ? আপনে কোথায় দেখিয়াছেন যে মুসলমানগণ দুগ্ধবতী ছাগল জবাহ করিয়া মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে ? কোরাণে নিষেধ আছে যাহারা জাহেল (মূর্খ) এবং ধর্ম্ম-বিষয়

অনভিজ্ঞ তাহাদের সহিত শাস্ত্র প্রসঙ্গে বাদানুবাদ করা কর্ত্তব্য নহে।

১৬। "ছাগলের মধ্যে পাঁঠা তো খাদা—তাহার দিকে বড় ঘেঁষিনা।" পাঁঠার দিকে ঘেঁসিতে নিষেধ নাই, কেন যে তাহার দিকে ঘেঁষিনা তাহা কেনা জানে? পাঁঠার মাংস স্বভাবতই অতি দুর্গন্ধযুক্ত অথচ এক পাঁঠার মূল্যে তিন ছাগল পাওয়া যায় বলিয়া আমরা তাহার দিকে ততদূর ঘেঁষিনা। কিন্তু অপর নিয়মে শাস্ত্রানুসারে তাহার দিকে ঘেঁষিতে নিষেধ নাই। পাঁঠার দিকে আমরা ঘেঁষিনা বলিয়া কি পাঁঠাকুল রক্ষা পাইয়াছে? কোন সম্প্রদায় যে পাঁঠাকুলের অনবরত সংহার করিয়া আসিতেছেন তাহা কি আপনার চক্ষে উঠে না?

১৭। "উষ্ট্র এদেশে নাই, থাকিলে তাহার কাছেও যাইত না। শরীরের গঠন দেখিয়াই পাকস্থলি ঠাণ্ডা হয়।" উট অতি পবিত্র জন্তু, তাহার মাংস অতি পবিত্র ও হালাল, কিন্তু তাহা দেখিয়া যে পাকস্থলি ঠাণ্ডা হয়, পবিত্র বস্তুর প্রতি এই ঘৃণারূপ মহাপাপ মুক্তি লাভার্থে অগত্যা একবার তাহার মাংস ভক্ষণ করা আপনার প্রতি ওয়াজেব (কর্ত্তব্য)। যে বস্তু যে দেশে সহজলভ্য সে দেশে তাহার ব্যবহার অধিক। উষ্ট্র আমাদের দেশে নাই সুতরাং তাহার ব্যবহারও বিরল। ভাই বলিয়া মাথা ঠুকিয়া মরেন কেন? গোজাতি এদেশে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ পাওয়া যায়, কাজেই তাহার ব্যবহার অধিক।

১৮। "মহিষ খাদা, তাহার নিকট ছুরি হাতে করিয়া যায় কে?" ছুরি হাতে করিয়া কেহ যায় না বটে কিন্তু কোমর বান্ধিয়া জগদামর্দ্দীর পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া অলীক আমাদের জন্য শত শত দর্শকমণ্ডলীর সাক্ষাতে অসিহস্তে ধাবন পূর্ব্বক যে শত শত লোক তাহার দিকে ধাবিত হয় আর বাদ্য ঘণ্টা বাজিতে থাকে ও উলুধ্বনি পড়িতে থাকে তাহা বোধকরি লিখক মহাশয়ের চক্ষে বেশ সহ্য হয়।

১৯। "মহিষ, ঘোড়া, বনগরু, ছাগল, মৃগ, খরগোশ—সকলি তো চলিতে পারে, এ সকল খাইলে ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়, এত থাকিতে গোমাংসে জিহ্বার জল পড়ে কেন?" ঘোড়া, বনগরু, ছাগল, মৃগ প্রভৃতি কোন কোন জন্তুর মাংস যে ব্যবহার না হয় এমন নহে। যাহাদের সংখ্যা অল্প ব্যবহারও অল্প। গোমাংস দেখিয়া জিহ্বার জল পড়ে বলিয়া ব্যবহার হইতেছে—এটি আপনারই মনগড়া কথা। গোজাতির সংখ্যা অত্যধিক, মাঝে মাঝে তাহার বধ হইলে গোবংশ নির্ম্মূল

হওয়ার সম্ভাবনা নাই ; তদজন্যই বধ হইয়া থাকে। ছাগ প্রভৃতির সংখ্যা অতি অল্প, তাহাদের অনবরত ধ্বংশে বংশ নিপাত হওয়ার আশঙ্কা। সৃষ্টি নিপাত করা কাহার তো উদ্দেশ্য নহে।

২০। "এপর্য্যন্ত মুসলমান জগতে প্রচলিত ধর্ম্মগ্রন্থে উল্লেখ, সুতরাং কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। ঘটনাস্থল "মক্কা" হজরত মহাম্মদের জন্মের পূর্ব্বে,"—লিখক মহাশয়! কোরবানির উৎপত্তির মূল কারণ কিছুই উল্লেখ করেন নাই, কেবল ঘটনাটি মাত্র প্রকাশ করিয়া নানা ব্যঙ্গজনক উক্তি করিয়াছেন। মুসলমান ধর্ম্ম সৃষ্টি অবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইহার বিরোধীগণও ইহাকে এমন তীব্রভাবে আক্রমণ করেন নাই। তবে লিখক মহাশয় স্বয়ং মুসলমানী দায় দিয়া কেন যে এসলামকে বিদ্রূপ এবং উপহাস করিয়া ধর্ম্মচ্যুত হইতেছেন, তাহার বিচার মুসলমান সমাজ করুন।

"এ পর্য্যন্ত মুসলমান জগতে প্রচলিত," লিখক মহাশয়ের মনে বিশ্বাস যে ইহার মূলে কিছুই নাই, কেবল প্রচলিত প্রথানুসারে চলিয়া আসিতেছে, বাস্তবিক তাহা নহে, মূল অতি দৃঢ়। "ধর্ম্মগ্রন্থে উল্লেখ," তাঁহার লিখার ভাবে বুঝা যায় যে তিনি এ-কথাটি সহজে স্বীকার পাইতেছেন না, কেহ যেন তাঁহাকে বলপূর্ব্বক স্বীকার করাইতেছে। কোরাণ ও হাদিসে যে কোরবানির কথা উল্লেখ আছে তাহা কি কখন তিনি কর্ণেও শুনেন নাই?

২১। "ধর্ম্মের গতি বড় চমৎকার, পাহাড়, পর্ব্বত, মরুভূমি সমুদ্র, নদনদী ছাড়াইয়া মুসলমান ধর্ম্ম ভারতে আসিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে কোরবানিও আসিয়াছে", ধর্ম্ম বাস্তবিকই ধর্ম্ম, তাহার গতি অতি চমৎকার না হওয়ার কথা কি? যে ধর্ম্মের নেতা একজন মাত্র সহায় লইয়া আপনার সদৃশ বহু সংখ্যক প্রতিবাদীর মুখের উপর ধর্ম্ম প্রচার করিতে ভীত ও কুণ্ঠিত হন নাই, সে ধর্ম্মের গতি চমৎকার বৈকি? যখন তাহার গতি চমৎকার তখন তাহাকে পাহাড়, পর্ব্বত, মরুভূমি, সমুদ্র, নদনদী ছাড়াইয়া ভারতে আসিতে বাধা দিতে পারে এমন সাহসী কে? ধর্ম্ম যখন আসিতে সাহসী হইল তখন তাহার অঙ্গ-প্রতঙ্গ সমস্ত অবশ্য তাহার সঙ্গে আসিবে, তাহাতে কোরবানি দূষি কিসে?

গোরক্ষক মহাশয়! নয়ন মুদিয়া মননিবেশ পূর্ব্বক একটুক চিন্তা করিয়া দেখিলেই অনুধাবন করিতে সমর্থ হইবেন যে, তাঁহার আপন মতানুসারে দিনদিন দশ সহস্র গোবধ হওয়া সত্বেও গোবংশের কিছুমাত্র ধ্বংস বা বিলুপ্তি হয় নাই!

জগতে গোজাতি ভিন্ন আরও অনেক রকমের গ্রাম্য জন্তু আছে (যাহা কোন সম্প্রদায়ের আহার্য্য নহে)। তাহার সহিত গোপালের তুলনা করিলে কোন জাতির সংখ্যা অধিক হইবে? অনিবার্য্য গোবধ হওয়া সত্বেও ঘাটে, হাটে, মাঠে শত শত গোপালই রক্ষিত হইয়া থাকে, অন্য প্রকারেব দশ বারটি পশু বোধকরি লিখক মহাশয় একত্রে একস্থানে পান কিনা সন্দেহ। সদ্ব্যবহারের বস্তু কখনই নষ্ট হয় না, বরং উহাব উন্নতি এবং বৃদ্ধি হইয়া থাকে। গো দুগ্ধেই আমাদের শরীর পোষণ হইতেছে, গোজাতির পরিশ্রমের উপর এ দেশের কৃষিকার্য্য নির্ভর, সেই গোজাতির উন্নতির এবং বৃদ্ধির জন্য ভারতবাসী মাত্রই সচেষ্টিত। মুসলমানগণ শুধু মাংসার্থে গোজাতিকে সমাদব করিয়া থাকে না, তাহাবা বহুবিধ প্রয়োজনানুরোধে গোজাতির সমাদর করিয়া থাকে। আপনার বিচক্ষণ বুদ্ধিতে কেমন করিয়া প্রবেশ করে যে, মুসলমানগণ শুধুই গোজাতির শত্রু। কোরাণে যে ভাবে ও যে চক্ষে গোজাতিকে লক্ষ করার বিধান আছে সে চক্ষে দেখিলে কবে গোজাতি নির্ম্মূল হইত। ভারতবাসীর অপর সম্প্রদায়গণ ঘরে ঘরে প্রতিপালন করিয়াও সে ক্ষতি পূরণ করিতে সমর্থ হইতেন না। "সুফি সাহেব কিছু মনে করিবেন না।"

সুফি সাহেব! আমি কিছু মনে না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি মোল্লা মানুষ, স্বভাবত বিবাদ প্রিয় নহি, কাজে কাজেই ক্ষান্ত না থাকিয়া উপায় কি! একটি কথা হঠাৎ মনে পড়িল, তাহাই জনসমাজে প্রকাশ পূর্ব্বক প্রস্তাব উপসংহার ও মনের খেদ নিবারণ করি। প্রথম এদেশে যখন খৃষ্টিয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগের হস্তগত হয় তখন তাঁহাদের আপন ধর্ম্ম বিস্তার জন্য পালে পালে মিশনারীগণ দেশ-দেশান্তর বহির্গত হইয়া সুমিষ্ট বাক্য ও গম্ভীর স্বরে ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। তাহাতে অনেক নিচাশয় পামরচেতা হিন্দু আপন ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক খৃষ্টিয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া হেটকোট পরিধান করত সাহেব সাজিলেন। ইহাতেই কি সাহেব হওয়া যায়?—না তাহারা এখন এদিকে মিশিতে পারেন না ওদিক যাইতে পারেন! অন্নবস্ত্রের উপায়ান্তর না দেখিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থে পুনরায় মিশনারী-দিগের নিকট আবেদন করায় তাঁহারা বলিলেন যে, তোমরা আপন আপন ধর্ম্মে নিগুঢ়তত্ত্ব উদঘাটন পূর্ব্বক প্রচার করিতে থাক, সরকার হইতে তোমাদের জন্য বন্দোবস্ত করা যাইবেক। তদানুসারে তাহারা আদাজল খাইয়া তাহাই করিতে লাগিলেন। এখন দেখা যাইতেছে যে, তাহাদের ধর্ম্ম বিনাশের প্রাণপণ চেষ্টা সত্বেও হিন্দুধর্ম্মের কিছুমাত্র অনিষ্ট ঘটে নাই; সেইরূপ আজকাল কোন কোন

মুসলমান আপন সমাজ হইতে ধর্ম্মচ্যুত হইয়া মুসলমান ধর্ম্মের মূল উচ্ছেদ মানসে যে তাহার নিগূঢ়তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতে বসিয়াছেন তাহাতে সত্যধর্ম্মের কিছু মাত্র অপচয় হইবেক না। সত্যের জয় মিথ্যার পতন !

মহাশয় ! সমাজের গ্রন্থি অতিশয় দৃঢ়, একটুক সাবধান হইয়া লিখনি ধরিবেন ; সমাজকে চটাইলে বড় প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা। উপসংহার কালে একটি হিতোপদেশ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। আপনে তওবা করিয়া পুনরায় মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হউন। তাহা না হইলে আপনার মুক্তিলাভের কোনই উপায় নাই।

ভারতে গোবধ

আজকাল ভারতে গোবধ সম্বন্ধে প্রচুর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে সমগ্র ভারতবর্ষ তরঙ্গায়িত। স্থানে স্থানে সভা-সমিতি সংস্থাপিত হইয়া এই তরঙ্গের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতেছে। অধুনা ভারতীয় হিন্দুসম্প্রদায় গোহত্যা-জনিত দুঃখে বিষম দুঃখিত ও মর্ম্ম-পীড়িত। গোখাদক জাতির অত্যাচারে গোকুল নির্ম্মূল হইল, ইহাই তাহাদের আর্ত্তনাদের মূলসূত্র। খৃষ্টিয়ান ও মুসলমানদিগের নিষ্ঠুরতাই গোবংশ ধ্বংশের একমাত্র প্রধান কারণ, এইটি তাহাদের যুক্তি। উক্ত ধর্ম্মধ্বজীগণের যুক্তি কিরূপ ন্যায়সঙ্গত নিম্নে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

গোখাদকদিগের অত্যাচারে গোকুল নির্ম্মূল হইতেছে - কোন যুক্তি বলে গোকুল রক্ষকগণ এরূপ অসার তর্ক উপস্থিত করিতেছেন, তাহা আমরা স্থির করিতে পারিতেছি না। জগতের অধিকাংশ জাতিই গোখাদক ; সমগ্র ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা এবং পশ্চিম দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার সমস্ত অধিবাসীগণই গোমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। কি আশ্চর্য্য ! ঐ সকল দেশের গো বংশ তো ধ্বংশ হয় নাই। আর ভারতবর্ষে প্রায় আটশত বৎসর পর্য্যন্ত মুসলমানগণ গোমাংস ভক্ষণ করিয়া আসিতেছেন, খৃষ্টিয়ানগণও শতাধিক বৎসর পর্য্যন্ত গোমাংসে উদর পূর্ণ করিতেছেন, কিন্তু কোথাও এই দীর্ঘকালের মধ্যে গোকুল উৎসন্নে যায় নাই। আজ উনবিংশ শতাব্দীর প্রবল তরঙ্গে গোকুল যেন ভাসিয়া চলিয়াছে। মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানগণের গোমাংস ভক্ষণের মাত্রা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইলে আমরা এই যুক্তি

কতকটা সঙ্গত বলিয়া মনে করিতাম। বরং মুসলমানদিগের মধ্যে ' নিরামিষ ভোজী" নামে এক শ্রেণীর নব্যজীব আবির্ভূত হইয়াছে, তদ্দারা গোবধের মাত্রা অবশ্যই কিছু না কিছু কম হওয়া সম্ভব। যদি গোবধের আধিক্য দৃষ্ট হয়, তবে তাহার কারণ অন্যপ্রকার, ধর্ম্মধ্বজী হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকেই গোমাংস ধ্বংসকারী। যদি কেহ একবার সত্যতা উপলব্ধি করিতে চান, তবে সন্ধ্যার সময় কলিকাতাস্থ ফৌজদারী বালাখানার মোড়ে রুটি ও কাবাবের দোকানে এবং মোগলদিগের "প্রাইভেট রুমে" দুই এক ঘন্টা কাল দাঁড়াইলে দেখিবেন। দুঃখের বিষয় যাঁহাদের পেটে এখনও গরুর "হাম্বা" রব শ্রুত হওয়া যায়, তাহারাও ধর্ম্মধ্বজী নাম ধারণপূর্ব্বক গোবধের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমরা অবাক হইয়াছি। মাড়োয়ারী প্রভৃতি জৈন ধর্ম্মা-বলম্বীগণের মুখে এসব কথা শোভা পায়। মাংস প্রিয় বাঙ্গালী ভায়াদের মুখে এরূপ অযথা চীৎকার শোভা পায় কি? হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীগণ আইন দ্বারা গোবধ নিবারণ করিতে গবর্ণমেন্টকে উপদেশ দিতেছেন, তাঁহাদের এরূপ ধৃষ্টতা দেখিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। বাপুহে! আমাদের খাদ্য জিনিস আমরা খাই। তাহাতে তোমাদের বৃথা চীৎকার এবং গলাবাজী কেন? আমরা তো তোমাদের গরুগুলি জোর করিয়া আনিয়া বধ করিতেছি না? নিজেরা পালিয়া, পুষিয়া আবশ্যক মত তাহার মাংস ভক্ষণ করিতেছি, তাহার বিরুদ্ধে চিৎকার করিয়া তোমাদের কি হইবে? যদিও আমরা জানি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট হিন্দুদিগের এই অযথা অনুরোধ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিবেন, তবুও তাহাদের বিদ্বেষ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। গোড়া হিন্দুদিগকে বলি, তোমরা গোজাতিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিবে বলিয়া আমাদের তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? সরল মনে বন্ধুভাবে একথা বলিলেও কতকটা ভাল শুনায়, আইনকানুন ও জোর জবরদস্তির কথা শুনিলে আমাদের মনে বিজাতীয় ঘৃণা ও রোষের সঞ্চার হয়! ঐরূপ কথা শুনিলে আমরা স্পষ্ট অনুভব করিব, ইহা মুসলমানদিগের সহিত বিবাদ-বিসম্বা-দের কারণই—আর কিছুই নহে। যাঁহারা গোকুল ধ্বংস হইল বলিয়া গগনভেদী চীৎকার করিতেছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি আপনারা গোকুল বৃদ্ধির জন্য কি উপকার করিতেছেন? পূর্ব্বকালে আপনাদের মধ্যে রাজাধিরাজ হইতে সামান্য [অ]ধিবাসী পর্য্যন্ত সকলেই গোপালন করিতেন, এমন ভদ্র নামধারী কয় ব্যক্তি

গোপালন করিতে তৎপর ? আজকাল শিক্ষার প্রভাবে এদেশে যে বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিয়াছে, গোজাতির অবনতির তাহাই একমাত্র কারণ। আজকাল অনেক চাষার ছেলে খোদানুগ্রহে "বিদ্বান" তৎসঙ্গে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীতে উন্নীত। তাহারা গোপালন করিতে বা কৃষিকার্য্য করিতে কখনও কি সম্মত হইতে পারেন! বিদ্বানের সংখ্যা যতই বাড়িতেছে, দেশের অবস্থা উন্নত না হইয়া ততই অবনত হইয়া দাঁড়াইতেছে। গোপালনে বীতানুরাগ ও কৃষিকার্য্যে অনাস্থা দেশের সর্ব্বনাশের প্রধান কারণ। দেশে দরিদ্র হইবার যত কারণ নির্দ্দেশ করা যায়, ইহা অপেক্ষা তাহার কোনটিই সমীচিত নহে। যাহাদের চৌদ্দপুরুষ কৃষিজীবি, তাহারাও অনেকে এখন গো-পালন এবং কৃষিকার্যের নাম শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করেন। এদেশে শিক্ষাকার্য্যের যতই উন্নতি হইতেছে গোবংশের এবং তৎসঙ্গে কৃষি কার্য্যের ততই অবগতি হইতেছে। ইউরোপ প্রভৃতি সুসভ্য জনপদে শিক্ষার ফল ঠিক ইহার বিপরীত। চাকুরীই যে-দেশের বিদ্যাশিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য সে দেশের অবনতি যে অবশ্যম্ভাবী একথা কে না স্বীকার করিবে ? কোন সৌখীনবাবু একটি গাভী প্রতিপালন করিয়াই মনে করেন যে আমি গোকুল রক্ষা করিলাম। দুইটি ইংরেজী বর্ণমালা বা দুইগৎ বাঙ্গলা ভাষা যাহার কণ্ঠস্থ তিনিই গোপালন বা কৃষিকার্য্যকে অতীব ঘৃণিত কার্য্য মনে করেন। এরূপস্থলে গোবংশের উন্নতির আশা কিরূপে করা যাইতে পারে তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। নগরের দ্বিতল, ত্রিতল অট্টালিকায় বসিয়া যাঁহারা গোকুল রক্ষার জন্য জাগ্রত স্বপ্ন দেখেন, সভা-সমিতিতে বৃথা গলাবাজী করেন, তাহাদের জ্ঞান ও বিবেক শক্তিকে ধন্য। গরু দ্বারা মুসলমানদিগের দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে, একটি কৃষিকার্য্য দ্বিতীয়টি গো-মাংস ভক্ষণ, যেখানে গুরুতর দুইটি স্বার্থ রহিয়াছে, সেখানে জাতির উন্নতির জন্যও তাহাদের চেষ্টা অনেক পরিমাণে বেশি। ইহার প্রমাণ সংগ্রহের জন্য আর অধিক দূরে যাইতে হইবে না। বঙ্গদেশে হিন্দুদিগের অপেক্ষা মুসলমান-দিগের গোধন যে অধিক তাহাই এ বিষয়ের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থল।

যাহারা বলেন, গোখাদকদিগের অত্যাচারেই গোকুল নির্ম্মূল হইতেছে তাহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, কুকুর, বিড়াল, শূকর, শৃগাল, ইত্যাদি যেসকল জন্তুর একবার একাধিক সন্তান প্রসব করে, আবার বৎসরে একবার যাহাদের সন্তা-নোৎপাদন হয়, অথচ যাহারা ভারতবাসীগণের অখাদ্য, তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হয় না কেন ? গরু তো একেবারে একটি মাত্র সন্তান প্রসব করে, পক্ষান্তরে উহার মাংস

বহুল পরিমাণে ভক্ষিত হয়, অথচ উহাদেরই বা বংশের এত উন্নতি কেন? ইহার অভ্যন্তরে কি কোন বৈজ্ঞানিক রহস্য নহে? যাঁহারা যুক্তিমার্গ বিচরণ করেন তাঁহাদের একবার এসব বিষয় চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

কোন কোন বিজ্ঞ সংবাদপত্র সম্পাদক এরূপ প্রস্তাবও উত্থাপন করিয়াছেন যে ভারতের হিন্দু রাজা ও জমিদারগণ তাঁহাদের অধিকারে গোবধ নিবারণ করিয়া দিলে গোবংশ অনেক অংশে রক্ষা পায়। আমরা বলি, আমাদের ন্যায় পরায়ণ সদাশয় ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট কি হিন্দুরাজা ও জমিদারদিগকে এরূপ অযথা ক্ষমতা প্রদান করিবেন? যদি এরূপই হয়, তাহা হইলে মুসলমান নবাব ও জমিদারগণ হিন্দুদিগের মধ্যে গায়েব জোরে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিতে পারেন। গোকুল রক্ষা অপেক্ষা হিন্দু বিধবাদিগকে পাপকার্য্য হইতে রক্ষা করা এবং ভ্রূণ হত্যা নিবারণ করা কোনরূপেই অল্প পুণ্যের কার্য নহে। আমাদিগের হিন্দু ভ্রাতাগণের বর্তমান গতিমতি দেখিয়া স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে, ইহারা কিঞ্চিৎমাত্র রাজ্য প্রাপ্ত হইলে প্রথমেই মুসলমানদিগকে গোমাংস হইতে বঞ্চিত করিবেন। তারপর মুসমানদিগের অন্যান্য ধর্ম্মকার্য্যগুলিও বন্ধ করিয়া দিবেন। ইহার স্পষ্ট প্রমাণ কাশ্মির এবং অন্যান্য হিন্দুরাজ্যে বর্তমান। হিন্দুদিগের এই সমস্ত অযথা আন্দোলন ও আবদার দেখিয়া স্পষ্টই অনুমান হইতেছে যে, মুসলমানদিগকে নির্য্যাতন করাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

উপসংহারকালে আমরা আর একটি কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, দেলদুয়ার হইতে একখানি মোসলমান সংবাদপত্র (আমরা কিন্তু মুসলমান সংবাদপত্র বলিতে প্রস্তুত নহি) বাহির হয়। কাগজখানির নাম "আহমদী", সম্পাদক আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী মুসলমান নামে পরিচিত। কিন্তু কাগজখানির ভাব, ভঙ্গি ও সম্পাদকের লিখন ভঙ্গি দ্বারা আমরা কোনরূপেই সম্পাদককে মুসলমান বলিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। বর্তমান বর্ষের আহমদীর প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় "গোকুল নির্ম্মূল আশঙ্কা" নামক একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, লেখক কে তাহা জানিনা, কিন্তু তিনি আপনাকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি এরূপ যাহার মনের ভাব, তিনি মুসলমান নহেন। মুসলমান বলিয়া তিনি কোনরূপেই দাওয়া করিতে পারেন না। এরূপ প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি খোদাতালার সত্যধর্ম্ম প্রচারকের আদেশ অমান্য করত নিশ্চয়ই কাফের হইয়াছেন। যদি তিনি ইহার প্রমাণ

আমাদিগকে দর্শাইতে বলেন, তবে খোদাতালার ফজলে আমরা নিশ্চয়ই তাহা প্রদর্শন করিব। আর যদি তিনি প্রবন্ধ লিখিয়া 'তওবা' করিয়া থাকেন, তবে খোদাতালার নিকট প্রার্থনা করি এই গুরুতর অপরাধীন যেন পরম দয়ালু খোদা-তালার ক্ষমার পাত্র হন। আর মুসলমান ভ্রাতাদিগকে আমরা বলি যে আপনারা এই প্রবন্ধকে মুসলমানের লিখা বলিয়া কোন ক্রমেই গ্রহণ করিবেন না এবং তাহাতে আস্থা প্রদর্শন করিবেন না। লেখকের হৃদয় সৎপথে চালিত হউক ইহাই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করুন। আমিন! আমিন!

প্রস্তাব লিখক আহমদীর বন্ধু আপনি যে উচ্চদরের লিখক, বাঙ্গালা ভাষায় যে আপনার অধিকার আছে তাহা স্বীকার করি, তাই বলিয়া আপনার কলমে যাহাই আসিবে তাহাই লিখিবেন ? অন্যায় কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। এসলামী ধর্ম্ম বিগর্হিত আপনার প্রস্তাবের প্রতিবাদ সম্বন্ধে আমাদের গোটাকত কথা লিখিতে হইল। ক্রটি মার্জনা করিবেন। মহোদয়! আপনি পাঁচ ছয় মাসের যোগাড়ে আবার গোকুল নির্ম্মূল আশঙ্কা সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়া বিগত ১৫ই পৌষ আহমদী মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আপনে যে সত্য-বাদীও ধার্ম্মিক তাহা বেশ প্রকাশ হইয়াছে।

প্রস্তাব লিখক !

আপনি লিখিয়াছেন, "আমার লিখিত প্রস্তাব আহমদীতে প্রকাশ হইলে "কোন কোন" সহযোগী উক্ত প্রস্তাবটি অবিকল উদ্ধৃত করিয়া গোকুল রক্ষার সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন সহযোগী উদ্ধৃত করিতে না পারিয়া আক্ষেপ সহকারে প্রস্তাবের পোষকতা করিয়াছেন।" মহাশয়! যাহা আপনি লিখিয়াছেন যদি উহা সত্য হয়, তবে আপনি ও তিনি এক ধর্ম্মাবলম্বী সন্দেহ নাই।

প্রস্তাব লিখক! আপনি লিখিয়াছেন, "কোন মহোদয় আহমদী সম্পা-দককে অযথা গালি দিয়া পত্র লিখিয়াছেন। কেহ আহমদী পত্রিকাতেই যাহা ইচ্ছা বলিয়া মনের আবেগ সান্ত্বনা করিয়াছেন।" মহাশয়! এসলামী ধর্ম্ম বিগ-র্হিত অন্যায় কথা শুনিয়া কোন মুসলমান সহ্য করিতে পারিবে ? যাহাদের ইমান আছে, যাহাদের মুসলমানী ধর্ম্মে বিশ্বাস আছে ভক্তি আছে, তাহারা আহমদী সম্পাদককে ও আপনাকে গালি না দিয়া থাকিতে পারিবে না। অধিক কি বলিব, ধর্ম্ম সম্বন্ধে মুসলমানগণ প্রাণকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া থাকে; ইহা তাহাদের

স্বভাবসিদ্ধ যদি মুসলমানের রাজ্য হইত তাহা হইলে আহমদী সম্পাদকের ও আপনার জীবন তিন দিবসের ছিল !"

প্রস্তাব লিখক ! আপনি লিখিয়াছেন, "কেহ লেখকদের প্রতি সন্দেহ করিয়া হিন্দু সাব্যস্তে কত কি ছাইভস্ম লিখিয়া সম্পাদকের নিকট কৈফত তলব করিয়াছেন।" মহাশয় ! আপনি সত্য বলিয়াছেন, ঐ প্রবন্ধ লিখককে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীবই কোন মুসলমান এসলামী ধর্ম্মাবলম্বী বলিতে পারেন কিনা সন্দেহ। এতাদৃশ এসলামী ধর্ম্ম বিগর্হিত প্রবন্ধ মুসলমানের কলমে কখানি আসিবে না এবং কোন মুসলমান লিখিতেও সাহসী হইবে না। এবারের প্রবন্ধেও আপনে ত্রুটি করেন নাই। এমন কি প্রকারান্তরে হিন্দুধর্ম্মের পিছেও লাগিয়াছেন। গরু জবহ করা যে এসলামী ধর্ম্ম সঙ্গত তাহা অনেকেই পবিত্র কোরাণ শরীফের আএত (প্রবচন) দ্বারা সপ্রমাণ করিয়া আপনাকে দেখাইয়াছেন, পবিত্র কোরাণ শরীফের দ্বারা যে কথা প্রমাণিত হয়, তাহা মুসলমান মাত্রেরই শিরোধার্য্য, ভরসা করি আপনি ও আপনার বন্ধু ব্যতীত জগতের কোন জাতি কোরাণ শরীফের প্রমাণকে ছাইভস্ম বলিতে সাহসী হইবেন না। যাঁহারা মুসলমান হইয়া পবিত্র কোরাণ শরীফের প্রমাণকে ছাইভস্ম বলিবেন তাঁহারা শরার ব্যবস্থানুসারে সে কাফের ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রস্তাব লিখক ! আপনি বিগত ১৫ই শ্রাবণের প্রবন্ধে এসলামী ধর্ম্মশাস্ত্রে যে আপনার বিশেষ অধিকার আছে, এ বিষয় আপনি একটি ছোটখাট দর্প করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই কোন কোন মুসলমান আপন আপন দাওয়া কোরণাদী দ্বারায় সপ্রমাণ করিয়াছেন। এবং আপনাকে তোবা করার কথা বলিয়াছেন যদি সেই প্রমাণ আপনার নিকট এসলামী ধর্ম্ম বিরুদ্ধ বিবেচনা হয় তবে আপনি এসলামী শাস্ত্রসঙ্গত প্রমাণ তাহাদিগকে দেখাইয়া দিলে তাঁহারা উহা অবশ্য সাদরে গ্রহণ করিবে, সত্যপ্রকাশ হয় এই তাঁহাদের ইচ্ছা। শুনিতে পাইলাম আপনি নাকি তাঁহাদের প্রতিবাদ পড়িয়া রাগান্বিত হইয়া উহার উত্তর লিখার কারণ কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং অনেক মৌলবী সাহেবের নিকট নাকি গরু জবহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া নিরাশ হইয়া রিক্ত সম্বলে পুনঃ দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। দীর্ঘকালের পর আবার আপনার লিখা ধর্ম্ম বিগর্হিত দ্বিতীয় একটি প্রবন্ধ বিগত ১২ই পৌষের আহমদীতে দেখিতে পাইলাম। উহা দৃষ্টে

আমার শিশুকালের একটি গল্প স্মরণ হইল দেখুন তো ন্যায় সঙ্গত কি না? উহা এই—কোন পথের ধারে হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ এক ব্যক্তি বাহ্যে বসিয়া খিরা খাইতে-ছিল। ঐ পথ দিয়া একটি চিকিৎসক যাইতেছিলেন। তিনি উহা দেখিয়া বলিলেন, ভাই! বাহ্যকালে কিছু খাইতে নাই। সে ব্যক্তি উহা শুনিয়া রাগান্ধ হইয়া বলিল, তুই এতবড় শক্ত কথা বলিলি। দেখ! আমি গু দিয়া খিরা খাইব, পরে তাহাই করিল। চিকিৎসক তাহাকে পাগল বিবেচনা করিয়া তাহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবেন!

প্রস্তাব লিখক আখবারে এসলামীয়া আহমদী সম্পাদককে লিখিযাছিলেন আপনার বন্ধু যিনি গোকুল নির্ম্মূল আশঙ্কা প্রবন্ধ লিখিযাছেন. তাঁহাব নাম কি, জানিতে ইচ্ছা কবি। তিনি তাঁহার কিছুই উত্তব দেন নাই. তদুত্তরে আপনি বলিতেছেন "সকলেবই জানা আবশ্যক যে প্রস্তাব লিখক ও সম্পাদক বাস্তবিকই ভিন্ন শরীর ও ভিন্ন আকৃতি।" মহাশয় চটিয়া উঠিবেন না, ভাল. বলুন তো দেখি! যদি আপনার কোন বন্ধু আপনাকে জিজ্ঞাসা করেন, ভ্রাতঃ! আপনাব ভ্রাতার নাম কি? যদি আপনি তাহার উত্তর না দেন আব আপনাব ভ্রাতা বলেন আর আমার ভ্রাতা বাস্তবিকই ভিন্ন শরীর ভিন্ন আকৃতি। তবে এই উত্তব ন্যাযসঙ্গত কিনা? এবং বক্তার গালে আপনি দুটা চড় মারিবেন কিনা? আহমদী সম্পাদক যে আপনার নাম লুকাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন, চাদরে ঢাকিয়া রাখিতে বাসনা করেন, উহাতে তাঁহার সুবুদ্ধির পরিচয় দিতেছে। লোকে বলে হাত ছোট আস্ত্র বড়—প্রমাদের কথা, সেদিন কথায় কথায় গোকুল নির্ম্মুল সম্বন্ধে উঠিল, তাহাতে আমাদের জনৈক বন্ধু বলিলেন আপনারা কি আহমদী সম্পাদকের বন্ধুকে চিনেন, যিনি গোকুল নির্ম্মুল সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন? আমরা বলিলাম—না। তিনি কহিলেন, সেই প্রবন্ধ লেখক সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এই অঞ্চলে আসিয়া-ছেন। আমি তাঁহাকে ভালরূপ চিনি। —তিনি একটী হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ ব্যক্তি, যদি আহমদী সম্পাদক বেড়ে আড়াই ফুট হন তবে তিনি অন্যূন পাঁচ ফুট হইবেন। যদি সম্পাদক দীর্ঘে তিন ফুট হন তবে তিনি অন্যূন চারি ফুট হইবেন। কিন্তু নাম বলিলেন না। মহাশয়! ধর্ম্ম বিরুদ্ধ প্রবন্ধ লিখিয়া কেনই বা মেয়েলোকের মত লুকাইয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন? এমন প্রবন্ধ লিখকের জীবনে ধিক না দিয়া কে থাকিতে পারিবে?

প্রস্তাব লিখক ! আপনি লিখিয়াছেন "আহমদী সম্পাদক ও পাক্কা মুসলমান।" তিনি যে পাক্কা মুসলমান তাহা এ অঞ্চলের অনেকেই অবগত আছেন। তিনি পাক্কা মুসলমানের ঔরষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। শুনিয়াছি তিনি নাকি আহমদী প্রকাশের পূর্ব্ব কতকদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম মন্দিরে উপাসনায় যাইতেন। মৎস্য, মাংস ছাড়িয়াছিলেন, নামাজ পড়িতেন না। পরে মুসলমান সমাজে তিনি ঘৃণিত হওয়াতেই হউক কি মনের ইচ্ছাতেই হউক কি মুসলমান সমাজে চলাচল করার জন্যই হউক কি মৎস্য মাংস পুনঃ রুচিবশতই হউক ঐ ধর্ম্ম ছাড়িযাছিলেন। বিগত ১৫ই শ্রাবণ আহমদী সম্পাদক সম্পাদকীয় স্তম্ভে যাহা লিখিয়াছেন, যাহার উত্তর আখবারে এসলামীয়াতে প্রকাশ হইয়াছে তাহা আপনার ও পাঠকগণের নিকট অপ্রকাশ নাই। এমন ব্যক্তি যদি পাক্কা মুসলমান হয়, তবে বলুন জগতে কাফের কে ? এইক্ষণ শুনিতে পাই আহমদী সম্পাদক নাকি নমাজ ছাড়িযাছেন। কয়েক দিবস হইল কলিকাতা অঞ্চল হইতে একটি হিন্দু বক্তা করটিয়া জমিদার বাটিতে আসিযাছিলেন, সেই উপলক্ষে জমিদার বাটিতে একটী সভা আহুত হয়। সে সভায় আহমদী সম্পাদকের আগমন হয়। মুসলমানগণ সভা হইতে উঠিযা আছরের নমাজ পড়িতে গেলেন, আহমদী সম্পাদক রিক্ত মস্তকে শালগ্রাম প্রস্তরের ন্যায় সভা মধ্যে বসিয়া রহিলেন।

প্রস্তাব লিখক ! আপনি লিখিয়াছেন, "মন স্বাধীন, লিখনিও স্বাধীন, কিন্তু বাধা অনেক, আশঙ্কা অনেক।" মহাত্মন ! যদি কেহ কোন কার্য্য করিতে উদ্যত হয়, তবে ঐ কার্য্য ন্যায়সঙ্গত হইলে যদি কোন প্রতিবন্ধক হওয়ার কারণ সে কার্য্য সম্পাদিত হইতে না পারে তবে সেই প্রতিবন্ধককে বাধা বলে। কোন ভয়ে সেই কার্য্য সম্পাদিত হইতে না পারিলে তাহাকে আশঙ্কা বলে। ভরসা করি ইহা আপনারও স্বীকার্য্য। যদি কেহ বাধা ভয় না মানে, মন স্বাধীন বিবেচনায় মনে যাহা লয় তাহাই করে, তাহাই বলে, তাহাই লিখে, তাহা হইলে পাগলবই তাহাকে কি বলা যাইতে পারে। অতএব মনে যে কথাই উদয় হয় ঐ কথা সাংসারিক উপকারী কি অনুপকারী, হিত কি অহিত ভাল কি মন্দ, সৎ কি অসৎ প্রথম বুদ্ধির বিচারালয় উপস্থিত করিবে। যদি বুদ্ধির বিচারে সে কথা অসঙ্গত হয়, তবে তাহা কখনই করিতে নাই। যদি সঙ্গত হয়, তবে ঐ কথা দ্বিতীয়বার ধর্ম্মের বিচারালয়ে

উপস্থিত করিবে। ধর্ম্মের বিচারে যদি উহা অসঙ্গত হয়, তবে উহা পরিত্যাজ্য, সঙ্গত হইলে অমনি সে কথা জীবনে পরিণত করিবে। যিনি প্রথম বিচারের অন্যথা করিবেন, তাঁহাকে পাগলবই কি সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে? যিনি দ্বিতীয় বিচারের অন্যথা করিবেন তিনি কথা বিশেষ কাজ বিশেষে পাপী, বিধর্ম্মী, কাফের বলিয়া অভিহিত হইবেন। এইক্ষণ আপনার মন কিরূপ স্বাধীন জানিতে ইচ্ছা করি।

গোমাংস

প্রস্তাব লিখক! আপনি লিখিয়াছেন, "খাদ্য, অখাদ্য, সুখাদ্য।" আপনি এইরূপে ক্রমশঃ যে খাদ্যদ্রব্যের বিভাগ করিয়াছেন, গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখুন, উহাতে আপনার মোটা ভুল হইয়াছে কি না? আমরা বলি সাধারণ খাদ্য, সাধারণ অখাদ্য। যাহা খাওয়া যাইতে পারে তাহা সাধারণ খাদ্য। যাহা খাওয়া যাইতে না পারে তাহা সাধারণ অখাদ্য। সাধারণ খাদ্য দুইভাবে বিভক্ত, খাদ্য অখাদ্য, ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে যাহা খাওয়া সিদ্ধ তাহাই খাদ্য। যাহা খাওয়া অসিদ্ধ তাহা অখাদ্য। আবার ঐ খাদ্যদ্রব্য দুইভাগে বিভক্ত। সুখাদ্য ও কুখাদ্য। সুস্থাবস্থায় যাহা খাইলে শরীরের উপকার ব্যতীত অপকার না জন্মে, তাহাই সুখাদ্য। যাহা খাইলে শরীরের অপকার না জন্মে, তাহাই কুখাদ্য। মহোদয়! জগতের সকল সভ্যজাতিই এক একটি ধর্ম্ম বজ্জুতে আবদ্ধ আছেন। সকলেই আপন আপন ধর্ম্মানুসারে খাদ্যাখাদ্যের বস্তু ঠিক করিয়া লন। তাহাতে কাহারও কথা চলে না। কাহারও তর্ক চলে না। অতএব যখন আমাদের পবিত্র কোরাণ শরীফে গোমাংস সেবনের ও গরু কোরবানি করণের বিধি স্পষ্ট লিখিত আছে, তখন গোমাংস যে আমাদের খাদ্য ইহা অভ্রান্ত মনে বিশ্বাস করিয়া গোমাংস সেবন করিয়া থাকি। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে উহা কখন বা সুখাদ্য কখন বা কুখাদ্য পরিণত হয়। আহমদী সম্পাদক যেরূপ শীর্ণদেহ ক্ষীণকায় তাঁহার মত লোকের পক্ষে গোমাংস সেবন করা অবশ্য কুখাদ্যের মধ্যে পরিণত হইবে। তাই বলিয়া কি পবিত্র কোরাণ শরীফের বিধি উড়িয়া যাইবে?

প্রস্তাব লিখক! আপনি লিখিয়াছেন "এইক্ষণে কথা এই যে দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া খাদ্যের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।" মহাশয় দেখা যাউক আপনার এই যুক্তি কতদূর ন্যায়সঙ্গত। দেশ বিবেচনাই যদি খাদ্যের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য

হয়, তবে ভারতবাসী হিন্দু, মুসলমানগণ যখন শীতপ্রধান দেশ ইউরোপে গমন করিবেন তখন তাঁহাদের শরাব, শূকর, গোমাংস ইত্যাদি সেবন করা কর্ত্তব্য হইবে। আবার যখন শীতপ্রধান দেশবাসী ইউরোপীয় মহাপুরুষগণ ভারতে আগমন করিবেন তখন তাঁহাদের চাল, ডাল, কাঁচকলা ইত্যাদি সেবন করা কর্ত্তব্য হইবে। এই যুক্তিটি ভারতবাসী হিন্দু, মুসলমান ও ইউরোপীয মহাপুরুষগণের পক্ষে মন্দ হয় নাই।

২। কেবল কাল বিবেচনাই যদি খাদ্যের ব্যবস্থা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে শীতকালে ভারতবাসী হিন্দু মুসলমানগণের শরাব, শূকর, গোমাংস সেবন করা কর্ত্তব্য। আবার গ্রীষ্মকালে উহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য হইবে। প্রস্তাব লিখক এই যুক্তি দিয়া ভারতবাসী হিন্দু মুসলমানের যে আশীর্ব্বাদের পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

৩। কেবল পাত্র বিবেচনাই যদি খাদ্যের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে ভারতে হিন্দু মুসলমান মধ্যে যাহারা আহমদী সম্পাদকের ন্যায় দুর্ব্বল ক্ষীণকায় তাহাদের পক্ষে শূকর, শরাব, গোমাংস না খাওয়া কর্ত্তব্য। আবার ভারতের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যাহারা হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ তাহাদের পক্ষে শূকর, শরাব, গোমাংস খাওয়া কর্ত্তব্য। প্রস্তাব লিখক এই যুক্তি দিয়া যে ভারতের হিন্দু, মুসলমানের আলিঙ্গনের পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ কি? ধন্য তাঁহার যুক্তি শক্তি। যদি বলেন দেশ, কাল, পাত্র সম্বন্ধে পৃথক পৃথক মীমাংসা না করিয়া একত্র মীমাংসা করা কর্ত্তব্য, মানিলাম। তাহা হইলেও তাহার ফল এইরূপ দাঁড়াইবে যে, ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমানগণ ইউরোপে গেলে তাঁহাদের মধ্যে ও ইউরোপীয়গণের মধ্যে যাঁহারা দুর্ব্বল যাহাদের পরিপাক শক্তি নিস্তেজ তাহাদের ব্যতীত সকলেরই শরাব, শূকর, গোমাংস ইত্যাদি সেবন করা কর্ত্তব্য হইবে। আবার ইউরোপ হইতে যে সকল মহাপুরুষগণ ভারতবর্ষে আগমন করিবেন তাঁহাদের ও ভারতের হিন্দু, মুসলমানগণ মধ্যে শীতকালে যাহারা শক্তিহীন যাঁহাদের পরিপাক শক্তি অতি কম, তাঁহাদের ব্যতীত সমস্তেরই শরাব, শূকর, গোমাংস ইত্যাদি খাওয়া আবশ্যক হইবে। এইরূপ যুক্তিটিও ভারতবাসী হিন্দু মুসলমানগণের পক্ষে মন্দ হয় না।

আমরা বলি যাহার যে ধর্ম্ম সেই ধর্ম্মানুসারে প্রথম তাহার খাদ্যের জিনিস সকল নির্ণয় করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। পরে দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় ঐ সকল

জিনিস মধ্যে যে সকল দ্রব্য যে দেশে যে সময় যাহাদের পক্ষে উপকারী তাহাই তাহাদের সেব্য যাহা অপকারী তাহাই অসেব্য।

প্রস্তব লিখক! আপনি লিখিয়াছেন, "যে মৌলবী সাহেব গোমাংসের জন্য এত লালায়িত, এক টুকরা গোমাংসের জন্য এত জেদ এত প্রতিবাদ ধর্ম্মত বলুন তো প্রতিদিন দুবেলা কি তাহা খাইয়া থাকেন? প্রতি সন্ধ্যা কি গোমাংসে ক্ষুধা নিবৃত্ত করেন? না প্রতি সন্ধ্যাতে গোমাংস ব্যঞ্জনে অন্ন রঞ্জিত করিয়া থাকেন? না সপ্তাহে দুদিন কি একদিন গোমাংসের স্বাদে রসনা পরিতৃপ্ত করেন? না প্রতি সন্ধ্যা খাইতে ইচ্ছা করেন? ধর্ম্মের দোহাই মিথ্যা বলিবেন না।" মহাশয় কোন মৌলবী সাহেব গোমাংসের জন্য লালায়িত নহেন, গোমাংসের জেদে প্রতিবাদও করেন না, প্রতিদিন প্রতি সন্ধ্যা তাঁহারা যে গোমাংস খাইয়া থাকেন একথা কোন মৌলবী সাহেব লিখেন নাই ও বলেন নাই। গোমাংস বলিয়া কথা কি, আপনি ধর্ম্মত বলুন তো আজ যে যে ব্যঞ্জনে অন্ন রঞ্জিত করিয়াছেন প্রতিদিন কি প্রতিসন্ধ্যায় তাহা কি খাইয়া থাকেন? কখনই নয়। বিগত ১৫ই শ্রাবণের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেখুন তাহাতে আপনি কত ধর্ম্ম বিগর্হিত কথা লিখিয়াছেন, সে কথা কি দুমাস ছমাসেই ভুলিয়াছেন? মহামান্য পবিত্র কোরাণ শরীফে খোদা-তালা আদেশ করিয়াছেন, "তোমরা গোমাংস সেবন কর।" আপনি লিখিয়াছেন, "আমরা যেন আর গোখাদক বলিয়া অভিহিত না হই।" তজ্জন্যই মৌলবীগণ আপনার প্রতি কাফেরের ফতওয়া দিয়াছেন। আপনি ধর্ম্মত বলুন তো কখনও গোমাংসের ব্যঞ্জনে আপনার অন্ন রঞ্জিত হইয়াছে কি না? গোমাংসের সুরুয়া ঢালিয়া লইয়াছেন কিনা? বাটী ভরা গোমাংস না পাইলে ক্রোধে জ্বলিয়া ছার-খার হইয়াছেন কিনা। এখনও মধ্যে মধ্যে চুপেচুপে গোমাংসের বাটীর সামনে গমনাগমন করেন কিনা? যাহারা কুড়ি ত্রিশ বৎসর গোমাংস সেবন করিয়া প্রকাশ্যে গোমাংসের নিন্দা করে তাহাদিগকে ধিক্! শতধিক্।

মৌলবী সাহেবগণ বলেন, পবিত্র কোরাণ শরীফের ব্যবস্থানুসারে গোমাংস সেবন করা মুসলমানের পক্ষে হালাল। কোরবানি করাও হালাল। গোমাংস খাইলে যাহার শারীরিক উপকার হয় তাহার খাওয়ায় বাধা নাই, না খাইলেও পাপ নাই, আবার গোমাংস খাইলে যাহার শারীরিক অপকার হয়, তাহার না খাওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু গোমাংস ও কোরবানিকে হালাল বিশ্বাস করা মুসলমান মাত্রেরই

উচিত। যিনি মুসলমান হইয়া উহা হালাল না জানেন তিনি কাফেরের মধ্যে পরিগণিত, এই এসলামী ধর্ম্মের সার ব্যবস্থা।

প্রস্তাব লিখক। আপনি লিখিয়াছেন "প্রকৃতি কাহারও নিকট কোন উপদেশ লইয়া কোন কার্য্য করে না। স্বভাবের বৈপরিত্তও সহজে ঘটে না জোর জোববান ঘটাইবার চেষ্টা করিলেও টেঁকে না।" মহাশয় যিনি কেবল আপনার এই মন্ত্রে দীক্ষিত, তিনি নাস্তিক। যাহারা নাস্তিক তাহাবা এসলামীয়া ধর্ম্মানুসারে কাফের। তাহারা কখনই মুসলমান বলিযা গণনীয নহে। আপনার এই মন্ত্রটি যদি কেহ কাহাব পরিবারবর্গকে শিখাইয়া দেয়, এবং বলিয়া দেয় যে তোমাদের স্বভাবে যাহা লয তাহাই কব কোন বাধা বিঘ্ন মানিও না। তবে তাহাব বাটিতে অনতিবিলম্বে কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে কিনা? আবার যাহারা ঐ মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন যদি তাহারা তাহাদের পবিবাবকে পিনজব পাখীর ন্যায় আবদ্ধ রাখেন তবে তাহাদের প্রকৃতির আদেশ ভঙ্গ হয় কিনা?

প্রস্তাব লিখক! যাহারা গোমাংস সেবন করে তাহারা তো আপনার কথানুসারে প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন কবিয়া থাকে। মানিলাম! ভাল বলুন দেখি যাহারা গোবংশগুলাকে জবরদাস্ত ক্রমে বাঁধিয়া রাখিয়া তাহাদের জীবিকা কাড়িয়া খায়, তাহারা প্রকৃতিব নিয়ম ভঙ্গ করে কিনা? আফসোস! খোদরা ফজিহত। দগররা নছিহত।

প্রস্তাব লিখক। আপনি লিখিযাছেন, "যে দেশে যাহা প্রয়োজন, সে দেশের জন্য করুণাময ভগবান অপর্য্যাপ্তরূপে তাহা দান করিয়াছেন। মহাশয়! আপনাব এই কথা স্বীকার্য্য। সেইজন্যই ভারতে মুসলমানগণ গরু খাইয়া থাকেন। কেননা খোদাতালা ভারতে অপর্য্যাপ্তরূপে গরু সৃষ্টি করিয়াছেন। দেখুন প্রায় সহস্র বৎসরাবধি মুসলমানগণ গরু খাওযা সত্বেও ভারতে গরুর কোন অংশেই ন্যূনতা নাই। সে দিগেই চাওয়া যায় সেইদিগেই শত শত গরু দৃষ্টিগোচব হয়। অতএব এদেশে গরু খাওয়া যে খোদাতালার অভিপ্রায় তাহা আপনার লিখাই প্রমাণ করিতেছে। যাহারা গরু খাওয়া নিষেধ করেন তাহারা খোদাতালার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। নউজ্জ বেল্লা মেন্‌হা!

প্রস্তাব লিখক! আপনি লিখিয়াছেন "আর চাই কি? দশটি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তির পরিচয় লইয়া দেখিবে তাহার মধ্যে কয়জন হিন্দু আর কয়জন মুসলমান।" মহাশয়! আমরা বোধ করি মুসলমানের সংখ্যা অধিক হইবেক না, গোমাংসের

গুণ অধিক কি দেখাইব, ভাল আপনি দশজন পুরুষত্বহানি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পরিচয় লইয়া দেখুন, তন্মধ্যে কয়জন হিন্দু কয়জন মুসলমান। পিত্তশূল পীড়িত দশজন লোকের পরিচয় লইয়া দেখুন কয়জন হিন্দু কয়জন মুসলমান। দশজন গৃহিনী রোগাক্রান্ত মেয়েলোকের পরিচয় লইয়া দেখুন কয়জন হিন্দু ও কয়জন মুসলমান। অতএব হালালী বস্তুর অসীম গুণ। ভরসা করি যাহার উদরে মোরগের বাণ, গো-মাংসের স্বরুয়া একবার প্রবেশ করিয়াছে সে এ-ভবে ভুলিবার নয়।

প্রস্তাব লিখক! আপনি লিখিয়াছেন "ভ্রাতাগণ! সেই হাকিমানের বস্তু বিচার গ্রন্থে গোমাংসের গুণাগুণ কিরূপ বর্ণিত হইয়াছে অনুগ্রহ করিয়া এক-বার পাঠ করিয়া দেখিবেন, যদি মূর্খতাদোষে সে গ্রন্থ পাঠের শক্তি না থাকে, তবে কোন হাকিমকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন।" মহাশয় এই লিখানুসারে ইউনানি হেকিমী বিদ্যায় যে আপনার বিশেষ অধিকার আছে ইহাই প্রকাশ পাইতেছে। প্রথম আপনি হাকিমী ও ডাক্তারী মতানুসারে গোমাংসের গুণাগুণ ও দুগ্ধের গুণাগুণ আগামীবারে আহমদীতে প্রকাশ করুন। এবং তাহা কোন কেতাবের কত অধ্যায় লিখিত আছে তাহা লিখিয়া দেউন, তৎপর যাহাদিগকে আপনি মূর্খ বলিয়া নির্দ্দেশ করত দর্প করিয়াছেন তাহাদের কথা পরে শুনিবেন।

পাঠক! প্রস্তাব লিখকের প্রবন্ধটি নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। ঐ সম্বন্ধে আপনাদের মতামত লিখিবেন, আগামীতে আখবারে প্রকাশ হইবে।

(প্রতিবাদ সমাপ্ত)

পরিশেষে লিখকের কয়েকটি কথা

১। প্রতিবাদকারী মহাশয়গণ লিখকের নাম, ধাম, পরিচয়, আহমদী সম্পাদক নিকট তলব করায় সম্পাদকের অনুরোধে লিখক পরিচয় দিতেছে।

২। আখবারে এসলামীয়া সম্পাদক লিখকের পরিচয় আভাবে "সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এদেশে আস।" যে লিখিয়াছেন, তাহা নহে। অদৃষ্টের চক্রে এবং অন্নজলের আকর্ষণে সামান্য দাসত্ব স্বীকারে, গৌরী, পদ্মা, যমুনা, পার হইয়া সপরিবারে এ অঞ্চলে আসিয়াছে। নিবাস—বঙ্গরাজ্য মধ্যস্থিত বিখ্যাত নদীয়া জেলার অন্তর্গত সাবডিবিজান কুষ্টিয়ার অতিনিকট সামান্য পল্লী লাহিনী-পাড়া গ্রামে জন্মস্থান—যৎসামান্য বাসকুঠির বর্ত্তমান।

৩। এসলামীয়া সম্পাদক ও তাঁহার বহুরূপী বন্ধু, যিনি, কখনও মৌলবী, মূহুর্ত্ত পরেই মুন্সী, চার পাঁচ ছত্র পরেই আবার সুফি পরিচয় দিয়া লিখককে কাফের সাব্যস্ত করিয়াছেন, মুরুব্বি-য়ানা মতে "তওবা" করিবারও উপদেশ দিয়াছেন।

৪। টাঙ্গাইলের অবৈতনিক কাজী এবং নেকাহ্ তালাকের সাক্ষী গোপাল মৌলভী সুলতান আহাম্মদ সাহেব বিগত ২রা ভাদ্র শুক্রবার দিবা দ্বিপ্রহর তিনটার সময়, সাবডিপুটী মৌলবী সফাউদ্দিন সাহেবের বাসাবাটিস্থ কয়েক সপ্তাহস্থিত, মোসলমান ধর্ম্মসভার সভ্যগণ সম্মুখে গোকুল নির্ম্মূল প্রস্তাব বিষয়ে উল্লেখ করিয়া লিখককে "কাফের" এবং স্ত্রী "হারাম" হওয়া সাব্যস্ত করিয়া উপস্থিত সভ্যগণকে বুঝাইয়া সমস্ত ব্যক্ত করেন। আরও বলেন যে, "যদি কোন মোসলমান ঐ প্রস্তাব লিখিয়া থাকেন তবে তিনি "তওবা" করুন।" সে সময় লিখকের নাম অপ্রকাশ। কিন্তু লিখক সে ধর্ম্মসভায় উপস্থিত। কিন্তু কোন বাদ প্রতিবাদ করে নাই। —মাত্র বলিয়াছিল বিষয়টি বড়ই গুরুতর, বিবেচনা করিয়া আপনার এইমত প্রকাশ্য পত্রিকায় প্রকাশ করিলে ভাল হয়। অবশ্যই প্রস্তাব লিখকের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

৫। এইক্ষণে লিখক এসলামীয়া সম্পাদক মৌলবী নইমুদ্দীন ও তাঁহার বহুরূপী বন্ধু এবং অবৈতনিক কাজী সুলতান আহাম্মদ খাঁ সাহেবকে এতদ্বারা জ্ঞাপন করিতেছে যে, তাহারা গো-জীবনের কোন কোন প্রস্তাবের, কোন কোন শব্দে লিখককে কাফের ও তাঁহার স্ত্রী হারাম হওয়া স্থির সিদ্ধান্ত, করিয়াছেন, সেই সেই স্থানের সেই সেই শব্দ বা উক্তি বিশেষরূপে নিদৃষ্ট করিয়া অদ্য হইতে ত্রিশদিনের মধ্যে লিখকের প্রতিনিধি টাঙ্গাইল মুন্সেফী আদালতের উকিল শ্রীযুক্ত বাবুহরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিকট প্রেরণ করুন এবং এসলামীয়া পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

৬। সুবিজ্ঞ মুসলমান ভ্রাতাগণ! গো-জীবনের আদি-অন্ত মনোসংযোগ পাঠ করিয়া কোফরে কালামের পদগুলি নির্ণয় করত প্রকাশ করিয়া লিখককে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করুন। ইহাই লিখকের সাম্নয়ে প্রার্থনা।

৭। "কাফের" ও "স্ত্রী হারাম" দুইটি কথা যেমনই হৃদয় বিদারক, তেমনি ভয়ানক। লিখকের মনে বিশেষ আঘাত লাগিয়াছে। যথার্থ মোসলমান ভিন্ন

সে আঘাতের বেদনা, অন্য কোন সম্প্রদায় অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন কিনা সন্দেহ। স্ত্রী বর্জ্জিত—বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। এ বেদনা এ যাতনা স্ত্রী, প্রিয়জন মাত্রেই সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন।

৮। ঘোড়াশাল স্কুলের প্রথম শিক্ষক মহাশয় প্রতিবাদ ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া ৫ম ভাগ ৬ষ্ঠ সংখ্যা আখবারে এসলামীয়া মাসিক পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, "গোকুল নির্ম্মূল আশঙ্কা প্রস্তাবের প্রতিবাদ আহমদী পত্রিকায় প্রকাশ জন্য পাঠান হইয়াছিল, সম্পাদক তাহা প্রকাশ করেন নাই।" যদিও এক্ষেত্রে সম্পাদক নিরব। কিন্তু লিখক বলিতেছে, এবং চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেছে ১৫ই আশ্বিন ৫ম সংখ্যার আহ্‌মদী দৃষ্টি করুন। ভ্রম দূর হইবে। শিক্ষক মহাশয়ের লিখিত প্রতিবাদ লিখক বিশেষ মনোসংযোগের সহিত পূর্ব্বেই পাঠ করিয়াছিল, গো-জীবন মুদ্রাঙ্কন সময়েও পাঠ করিয়াছে—গৃহীত প্রতিবাদ হইতে তাহাতে বিশেষ কোন নূতন কথা নাই বলিয়া গো-জীবনে গৃহীত হইল না। শিক্ষক মহাশয় ক্ষমা করিবেন।

৯। দয়াময় ভগবানের অনুগ্রহ হইলে এই গো-জীবন শীঘ্রই আরবী, ফারসী, উর্দ্দু এবং হিন্দী ভাষায় অনুবাদিত হইয়া পবিত্রধাম মক্কা মোয়াজ্জমায় পূণ্যক্ষেত্রে বোগদাদে, মোসলমান রাজ্য প্রধান প্রদেশ তুরস্কে, হায়দারাবাদে, ঢোকে, দিল্লীতে এবং আজমীর শরীফে প্রেরণ করিয়া তথাকার প্রধান প্রধান মৌলবী মৌলনা, মহামতিগনের মতামত সংগ্রহ করিয়া যত সত্বরে হয় পুনঃ প্রকাশ হইবে। সর্ব্বশক্তিমান ভগবানই লিখকের রক্ষক। সেই অদ্বিতীয় জগত-নিধান জগতপতি জগদীশ্বরই লিখকের আশ্রয়।